বাংলার ছোটগল্প

বাংলার ছোটগল্প

পঞ্চম খণ্ড

সম্পাদনা

ড. বিজিত ঘোষ

প্রকাশ
৯এ নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

BANGLAR CHHOTO GALPA
Collection of Bengali Short Stories
5th Volume
Edited by
Dr Bijit Ghosh

Price Rs 100/-

প্রচ্ছদঃ সুনীল শীল

ISBN 81 7332 377 9

দাম ঃ ১০০ টাকা

পুনশ্চ, ১১৪ এন ডাঃ এস. সি. ব্যানার্জী রোড, কলকাতা - ৭০০০১০ থেকে
সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং ডটলাইন প্রিন্ট অ্যান্ড প্রসেস ১১৪ এন
ডাঃ এস. সি. ব্যানার্জী রোড, কলকাতা-৭০০ ০১০ থেকে মুদ্রিত।

'কিছু বা সে মিলন মালায় যুগল গলায় রইবে গাঁথা,
কিছু বা সে ভিজিয়ে দেবে দুই চাহনির চোখের পাতা।'

বীথিকা-স্বপন-কে

প্রাসঙ্গিক কয়েকটি কথা ঃ পঞ্চম খণ্ড

পঞ্চম খণ্ড শুরু করেছি বিশিষ্ট গল্পকার অসীম রায়কে দিয়ে। তাঁর অসামান্য গল্প 'শ্রেণীশত্রু' সহ 'অনি', 'পদযাত্রা', 'তরমুজ', 'প্রতিপক্ষ', 'প্রেমের হাল কে বোঝে শালা'; কৃষ্ণ চক্রবর্তীর 'মেঘু', 'শহীদ', 'তুলসী', 'রাত্রি শেষে'; মিহির সেনের 'আলোয় শুধু'; সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'রাণীর ঘাটের বৃত্তান্ত', 'কালবীজ', 'মৃত্যুর ঘোড়া', 'সূর্যমুখী', 'গাজনতলা', 'ইন্তি পিসি ও ঘাটবাবু'; বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বঙ্গ আমার জননী আমার', 'নৌকাবিলাস', 'তোপ', 'কালবেলা', 'জুয়া', 'বাঘনখ', 'কুকুর', 'বেস্পতির এক বাবু ছিল', সৌরি ঘটকের 'হারেমের ভাত', কবিতা সিংহের 'খিদে', 'বৃহন্নলা', 'শূন্যগর্ভ', 'অন্য চোখে জাগে', 'খেলতে খেলতে একদিন', 'চিত', 'তিন তাসের খেলা', 'বয়সের কথা' র বাইরেও চিত্ত ঘোষালের 'দারা সুত পরিবার', 'আলোর চোখ', 'কেষ্টপদর গল্প', 'ভবনাথের কালীপুজো', 'পিতা', 'ঈশ্বরের মৃত্যু' প্রভৃতি গল্পের কথা মনে পড়ছে।

সমকালে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের 'বিপ্লব ও রাজমোহন', 'বিজনের রক্তমাংস', 'ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী', 'মীরাবাঈ', 'আশালতা', প্রভৃতি গল্পগুলি। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সাক্ষীডুমুর গাছ', 'সহদেব', 'পরী', 'মহাকাল কেবিন', 'তারা গুনতির দেশে', 'কন্দর্প', 'অন্নপূর্ণা', 'যুদ্ধ', 'নৃপেনদের বাড়ী', 'চন্দনেশ্বরের মাচানতলায়' গল্পগুলি তো অনন্যসাধারণ। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মুহূর্ত' ও শোকমিছিল' গল্প দু'টি সমসময়ে সাড়া ফেলেছিল।

এছাড়া পূর্ণেন্দু পত্রীব 'অন্ধকারে নিশিকান্ত', মতি নন্দীর 'শবাগার', 'তাপের শীর্ষে', 'ছটা পঁয়তাল্লিশের ট্রেন', 'টুপু কখন আসবে', 'একটি মহাদেশের জন্যে', উৎসবের ছায়ায়', 'শেষ বিকেলের দুটি মুখ', 'দুর্ঘটনা', 'সুখী জীবন লাভের উপায়', অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'এক হাত গন্ডারের ছবি', 'দ্য গ্রেট ক্যালক্যাটা শো', 'রাজা গোপালের আত্মচরিত', 'আমাকে বাঁচান', 'বৃষ্টির পরে', 'ডেথ ডেথ খেলা', 'শাদা অ্যাম্বুলেন্স', 'মানিকলালের জীবনচরিত', 'রাজার টুপি', অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'নচিকেতা জানিতে চাহিলেন', 'কোন এক লেখক বন্ধুকে' গল্পগুলির অনন্যতা স্বীকার করতেই হয়।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গরম ভাত ও নিছক ভূতের গপ্পো', 'খরা', 'দেবদূত অথবা বারোহাটের কানাকড়ি', 'রাণী ও অবিনাশ', 'সাতঘরিয়া', 'মহাপৃথিবী', 'ইরফান আলি দু'নম্বর', 'শাহজাহান ও তার নিজস্ব বাহিনী' গল্পগুলি তো ইতিমধ্যেই যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে পাঠক-হৃদয়ে।

অসীম রায়ে শুরু হয়ে এ-কালের অন্যতম প্রধান কথাকার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে এই খণ্ডটি শেষ হয়েছে। এখানে মোট গল্পের সংখ্যা ৩৮। লেখদের জন্মসনের প্রেক্ষিতে এই খণ্ডের সময়সীমা ১৯২৭ থেকে ১৯৩৪।

পুনশ্চ ঃ বিশেষ উৎসাহী / আগ্রহী সহৃদয় পাঠকদের জ্ঞাতার্থে কয়েকটি কথা। দশ খণ্ডের 'বাংলার ছোটগল্প' গ্রন্থের **কেবলমাত্র প্রথম খণ্ডেই রয়েছে বাইশ পৃষ্ঠার একটি তথ্য-সমৃদ্ধ দীর্ঘ ভূমিকা।** সেখানে আছে বাংলা **গদ্যের সূচনা, গদ্যগ্রন্থ, গদ্য-সাহিত্য, আদি-গল্প, গল্প;**
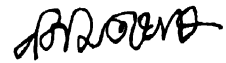
ছোটগল্পের আবির্ভাব : তার **জন্ম ও উৎস সন্ধান, সংজ্ঞা** ইত্যাদি বিষয়ের উপর দীর্ঘ আলোচনা। আছে অসংখ্য ছোটগল্প সৃষ্টির অনিবার্য প্রেরণা হিসেবে অপরিহার্য পটভূমি-সমূহের (ভারতবর্ষের বহু বিচিত্র সামাজিক পরিস্থিতি, নানা ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-সংঘাত-সংঘর্ষ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-লাভ, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের নানাবিধ সমস্যা, সংকট ইত্যাদি) তথ্য ও প্রমাণ সহযোগে বিস্তৃত বিশ্লেষণ।

বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহা মন্বন্তরে ভেঙে পড়া বাংলার সমাজ-অর্থনীতি, **দেশভাগ, খণ্ডিত-স্বাধীনতা-প্রাপ্তি, উদ্বাস্তু-স্রোত**; সেই মহা-প্রলয়ের সময়ের জীবন্ত ছবিও (এক-একটি কালজয়ী গল্পের সঙ্গে যে পটভূমির অঙ্গাঙ্গী যোগ) প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় আমি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

আগস্ট-আন্দোলন, ১৯৪৬-এর ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা তথা '**গ্রেট ক্যালক্যাটা কিলিং**' আর ঠিক তার পরই **তেভাগা আন্দোলন**; পরবর্তীকালে '**নকশাল আন্দোলন**', '**জরুরী অবস্থা**', বার বার বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির উত্থান—এ-সব কিছুই বাংলার গল্পকে দিয়েছে নতুন প্রাণ। তারও অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সেখানে করেছি আমি।

আবার বিভিন্ন সাহিত্য-আন্দোলন ('**কল্লোল**', '**শ্রুতি**', '**হাংরি জেনারেশন**', '**শাস্ত্রবিবোধী সাহিত্য আন্দোলন**', '**এই দশক**', '**নিম সাহিত্য-আন্দোলন**', '**নতুন রীতির গল্প আন্দোলন**' ইত্যাদি); লেখক-পাঠক-সম্পাদক-প্রকাশকের ছোটগল্প ব্যাপারে দায়িত্বহীনতা ও দাযিত্বের কথা; সর্বোপরি পাঠকের কাছে সে-কাল ও এ-কালের ছোটগল্পের প্রতি আকর্ষণ-বিকর্ষণের সম্ভাব্য কারণগুলিও বিশ্লেষিত হয়েছে সেই ভূমিকায়।

তাই, উৎসুক শ্রদ্ধেয় পাঠক সেটি একবার দেখে/পড়ে নিলে সম্পাদকের শ্রমের ভার কিছুটা লাঘব হবে।

(ড. বিজিত ঘোষ)

সূচীপত্র

অসীম রায়	ধোঁয়া-ধুলো-নক্ষত্র	১১
কৃষ্ণ চক্রবর্তী	পা-টা নামিয়ে বসুন	২০
মিহির সেন	সিদ্ধবাক	২৫
সুলেখা সান্যাল	ঘেন্না	৩২
অজিত মুখোপাধ্যায়	নতুন মানুষ	৪১
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	ভালোবাসা ও ডাউন ট্রেন	৫২
ব্রজেন মজুমদাব	গৃহবধূ স্বপ্না	৫৯
বরেন গঙ্গোপাধ্যায়	বজরা	৬৫
সৌরি ঘটক	অবণ্যের স্বপ্ন	৭৩
শৈবাল চক্রবর্তী	দশাননের পঞ্চানন	৮৩
কালিদাস রক্ষিত	অপরাজেয়	৮৯
গুণময মান্না	সাক্ষী	৯৪
ইন্দ্র মিত্র	বিশদ চিঠি	৯৯
অজিতেশ ভট্টাচার্য	খড়্গ	১০৫
কবিতা সিংহ	একটি অশুচি মেয়ের গল্প	১১১
সুচরিত চৌধুরী	একরাত	১২৪
চিত্ত ঘোষাল	বয়সের কথা	১৪৩
কার্তিক লাহিড়ী	অনাগত	১৫৩
মিহির মুখোপাধ্যায়	নীল অপরাজিতা	১৬২
আলাউদ্দিন আল আজাদ	ছাতা	১৮২
নিমাই ভট্টাচার্য	বিসর্জন	১৯১
সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়	এখানে সকলে একপ্রকার কুশলে আছি	২০১
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়	রাখাল কড়াই	২০৬
শংকর	পুরোহিত দর্পণ	২১৬
আনন্দ বাগচী	নিশিপালন	২৩০
ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়	নকুড়মামার জামাই আদর	২৪৩
দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	অশ্বমেধের ঘোড়া	২৫১
পূর্ণেন্দু পত্রী	অন্ধকারে নিশিকান্ত	২৬০
মতি নন্দী	বেহুলার ভেলা	২৬৯
রতন ভট্টাচার্য	কৃষ্ণকীর্তন	২৮৫
জহির রায়হান	বাঁধ	২৯৫

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়	কোনো এক উর্মির জন্যে	৩০১
অমলেন্দু চক্রবর্তী	কিংবদন্তি	৩০৭
সোমনাথ ভট্টাচার্য	নন্দনকানন	৩১৭
প্রলয় সেন	সীমানা ছাড়িয়ে	৩৩৪
সত্যেন্দ্র আচার্য	কাণ্ডারী	৩৪৪
আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী	রোদের অন্ধকারে বৃষ্টি	৩৫২
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	ভীষ্মের দীর্ঘশ্বাস	৩৬৩

ধোঁয়া-ধুলো-নক্ষত্র

অসীম রায়

গবমের রাত। কলোনির লোকজন সবাই ঘুমোয় নি। মাঝে মাঝে হাওয়া উঠে হাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। আর তারই সঙ্গে রাস্তার পাশে চূড়ো করে জমানো পাঁকের গন্ধ আসে। ফেলুব মা রাতকানা। কিন্তু অন্ধকার তক্তাপোশের পাশে কুঁজো থেকে জল গড়াতে অসুবিধে হয় না। অন্যদিন জল গড়িয়ে মাজা বেঁকিয়ে সরে আসেন, কিন্তু আজ কিছু না ভেবেই পিঠটান করে উঠতেই শক্ত থলিটা পিঠে লাগে। বুঝতে পারেন না ওটা পেঁপের থলি না বোমার থলি। ফেলু দুটো থলিই দিযেছিল সকালে। পায়খানার গায়ে যে পেঁপে গাছটা ঝুম ঝুম করছে পেঁপেতে তা থেকে পেঁপে পেড়ে থলি ভর্তি করে দাওয়ায় উঠে মা-কে ফেলু বলে, 'ভালো কইরা দেইখ্যা লও। দুইডা দুইরকম। একটা বড়, একটা ছোট। ভালো কইরা দেইখ্যা লও।'

ফেলুর মা এবার ঘুমোবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ঠিক এই সময় দরজায় ধাক্কা পড়ে। নাঃ, ফেলু না। ফেলু এসে ডাক দেয়। ফেলুর মার মনে হলো পুলিস। কিন্তু বাহির থেকে শান্ত গলায় হুকুম এলো, 'আমি বেণু, দরজা খুলুন।'

ফেলুর মা ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে দরজা খুলে দেন। বাহিরে রাস্তার আলোয় নীল বুশশার্ট খাকি প্যাণ্ট পরা তিরিশ বছরের এক যুবককে দেখা যায়। রোগা ঢ্যাঙা ছেলেটা দু-পা এগিয়ে আসে। তারপর স্থির শান্ত গলায় বলে, 'আমি ফেলুকে খুন করেছি। পুলিসে জানালে বাড়ি জ্বালিযে দেব।'

হালকা পায়ে মিলিয়ে যায় ছোকরা। ফেলুর মা-র পাশে তার ছোট ছেলে রতন। আতঙ্কে তার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। ফেলুর মা অন্ধকারে ছুটে যান। অভ্যস্ত হাতে এক হেঁচকায় থলিটা নামিয়ে রতনের হাতে দিয়ে বলেন, 'আমার রক্ত যদি তর গায়ে থাকে তবে উয়ারে মার এহনই। কি! ভিরমি খাইয়া পর্ডালি? যা, দৌড়া!'

অন্ধকারেও টের পাওয়া যায় রতন কাঁপছে। চৌদ্দঘোড়া রিভলবার যে চালায় অবলীলাক্রমে ছুটন্ত ট্যাক্সি থেকে পুলিস অফিসারকে মেরে বছরের পর বছর হাওয়ায় মিলিয়ে যায়, যে থানায় ঢুকলে থানা অফিসার চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে ওঠেন, সেই মুকুটহীন রাজা বেণু বিশ্বাসের সামনে দাঁড়াতে হবে ভেবে তার জিভ শুকিয়ে যায়।

'বুঝছি। তরে দিয়া কিস্‌সু হইব না। আমার বি-কম পাশ ছাওয়াল রে! আমার ইস্কুল মাস্টার ছাওয়াল!'

এতক্ষণ পর ফেলুর মা কাঁদতে বসেন। অন্ধকারে মেঝেয় বসে বিলাপ করেন। আব সেই ভাঙা বাঙাল বিলাপ শুধু ফেলুর জন্য নয়, মূলত তাঁর শ্বশুরের ভিটের জন্যে। ষোলো-সতেরো বছর আগে হঠাৎ এক রাত্তিরে হুড়মুড় করে গহনা নৌকায় উঠে তাঁদের সেই পূর্ববাঙলা থেকে চলে আসার দিন, শেয়ালদা স্টেশনে পড়ে থাকার দিন, তারপর এই উত্তর কলকাতার উপকণ্ঠে কাদায় বৃষ্টিতে হোগলার নিচে বছরের পর বছরের অস্তিত্ব—এইসব মিলেমিশে এই বিলাপ।

এই সবে পয়সার মুখ দেখছে তারা। ফেলু অনেক দিন যাবৎ এদিক ওদিক করে শেষ পর্যন্ত বেণুর সঙ্গে ভিড়েছিল। তাদের ঘরে মালগাড়ি এসেছে মা লক্ষ্মী হয়ে।

পাথরের মতো চৌকাঠে বসেছিল রতন। ঘণ্টা খানেক বিলাপের পর তার মা উঠে আসেন।

'দ্যাখ, কি হইল। দাদাটার কি হইল একবার দ্যাখ, একবার খুইজ্যা দেখ।'

কিন্তু রতন নড়ে না, তার চোখ তখনও আতঙ্কে স্বাভাবিকতা পায় নি।

'তুই কি করস? অরে আমার ইস্কুল মাস্টার পোলা! তুই কি করস?'

এতক্ষণ পর ছেলেটা নড়েচড়ে বসে। রতনের বয়স কুড়ি একুশ হবে। পাশের কলোনির হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুলে পড়ায়।

হঠাৎ খেপে উঠে, হাত দুটো মা-র সামনে নাচিয়ে বলে, 'ফেলু ফেলু ফেলু! আমি কিছু করি নি! পাঁচ টাকা দশ টাকা করে মাস মাস টিউশনি করলাম। ফেলুর মতো মালগাড়ি ভাঙার দলে নই বলে কি আমরা মানুষ নই?'

'তুই মাইয়ালোক। তুই পারস ফেলুর মতো বাড়ি বানাইতে?' ফেলুর মা পাকা মেঝেতে লাথি মারেন।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে ওঠে রতন। তারপর নিঃশব্দে পাশের ঘরে চলে যায়। লুঙ্গি ছেড়ে কালো প্যান্ট পরে। তারপর বাতায় গোঁজা ফেলুর বহু ব্যবহৃত সঙ্গীটাকে পায়ে বেঁধে নেয়।

'কই যাস?' বসা গলায় রতনের মা হাঁক দেন। রতন জবাব দেয় না।

তাদের নতুন টিনের চালে জ্যোৎস্না আটকে আছে। একটা বেঁটে নারকেল গাছ দুবছর হলো ফল দিচ্ছে, সেটা হাওয়ায় মড়মড় করে ওঠে। রতনের মা বলেন, নারকেল গাছটাই তাদের ভাগ্য ফিরিয়েছে। যেবার তার জালি পড়ল গাছে, ঠিক সেই সপ্তাহেই ফেলু চার হাজার টাকার স্টিল রড ভাঙলে মালগাড়ি থেকে। রতন জানে এ সমৃদ্ধি তার সারাজীবনের আওতার বাইরে। তার একশো চল্লিশ টাকার মাইনেতে তাকে আরও চার-পাঁচটা বাড়ির মতো কাঁচা মেঝেয় কিংবা শান বাঁধানোর ব্যর্থ চেষ্টায় আরও কদাকার মেঝেতে শুয়ে দিন কাটাতে হতো।

রতন বাড়ির বাইরে এসে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেয়। দাদার এই আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে তার গত কয়েক বছরের সমস্ত ভাবনাচিন্তা একেবারে ওলোটপালট লাগে। পাশে দুখানা টিনের চালওয়ালা বাড়ি একেবারে নিস্তব্ধ। এখানেই বেণুর আড্ডা। দ্বিতীয় বাড়িটা দীপ্তি দাসের, বেণুর তৈরি। বেণু মাঝে মাঝে এ-বাড়ি আসে। রতন আঁচ করে দীপ্তিকে নিয়েই হয়তো গণ্ডগোল। বাড়িটার কাছে আসতেই আর একবার থমকে দাঁড়ায়। দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতো গরমের হাওয়া উঠে আসে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে ধুলো। পাক খেতে খেতে শুকনো পাঁক মেশানো ধুলো রতনের নাকে মুখে ঝাপটা দেয়। এরপর একটা আধবোজা পুকুরের সহসা উপস্থিতি। সেই বেনো জলে চাঁদের আলো দেখে বুকের ভেতরটা রতনের একবার সিরসির করে ওঠে। জল ছেঁচলে বোধহয় দুটো মানুষের কঙ্কাল এখনও বেরোতে পারে। এরপর পাঁচ ছখানা টালির বাড়ি। এরা কিছু করতে পারল না। কুড়ি বচ্ছর জিলিপি আর বাসি ছানার মিষ্টি করে কাটিয়ে গেল। কিন্তু এদের দু-তিনটে ছেলে ইতিমধ্যেই ফেলুর সাকরেদ হয়েছিল। পাকিস্তান থেকে চোরাই সুপুরি আর চাল এলে সেগুলো ছেনতাই করত। এ-বিজনেসটা ভারত-পাক যুদ্ধের আগ পর্যন্ত বেশ চালু ছিল। ট্রেন থেকে মেয়েদের দল যখন মাল পাচারে ব্যস্ত, তখন তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণের নেতা ছিল ফেলু। তারপর ব্যবসাটা একদম ফেল পড়ে গেল। ফেলু ভিড়ল বেণুর দলে।

এবার বড় রাস্তা। দুটো লরি হু হু করে বেরিয়ে যায়। একটা কুকুর চাঁদের দিকে চেয়ে বিলাপ করতে শুরু করে। রাস্তার দুধারে টালি-খাপরার সারবদ্ধ দোকান। মোড়টায় এসে

থমকে দাঁড়ায় রতন। ঠিক যা ভেবেছিল তাই। রামপ্রসাদ বসে আছে। পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে। সামনে খাটা ড্রেন আর ছাইগাদার পাশে দুটো নতুন র‍্যালে সাইকেল তাদের শোভার প্রকাণ্ড বৈপরীত্যে ঝলমল করছে। পেট্রোম্যাক্সের আলোয় স্পষ্ট দেখা যায় রামপ্রসাদের দৃষ্টি দোকানের ভেতরে নয়, রাস্তার দিকে। তার চোখ পাহারা দিচ্ছে দোকানের গায়ে চওড়া গলি, থানায় যাবার গলি।

রতন ফেরে। সরু কাঁচা শুকনো কাদায় অসমান গলি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পাশের কলোনিতে পড়ে। আবার বড় রাস্তা। গ্যারাজমুখী খালি বাস বেরিয়ে যায়। একসঙ্গে অনেকগুলো কুকুর ডাকতে ডাকতে থামে। রতন রাস্তা পেরোয়। পেরিয়েই বন্ধ মাংসের দোকান। দোকানের পাশে ঘাসের এক কোণে পাঁঠার রক্ত কালচে হয়ে জমে আছে। রিক্সা-স্ট্যাণ্ডে এখনও সবাই ঘুমোয়নি। গাঁজার কলকে হাতে গোল হয়ে কয়েকটা মানুষ। একটা মিশমিশে কালো ঢ্যাঙা লোক কলকেতে সজোরে টান দেওয়ায় তার মুখের দুপাশ আলো হয়ে ওঠে। সেই আলোকিত গালের দিকে সাবধানে এক নজর তাকায় রতন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। হাঁটতে হাঁটতে পিঠ ঘেমে গেছে। থানাব পেছনেব গলি দিয়ে নিঃশব্দে বারান্দায় উঠে আসে রতন। সান্ত্রী ঢুলছিল চেয়ারে বসে বসে। তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। দুটো স্ট্যাবিং কেস চুকিয়ে বড়বাবু এই মিনিট পনেরো ফিরেছেন। ফ্যানের নিচে শার্ট খুলে গা এলিয়ে নিবিষ্ট মনে নাক খুঁটছেন, রতনকে দেখে ধড়মড় করে উঠে বসলেন।

'কি ব্যাপাব? এত বাতে? কটা বেজেছে জানেন?'

'বেণু আমাব দাদাকে খুন কবেছে।'

ক্লান্তিতে বড়বাবু অজিত বিশ্বাসের হাই উঠছিল। মাঝপথে হাই বন্ধ হয়ে যায়। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন আগন্তুকের দিকে।

'বেণু এসেছিল, মাকে বলে গেল সে ফেলুকে খুন করেছে, বলে গেল, পুলিসে খবর দিলে ঘর জ্বলে যাবে।'

এবার ছোকরাকে চিনতে পারেন বড়বাবু। এ অঞ্চলের সমস্ত রাফ্‌দের তিনি মুখ চেনেন। রতন এ দলে নেই সে কথাও বিলক্ষণ জানেন।

রাত্তির দেড়টায় আবার একটা নতুন ঝামেলা পাকিয়ে উঠেছে ভেবে খিঁচিয়ে উঠলেন। 'তা এসেছ কেন? ঘর যদি জ্বলে যাবে তবে এসেছ কেন?'

পাশে যে সাবইন্সপেক্টরটি সামনে লম্বা খাতার হলদে পাতা ভর্তি করছিল সে কলম থামিযে বললে, 'লিখে নেব স্যার?'

'তুমি তোমার কাজ করো।'

সে ছোকরাও বোধহয় এইটিই চাইছিল। সে খাতা বন্ধ করে টেবিলের ওপর মাথা রেখে শোয়। কয়েক মুহূর্তেব মধ্যেই তাব গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ ওঠে।

অবসাদে পা টলছে রতনের। সামনের চেয়ারটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, 'বসতে পারি?'

'বিলক্ষণ! এখন হাতে ছুরি থাকলেও তাদের চা খাওয়াই। সিঙ্গাড়া চলবে?' বড়বাবুর গলায় চাপা ঠাট্টায় রতন চটে।

'একটা কিছু করুন। একটা লোক খুন হয়ে গেল আপনার চোখের সামনে।'

বড়বাবুর বয়স চল্লিশ বিয়াল্লিশ। কুচকুচে কালো দীঘল পেশীসচ্ছল চেহারা। হাতে-ঘাড়ে অতীতের ব্যায়ামচর্চার স্পষ্ট ইঙ্গিত। রতনের কথা শুনে বড়বাবু শরীরটা গুটিয়ে নেন। যেন প্রতিপক্ষের আক্রমণ রুখছেন।

'আমাব চোখেব সামনে?'

'আমি তো বলছি, আমার দাদাকে খুন করেছে। খুনী নিজে এসে বুক ফুলিয়ে বলে যাচ্ছে বাড়ির ওপর। আর তাই সহ্য করতে হবে আমাদের?'

'নিজের চোখে দেখেছ?'

মুহূর্তের জন্যে চুপ করে যায় রতন। তার কচি পাতলা গোঁফআঁটা ছোট মুখখানায় আত্মবিশ্বাসের অভাব স্পষ্ট।

'আমি শুনেই দৌড়ে এসেছি থানায়।'

'বাঃ বেশ!' এতক্ষণের চাপা হাইটা এবার প্রবল প্রত্যয়ে ঠেলে ওঠে বড়বাবুর মুখ দিয়ে। দুবার তুড়িও দিলেন সঙ্গে সঙ্গে।

'তার মানে আপনারা কিছু করবেন না?'

'না।'

রতন উঠে পড়তে যাচ্ছিল। অজিত বিশ্বাস বললেন, 'বোসো বোসো। তোমার নাম রতন, না? ইস্কুল মাস্টার, না? দেখছ সব খবর রাখি।'

চারমিনার সিগারেট ধরান বড়বাবু। রতনের দিকে খোলা প্যাকেটটা ঠেলে দিয়ে বলেন, 'তুমি ভাল লোক। তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে তো কোনো গণ্ডগোল নেই বাবা। তুমি এর মধ্যে আসছ কেন? কাল ইস্কুল বন্ধ?' নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া বার করতে করতে বললেন।

'ফেলু আমার দাদা।' নীচু গলায় বলে রতন।

'তা তো নিশ্চয়।' আবার এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে শূন্যে তুড়ি দিয়ে ছাই ফেলেন বড়বাবু। 'তবে সে তো খুব ভালো লোক ছিল না, নিজেই বলো।'

ঠিক এই জায়গায় এলেই রতন এক প্রবল ব্যথায় অবসন্ন বোধ করে। দাদা গুণ্ডা একথা সে খুব ভালোভাবে জানে। কিন্তু তার আশা ছিল দাদা শোধরাবে। ফেলু বিয়েথাওয়ার কথা ভাবছিল, সংসার পাতবার কথাও ভাবছিল। রতনের আশা ছিল সে যদিও তর্ক করে তাকে শোধরাতে পারবে না, কিন্তু সময়ের চাপে অবস্থার গতিকে সে অন্য মোড় নেবে।

'গুণ্ডারা তো মারামারি করেই মরে।' অজিত বিশ্বাস সামনের খোলা লম্বা খাতাটা বন্ধ করেন। পুরনো তেলচিটে দেয়াল ঘড়িটায় ঘড়ঘড়ে দুটো বাজার শব্দ আসে। বোধহয় বড়বাবু তাল করছেন উঠবার।

মস্ত লম্বাচওড়া টেবিলটাব ওপর চোখ বুলাতে বুলাতে রতন বললো, 'বেণু দাসও তো গুণ্ডা।'

'হ্যাঁ গুণ্ডা। তবে গুণ্ডারা বড় হয়ে গেলে তারা আর গুণ্ডা থাকে না।'

'তারা কি হয়?'

'তারা? তারা তখন রাজা। আমরা তাদের হুকুম তামিল করি।' সুন্দর ঝকঝকে দাঁতের পাটি বার করে অজিত বিশ্বাস হাসেন।

রতন এবার সোজা হয়ে বসে। একটা প্রবল রাগ পাক খেয়ে তার গলা পর্যন্ত উঠে আসে।

'যদি গুণ্ডাদের সেলাম বাজান, তাহলে অত ঠাট করে কোমরে রিভলভার এঁটে ঘুরে বেড়ানোর কি দরকার?'

বড়বাবু রুমাল বের করে তাঁর গাল কপাল গলা ঘাড়— আগাপাস্তলা মুছতে শুরু করেন। নিজের মনে বিড়বিড় করেন, 'আজকের ঘুমটাই শালা গেল!' তারপর রতনের দিকে চেয়ে বলেন, 'বলছি', আবার একটা সিগারেট ধরান। চোখ বন্ধ করে ধোঁয়া ছাড়েন। তারপর হঠাৎ মুখ খুলে স্বগতোক্তির স্বরে বলতে থাকেন, 'আমি শিকদার নই ভাই। শিকদার জানো তো? কানুর গুলিতে মরল। তারপর মরার পর মেডেল পেল। আমি ভাই মরার পর মেডেল পেতে চাই না। শিকদারের দুই ছেলের কি হয়েছে জানো? পুলিস অফিসারের

ছেলে। ওয়াগন ভাঙার ট্রেনিং পায় নি। এ অঞ্চলে যদি থাকত, তোমার দাদার দলে ভিড়ে যেত। আমরা ভাই ছাপোষা মানুষ, খেয়েপরে বাঁচতে চাই। বেণুকে অ্যারেস্ট করা কি আমার কাজ? বেণুকে কে পারে অ্যারেস্ট করতে? মিনিস্টার পারে? স্বয়ং ভগবানও পারবে না। ওঁরা ক্ষণজন্মা পুরুষ। এ অঞ্চলে যেখানেই যাবে সেখানেই বেণু। এই থানায় বসে বসে মাঝরাতে সেই বেণুধ্বনি শুনছি আর কাঁপছি।'

'আপনারা এত অথর্ব, এত অসহায়?'

'হ্যাঁ স্যার। আমার যে হাত-পা বেঁধে রেখেছেন স্যার। তাছাড়া...' হঠাৎ গলা খাটো করে বড়বাবু বলেন, 'কানু তো আবার আসবে কবছর পর।'

আবার একটা অসোয়াস্তি বমির মতো পাক খেয়ে খেয়ে ওপরে উঠতে থাকে। রতন প্রায় চীৎকার করে বলে, 'সে লোকটার তো যাবজ্জীবন হয়েছে, তবে?'

'আবার তো ফিরবে।'

এবার তীক্ষ্ণ গলায় রতন বলে উঠল, 'আপনি কি বলছেন বড়বাবু? অত বছর পরও আমাদের দেশের অবস্থা এমনিই থাকবে?'

বড়বাবুর প্রকৃতপক্ষে ঘুম ছুটে গেছে। চোখ দুটো লাল হয়ে উঠলেও হাই উঠছে না বোধহয় ক্রমাগত সিগারেট খাওয়ার দরুন। জুত করে চেয়ারে পা তুলে বসে জিজ্ঞেস করেন, 'এক-একটা কলোনিতে ক'টা করে লোক আছে বলো তো?'

রতন বিরক্ত হয়ে বলে, 'এসব কথা কেন?'

বড়বাবু সে কথায় কান না দিয়ে বলে যান, 'এক-একটা কলোনিতে পাঁচ-ছয়-সাত হাজার লোক, এরা যখন এলো তখন শুরুই করল তাদের জীবন জবরদখল দিয়ে, বুঝলে? চাকরি নেই, ব্যবসা নেই, রাস্তা নেই, আলো নেই। সাপ মশা পাঁক। এখানে যদি ক্রাইম না হবে, কোথায় হবে? তার ওপর ঘরে ঘরে সোমত্থ মেয়ে— সবাই এক একটা বোমা। আর ফেলুও তো মরল ঐ তোমাদের বাড়ির পাশের দীপ্তি দাসকে নিয়ে। মাঃ! আর কত দেখব!' শেষ বাক্যটা এবার বিশাল হাইয়ে তলিয়ে যায়।

রতন চেঁচিয়ে ওঠে। এতক্ষণের রাগ, ক্ষোভ, অবসাদে সে ফেটে পড়ে, 'আপনার ওসব কচকচি ছাড়ুন বড়বাবু। দাদা রাস্তায় পড়ে আছে, আপনারা কিছু করবেন?'

এবার চেয়ার থেকে পা নামিয়ে খাড়া হয়ে বসেন অজিত বিশ্বাস। চোখে চোখ রেখে বললেন, 'তুমি, তোমার মা, কোর্টে দাঁড়িয়ে বলতে পারবে— বেণু তোমাদের বলেছে সে খুন করেছে ফেলুকে?'

বড়বাবুর প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে রতনের চোখের সামনে ভেসে ওঠে তাদের বাড়ির কাছেই সেই বেনো জলে চাঁদের আলো। আর সঙ্গে সঙ্গে শিরদাঁড়া সিরসির করে।

'তোমার মা পারবে?'

রতন স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

'তবে? এতক্ষণ যে এত চেঁচামেচি করছিলে, এবার কি? একটু সাহস দেখাও। ভয় কি! তুমি পার্টি করো না? আমি সব খবর রাখি। যাও, তোমার দাদাদের কাছে যাও।' চাপা উল্লাসে চকমক করে বড়বাবুর চোখ।

'তাই যাব।'

'যাবে? ভয় করবে না? যে তোমাদের এত করেছে তাকে গুণ্ডা বলবে? আঁ?'

'আমাদের পার্টি গুণ্ডাকে প্রশ্রয় দেয় না।'

বড়বাবু উঠে পড়েন, 'বাড়ি যাও, বাড়ি যাও। আজ রাতটা থাক। লাশ থাক ওখানে।.. শেয়াল এক আধটা থাকতে পারে... ও কিছু হবে না। ভোরে গাড়ি যাবে।''

জড়ভরতের মতো রতন বসে থাকে। এতক্ষণ সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার মাঝখানে সে যেন আশ্রয় পেয়েছিল। এখন আশু কর্তব্য কি ভেবে পায় না। এখন সে কি করবে? ফেলুর লাশ বাড়ি নিয়ে আসবে, না... কিন্তু অধীরদার বাড়ি এত রাতে?

বড়বাবু উঠে পড়েন। ঘেমো শার্টটা শুকিয়েছে কিনা আলোর দিকে পরীক্ষা করেন। তারপর সেটা দলা পাকিয়ে তুলে নেন। বারান্দায় তাঁর গেঞ্জিপরা ফর্সা পিঠখানা অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

এতক্ষণ যে সাবইন্সপেক্টরটি কুঁই কুঁই করে সুরেলা নাক ডাকাচ্ছিল, তাদের কথাবার্তার সঙ্গে তাল রেখে সে হঠাৎ উঠে বসে। চোখ কচলিয়ে দুহাত শূন্যে তুলে আড়মোড়া ভেঙে বলে, 'যান— যান, ভোরে ট্রাক পাঠামু, যান!'

রাস্তায় নেমে রতন ঠোক্কর খায়। চাঁদ অস্ত গেছে। অন্ধকার আকাশে কয়েকটা অস্পষ্ট ম্লান তারা মিটমিট করছে। দিকভ্রষ্টের মতো হাঁটতে হাঁটতে প্রায় রামপ্রসাদের দোকানের গায়ে এসে উঠছিল। তারপর পেট্রোম্যাক্স আলোর গায়ে হাসির আওয়াজ উঠতেই তাব তন্দ্রা কাটে। রতন পেছন ফেরে। এবার কাঁচা রাস্তাটা অন্ধকার। আবার আধবোজা পুকুর। বাজপড়া একটা নারকেল গাছের ডগা ঝুঁকে আছে জলের দিকে।

রতন দাঁড়িয়ে পড়ে জোরে জোবে নিঃশ্বাস নেয়। কাছে-পিঠেই মদ চোলাইয়ের গোপন কারখানা। কাজ পুরোদমে চলছে। রতন লক্ষ্যভ্রষ্টের মতো হাঁটতে থাকে পাশের কলোনি দিয়ে। খেয়াল নেই, একটা গলি ভুল করে তাদের ইস্কুলের গলিতে এসে পড়েছে। লম্বা টিনের চালের শূন্য দাওয়া অন্ধকার, খাঁ খাঁ করে। পা ধরে গেছে রতনের। অন্ধকার দাওযায এসে বসতেই একটা সাদা পাটকেলি বড় দেশী কুকুর তার কাছে এসে লেজ নাড়াতে থাকে। রতন অন্যমনস্কভাবে তাদের ইস্কুলের ভুলুয়া কুকুরটার মাথায় হাত বোলায়। কাল সকালেই ক্লাস ফাইভের অঙ্কের ক্লাস। বত্রিশ প্রশ্নমালার ঐকিক নিয়মের অঙ্ক। রতন দীর্ঘশ্বাস ফেলে দাঁড়িয়ে ওঠে। এবার আর সে ইতস্তত করে না। সামনে যে দুটো রাস্তা বেরিযেছে তার বাঁ-টা ধরে এগিয়ে সোজা সাদা একতলা বাড়িটার দাওয়ায় উঠে আসে।

রাস্তার গায়েই ঘরখানায় তক্তপোশের এককোণে অধীর চ্যাটার্জি শুযে।

'অধীরদা অধীরদা, —আমি রতন।'

সঙ্গে সঙ্গে শ্লেষ্মা ঝাড়ার শব্দ। 'দাঁড়াও, আলো জ্বালি।'

আলো জ্বেলে লুঙ্গি আঁটতে আঁটতে দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন বছর পঞ্চান্ন বয়সের একজন লোক। গেঞ্জির ওপবে কণ্ঠার হাড় উঁচিয়ে আছে। চশমা ছাড়া বলেই চোখদুটো ঘোলাটে, দৃষ্টিহীন। ঘরে রতনকে ডেকে তক্তপোশের কোণে বসতে বললেন। একেবারে নিরাভরণ ঘর। দেওয়ালে লেনিনের ছবি। বাড়িতে কাচা সাদা শার্ট আর ধুতি দেওয়ালে টাঙানো। অধীর চ্যাটার্জি বিয়ে-থাওয়া করেন নি। আগে কলোনির আরও ভেতরের দিকে ছিলেন। দশ বছর হলো বোনের বাড়িতে এই ঘরটায় বাস করছেন।

অধীরদা আরও কয়েকবার গলা ঝাড়েন। নিজের মনে বিড়বিড় করেন, 'সর্দিটা এখনও ওঠে নি।'

'দাদাকে বেণু খুন করেছে।'

বহুদিনের অভ্যাসমতো বিড়ি ধরান অধীরদা। আস্তে আস্তে বলেন, 'বেণু এসেছিল?'

'হ্যাঁ, বাড়িতে এসে বলে গেছে।'

আবার কাশেন, গলা ঝাড়েন। 'সর্দিটা এখনও যাচ্ছে না, বুঝেছ?' নিজের মনেই বলেন।

রতন হঠাৎ অধীর হয়ে বলে, 'আমাদের কি কোনো রাস্তা নেই অধীরদা? কানু আর বেণু এরাই যেরকম চালাবে তেমনি সব চলবে? লেনিন-স্ট্যালিন-মাও-সে তুঙ, এর কি মানে আছে?'

এবার চশমার খাপটা বালিশের তলা থেকে বার করেন অধীরদা। গালে কাঁচাপাকা দাড়ি। চশমা পরতেই শীর্ণ মুখে চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠে।

'উত্তেজিত হয়ো না রতন। উত্তেজিত হয়ে কি করবে? তুমি তো আর বাইরের লোক নও। বাইরের লোকদের মতো কথা বলো না।'

কিন্তু এই শান্ত ধীর গলায় অস্থিরতা বোধ করে রতন। যা কোনো দিন সে স্বপ্নেও ভাবেনি ঠিক তাই করলে। ক্ষ্যাপার মতো চেঁচিয়ে উঠল, 'ওরকম ব্লাফ দিচ্ছেন কেন অধীরদা? বলুন খোলাখুলি, আপনারা বেণুর হাতের পুতুল। তাহলেই ব্যাপারটা চুকে যায়।'

'বেণু খুব খারাপ কাজ করছে। দেখা হলেই আমি তাকে বলব।'

'ব্যস, আপনার কর্তব্য চুকে গেল, না?'

বিড়িটায় কয়েকবার শেষটান দিয়ে জানালার বাইরে অন্ধকারের দিকে ছুঁড়ে দেন। আবার ধীর গলায় বলেন, 'তুমি আজ যাও রতন। এখন যাও। লাশ বাড়িতে আনার ব্যবস্থা করো। আমার ভোর পাঁচটায় গেট মিটিং আছে রসিকলালের ফ্যাক্টরিতে। একটা গোলমাল হতে পারে। আমি সেখান থেকে সোজা আসছি।'

'তার মানে আপনার দ্বারা কিস্‌সু হবে না, কিস্‌সু না,' ঠিক যেভাবে তার মা তাকে বলেছিলেন অবিকল সেইভাবে রতন বলে।

'দ্যাখো রতন, বিশ বছর এখানে পড়ে আছি। কেউ আমাকে এভাবে কথা বলে নি'— হঠাৎ তাঁর গলা চড়ে যায়, 'এই জলকাদায় বনবাদাড়ে লাঠি হাতে দাঁড়াতে কে শিখিয়েছে? কোন শালা এখানে এসেছিল হামলা ঠেকাতে? কোনো মিএগ আসে নি। আমি ব্লাফ দিচ্ছি, আমি বেণুর হাতে পুতুল? ও সব কথা বাইরে বোলো। খবরের কাগজে ফলাও করে লেখো। যারা আমাদের সম্পর্কে দিন-রাত কুৎসা ঢালছে তাদের দলে ভেড়ো। এখানে কেন?' রতন চুপ করে থাকে। অধীরদা যা বললেন তার এক বর্ণও মিথ্যে নয়। এই কাদায় বাঁশ দরমা বেঁধে যেখানে কলোনি গড়ে উঠেছে সেখানেই অধীর চ্যাটার্জি তাঁর বরাভয়ের হাত প্রসারিত করেছেন। সরকার থেকে বাড়ির জন্য ঋণ, স্কুলের জন্য গ্রাণ্ট আদায়— এ সমস্তের মূলেই তিনি।

'আমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে অধীরদা,' রতন মৃদুগলায় বললে, সঙ্গে সঙ্গে যোগ করে দেয়, 'কিন্তু বেণুর বিরুদ্ধে কিছু করতে পারেন না?'

'নাঃ। বেণুকে আমাদের দরকার।'

'যেমন আপনাদের প্রতিপক্ষের দরকার ছিল কানুকে। তাহলে কাগজে কাগজে যে লেখে আমাদের পার্টি গুণ্ডা পোষে তাই ঠিক?'

'কাগজে আমি পেচ্ছাপ করি। আমাকে এত রাতে উত্তেজিত কোরো না রতন। তাহলে ব্যাপারটা বলি, শোনো। আমরা যাই করি না কেন— এসেমব্লি করি, ময়দান মিটিং করি— সবসময় আমাদের সশস্ত্র বিপ্লবের জন্যে তৈরি থাকতে হবে। আর অস্ত্র কারা ব্যবহার করবে? কলেজের অধ্যাপক সাহিত্যিক? যারা বোমার সামনে বোমা নিয়ে দাঁড়াতে পারে, দরকার হলে স্টেনগান চালাতে পারে, তাদের ওপর নির্ভর করতে হবে। ওসব রাশিয়া চীন, সব দেশেই এক অবস্থা। অস্ত্র ধরনেওয়ালা লোক চাই।'

লুঙ্গি আর গেঞ্জিপরা লোকটার চোখ জ্বলজ্বল করে। নির্বাক রতনের দিকে ঝুঁকে পড়ে অধীর চ্যাটার্জি বলেন, 'মনে আছে সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলোর কথা? যখন কানু দত্তের ভয়ে এ তল্লাট কাঁপত। লোকটা প্রকাশ্য দিবালোকে বাজারের মধ্যে মেয়েদের কাপড় টেনে খুলে উলঙ্গ করে দিয়েছিল— পাঁচ টাকা বাজি জিতবার জন্যে। একটা লোক প্রতিবাদ করবার সাহস করে নি। ফ্যাক্টরি মালিকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাদের কমরেডদের খুন করেছে

আর আমরা থানায় গেলে থানা অফিসার নাক খুঁটেছেন। সেই সব ভয়ঙ্কর দিনগুলোর কথা এর মধ্যে ভুলে গেলে? তখন বেণু এগিয়ে এসেছিল রিভলভার হাতে। আমি সেকথাটা বেমালুম ভুলে যাব?'

'কিন্তু অধীরদা, বেণু তো ডাকাত! তাহলে আমার কি হবে অধীরদা?' রতন হঠাৎ ডুকরিয়ে ওঠে। 'আমি ভেবেছিলাম অন্যরকম হবো। আমিও কি ভিড়ে যাব বেণুর দলে?'

অধীর চ্যাটার্জি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। 'শান্ত হও বতন, শান্ত হও। এসব মিটে গেলে আর একদিন এসো তখন কথা হবে।'

'না, অধীরদা, আপনাকে বলতে হবে। আমাদের কি আর কোনো আশা নেই? কোনো ভবিষ্যৎ নেই?'

আর একটা বিড়ির ডগায় ফুঁ দিতে দিতে হঠাৎ থেমে যান অধীরদা, ধীরে ধীরে বলেন, 'আছে। যেদিন আরো লোকের চেতনা বাড়বে। যখন আর বেণুকে কোনো দরকার হবে না।'

'আপনি যে কবিতার মতো কথা বলছেন, অধীরদা।'

রতনের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের হাসি চোখ এড়িয়ে যায় না অধীরদার। বললেন, 'কবিতা? তাহলে তাই।'

'আমি যাই অধীবদা।' হঠাৎ ভীষণ অসহায় লাগে রতনের গলা।

'আবার এসো।'

রাস্তায় বেরিয়ে রতন অন্ধকার ঘর থেকে গলা ঝাড়ার আওযাজ পায়।

আবার রতন ঘুরপথ নেয়। ভোরের প্রথম লক্ষণ আকাশে। একটা তারা জ্বলজ্বল করে। আবার ইস্কুল, এটা মিডল প্রাইমারী। রতন মনে মনে হাসে। এত ঘন ঘন ইস্কুল কেন? এ কথাটা কোনোদিন এমন তীক্ষ্ণ প্রশ্ন হয়ে ওঠেনি মনের মধ্যে। জনপদের সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যালয়, কিন্তু কেন? রতন নিজেকে আর ফেলুকে দুই বিপরীত ধারা রূপে দেখতে পায়। সে আর ফেলু, ইস্কুলে পড়ানো আর ওয়াগন ভাঙা, এই দুটোই রাস্তা। এ দুটো মূল্যবোধের কোনটা জয়ী হবে শেষ পর্যন্ত?

আবার দীর্ঘশ্বাসের মতো হাওয়া দিতে থাকে। একটু শীতল ভাব লাগে। একটা শিশুব কান্না শোনা যায়, তারপর হাঁচির আওয়াজ। দরমার ঘরখানা থেকে হাঁচির আওয়াজ শুনতে শুনতে রতন মোড় ফেরে। সামনেই বাড়ি। দরজা খোলা। মা যেমন বসেছিলেন ঠায় তেমনি বসে আছেন। রতন নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে ঢোকে। মা একবার ফিরেও তাকান না। বোধহয় বসে বসে ঘুমোচ্ছেন। সেদিকে চেয়ে চেয়ে তাদের প্রথম কলকাতা আগমনের দিনটা মনে পড়ে রতনের। শেয়ালদা স্টেশনে মানুষের পুঁটলি। চারদিক ভেজা, নাকপোড়া ব্লিচিং পাউডারের গন্ধ। রিফিউজিদের মধ্যে বসন্ত লেগেছে। মস্ত বড় করে লাল শালুতে লেখা, 'বসন্তের টিকা নিন।' তার মধ্যে তারা কুঁকড়ে শুয়েছিল পুরো দশ বারোটা দিন। 'হাট্‌কে হাট্‌কে' বলে ক্রমান্বয়ে কুলিদের হাঁক আর অহর্নিশি পদধ্বনি। প্রথম তিন চারটে রাত্তির রতন ঘুমোতে পারেনি। মাঝে মাঝে গায়ে টর্চ পড়েছে। চোরাই মালের জন্যে স্টেশনের এধার ওধার খানাতল্লাসী চলেছে। তখন বুঝতে পারে নি। মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে শুনেছিল একটা কমবয়সী মেয়েকে নিয়ে হৈ হৈ। একজন বৃদ্ধ চেঁচাচ্ছে, 'ও মাগী আমার মেয়ে না।' তার মায়ের স্থানু মূর্তির দিকে চেয়ে চেয়ে তার কত কথাই মনে পড়ে। হঠাৎ গুলি খেলবার সময় ফেলুর চোট্টামির কথাও মনে আসে। তারপর ফেলুর চায়ের দোকান, যেখানে ইয়ার বন্ধুদের খাওয়াতে খাওয়াতে সে ফেল মারল। তার সঙ্গে তার দাদার মেজাজের কোথাও একটা প্রবল অমিল ছিল কিন্তু এক প্রবল মমতাও বোধ করে দাদার জন্যে। ফেলু সব

ব্যাপারে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে লেবড়ে যেত। আত্মরক্ষার দরজাগুলো তার সবসময় বন্ধ হয়ে যেত। দাদা তাকে তার পথে অনেক ভিড়াবার চেষ্টা করেছিল। ছুরি খেলা শিখিয়েছিল। বলেছিল, 'তোর হবে, তোর কব্জিতে অসাধারণ জোর।' কিন্তু সে পথে রতন যায় নি। তবে না গিয়েই বা কি হয়েছে? রতন আর ভাবতে পারে না। ক্লান্তিতে তার মাথা ঝিমঝিম করে। আর ঠিক এই সময় দাওয়ায় হাল্‌কা পায়ের আওয়াজ আসে। সঙ্গে সঙ্গে রতন খাড়া হয়ে ওঠে। সামনেই বেণু দাঁড়িয়ে, মুখে হাসি।

'তোর দাদাকে শেয়ালে খাচ্ছে। নিয়ে আয়।'

রতন জড়ভরত। কোথায় জিজ্ঞাসা করবে ভেবেছিল কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না।

'বামপ্রসাদের বাড়ির গায়, দুটো গুলি বুকে দিয়েছি, একটা কপালে। কেউ জানতে পারলে তোকেও দেব।'

রতন ঝিমোয়। তার সমস্ত চিন্তাশক্তি তার আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। একবাব ভাবলে এরকম ঝিমোতে ঝিমোতে রাতটা কাটিয়ে দিলে হয় না? বেণু কখন চলে গেছে। একলা একলা নাটকীয় ভাবে টেনে টেনে হঠাৎ বলে ওঠে, 'যেদিন লোকের চেতনা বাড়বে তখন আর বেণুকে কোনো দরকার হবে না।'

বিড়বিড় করতে করতে বেরিয়ে আসে রতন। দরজায় স্থানু মূর্তিটা থেকে হাঁক আসে, 'কই যাস?'

রতনের কানে সে ডাক পৌঁছয় না।

হলদে রঙজ্বলা পাঁচিলের গায়ে এক চিলতে জমি। তার বুকে মানকচুর ঝোপ। কালচে সবুজ সতেজ চেটালো পাতাগুলোর দিকে রতন সম্মোহিতের মতো চেয়ে থাকে। নিচেই ফেলু। বুকে সাদা শার্টের ওপর কালো দুটো রক্তের বৃত্ত। কপালে চুলেও রক্ত চাপ বেঁধে আছে।

রতন ফেলুর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে। ফেলুর ঠোঁটের কোণে তার বাল্যকালের হাসি ফুটে উঠেছে, সেই যখন গুলি খেলায় চোরামি করে সে মজা পেত। রতন তার বুকের ওপর মাথাটা রাখতে গিয়ে আবার ভোরের আকাশখানা দেখে। আর সেই ভোরের আকাশেব একটা তারা। দাদা বলে একবার ডাকবার ইচ্ছে হয় তার। কিন্তু তার বাকশক্তি সে বোধহয় হারিয়ে ফেলেছে। আবার মুখ তুলে আকাশটা দেখবার চেষ্টা করে এবাব চোখে পড়ে একখানা হাসিতে ভরা মুখ, বেণু ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসছে।

রতন আবার মুখ নীচু করে। তারপর আলগোছে পায়েব দিকে হাত বাড়ায। কাঠের বাঁট শক্ত কবে চেপে ধরে। বেণু কিন্তু হাসি থামায় নি। এখনও সে হাসছে। রতন সেই হাসির দিকে তার সমস্ত শরীরটা ছুঁড়ে দেয়।

পা-টা নামিয়ে বসুন

কৃষ্ণ চক্রবর্তী

ঘটনাটা এই রকমই ঘটেছিল।

কিন্তু ঘটনার থেকে যাকে নিয়ে ঘটনা সেই মানুষটাই আমাকে চমকে দিয়েছে বেশি করে। এমন শান্তশিষ্ট গোবেচারা ছেলে, যার গুছিয়ে কথা বলতেও বেশ খানিকটা সময় লাগে, কোনো বিশেষত্বই নেই যার মধ্যে, কালো বেঁটে রোগা, তাকিয়ে দেখবার প্রয়োজন ঘটে না যাকে কোনোদিন, সেই ছেলের কথা গল্পের কাহিনীর মতো করে আমার কাছে এসে পৌঁছোবে এবং এমন করে নাড়া দেবে আমার অনুভূতিকে তা কে ভেবেছিল! ছেলেটার বাপকেও চিনি, সামান্য একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে খাতা লেখেন। কত বা আয়! বাপ যেমন সাধারণ, ছেলেটা তার থেকেও সাধারণ।

একদিন খবর শুনলাম ছেলেটা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যা নিয়ে এম. এস. সি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছে। রাস্তায় বাপের সঙ্গে দেখা হতে জিজ্ঞেস করলাম— কী দাদা, সত্যি? মৃদু হেসে খুব সাধারণভাবেই জবাব দিলেন ভদ্রলোক, যা শুনেছেন সত্যি।

তাহলে তো এবার আপনার—

একটা চাকরি যদি পায়!

কী যে বলেন!

ভদ্রলোক মৃদু হেসে কোনো জবাব না দিয়ে চলে গেলেন।

একদিন দেখলাম ছেলেটাকে। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে ফর্সা সুন্দর চেহারার সমবয়সি এক বন্ধু। এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম— কী মিহির, খবর কী?

একটু হাসল।

সঙ্গের ছেলেটিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার বন্ধু বুঝি? কোনোদিন দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না।

আমার সঙ্গে পরীক্ষা দিয়েছে। ওর বাড়ি এদিকে না।

নাম কী?

ছেলেটিই জবাব দিল, শক্তিপদ ঘোষ।

উৎসাহিত হয়ে আরো পরিচয় দিল মিহির। প্রথম শ্রেণীতে পাস করেছে, তার স্থান হয়েছে চতুর্থ। বাপ কেন্দ্রীয় সরকারের একজন বড়ো অফিসার, পূর্ববাংলায় ফরিদপুরে বাড়ি ছিল, এখন নিউ আলিপুরে বাড়ি করেছেন।

বললাম— ভালো, তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আনন্দ পেলাম। তোমরা সব বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র।

এরপর আমি চলে যাব সেই ঘটনায় যে ঘটনা নিয়ে এই কাহিনী। অর্থাৎ আমি এখন শুধুমাত্র রিপোর্টার। ঘটনাচক্রে মিহির যে স্কুলের ছাত্র ছিল সেই স্কুলের এক শিক্ষকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে। একমাত্র সেই শিক্ষকের সঙ্গেই মিহিরেরও পুরোনো সম্পর্ক এখনো ছিন্ন হয়নি। তাঁর কাছে কাহিনীটা যা শুনেছি তাই বিবৃত করছি।
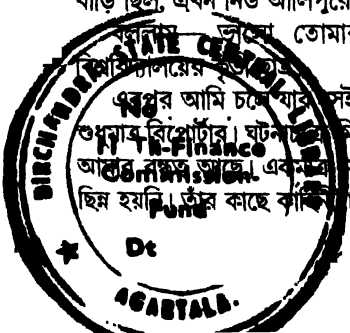
হরেনবাবু, অর্থাৎ মিহিরের সেই শিক্ষক আগে থেকে বুঝতে পারেননি মিহির এত ভালো ফল করবে। প্রথম শ্রেণীতে যাবে এমন একটা আশা তাঁর ছিল, তবে প্রথম স্থান অধিকার করবে এতটা আশা তিনিও করেননি। স্কুলে মিহির তাঁর কাছে ইংরেজি পড়েছে। পরীক্ষার ফল জানাতে এসে মিহির প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতে তিনি বললেন, বোসো।

বিশ্ববিদ্যালয় যাকে কৃতিত্বের অধিকারী করেছে তার মনটা খুশি থাকবারই কথা।

হরেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কী করবে এবার ভাবছ?

দেখি, কলেজে যদি ঢুকতে পারি। রিসার্চ করব, তবে চাকরি একটা নিতে হবে। বাবা তো আর সংসার চালাতে পারছেন না। ছোটো ভাই-বোনগুলো এখনো মানুষ হয়নি।

কলেজে চাকরি নিতে চাইলেই পাবে মনে করেছ নাকি? মাস্টারমশায় তাকালেন ছাত্রের মুখের দিকে।

মিহির কিছু না বলে মুখ নিচু করে বসে রইল।

মাস কয়েক পরে আবাব মিহির এল একদিন।

স্যার, ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছি।

কোথায়?

শ্রীরামপুর কলেজে।

দেখ, যদি হয়।

কলেজে পৌঁছে যারা ইন্টারভিউ দিতে এসেছিল তাদের মধ্যে সে জড়োসড়ো হয়ে এক কোণে গিয়ে বসল। তারই সঙ্গে পরীক্ষা দিয়েছে এমন কয়েকজনের সঙ্গে চোখাচোখি এবং হাসি বিনিময় হল, বাকি যারা ছিল, কানাকানি হতে হতে সকলেই জানল যে এবারের ব্যাচের প্রথম বিভাগে সে প্রথম হওয়া ছেলে।

ইন্টারভিউ নিতে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, আপনার রেজাল্ট ভালো। কিন্তু আপনি তো আর এখানে চাকরি করার জন্য আসছেন না, শুধু শুধু—

তবে কী জন্যে আসছি? বিস্মিত মিহির জিজ্ঞেস করল।

মানে, চিরকাল তো আর আপনি এখানে থাকবেন না। সে কথাই বলা হচ্ছে।

চিরকাল কে কোথায় থাকে?

ইন্টারভিউ বলতে গেলে এখানেই শেষ হল।

এর প্রায় তিন মাস পরে মিহির এল আবার হরেনবাবুর কাছে। এবার স্যার, কলকাতার একটা কলেজে যাচ্ছি। আজকে ইন্টারভিউ, দেখি কী হয়।

দেখে এসো। এ পর্যন্ত ক'টা ইন্টারভিউ দিলে?

এইটে হলে তিনটে হবে স্যার।

কলকাতার ইন্টারভিউয়ের পরে আবো ইন্টারভিউ হল, এবং আবো। বছর ঘুরে গেল। হাসিখুশি উৎফুল্ল সজীব মনটার ওপরে মরচে পড়তে লাগল। হরেনবাবুর বাড়িতে এখন মিহির আরো ঘন ঘন আসে। স্কুলের ছাত্র পড়ানো আরম্ভ করেছে কয়েকটা। বেকার জীবনটা দুঃসহ লাগে। নিজের সম্পর্কে হঠাৎ কেমন একটা প্রত্যাশার আলো চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল, দৃষ্টিটা আবার স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, কিন্তু সেই সঙ্গে মনের মধ্যে সংকল্পগুলো যেন কঠিন হতে হতে গ্র্যানাইট পাথরের মতো শক্ত হয়ে উঠেছে। আজকাল সে হাসে খুব কম, কথা বলে কম। নিয়মিত সময়ে ছাত্র পড়াবার জন্য বাড়িতে বাড়িতে ঘোরে। হরেনবাবুর উপদেশ শুনে তিনশো টাকার দু'বছর মেয়াদি একটা রিসার্চ স্কলারশিপের জন্য দরখাস্ত দিয়েছে, এখনো জবাব আসেনি। পাবলিক সার্ভিস কমিশনে দরখাস্ত দিতে বলেছিলেম মাস্টারমশায়, সেটাও দিয়েছে।

একদিন ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে ছিল— মা এসে জিজ্ঞেস করলেন, কী হল রে খোকা? চাকরি একটা জোগাড় করতে পারলি না?

মা'র চোখের কোল বসা, অপুষ্টিজনিত রুগ্ন চেহারা এবং ময়লা কাপড়ের দিকে তাকিয়ে মিহির বলল, চাকরি হতে একটু দেরি হবে মা।

আর কত দেরি বাবা? এক বছরের ওপর পাস করে বসে আছিস।

মা চলে গেলে মিহির হিসেব করতে বসল এ পর্যন্ত ক'টা চাকরির ইন্টারভিউ দেওয়া হল। ইন্টারভিউর চিঠি সব জায়গা থেকেই আসে, ইন্টারভিউ দিতে গেলে সকলেই বলেন, আপনার রেজাল্ট তো ভালো। কিন্তু ওই পর্যন্তই, চাকরিটা হয় না। পরে খবর নিয়ে জানতে পারে যোগ্যতার বিচারে যারা তার থেকে অনেক নিচে তাদের একজনের চাকরি হয়েছে, তার হয়নি। সব জায়গায় এই এক ব্যাপার।

মাস্টারমশায়ের কাছে গেলে বলেন, তোমাকে আমি আগেই বলেছিলুম। তবে আশা ছেড়ো না, চেষ্টা চালিয়ে যাও।

অনেকদিন পরে আবার তার নামে একখানা রেজিস্ট্রি চিঠি আসে। আগ্রহের সঙ্গে চিঠিটা খুলে দেখে একটা কলেজে তাকে ইন্টারভিউ দিতে যেতে বলা হয়েছে। বিখ্যাত মিশন পরিচালিত কলেজ। সারা ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের বাইরেও ওই মিশন খুব পরিচিত।

ছুটে গিয়ে মাস্টারমশায়ের সামনে সেইদিনই চিঠিটা খুলে ধরল সে। হরেনবাবু বললেন— নামকরা কলেজ, দেখ যদি হয়।

নির্দিষ্ট দিনে কলকাতার উপকণ্ঠে বিরাট কম্পাউন্ড ঘেরা কলেজে গিয়ে উপস্থিত হল মিহির। সুদৃশ্য বাড়ি, কোয়ার্টার, কংক্রিটের রাস্তা, পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বিশাল একটা উপনগরী বিশেষ। গেটের দারোয়ানের নির্দেশমতো একটা তিনতলা বাড়িতে গিয়ে পৌঁছোল। মোট পাঁচজন ইন্টারভিউ দিতে এসেছে, তার মধ্যে তার বন্ধু শক্তিপদ ঘোষ। শক্তিকে জড়িয়ে ধরল সে, তুইও এসেছিস?

ইন্টারভিউ আরম্ভ হতে প্রথমে যাঁর ডাক পড়ল তিনি উজ্জ্বল মেরুন রঙের পোশাক পরে এসেছেন, গলায় টাই, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। শক্তি বলল— ভদ্রলোক গাড়িতে করে এসেছেন, নিজেই ড্রাইভ করেন।

বলছিস, এটা ওঁর বাড়তি কোয়ালিফিকেশন?

মিহির হাসে।

পরে যাঁর ডাক পড়ে তিনিও গাড়ি করে এসেছেন, তবে ড্রাইভার সঙ্গে এসেছে।

তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে ডাক পড়ে মিহিরের । যাবার সময়ে শক্তির দিকে তাকিয়ে বলে, আমিও গাড়ি করে এসেছি, তবে সেটা বাস, ড্রাইভার স্টপেজে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে গেছে।

টাক-মাথা বয়স্ক এক ব্যক্তি মিহিরকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার নাম মিহির দত্ত? উপস্থিত আরো দু'জন লোক তাকে এক নজর দেখেই হাতের কাগজপত্রে মনোনিবেশ করলেন। দু'জনেই প্রায় সমবয়সি। চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে বয়েস হবে।

টাক-মাথা ব্যক্তি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, রেজাল্ট তো আপনার খুবই ভালো, তা আপনি গিয়ে মহারাজের সঙ্গে দেখা করুন।

দরজার বাইরে যে লোকটি দাঁড়িয়ে ছিল সে-ই তাকে সঙ্গে করে দোতলায় নিয়ে গেল। ওপরটা আরো সুন্দর, মোজাইক-করা মেঝে, দেয়ালগুলো রং-করা ঝকঝকে, তকতকে। মহারাজের ঘরের মেঝে এবং দেয়ালে টাইল বসানো, বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিল, গদি আঁটা চেয়ার। গাঢ় রঙে ছাপানো লুঙ্গি এবং পাঞ্জাবি পরে মহারাজ টেবিলের ওপরে দুটো

পা তুলে দিয়ে বসে আছেন। মাথা ন্যাড়া, চোখে চশমা, হাত দুটো বুকের ওপর রেখে চোখ বুজে আছেন। মিহির ঘরে ঢুকতে বললেন, বোসো। তোমার নাম?

বসবার জন্য একটাই মাত্র চেয়ার। মিহির চেয়ারটায় বসে দেখল মহারাজের দু'খানি পায়ের পাতা একেবারে মুখের ওপর। বয়স খুব বেশি হলে পঞ্চাশ, শরীরখানা দশাসই, ফর্সা উজ্জ্বল রং। পোশাকটা ঢোলা আলখাল্লার মতো।

আবার প্রশ্ন হল, তোমার নাম?

পায়ের পাতা ছাড়া মিহির আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। পায়ের পাতা মানুষের এত বড়ো হয়? এত চকচকে? এক কণা ধুলো নেই, যেন হাত বুলিয়ে বুলিয়ে, তেল মালিশ করে করে যতদূর সম্ভব চকচকে করে তোলা হয়েছে। পায়ের পাতার দিকে তাকিয়ে কথা বলা যায় কখনো? মুখটা তো দেখা দরকার। হঠাৎ মিহিরের মনে হল ওই পা দুটো বাড়তে বাড়তে বিশাল আকার নিচ্ছে, ঘরের ছাদে ঠেকে গেছে পায়ের পাতা, তার দৃষ্টির সামনে সারা পৃথিবীটা জুড়ে এক জোড়া পায়ের পাতা, ভয়ানক অস্বস্তিতে ছটফট করে উঠল তার অন্তরাত্মা, আর একটু হলে দম বন্ধ হয়ে যাবে যেন। নাম বলতে পারল না সে। বলল, পা-টা নামিয়ে বসুন।

ভূমিকম্পে পৃথিবীটা নড়ে উঠল বুঝি। কেঁপে উঠল টেবিলটা। পা জোড়া নামিয়ে সোজা হয়ে বসলেন ন্যাড়া মাথা রঙিন ঢোলা পোশাক পরা মসৃণ চকচকে চেহারাব গৌরবর্ণ মানুষটি।

ও, আচ্ছা! আপনি দয়া করে নামটা বলবেন?

মিহির দত্ত।

টেবিল থেকে একটা কাগজ তুলে নিয়ে মহারাজ কিছুক্ষণ তা থেকে কী দেখলেন।

আপনি গত বছর পাস করেছেন।

হ্যাঁ।

দেখুন, একজন লোককে দিয়ে আমরা ক্লাস নেওয়াচ্ছি। সে মোটামুটি ভালোই পড়াচ্ছে। তাকে ছাড়িয়ে দিয়ে আপনাকে নেওয়াটা কি উচিত হবে?

একথা আমাকে কেন জিজ্ঞেস কবছেন?

জিজ্ঞেস কবছি এই কাবণে যে আপনাব জন্য আর একজনের চাকরি যাক এটা নিশ্চয আপনি চাইবেন না।

আমি কেন তা চাইব? মিহিরেব বিস্ময়েব আর সীমা থাকে না। বলে, কিন্তু আপনারা তো দু'জন লোক নেবেন, বিজ্ঞাপনে তো তা-ই আছে।

তা আছে, কিন্তু আমারই বলতে ভুল হয়েছে, দু'জন লোকই কাজ করছে। শিক্ষক হিসাবে তারা দু'জনেই যোগ্য। আপনি কী বলেন? তাদের ছাড়িযে দেব?

আমি এ প্রশ্নের কেন জবাব দিতে যাব?

তাহলেও আমার তো একটা কর্তব্য আছে। তা-ছাড়া আপনি তো ফরেনে যাচ্ছেন।

আমি? ফরেনে যাচ্ছি?

আমার কাছে তো সেই রকমই খবর আছে, আর কয়েক মাস পরেই আপনি ফরেনে চলে যাচ্ছেন। আপনাকে কোন্ ভরসায় নিই বলুন। কলেজের স্বার্থটা'ও তো আমাকে দেখতে হবে!

আমি জানি না, আর আমার ফরেনে যাওয়ার সংবাদ আপনি জেনে বসে আছেন?

বললাম তো আপনাকে। আমার কাছে সেই সংবাদই এসেছে। এ তো ভালোই। বাইরে যেতে পারলে উন্নতির সম্ভাবনা বেশি।

আমি ফরেনে যাচ্ছি না। আপনার সংবাদ ঠিক নয়।

কথাটা বলার পর মিহিরের দুটো কানের পাশ ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে, সমস্ত রক্ত যেন মাথায় উঠে এসেছে।

নিচে নেমে শক্তির সঙ্গে দেখা হয়। শক্তির ডাক পড়েছে, সে ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছে।

তুই একটু দাঁড়া মিহির। আমি আসি, একসঙ্গে যাব।

কথাটা বলে শক্তি ভেতরে চলে যায়।

অস্বাভাবিক গম্ভীর লাগে মিহিরকে। কিছুক্ষণ পরে বারান্দা থেকে নেমে গিয়ে বাগানের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে। কত রকমের ফুল। চোখ দুটো তৃপ্তিতে ভরে উঠলেও মনের ভেতরটা জ্বলে যেতে থাকে। চোখের সামনে এখনো পা দুটো ভাসছে সেই সঙ্গে নাড়া মাথা তেল চকচকে মুখখানা।

শক্তি ফিরে আসে। কলেজ কম্পাউন্ডের বাইরে তারা বাস রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। শক্তি বেশ হাসিখুশি। একটার পর একটা প্রশ্ন করে, কিন্তু মিহির নীরব। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে মিহির তার মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞেস করে, মহারাজ তোকে কী বলল?

বলল, কবে জয়েন করতে পারব। কলেজের কোয়ার্টারে থাকতে রাজি আছি কি না।

পা জোড়া টেবিলে তুলে রেখেছিল?

হ্যাঁ, দেখ্ মাইরি, কী বিশ্রী ব্যাপার।

কিছু বললি না তুই?

না।

মিহির খপ্ করে ওর বুকের জামাটা চেপে ধরে।

তোর চাকরির এত দরকার? আমার থেকে তোর দরকার বেশি?

মুঠির মধ্যে জামাটা দলা পাকাতে থাকে সে, তারপর ওকে ঠেলে দিয়ে বলে— যা, যেখানে যাবি যা। নিজে পেছন ফিরে হন্ হন্ করে হেঁটে চলে, মনে হয় বাড়ি পর্যন্ত সমস্ত পথটাই বুঝি আজ সে হেঁটে যাবে।

সিদ্ধবাক

মিহির সেন

ইতু আজ মারা যাবে।

জপের মালার রুদ্রাক্ষগুলো কম্পিত আঙুলে সরাতে সরাতে ভাবছিলেন ঠাকুমা, ইতুর জীবনের আজ শেষ দিন। মিথ্যে হতে পারে না, এ. ভুল হতে পারে না। আজ ইতুর উনিশ বছরের শেষ দিন, বিশে পা দেবে কাল। অথচ এখনো....

ঘরের মৌন ভেঙে দেয়াল ঘড়িটা যেন চীৎকার করে উঠল— ঠং। সবাই ফিরে তাকায় ঘড়িটাব দিকে। আশ্বাসে হোক আক্রোশে হোক, সবাই।

ঘরের এককোণে দুবার শেষ করা দৈনিকটাতে কৃত্রিমভাবে ডুবে-থাকা বাবা, খাটের এককোণে বার বার কাঁটা থেকে ঘর-পড়ে-যাওয়া উলবোনারত মা, এলোমেলো টিপভুল হয়ে যাওয়া ক্যারাম খেলামগ্ন দু'ভাই, সকলেই ফিরে তাকাল। যেন উদগ্রীব হয়ে ঘড়ির এই সরব ঘোষণাগুলোর জন্যেই সবাই প্রহর কাটাচ্ছে। তাকাল না শুধু ইতু। এ মুহূর্তের নায়িকা, এ রাতের কেন্দ্র—ইতু। খাটের এককোণে ঠিক একই ভাবে ঘাড় গুঁজে বসে আছে সে। ওর মুখের ওপর সঞ্চারমান সময়গুলোর প্রভাব তাই পড়া গেল না।

আরো উদ্ভাসিত হয়ে উঠে অশোকের মুখ। মা-বাবারও। শুধু একটু বেশী আনমনা দেখাল ঠাকুমাকে। অশোক বললো, কি ঠাকুমা। উত্তরে খেঁকিয়ে উঠলেন ঠাকুমা, কি ঠাকুমা মানে? আমিও কি সেরকম কিছু হোক চাই নাকি? তবু লখিন্দরের কাহিনী জানিস তো? এখন ভালোয় ভালোয় সময়টা কেটে গেলেই হয়। তাঁর ঘনকুঞ্চিত কপালে আরও একটা কুঞ্চন বাড়ল বলে যেন মনে হলো অশোকের।

আবার যে যার কাজে ডুবে গেল। আবার শুরু হলো সময়পাড়ি। খুট্ করে একটা শব্দ হলো দরজার আছে। ভুরু কুঁচকে উঠল বাবার। কাগজটা নামিয়ে একবার কান খাড়া করলেন। আবার উঠে দাঁড়ালেন বাবা। আতঙ্কিত সংশয়ী চোখে ফিরে তাকাল সবাই। সন্তর্পণে দরজাটা খুললেন বাবা। মা বললেন, কি? দরজাটা আবার বন্ধ করতে করতে বাবা বললেন, ইঁদুর। পড়ে-যাওয়া ঘরটা আবার কাঁটায় তুলে নিলেন মা। থেমে থাকা আঙুল দুটো পরের রুদ্রাক্ষের জন্যে এগিয়ে গেল ঠাকুমার। স্ট্রাইকারটা ছুটে বেরিয়ে গেল রেড্ লক্ষ্য করে। চৌকাঠের ফুটোটা বন্ধই ছিল কাপড় দিয়ে, দুবার তবু ঠেলে দেখলেন বাবা, ঠিক আছে কিনা। অটুট আছে কিনা লৌহবাসর। হোক এটা শীতকাল। শহর কলকাতা।

ঠাকুমা আর একবার আড়চোখে তাকালেন ঘড়িটার দিকে। আর মাত্র আধঘণ্টা। অথচ....। বিরক্তিতে ছেয়ে যায় মনটা। শুধু ইতুর নয়, আজ যেন তাঁর নিজের জীবনেরও একটা ঐতিহাসিক দিন চরম পরীক্ষার মুহূর্ত। হয় এতদিনের বিশ্বাস আর সাধনার সত্যতা প্রমাণিত হয়ে জয়ী করবে তাঁকে, নয় অশোকের নাস্তিকতার ঔদ্ধত্যের সামনে চুরমার করে দেবে। শূন্যের অঙ্কে হবে তার মূল্য নিরূপণ।

চোখের সামনে ভেসে উঠল সর্বদর্পহারী চক্রধারী নারায়ণের সুদর্শন মূর্তিটি, আর তারই পাশে তাঁর দীক্ষাগুরু সিদ্ধবাক সাধকের সৌম্যমূর্তি। কারো কাছ থেকে একটি কপর্দকও

গ্রহণ করতেন না তিনি। একটি ফলও না— ভিক্ষা হিসাবে দিলেও না। একপাশে সরিয়ে রেখে হাসতেন। এতদিন, বার্ধক্যের সীমান্তে এসেও দীক্ষা নেননি ঠাকুমা। নিষ্ঠাবতী, গোঁড়াধর্মান্ধ হলেও ব্যক্তিত্ব ছিল তাঁর প্রখর। দীক্ষা দেবার কারো জন্মগত অধিকারে বিশ্বাস করতেন না ঠাকুমা। সমস্ত জীবনব্যাপী তাই দীক্ষাগুরু খুঁজেছেন তিনি। তারপর এতদিনে পেলেন তার দেখা। সিদ্ধবাক সৌম্য সেই সাধক! ঠাকুমার আঙুলগুলো জপের রুদ্রাক্ষের ওপর কাঁপতে থাকে ধীরে ধীরে।

ইতু আজ মারা যাবে!

হাসি পায় অশোকের। নিয়তি! স্ট্রাইকার আর ঘুঁটিগুলোতে অন্যমনস্কে নড়ে চড়ে বেড়ায় আঙুলগুলো। আর মন জুড়ে এলোমেলো চিন্তা।

বিজ্ঞানের ছাত্র অশোক, সংস্কার আর ধর্মের ছিল দুর্জয় বিরোধী। নবাগত সিদ্ধবাক সাধকের নির্লিপ্তি প্রথম প্রথম ওকেও কিছুটা অবাক করেছিল। কিন্তু সে শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্যে। ও বুঝেছিল, এ শুধু আখেরে লাভের সন্তর্পণ প্রস্তুতি। ধর্মের ইতিহাস জানে ও। এ সমস্ত বুজরুকি। বিরাট ধাপ্পা।

এ শুধু তার দৃঢ় বিশ্বাস নয়, এ বিশ্বাস ঘোষণায় দুর্জয়ও সে। ধর্মান্ধ গোটা মুখার্জী পরিবারের সঙ্গে সংঘাত তার লেগেই আছে। যদিও এজন্যে কম নিগ্রহ সহ্য করতে হয় না তার। অবশ্য প্রথম বন্ধনমুক্তির অতি-উচ্ছ্বাসও যে তার না ছিল তা নয়। বাড়াবাড়িও তার ছিল কিছুটা। ধর্মের এতটুকু অংশ, সংস্কারের এতটুকু আভাস সে সহ্য করতে পাবত না।

কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে তাই সিদ্ধবাকের কাহিনী শুনে মুহূর্তে আগুন হয়ে উঠেছিল অশোক। ইতু নাকি উনিশ বছরের বেশী বাঁচবে না, সিদ্ধবাকের ভবিষ্যৎবাণী— বিশে আর পা দেবেনা ইতু। কিছুতেই না। আঁৎকে উঠেছিল নাকি ইতু। ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল শান্ত, ক্ষীণজীবী দুর্বলচিত্ত মেয়েটা। হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিল ঠাকুমা। ইতুর এই উনিশ চলছে!

ফিরে এসে সব শুনে মাথায় সেই আগুনটা জ্বলে উঠেছিল অশোকের আবার। নিয়তি? সবাইকে শুনিযে শুনিয়েই চেঁচিয়ে উঠল সে, বুজরুকি, এ সমস্ত বুজরুকি। তুই ভয় পাস না ইতু। এ সমস্ত ধর্মের নামে ব্যবসা। বোকাদের ওরা এইভাবেই ঠকায়।

সন্ধ্যা-আহ্নিকে বসতে যাচ্ছিলেন বাবা। শুধু একবার বাইরে এসে ডাকলেন, অশোক!

মুহূর্তে চুপসে গেল অশোক। বাবার এ মূর্তির সঙ্গে সে পরিচিত, এই দুর্বাসা-রূপের সঙ্গে। মাথা নীচু করে ভেতরে চলে গেল অশোক। গেল ইতুব ঘরের দিকে ওকে সান্ত্বনা দিতে। কিন্তু চৌকাঠ পেরিয়েই থমকে দাঁড়াল। আয়নার সামনে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে বসে আছে ইতু। সমাধিস্থ তাপসীর মতো। অদ্ভুত সে চোখের দৃষ্টি। আশ্চর্য সে সমাহিতি।

ইতুর মেরু-জীবনে ঋতু পরিবর্তন সেদিন থেকেই।

খাট থেকে শুধু একটা পা নামিয়েছিল ইতু, হা হা করে উঠলেন মা-ঠাকুমা, এই —এই, করিস কি? করিস কি? কোথায় যাস?

— একটু জল খেতে, মিন মিন করে জবাব দেয় ইতু।

— তা বললেই পারতিস, আমরা এতগুলো লোক থাকতেও....কথাটা শেষ না করেই মা আবার বললেন, আর কটা মিনিট বইতো নয়, একটু ধৈর্য ধরে থাক না মা।

মা জল এনে দিলেন। আবার ধীরে ধীরে নিস্তব্ধ হয়ে এলো ঘরটা। ক্যারাম রেখে একটা বই নিয়ে বসল অশোক। ঘুমে নুয়ে পড়ল ছোট ভাই খাটেরই এককোণে। ছবির এক একটা

মডেলের মতো স্থির বসে থাকল যে যার জায়গায়, বেহুলার সজাগতা নিয়ে। শুধু ঘড়িটা অনেক বেশী শব্দ করে এগিয়ে চললো, টিক-টিক-টিক।

বাবার চোখে ঘুম জড়িয়ে এসেছে। কাগজটা কোলের ওপর এলিয়ে পড়েছে। চুলের ভেতর ঘন ঘন হাত বুলাচ্ছেন বাবা স্তিমিত চোখে। কঠিন মকদ্দমার আগে বাবাকে অনেকদিন দেখেছে অশোক এ অবস্থায়। সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার পথান্বেষী বাবাকে। সঞ্চারমান সময়গুলি কি বাবাকেও দুর্বলতর করছে?

ভাঁজকরা হাঁটুর ওপর চিবুকটা চেপে মাথা নীচু করে এক মনে পায়ের একটা নখ খুঁটে চলেছে ইতু। উপলক্ষই। এখনও কি চিত্তের সে স্থৈর্য আছে ইতুর, এলোমেলো চিন্তাগুলোকে যা পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে তুলতে পারে? সঠিক সিদ্ধান্তগামী করতে পারে বিচারকে? ইতু ঠিক কি ভাবছে এ-মুহূর্তে? বড় ভীতু, বড় দুর্বলচিত্ত মেয়েরা —পারাবত-মনা।

ছেঁড়া স্মৃতির রেশ টানল আবার অশোক। আয়নার মুখোমুখি সেই সমাহিতি ভাঙতে প্রথম প্রথম কেন যেন একটু ভয় ভয় করছিল অশোকের। ফিরে গিয়েছিল তাই সে ঘর থেকে। ফিরে এসেছিল আবার ঘণ্টা দুই পরে। ঘর অন্ধকার দেখেই বুঝল ঘরে কেউ নেই। কিন্তু সুইচটা জ্বালতেই চোখে পড়ল ইতুকে। জানলার শিকের সঙ্গে মুখটা চেপে ধরে দিগন্তের দিকে চেয়ে বসেছিল। চমকে উঠল ইতু অশোককে দেখে। চমকালো না কিন্তু অশোক। বুঝল, প্রতিক্রিয়ার এই সবে শুরু। গভীর বেদনার্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, এ ভাবে চুপ করে বসে আছিস যে?

ভিজে চোখ দুটো নামিয়ে নিল ইতু।

আরো কাছে সরে এলো অশোক। সান্ত্বনার সুরে বললো, কি মেয়েরে! আজকালকার মেয়ে হয়ে তুইও বিশ্বাস করলি ও সব! ও সমস্ত বুজরুকি।

ইতু একটু ইতস্তত করল। বললো, উনি সিদ্ধবাক।

-- সিদ্ধবাক? সমস্ত ভণ্ডামি, রাগে জ্বলে উঠল অশোক।

যেন একটা আশ্রয় পেল ইতু। তবু আমতা আমতা করল, সেরকম সাধু নন উনি। আব বাবা বলেছেন, এ তো আর কোনো মনগড়া কিছু নয়, এও বিজ্ঞান। প্রত্যেকের অতীত, বর্তমান সমস্ত হুবহু বলে দিলেন সাধুবাবা। যাকে যা বলেন উনি, তার একটাও নাকি ব্যর্থ হয় না।

বুঝল অশোক শুধু রাগে কিছু হবে না। বললো, দেখ-- আমিও কিছুদিন 'কিরোর' বই পড়েছি। অতীত-বর্তমান অনেকেই বলতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যৎ বলা অত সহজ নয়। হাতের রেখা মাঝে মাঝে বদলে যায়, দৃঢ় আত্মবিশ্বাস থাকলে বদলে ফেলাও যায়। মিথ্যে কেন ভয় পাচ্ছিস? আর বাড়িও হয়েছে এমন! যত সব ভণ্ডের ইয়ে!

যেতে যেতে সব শুনলেন ঠাকুমা। রাগে কাঁপতে কাঁপতে এসে ঢুকলেন ঘরে। মুখ সামলে কথা বলো অশোক। বড় বেশী উদ্ধত হয়ে উঠছ আজকাল। নিজের যা খুশি বিশ্বাস থাক, অন্যের বিশ্বাসকে অপমান করবার কোনো অধিকার তোমার নেই।

— কেন নেই? সমানে রুখে উঠল অশোকও, চোখের সামনে এত বড় ভণ্ডামি চুপ করে সয়ে যাব? একদিনে মেয়েটার চেহারা কি হয়েছে দেখেছ?

— সে সাধুবাবার দোষ নয়, ওর নিয়তির।

— নিয়তি? নিয়তি বলে কিছু নেই। একটা বিকলাঙ্গ ধর্ম নিয়ে শুধু ব্যবসা এটা।

এবার দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলেন ঠাকুমা, অকাল কুষ্মাণ্ড, ইতর ছেলে, বিকলাঙ্গ বলবার স্পর্ধা রাখো বাপ-ঠাকুরদার ধর্মকে?

অশোক জানিয়েছিল সে স্পর্ধা সে রাখে। যেহেতু সে জানে ধর্মের ইতিহাস। সিদ্ধিপুরুষদের ইতিবৃত্ত। আর এও জানে যে, ইতুর প্রতি এ ভবিষ্যৎবাণী ফলবে না, ফলতে পারে না। ইতুকে দিয়েই সে প্রমাণ করিয়ে দেবে যে কতখানি ভুয়ো তাদের ধর্ম।

এত বড় স্পর্ধায় নির্বাক হয়ে কেঁপেছিলেন ঠাকুমা শুধু কয়েক মুহূর্ত। কুঞ্চনগুলো শক্ত হয়ে উঠেছিল কপালের। তারপর গম্ভীর সৌম্যকণ্ঠ তুলে নিয়েছিলেন সেই চ্যালেঞ্জ। বেশ, ইতুকে দিয়েই প্রমাণ হোক কার শক্তি সত্যি, ধর্মের না অধর্মের, ঈশ্বরের না অসুরের। এই জপের মালা হাতে আমি প্রতিজ্ঞা করছি, সিদ্ধবাক সাধকের এই ভবিষ্যৎবাণী যদি ব্যর্থ হয় তবে আমি...

কথা আর শেষ করতে পারেননি ঠাকুমা। এতক্ষণ উত্তেজনার মুখে কেউ ঠিক খেয়াল করেনি ইতুর কথা, ইতুর ৺পস্থিতি। কিন্তু হঠাৎ তাকে দুহাতে মুখ ঢেকে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে সম্বিৎ ফিরে এলো দুজনারই। অপরাধীর মতো মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল দুজনেই। কিছুক্ষণ।

এতক্ষণ তাও ক্যারামের শব্দ ছিল, এবার যেন এক দমবন্ধ নিস্তব্ধতা চার পাশে। অসহ্য হয়ে উঠল সে-মৌন ধৈর্যের ওপর। বাবাই তাই কথা বললেন, পৌষমাস পড়ে গেল অথচ শীতের নাম গন্ধও নেই এবার।

মা বললেন, হ্যাঁ।

আবার সব চুপচাপ। হঠাৎই মা বললেন, অশোক, রমেনরা দিল্লী থেকে ফেরেনি?

অশোক বললো, না।

এবার? এবার কি বলা যায়? মনে মনে হাতড়াতে থাকে সবাই। নিষ্কৃতি পেতে চায় এই শ্বাসরোধী নীরবতা থেকে। তবু এগোয় না কথা।

অহেতুক শব্দে দুটো পাতা উল্টায় অশোক। মিষ্টি ক'টা রিম্‌ঝিম্ শব্দের সঙ্গে মিশে যায় সেই শব্দ। আড়চোখে তাকায় অশোক ইতুর দিকে। কপালের ওপর থেকে ক'গাছা চুল সরাতে গিয়েছিল বোধ হয়; গড়িয়ে নামা ভারী চূড় আর চুড়িতে তাই এ সংঘর্ষ। চোখ নামিয়ে আনে অশোক।

অথচ, বেশ মনে পড়ে অশোকের, এই চূড় পরানোর জন্যেই একদিন কত না সাধ্য-সাধনা আর শাসনের বহর ছিল এ বাড়িতে। চূড় তো চূড়, দু-গাছার বেশী চুড়ি পর্যন্ত পরতে চাইত না ইতু। এত সাধাসিধে ছিল মেয়েটা। অবাক হতো সকলে, ভোগে এ নির্লিপ্ত পেল কোত্থেকে এতটুকু মেয়ে?

শাড়ি না, গয়না না, ভোগবিলাসের কোনো উপকরণই নয়। সংসারে শুধু একটা জিনিসের ওপর ছিল ওর আসক্তি— বই। রাতদিন ঘাড় গুঁজে পড়ে থাকত বই নিয়ে। অনেকে ভেবেছিল বয়সের ধর্মে কিছুটা আকর্ষণ হয়তো আসবে সময়মত। অথচ সে বয়স এসে তো প্রায় চলেও গেল। এমনকি কোনো বন্ধুবান্ধব পর্যন্ত ভালোবাসত না ইতু। বলত, বড় নোংরা ওদের আলোচনা। মেয়েটাকে নিয়ে ভাবনা ছিল না তাই, ভয়ও ছিল না। যা ছিল তা উৎকণ্ঠা।

মাঝে মাঝে বকত অশোক, মেডিকেল ছাত্র অশোক, রাতদিন এভাবে বইয়ে ঘাড় গুঁজে ঘরের কোণে পড়ে থাকিস কেন? একটু হাত-পা নাড়াচাড়া করতে পারিস না? শেষে একটা টি. বি. ঠি. বি. না বাধিয়ে ছাড়বি না দেখছি।

নির্লিপ্ত হাসি হাসত ইতু— তাহলে তো বাঁচি।

আরো চটে যেত অশোক, দেখ, ওসব ডেঁপোমি রেখে দে তো। চল্ আমার সঙ্গে আজ সিনেমা যাবি। নিজেকে এভাবে বঞ্চিত করার ভেতর কোনো কৃতিত্ব নেই। লাইফ ইজ ফর এনজয়মেণ্ট। একটাই যখন জীবন, তাকে অতৃপ্ত রেখে যাবি কেন? পরিচ্ছন্ন উপভোগই

জীবন। ওঠ। অনেক কষ্টে রাজী করানো গিয়েছিল ইতুকে, কিন্তু অশোকের সঙ্গে ওর এক বন্ধুও যাচ্ছে শুনে সেই যে বেঁকে বসল ইতু, আর সোজা করা গেল না।

অবাক হতো অশোক ইতুকে দেখে, মেয়েটা জীবনকে ভয় পায়, না ঘৃণা করে?

আরো অবাক হলো তাই ওর হঠাৎ পরিবর্তনে। প্রথম প্রথম অশোক প্রায়ই লক্ষ্য করত, ইতু আয়নার সামনে চুপ করে বসে থাকে নিজের প্রতিবিম্বের মুখোমুখি, প্রথম দিনের সেই সমাহিতি নিয়ে। ইজেলের গায়ে একটুকরো ছবির মতো।

একদিন পড়ছিল অশোক, হঠাৎ পেছন থেকে সামনে এসে দাঁড়াল ইতু। সত্যিই প্রথমে চিনতে অসুবিধে হয়েছিল ওকে দামী জর্জেটে। একটু সলজ্জ হাসি হাসল, দেখ তো দাদা, কেমন লাগছে?

জোর করে একটু হাসল অশোক, ধ্যান ভাঙালো কোন মহেশ্বর?

কৃত্রিম অভিমান টেনে আনল ইতু স্বরে, সত্যি দেখতো, এমন সং সেজে থাকতে ভালো লাগে? মার জন্যে আর পারি না।

তবু পাবল ইতু। সূচনার সেই হাসিটুকু ধীরে ধীরে মুখ থেকে সরে গেল কিন্তু সরলো না সেই জর্জেটখানা। বরং এতদিনের অবহেলিত দামী দামী শাড়ি ব্লাউজগুলো নামতে থাকল বাক্স থেকে, দিনের পর দিন। গয়নাগুলোও। আংটি ছিল না ইতুব, মার আংটিটাও একদিন নেমে এলো তাঁর হাত থেকে ইতুর অনামিকায়। ইতু সময় পেতে শুরু করল বৈকালিক প্রসাধনে, সবান্ধব আসর জমাতে। এমনকি তাদের সঙ্গে একদিন গিয়ে সিনেমাও দেখে এলো।

তারপর অনেকদিন। শুধু সিনেমাতেই নয়, কফি-হাউস, কাফে, রেস্টুরেন্টেও। তারপর ক্রমে ফিবপো, গ্র্যাণ্ডেও। পদপ্রদর্শক ছিল বন্ধু জয়া। আর অনুগামী বান্ধবীযূথ।

স্কুলের কবে ছেড়ে-আসা বন্ধুদের পর্যন্ত বাড়ি খোঁজ করে করে আকস্মিক উপস্থিতিতে চমকে দিতে শুরু কবল ইতু। কবে কাকে দুটো কটু কথা বলেছিল তারই জন্যে ক্ষমা চেয়ে বসত হয়তো কথার ফাঁকে। অবাক হতো তারা, সে কিরে, হঠাৎ?

বলত না কিছু ইতু। শুধু হাসত। অথবা হেঁয়ালিতে আরো ভাবিযে তুলত ওদের, অনেক দূর দেশে চলে যাচ্ছি তোদেব ফেলে। অনেকে বলে সেখান থেকে ফেরা যাবে, অনেকে বলে যাবে না।

কার কাছ থেকে কবে ক'টা পয়সা নিয়েছিল, স্মৃতিসমুদ্র মন্থন করে ফিরিয়ে দিয়ে এলো ইতু, চলে যাচ্ছি ভাই, পিছে ধার রেখে যেতে নেই। বন্ধুরা অবাক হতো, কোথায়? তারপর হেঁয়ালি ভরা জবাব পেয়ে আর আকস্মিক প্রসাধন বৈচিত্র্যে ভাবত— বোধহয় কোনো শিকার পাকড়িয়েছে। সমুদ্র পাড়ির প্রস্তুতি এটা। বাকি শুধু বিয়েটা।

বাড়ির কেউ এতটুকু বাধা দিত না তাকে। আর কদিন? উপভোগ করে নিক ইতু পৃথিবীটাকে। ফাঁসির আসামীর শেষ ইচ্ছার মতো সাধ মিটিয়ে নিক। ইতুর উপভোগে তাই ইন্ধনের অভাব হলো না।

সারাদিন উড়ে বেড়ায় ইতু, কিন্তু রাত্রে শোবার আগে কেমন যেন বদলে যায়। একমনে তাকিযে থাকে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে। নিজেকে খুঁজে ফেরে সেখানে, অথচ তল পায় না। ক্যালেণ্ডারের সেদিনের তারিখটা তারপর অন্যমনস্কে অনেকক্ষণ ধরে কেটে চলে। তারপর হয়তো হু হু করে কেঁদে ফেলে। কী এক অন্তর্জ্বালায় শিউরে শিউরে ওঠে। বালিশটা আঁকড়ে ধরে ডুকরে কেঁদে ওঠে।

ভালো লাগে না এ পরিবর্তন অশোকের। এ উদ্দাম স্রোতের মুখে বাঁধ দেওযা উচিত, বোঝে সে। তবু সমর্থ হয না এতগুলো শক্তিব বিরুদ্ধে লড়তে।

আবার ভাবে, কটা দিন বইতো নয়, চরম মুহূর্তটা পেরিয়ে গেলেই ভুল বুঝবে, শুধরে যাবে ইতু।

তবু একদিন প্রতিবাদ করতে হলো অশোককে। পড়তে গিয়ে একটা বই খুঁজে পেল না অশোক। বইটা বিশেষ করে ছোট ভাইবোনদের ভয়ে সে একটু সরিয়েই রাখে। কারণ শারীরতত্ত্বের বিজ্ঞানের চেয়ে বিকৃতির খোরাক হিসেবেই ওগুলো মূল্য পাবে ওদের কাছে বেশী। অনেক খুঁজল, তবু পেল না বইটা। শেষ পর্যন্ত ভাবল, ওর অনুপস্থিতিতে নিয়ে গিয়েছে বোধ হয় কোনো বন্ধু। হাতে কোনো কাজ না থাকায় ইতুর ঘরের দিকেই পা বাড়াল তাই। কিন্তু অশোক ঘরে ঢুকতেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠল ইতু। চকিতে হাতের বইটা আঁচলের তলে ঢেকে ফেললো। তবু সেটুকু সময়ের ভেতরই চিনতে পারল অশোক বইটা। অথচ লজ্জায় চাইতে পারল না। দু-চারটে কথা বলেই ভারী মন নিয়ে বেরিয়ে এলো অশোক।

সেদিন রাতে খাবার সময় ইতুকে না দেখে জিজ্ঞেস করল অশোক, মা, ইতু কোথায়? ঘরেও দেখলাম না তো।

একটু আমতা আমতা করে উত্তর দিলেন মা, জয়াদের বাড়ি নেমন্তন্ন আছে। বেশী রাত হলে আর ফিরবে না বলে পাঠিয়েছে জয়ার মা। তারপর নিজে থেকেই কৈফিয়ৎ-এর সুরে বললেন, তা থাকলেই বা একরাত বন্ধুর বাড়ি। তাও এদিকে একটু মনটন গিয়েছে আজকাল।

গম্ভীর হয়ে খেতে লাগল অশোক। অবাক হলো। মুখুজ্যে বাড়ির ছেলেদেরও রাত্রে বাড়ির বাইরে থাকার হুকুম নেই। ইতুই বোধ হয় এই প্রথম ব্যতিক্রম। তবু একদিক দিয়ে সুবিধেও হলো। বইটার প্রয়োজন ছিল কাল। ওর কাছ থেকে তো আর সামনা সামনি চাইতে পারত না। খাওয়ার পর ইতুর ঘরে গেল অশোক, বইটা খুঁজে বের করে আনতে।

বেশ একটা গোপন আশ্রয় থেকে বইটা আবিষ্কারও করল বটে, কিন্তু সঙ্গে আরো কিছু। বিজয়ের ক'টি চিঠি। জয়ার ভাই বিজয়ঃ আজ রাত্রে তো নিমন্ত্রণ তোমার। দেরি হলে এখানেই থাকবে মা'র হয়ে বলে পাঠিয়েছি। তোমার মা'রও বোধ হয় আপত্তি হবে না—কারণ আমি তো এখন 'কলকাতার বাইরে' মাদ্রাজে, কি বলো?....

পরদিন যখন ঘুম থেকে উঠল অশোক মুখ তার থম্‌থম্ করছে। এবার সময় এসেছে বাঁধ দেবার, বাধা দেবার। চরম মুহূর্ত যতই ঘনিয়ে আসছে ততই যেন উন্মত্ত হয়ে উঠছে ইতু। নিজেকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে পরম তৃপ্তির জন্যে। অথচ প্রতিটি তৃপ্তিই জাগিয়ে তুলছে অতৃপ্তি। ভোগের বিজ্ঞানই এই, জানে না ইতু।

দুপুরে নির্জন ঘরে উপুড় হয়ে শুয়েছিল ইতু। বুঝল না অশোক, ঘুমোচ্ছে কিনা। কিন্তু পায়ের শব্দেই মুখ তুলে চাইল ইতু। থম্‌থম্ করছে মুখচোখ। দরজাটা বন্ধ করে দিল অশোক। বিনা ভূমিকাতেই কাছে এগিয়ে গেল, ইতু এভাবে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছিস কেন?

সোজা হয়ে উঠে বসল ইতু। সবই বুঝল, তবু জিজ্ঞেস করল, অর্থাৎ?

— কেন, নিজে বুঝছিস না? মিথ্যে একটা ভয়ে নিজেকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস টের পাচ্ছিস না?

আবদারী মেয়ের মতো দাদার গা ঘেঁষে এলো ইতু, ও, তাই বলো। আর কটা দিন বইতো নয়। তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বললো, একটাই যখন জীবন তাকে অতৃপ্ত রেখে যাই কেন? লাইফ ইজ ফর এনজয়মেন্ট। অশোক বুঝল ইঙ্গিতটা ব্যঙ্গের। তারই জীবনদর্শনের পুনরাবৃত্তি। তবু বললো, কিন্তু সে এরকম উচ্ছৃঙ্খল উপভোগের নয়। স্বাস্থ্য, সম্পদ, সংস্কৃতি—জীবনের সমস্ত দিকের পরিচ্ছন্ন পরিপূর্ণ উপভোগই জীবন। এই উচ্ছৃঙ্খল উপভোগ নয়।

একটু চমকে উঠল ইতু। তারপর বললো, তোমার কথা শেষ হয়েছে? আমার ঘুম আসছে বড়।

বুঝল অশোক, ইতু আজ কারো উপদেশ চায় না। পরামর্শ চায় না। নিজের ওপর পর্যন্ত সমস্ত অধিকার হারিয়ে ফেলেছে সে আজ। সমস্ত চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে অসহায়ের মতো অশোক উদগ্র হয়ে চেয়ে রইল তাই এ দিনটির দিকে। আর যতটা সম্ভব প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে যেতে থাকল সবার সঙ্গে। বিশেষ করে ঠাকুমার সঙ্গে।

ইতুর এক-একদিন আয়ু যেন এক একটি জয়স্তম্ভ অশোকের।

চিন্তায় তলিয়ে গিয়েছিল অশোক। আচমকা ঘড়ির শব্দে চমকে উঠল। বারোটা বাজছে! আবেগে উদ্বেল হয়ে ওঠে অশোক। দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরল ইতুকে, ইতু কেমন! আমি তখনই বলি নি? তারপর তাকাল ঠাকুমার দিকে বিদ্রূপের ঝিলিক-মারা-চোখে।

মা-বাবা উঠে দাঁড়ালেন। স্মিত হাসিতে ছেয়ে যাওয়া মুখ দুটো বড় ছেলেমানুষ ছেলেমানুষ দেখাচ্ছে। বাবা বললেন ঠাকুমাকে, মা, এবার তবে শুতে যাও। বেহুলাকেও তবে হার মানালাম আমরা, কি বলো।

শুধু একটি কথাও বললেন না ঠাকুমা। ঝড়ের প্রস্তুতি নেওযা আকাশের মতো গুমোট হয়ে উঠল তাঁর মুখ। রুদ্রাক্ষের ওপর দিযে ছুটে চললো কম্পিত আঙুল দুটো। একবার শুধু বললেন, সারারাত দেখলে হতো না?

আর দুহাতে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকল ইতু। কেউ বাধা দিল না— আনন্দাশ্রুকে বাধা দিতে নেই।

পরদিন অন্যদিনের চেযে অনেক বেশী ভোরে উঠল অশোক। বিজয়গর্বে টলমল করছে আজ ও। কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। ইতুকে তো অন্তত তোলা যাক। ইতুর ঘরের সামনে মুখোমুখি দেখা হযে গেল ঠাকুমার সঙ্গে। কিন্তু মুখের সামনে ঠেলে আসা বিদ্রূপটাকে ও সামলে নিল ঠাকুমার অদ্ভুত ক্লান্ত দুটি চোখের দিকে তাকিয়ে। কিছু না বলেই গিয়ে ধাক্কা দিল দবজায়, ইতু এই ইতু, ওঠ।

কোনো সাড়া নেই। অত রাতে শুয়েছে! আবার ডাকল অশোক, ইতু! কিরে, ফাঁড়া কেটে যাওয়ায় একেবাবে শুষিয়ে ঘুমোচ্ছিস যে!

তবু সাড়া নেই। এবার জানলার দিকে এগিয়ে যায় অশোক। বন্ধ জানালা সব কটা। ফ্যাকাসে হয়ে যায় মুখ। দৌড়ে আবার দরজাব কাছে ছুটে আসে অশোক। তারপব সমস্ত শক্তি দিয়ে ঠেলতে থাকে দরজা, ইতু —ইতু —ইতু!

কম্পিত পায়ে ফিরে আসেন ঠাকুমা, সে কি? দৌড়ে এলেন মা-বাবাও। কি ব্যাপাব? দরজা ততক্ষণে ভেঙে পড়েছে। হুমড়ি খেয়ে পড়ল সবাই ঘরের ভেতব। তারপর থমকে থেমে গেল। কড়িকাঠের সঙ্গে পরনের শাড়িটা দিয়ে ঝুলছে ইতু। বোবার মতো ক'মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল সবাই। তারপর মা গিয়ে আছড়ে পড়লেন দেহটাব ওপর। বাবা দুহাতে মুখ ঢেকে বসে পড়লেন। আর ঠাকুমা বিড়বিড় করলেন নিজের মনে, আমি তখনই জানতাম। ইংরেজী নিয়মে দিন গুণলেই কি আর হয়? নিয়তি যাবে কোথায়? তারপর হাউ-হাউ করে চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন, ইতু, তুই একী করলি? গুরুদেব, তুমি পারলে না আমাদের সোনার বাছাকে নিয়তির হাত থেকে বাঁচাতে?

শুধু অশোক, মেডিকেল ছাত্র অশোক, এই শোকের ঝড়ের ভেতরও বিস্ফারিত দুচোখে নতুন এক আবিষ্কারের বিস্ময়ে তা৷কিয়ে থাকল ইতুর আসন্ন মাতৃত্বাভাস আর পূর্ণবক্ষের দিকে। তারপর এক ঝটকায় বেবিয়ে এলো ঘর থেকে। যেতে যেতে সবাইকে শুনিয়েই অস্ফুটে বলে গেল, এ মৃত্যু নয়, হত্যা!

ঘেন্না

সুলেখা সান্যাল

হাওড়া ছাড়িয়ে ওদিকে হুগলি পর্যন্ত যে স্টেশনগুলো পড়ে তারই একটা থেকে কোলকাতা-মুখো ট্রেন ছাড়ছে। কলরব করতে করতে একদল মেয়ে আসে প্রায় দৌড়তে দৌড়তে। বেশীর ভাগই বিধবা-মধ্যবয়সী। প্রায় হাঁটুর ওপর উঁচু করে পরা আধময়লা থান, সবায়েরই খালি গা, খালি পা। মাথায় আর কাঁখে প্রত্যেকেরই একটা করে বস্তা। সবুজ নিশান দেখাতে শুরু করছে গার্ড, অস্ফুট আর্তনাদ করতে করতে পায়ের গতি আরও বাড়ায় ওরা, "হেই বাবা লোকনাথ! পৌঁছে দিও বাবা।" হাঁসফাঁস করতে করতে উঠে পড়ে কোনো মেয়ে-কামরায়, মাথার-কাঁখের বস্তাগুলোকে ফেলে দিয়ে বড় বড় নিঃশ্বাস নেয়, "পেয়েছি গো বাবার দয়ায়। ভেবেছিলাম, আজ বুঝি আর যাওয়া হোলনি।"

— "হ্যাগো? সদি কই গো?" একটু আরাম করে বসে কৌটো থেকে মিসি বার করে দাঁতে দিতে দিতে হঠাৎ খেয়াল হলো সুন্দরীর, "হা রে, তাকে কেউ দেখলিনি তোরা? এখনও এলোনি! মাগী হাঁটতেই কি পারে?"

ও পাশের বেঞ্চ থেকে যোগমায়া বলে, "বলিনি তখন, নিস্‌নে ও বাঙালকে ব্যবসার কাজে, শুনলিনি। ওর জন্যে তোকে বিপদে পড়তে হবে, এ আমি বলে দিলাম।"

সুন্দরী উদ্বিগ্ন মুখে তাকিয়েছিল জানলা দিয়ে, দু'টো বাঁশি পড়েছে ট্রেনের, এখনও এলো না, "হেই যা! গাড়ি যে ছাড়ল গো।"

একটু দূরে দেখা যায় সৌদামিনীকে, হাঁটছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। জানলা থেকে সুন্দরী প্রাণপণে চেঁচায়, "হেথা গো— এই সদি। দৌড়ো—দৌড়ো। গাড়ি পাবিনি।" দৌড়য় সৌদামিনী, সারা গাড়িসুদ্ধ লোক যেন হাঁ করে তাকিয়ে ওর দিকে, ভেবে কান দু'টো লাল হয়ে ওঠে।

হেঁচকা টান মেরে প্রায় চলন্ত গাড়িতে ওকে তুলে নেয় সুন্দরী আর চেঁচায়, "এমন ঝকমারিও করিছি গো তোকে কাজে নিয়ে, আমার সব্বোনাশ না করে ছাড়বিনি তুই।"

বসে নিঃশ্বাস ফেলে সদি, কপাল বেয়ে ঘামের ফোঁটা নেমে আসছে। বড় বড় ভীরু চোখের দৃষ্টি দিয়ে গাড়ির ভেতরটা একবার দেখে নেয়।

গাড়ির যাত্রীণীরা— এ-গ্রাম ও-গ্রামেরই ঘর-গেরস্থের কেউ বউ, কেউ শাশুড়ি। মুখ চেনা-চিনি এর সঙ্গে ওর, আনকোরা বাইরের লোক ছাড়া এ সবে আশ্চর্য হয় না ওরা। একজন জিজ্ঞেস করে, "একে আবার কোথায় পেলে গো সুন্দুরী? নতুন লোক যে!"

পাশের একজন গায়ে ঠেলা দিয়ে বলে, "বাঙাল গো বাঙাল— বুঝছোনি? হাঁটা-চলা-ফেরা দেখেই বোঝা যায়।"

সুন্দরী সৌদামিনীর ফেলে দেওয়া বস্তা ভালো করে বেঞ্চির নিচে ঢুকিয়ে দিয়ে ঠিক হয়ে বসে, তারপর ট্রেনটা জোরে চলতে শুরু করলে আঁচলে বাঁধা একরাশ মুড়ি কোলের ওপর রাখে, বলে, "খা— আজ তো আর সারাদিন পাবিনি খেতে।" ছল-ছল করছিল তখনও সৌদামিনীব চোখ, ভারী গলায় বলে, "আসার সময় ছেলেটা হাউমাউ করে কানতেছিল, বলে, 'আমি যাব'। ওরে ফেলে আসতি মন চায় না।"

— "থাকবে ঠিক। কেন, আমারও তো রয়েছে গঙ্গা আর বোঁচা, মানুষ নয় ওরা? তোর ছেলে বাপু বড় নেই আঁকড়া।"

— "ওরা যে বাঙ্গাল ক'য়ে খেপায় ওরে। কানতিছিল কাল রাত্তিরে, এখানে থাকতি চায় না।"

ওপাশে কয়েকজন মুচকি হাসে সৌদামিনীর পূর্ববঙ্গের টান শুনে— ওর ছলছলে চোখ দেখে।

রেগে গিয়ে সুন্দরী মুখভঙ্গি করে, "তা যাও, দেশেই ফিরে যাও তোমাদের। সুখে আছ— সইবে কেন? পড়েছিলে তো সেই ইস্টিশনে— সেই ছিল ভালো। তোমাকে দিয়ে আমার ব্যবসা চলবেনি বাপু। এইতো সেদিন, শ্রীরামপুরের রামলোচন দোকানীর সঙ্গে ঠিক করে এলুম পঁচিশ টাকা মণ, তোমাকে দিল চব্বিশ টাকা। একটা আপত্তি না, কিছু না। ন্যায্য দাম চাইতে গেলাম, বলে, 'দেবো কেন? যার চাল সেই তো দিলে।' আরে বাপু, টাকাটা সদিকে ধার দিয়েছিল কে?" বলে সামনের বেঞ্চের সহযাত্রিণীর মুখের দিকে তাকাল সমর্থনের আশায়, "তা যাও। দুটো পয়সা পাচ্ছ আর এখন বুঝি দেশের মায়া উথলে উঠছে তোমার। ঝুঁটি ধরে ধরে মুসলমানগুলো তাড়াল যখন, তখন তো কই বাঁচাল না তোমার দেশ।"

আবার ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ করে ওঠে সৌদামিনী, "তাড়াবি কেন। ওরা তো থাকতিই কইছিল। সকলে আসতিছে দেখে আমি আর থাকি কোন ভরসায়।"

কিন্তু ভরসা কি একেবারেই ছিল না? যাবার খবর পেয়ে কানাই এসে বসেছিল, ম্লানমুখে বলেছিল, "সত্যিই যাবা?"

— "যাব না?"

— "না।"

— "ক্যান্?"

— "যাচ্ছ কি মুসলমানগারের ভয়ে, আমাগারে রহিস কাকা আর হাফেজরে বিশ্বেস কর না?"

লজ্জিত হয়ে বলেছিল সৌদামিনী, "না— তা না। এখানে থাকলি খাব কি? বাবুগারে পাড়ায় ভদ্দরলোক এক ঘর নাই যে খাটো খাব— পেট চলবি কিসে?"

— "ক্যান্ আমরা নাই? তুমি আমার মিতে কার্তিকের বউ না? একসঙ্গে মাঠে যাই নাই ফসলের দখল নিতি? আমার কোলের ওপর প্রাণডা যায় নাই কার্তিকের?"

তবু ভরসা পায়নি সে। ছেলের হাত ধরে একটা পোঁটলা নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। খানিকটা পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থেকে হন্ হন্ করে এগিয়ে এসে পেছন থেকে কানাই বলেছিল, "কামডা কিন্তু ভালো করলে না তুমি। শহরে— পথে কত বিপদ-আপদ, লোভ আর পাপের ছড়াছড়ি। মান-ইজ্জত নিয়ে টানাটানি সেখানেই বেশী। অপমান আর দুঃখু পালি এখানে জানাবার লোক আছে তোমার— সেখানে নাই।" এর বেশী কিছু বলতে পারেনি, গলাটা ধরে এসেছিল।

এখনও তার সেই নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, সেই ভাঙা ভাঙা গলার স্বর, আটকানো কথাগুলো কানে বাজে। মাঠে-ক্ষেতে লাঙল চালানো, ঘামে ভেজা চকচকে চওড়া পিঠ চাষীকে দেখলেই মনে পড়ে কার্তিকের কথা— কানাইয়ের কথা। চোখে জল আসে রাতে শুয়ে, "দ্যাশ কই? এ কনে আলাম আমি!" চোখের জল ঠোঁট দিয়ে চেটে নিয়ে অস্ফুটে কাঁদে সৌদামিনী— বাঙালের কান্না!

সেই নোনা জলেই ভরে আসছিল চোখ, হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে গেল সবাই। কথা থামিয়ে কাজে লাগার সময় এখন। সুন্দরী বলে, "আয় রে সদি।" একটা বস্তার মুখ খুলে ভেতর থেকে চটের টুকরো বার করে একখানা, লাঠি দিয়ে চটখানাকে অদ্ভুত কায়দায় ঢুকিয়ে দেয় দরজার মাঝখানের ঐ এক ইঞ্চি সরু ফাঁকে. তারপর সুন্দরী ছোট একটা র‍্যাশন ব্যাগে পুরে দেয় চাল, আর ও ঢালে। হাত কেঁপে ক'টা চাল উড়ে পড়ে বাইরে— ক'টা ছড়িয়ে পড়ে ভেতরে। হা হা করে ওঠে সুন্দরী, "ফেলিস্‌নি, ফেলিস্‌নি। গায়ে বুঝি লাগে না তোর? হ্যাঁরে সদি। টাকাটা আমার কিনা, মায়া হবেই বা কেন।"

ওপাশে আরও দুজন দুটো দিক অধিকার করেছে, একজন দরজার ফাঁকে ঢালছে, একজন ঢালছে জানলার ফাঁকে।

— "সর দেখি," ওকে সরিয়ে সুন্দরী নিজে ঢালে চাল। সৌদামিনীর হাত কাঁপে, বুকের ভেতরটা কেমন করে। ঘরে কি চাল দেখেনি সে!

উঠোনে ধান এনে ফেলত কার্তিক, নিজের হাতে সেই ধান ভেনে ঘর ভরে রেখেছে। একটা চাল মাটিতে পড়লে খুঁটে তুলেছে— চাল না লক্ষ্মী, সোনা-দানার চেয়েও বেশী।

কী যে দুঃখ তার। চালের মূল্য বোঝাতে আসে সুন্দরী, চুরি করা চালের ব্যবসা করতে গিয়ে! হায় রে কপাল! উপুড় হয়ে কপালটা একবার মেঝেয় ঠুকে দেয়।

সুন্দরী বলে, "কি লো। ঘুমোচ্ছিস নাকি? দে, এটা দিলেই তো শেষ হয়।"

তারপর কাজ শেষ হলে শুকনো মুখ করে চুপচাপ বসে থাকে সবাই। কপালে হাত ঠেকিয়ে যোগমায়া ফিস্‌ফিস্‌ করে, "দোহাই বাবা তারকনাথ। এই ইস্টিশনটা পার কবে দাও বাবা!"

ওরা জানে বিশেষ একটা স্টেশনের কথা। ধরা পড়ে বেশীর ভাগই ওখানে। সব জায়গায় পয়সা দিয়ে কেঁদেকেটেও মুক্তি পাওয়া যায় কিন্তু এখানে শক্ত পাহারা, তাই বড় ভয় ওদের শেওড়াফুলি জংশনকে। ওটা পার হয়ে গেলেই আবার কাজে মন দেয় ওরা— নীচের থেকে চটখানাকে টানে আর সব চাল ছড়িয়ে পড়ে বাইরে। সেগুলোকে কুড়িয়ে তুলতে হয়। সুন্দরী বলে, "একটা একটা করে খুঁটে তোল্‌ সদি। — পড়ে থাকেনি যেন। এ আর পারিনে বাপু, আধমন চালে আমার দশসের যাবে গুনগার।"

'এ আর পারিনে বাপু!' এই কথাটাই সদির মনে কান্নার ঢেউ তোলে, বুকের মধ্যে উথল-পাথাল করে দুঃখের সাগর। সত্যিই আর পারে না সে। এই চুরি করে পেট চালানো, অপমান আর অভিযোগ!

ছেলেটার কথা মনে পড়ে। আহা কচি ছেলেটা! সেই অন্ধকার শেয়াল-ডাকা মাঠের মধ্যে কুঁড়ে ঘরে পিদিম জ্বালিয়ে কাঠ হয়ে বসে থাকে, গেলে জড়িয়ে ধরে কাঁদে, "আমি থাকপো না। কিছুতিই থাকপো না। তুই আমারে কানাই কাকার কাছে রাখ্যে আয়।" ছেলে-মা দু'জনেই কাঁদে।

ছেলে বলে, "ক্যান্‌ তুই আলি ইস্টিশন্‌ থে। ওখানে কত লোক ছিল চেনা, এখানে ওরা আমাদের বাঙাল কয়, হাসে।"

স্টেশনের প্ল্যাটফরমে ঘুরতে ঘুরতে সৌদামিনীর ওপর চোখ পড়েছিল সুন্দরীর, বলেছিল, "যাবি মা? ব্যবসা করবি, স্বাধীন ব্যবসা? দু'টো পয়সা আসবে। এত কষ্টে থাকতে হবে না।"

সাগ্রহে তখন রাজী হয়েছিল সে। সুন্দরী ঘর দিয়েছে একখানা, টাকা ধার দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ব্যবসা বোঝায়। তাই ওর কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে আছে সে। আর অন্যদের মত সুন্দরী মুখরাও নয়, মনটা নরম আছে এখনও।

অন্যাদের হাসি-ঠাট্টা ব্যঙ্গের উত্তরে কতদিন বিরক্ত হয়ে সুন্দরীকে বলতে শুনেছে সৌদামিনী, "বাঙাল-টাঙাল বুঝিনি বাপু। কষ্টে পড়েছেল, বলতেই এলো, নিয়ে এলাম। তোরাইবা অমন বাঙাল বাঙাল করে মরিস কেন? বাঙালরা কি মানুষ নয়?"

স্টেশনে পৌঁছে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে সবাই। একসঙ্গে থাকলে ধবা পড়ার সম্ভাবনা বেশী। কুলিরা জানে কোথায় পৌঁছে দিতে হয় বস্তাগুলোকে। টিকিটবাবু, দাঁড়িয়ে থাকা রেলের লোক, গার্ড— সবাইয়ের জন্যে আলাদা করে পয়সা গুঁজে রাখে ট্যাঁকে। হাত ওরাও বাড়িযে থাকে, এরাও বাড়িয়ে রাখে। কথার চেয়ে কাজ হয় তাড়াতাড়ি। রিক্সায় উঠে সুন্দরী বলে, "দাঁড়া বাবা, দাঁড়া একটু। পেছনেরটাকে বেশী ছাড়িয়ে যাস্‌নি।" পেছনের রিক্সায় আসে সৌদামিনী, তাকে ডেকে বলে দেয়, "বলে দিবি সুবলসখাকে টাকা আর আমি রাখবোনি, পারিস যদি আজই আনবি আদায় করে।"

সুবলসখা বড় বাকী ফেলে রাখে টাকা, একটু বেশী দাম পাওয়া যায় বলে ওর কাছে চাল দিতে হয় বটে কিন্তু টাকা আদায় করতে প্রাণ যায়। নিজের অতিকষ্টে সমস্ত জীবন ধরে জমানো গোটা পঞ্চাশেক টাকা নিয়ে কাজে নেমেছিল সে। ভারী তো লাভ, ঘুষ থেকে শুরু করে গুনগার দিয়ে সারাদিনে একটা টাকাও তার লাভ হয় কিনা সন্দেহ। তবু তারই জন্যে প্রাণান্ত পরিশ্রম, অপমান, প্রতি মুহূর্তে ধরা পড়ার ভয়, সারাটা দিনের না খাওয়ার ধকল। ভেবে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে। এ ব্যবসা ছেড়ে দিলেই বা খাবে কি সে? তিনটে ছোট ছেলে--- নিজের পেটটাও আছে।

স্টেশন থেকে কতদূরে সব দোকান। বাবা' অসমান রাস্তায় রিক্সার ওঠা-নামায় শরীরে যেন ব্যথা ধরে যায় সৌদামিনীর, খিদেয় পেটের ভেতরটা মোচড়ায়। আজ সকালে খেয়েও আসেনি সে, মনটা খারাপ ছিল বলে। গলা শুকিয়ে আসে তেষ্টায়।

সুবলসখার দোকানে যাবার সময় দেখল বেলা প্রায় শেষ হযে এসেছে, এখানকার কাজ শেষ হলে স্টেশনে পৌঁছতে হবে তাড়াতাড়ি, সাড়ে ছ'টার গাড়ি যদি চলে যায় তবে আটটার আগে আর গাড়ি নেই। ছেলেটাকে দু'টো বেঁধে দিতে হবে তাড়াতাড়ি গিয়ে।

চালের ছোট বস্তাটা পাশের ঘরে রেখে এসে বেঞ্চিটা গায়ের গামছা দিয়ে ঝেড়ে দিয়ে একটা হাতপাখা এগিয়ে দিযে সুবলসখা বলে, "নাও বসো। যা রোদ, জিরিয়ে নাও একটু।"

বসে পড়ে সৌদামিনী বলে, "বসবার সময় নাই, টাকা কয়ডা যদি দেতেন আজ, সুন্দরী দিদি কয়ে দিল।"

— "সে হবে এখন", অনুরোধের দৃষ্টি নিয়ে সুবল বলে, "টাকা কি আর ফেলে রাখব নাকি? জল খাবে?" — বলে এক গ্লাস জল এগিয়ে দেয়। সৌদামিনী মুখে দিয়ে দেখে শুধু জল নয়, মিষ্টি — ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। এক‌চুমুকে সেটা শেষ করতে করতে একটা সিরসিরানি ভাব জাগে মনে। স্টেশনে একধরনের লোকের আনাগোনা, তাদের খুব কাছে এসে দাঁড়ানো দেখলে এমনি একটা গা ঠাণ্ডা করা ভাব জাগত। অনেকদিন পরে মনের মধ্যে সে রকম করে উঠল। জলের গ্লাসটা শেষ করে সে ভোতা আর বোকা চোখে তাকিয়ে রইল।

— "ছেলে মেযে আছে তোমার?" সুবলসখা প্রশ্ন করল।

— "আছে, এক ছাওয়াল মাত্তর।"

একটু ইতস্তত করে সুবল, কি একটা কথা বলতে গিয়েও বলে না, খানিক চুপ করে কি যেন ভাবে তারপর মৃদু স্বরে বলে, "রাগ যদি না কর তবে একটা কথা বলি সৌদামিনী।"

ঘরের চারপাশটা একবার অসহায়ের মতো চোখ বুলিয়ে নিল সৌদামিনী, তারপর ম্লান-নিস্তেজ গলায় বললো, "কন্ কি কবেন। আমাগর আবার রাগ আর বিরাগ!"

— "বলি কি, সুন্দরীর সঙ্গে ব্যবসা করা ছেড়ে দাও তুমি। আর তো ত্রি-সংসারে কেউ নেই, ছেলেকে নিয়ে তুমি আমার এখানে চলে এসো। তুমি ঘর-সংসারের কাজ করবে, আমি উপায় করে আনব।"

অত্যন্ত সহজ সরল প্রস্তাব। এরকম দু-একটা স্টেশনে থাকতেও এসেছিল তার কাছে, সিটিয়ে সিটিয়ে তাই যেন গুটিয়ে গেল সৌদামিনী।

ওকে অসহায়ের মতো চুপ করে থাকতে দেখে সুবল বলে, "কথাটা আমি ভেবেছি তোমাকে দেখার পর থেকেই, বলিনি সাহস করে। বড় লক্ষ্মীর মতো চেহারা আর স্বভাব তোমার— ও চুরির ব্যবসা তোমার যে ভালো লাগে না, তাও বুঝি আমি।"

তবু সৌদামিনীর গুটিয়ে আসা ভাবটা যায় না, মাথা নীচু করেই বসে থাকে। প্রায় গোপন কথা বলার মতো করে সুবল বলে, "এ ব্যবসা আমারও ভালো লাগে না। করি কেবল টাকার লোভে। আসল ব্যবসা তো দেখছ আমার — এই দর্জির কাজ— তাই ভালো। এ শালার চালের জন্যে জ্বালা কি আমারও কম, পুলিস-দারোগার ভয়ে তটস্থ। দু'পাঁচ সের চালের ওপরই যত নজর শালাদের।"

তবু উত্তর না পেয়ে বিরক্ত মুখে সুবল বলে, "কি বলবে বলো না। অন্যায় বলেছি কিছু! কি ভাবছ?"

—'ভাবা কি এতই সহজ? সুন্দরী ছাড়তি যাবি ক্যান্? আর আমি বাঙাল, আপনারা তো ঘেন্না করবেন আমাগোরে, তার উপরে বিধবা। মানের ভয়ে পালায়ে আস্যে, শ্যেষে কি দুর্নাম কেনব?"

— "ওসবের কোনোটাই মানিনে আমি, বাঙালও না বিধবাও না। আর লোকে কি বললো না বললো ভদ্দরবাবুদের মতো আমাদের তা নিয়ে মাথা ঘামালে চলবে কেন?"

হঠাৎ মাথা তুলে বেলার দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে সৌদামিনী— "সন্ধ্যে হয়ে গেল। যাবানে কেমন করে আমি!"

একটা রিকশা করে যেতে বলে সুবলসখা, ভাড়াটাও দিয়ে দিতে চায়, কিন্তু একা যেতে রাজী হয় না সৌদামিনী। সুবলকে তখন উঠতে হয় পৌঁছে দেবার জন্যে। দোকান বন্ধ করে, চাবিটা ট্যাকে গুঁজে খানিকটা রাস্তা এগিয়ে এসে মাঝরাস্তা থেকে একটা রিকশা ডেকে বসে। নিজে যথাসম্ভব গুটিয়ে বসে জায়গা ছেড়ে দিয়ে। গাঁয়ের মেয়ে তার ওপর বিধবা, পরপুরুষের পাশে বসে যেতে সঙ্কোচ তো হবেই। সৌদামিনী সমস্ত শরীরটাকে শামুকের মতো গুটিয়ে আনে ভয়ে, সঙ্কোচে। হয় তো মাথার ওপর হুড তোলা রিকশায় লোকটা জড়িয়ে ধরতে পারে। ওর অবস্থা বুঝে সুবল মুচকি হাসে, 'অত ভয় পাচ্ছ কেন গো? হাত-পা খেলিয়েই বসো না, ভয়টা কিসের?"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সুবল গলাটা পরিষ্কার করে বলে, "বলছিলাম— আসল কথার তো কোনো উত্তরই দিলে না। আমি তো রাজী— তোমার আপত্তি থাকলে চালের ব্যবসা ছেড়ে দেবো তো বললাম।"

সৌদামিনীর কমে আসা ভয়টা আবার বাড়ে, স্টেশনের পথ কতদূর, একবার তাকিয়ে দেখে নেয়। লোকটা বুঝি এখনই তার অধিকার কায়েম করতে চায়। খানিক জোর গলায় তাই বলতে হয়, "কথাতো তোমারে এখনই দিতি পারিনে, দেখি ভাব্যে!"

— "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভেবেই দেখো তুমি। সে আমি জোর করে মত আদায় করব না তোমার। তা সামনের দিনেই যাহোক কিছু ভেবে এসো— কেমন?"

সৌদামিনীর নিঃশ্বাস ফেলবার শব্দ পেয়ে বলে, "বিশ্বাস করা না করা তোমার হাত, আমার অন্তরের কথাই বলেছি। লোক আমি খারাপ না।"

লোক যে খারাপ নয় সেটা টের পাওয়া গেছে রিকশায় পাশাপাশি বসেই। কথাটা তা নয়, সৌদামিনীর এখন ধানের দখল নিতে গিয়ে প্রাণ দেওয়া স্বামীর কথা মনে পড়ে, তার মিতে কানাইয়ের কথা মনে পড়ে। দেশ-ঘর, জমি-ধান, পাপ-পুণ্য মিলিয়ে মনের মধ্যে অন্ধকার নামে।

স্টেশনের আলো দেখতে পেয়ে সুবল বলে, "আমি এবার যাই। তোমার দলকে পেয়ে যাবে ওখানে।"

হঠাৎ সুবলের হাত শক্ত করে চেপে ধরে সৌদামিনী, "না—না, গাড়ি পর্যন্ত উঠোয়ে দিয়ে যাও আমারে।"

সাড়ে ছ'টার গাড়ি একটু আগে ছেড়ে গেছে, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় পরের ট্রেনটার জন্যে। সুবল ওকে স্টেশনের চায়ের স্টলের বেঞ্চিতে বসিয়ে কাপে করে চা খাওয়ায়, কেক খাওয়ায়।

গাড়ি এলে দু'জনে একটা খালি কামরায় গিয়ে বসে থাকে পাশাপাশি। চুপ করেই থাকে, যেন সব কথা ফুরিয়ে গেছে।

— "যেতে পারবে তো একা?" গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা দিলে সুবল জিজ্ঞেস করে, চলন্ত গাড়ির সঙ্গে অনেক দূর এগিয়ে যায়। যেন অনেক দূরে চলে যাচ্ছে তার প্রিয়-পরিজন, আর বুঝি দেখা হবে না।

গাড়ি প্ল্যাটফরম্ ছাড়িয়ে গেলে জানলার কাছ থেকে সরে এসে ভেতরে বসে সৌদামিনীর দু'চোখ ভরে জল আসে। খালি কামরায় গায়ের মধ্যে কেমন ছম্‌ছম্ করে। মনে হয় এ সময়টায় সুবল সঙ্গে থাকলেই যেন ভালো লাগত, এই ভয় ভয় ভাবটা একটুও থাকত না তাহলে।

সেই গা ছম্‌ছম্ করা ভাব নিয়ে ঘরে এলে ছেলেটা আগুনের মতো গরম গা নিয়ে এসে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে বলে, "তুই ছিলিনে মা। শীতে আমারে কাঁপাইছে সারাডা দুপুর।" অনুতাপে বুকের মধ্যেটা পুড়ে যায়, কপালে বুঝি সত্যিই অনেক দুঃখ আছে তার! বিধবা মানুষ, ছেলের মা, দেড়কুড়ি বয়স হতে চললো, দেশ— জমি-জায়গা ছেড়ে এসে নইলে আবার নতুন করে সংসার পাতবার সখ জাগবে কেন মনে। ছেলেকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধবে সে বসে থাকে।

থমথমে মুখে সুন্দরী ঢোকে। বলে, "আজ সুবাস আর হাবাণী‌ে ধরে নে গেছে পুলিস, একেবারে হাজতে চালান। ও ভাবে আর নেওয়া যাবেনি চাল।'

পাপ-পুণ্যের জগত থেকে সম্পূর্ণ অন্য এক জগতে চলে আসতে হয়, বোকা আর ভোঁতা চোখে তাকিয়ে সৌদামিনী জিজ্ঞেস করে, "তবে কি করবা?"

— "উপায় আছে রে, উপায় আছে," এতক্ষণ পরে সুন্দরী একটু হাসে মিসিমাখা কালো দাঁতে, বলে, "বজর আঁটনেরই গেরো যায় ফস্‌কে। দে দেখি আট আনা পয়সা— দর্জিকে দিতে হবে। ব্যবসা তো রাখতে হবে, তোরও— আমারও, নইলে পোড়া পেট চলবে কি করে!"

"দর্জি!" বিস্ময়ে সৌদামিনীর কথা আটকে আসে।

— "দেখছিস কি? এবার মেমসাহেবী পোশাক পরতে হবে যে। উঠে আয় দেখি—", গুটিয়ে নিয়ে আসা মস্তবড় একখণ্ড চটের টুকরো তার বুক থেকে পিঠ পর্যন্ত ফেলে একবার মেপে নিয়ে বলে, "ঠিক, হবে তোর এতে। আমি মোটা মানুষ, আমার লাগবে বেশী।"

পয়সা নিয়ে যাবার সময় বলে, "ভাবিসনি কিছু, সব ঠিক হয়ে যাবে।" ওর চিন্তিত বিষণ্ণ মুখের দিকে চোখ পড়তে বলে, "মর্ মাগী। ছেলের জ্বর যেন কারুর হয় না, কাঁদছিস

কেন? রাতে আমার ওখান থেকে চাড্ডে খেয়ে নিসখনি তুই। কাল বোঁচাকে দিয়ে পাঁচু কবরেজের কাছ থেকে ওষুধ আনিয়ে দিলেই জ্বর সেরে যাবে— ভাবিসনি।"

ছেলে বলে, "তোরে যদি পুলিসে ধরে নিয়ে যায় মা?" বলে কেঁদে ফেলে।

পাপ-পুণ্য এক নিমিষে উধাও হয়ে যায় মন থেকে, সৌদামিনী বলে, "যাবি চলে এখান থে সোনা? একজন আমাগোরে নিয়ে যাতি চাইছে। তোরে আমি ল্যেখা পড়া শেখাব।" ছেলে ভারী খুশি হয়ে বলে, "তাই চল্ মা।" ওদের মনের মধ্যে সুখের ছবিটা একবার জাগে, আবার মিলিয়ে যায়।

সকালবেলা সুন্দরী নিয়ে এলো দর্জির তৈবী করা জিনিসটা। গলার ওপব থেকে পেট পর্যন্ত একটা মস্তবড় চটের টুকরো ভাঁজে ভাঁজে সেলাই করা-- পেছনে কাঁচুলিব মতো কতগুলো দড়ি।

সুন্দরী বলে, "চাল আন তো দেখি ক'সের।" চালেব ধামা এগিয়ে দিয়ে বলে, "ধর দেখি লম্বা করে।" তারপর কৌটোয় করে চাল ঢালতে থাকে সেলাই করা ভাঁজগুলোব মধ্যে।

হাঁ করে তাকিয়ে থাকে সৌদামিনী, দরজা-জানলার ফাঁকে ছালা গুঁজে চাল ঢালবার সময়ও এত আশ্চর্য হয়নি সে। ধামার প্রায় সব চালগুলো ঢেলে নিয়ে সুন্দরী বলে, "আয় এদিকে।" তার গা থেকে কাপড় ফেলে দিয়ে বেঁধে দেয় শবীবের সঙ্গে। চটের গরম আব চালের ভাপসা গন্ধে দম যেন বন্ধ হয়ে আসে। ভীষণ মোটা মেয়ে মানুষের মতো হাঁপাতে থাকে সৌদামিনী, "এ আমি পারব না। আমি মরে যাব ওসব পবে-- ও দিদি।"

ছেলেটাও মায়ের অদ্ভুত সাজ দেখে হাউমাউ কবে কাঁদে। সুন্দরী রেগে ওঠে, "পারবে না তো কববে কি শুনি? আমি এনন মোটা মানুষ— আমি পারছি নে? আবও সবাই যে নেবে, কষ্ট তাদের নেই? না হয় চাল কিছু কম করেই নিও তোমাবটায়। পেট চালাতে হবে তো?" ফিতেগুলো খুলে দিয়ে আবার চালগুলো ধামায় ভবে ফেলে তাড়াতাড়ি। সেদিকে তাকিয়ে কান্নায় যেন গলা আটকে আসে সৌদামিনীর।

সে কাকুতি জানায়: "তুমি চারডে দিন আমারে মাপ দেও দিদি। ছেলেডারে দেখাব কেউ নাই। আমারও শরীরডা খারাপ। তারপর যাতি তো হবিই, তোমাগোরে যে পথ, আমারও সেই পথ— এ তো জানিই।"

—"তা না হয় নাই গেলে তুমি ক'টা দিন", সুন্দবী এবার সহানুভূতিতে নরম হয়ে আসে, "বুঝিস তো দিদি, পেটের দায়েই তো সব। এই বা ক'দিন, আবাগীর ব্যাটাবা ঠিক ধরে ফেলবে দেখিস। যত চোখ কি আমাদের উপর গো। দশ সের, বিশ সের চাল নিয়ে কি দালান তুলব আমবা!"

সুন্দরীর কথা সৌদামিনীব কানে যায় না।

ও পথ খোঁজে। এইবার গিয়েই সে সুবলসখাব প্রস্তাবে রাজী হয়ে আসবে। তারপর চলে যাবে ছেলেকে নিয়ে। তাতে যদি পাপ হয়—হোক।

সেই একই সময়ে কলরব করে মেয়েরা দৌড়য় গাড়ি ধরতে। বস্তা নিয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকায় না বটে কিন্তু চোখের দৃষ্টি যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসে। বড় বড় নিঃশ্বাস নেয় আর হাঁপায়।

চেনাশোনা লোকের সঙ্গে দেখা হলে তারা হাসে, "কিগো, তোমরা যে সব পাল্লা দিয়ে মোটা হচ্ছ?"

ওরা গালাগালি কবে, "চুপ কর না ড্যাক্‌রা— কে কোথা দিয়ে শুনবে। হয়ে যাবে ব্যবসা করা।"

বিকেলে ফিরে আসে স্বাভাবিক শরীরগুলো নিয়ে ওরাই, স্বাভাবিক মানুষের মতো নিঃশ্বাস নেয়।

সবাই বলে, "ছেড়ে দেব ছাই এই ব্যবসা। দু'পাঁচসের চালের জন্যে প্রাণ যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল গো।"

কিন্তু ছেড়ে দেব বলেও কেউ ছাড়তে পারে না, কষ্টটা সেখানেই।

ক'টা দিন পরে ছেলে সুস্থ হয়ে গেলে কোনো অজুহাত দেওয়া যায় না। সুবলসখার সঙ্গেও দেখা করা দরকার। এখনও যদি তার মত না বদলে থাকে তবে সৌদামিনী মত দিয়েই আসবে আজ। খানিকটা আশা থাকে বলে সেব পনের চাল নিয়েও চটের পোশাকটা খুব ভারী মনে হয় না।

সুন্দরী বলে, "আর একটু জোরে হাট।" চালের ভ্যাপসা গরমে কষ্ট হয়—হাঁটতে পারে না তবু চেষ্টা করে। কেবলই মনে হয় আজই তো শেষ দিন তার!

চলতে চলতে ভাবে, সুবল পরিশ্রম করে ফিরবে, ছেলেটা ইস্কুলে যাবে পড়তে। সেও দরকার হলে সুবলকে সাহায্য করবে। আহা, এক নিমেষে যদি পৌঁছে যাওয়া যেত সেখানে।

গাড়িতে উঠে বড় কষ্ট হয়, জল তেষ্টায় গলা শুকিয়ে আসে। দু'টো স্টেশন পার হয়ে গেলে সুন্দরীকে বলে, "একটু খুলি দিদি। আর তো পারতিছিনে।"

ছেলেমানুষ বাতাসীও বলে, "সত্যি, খুলেই বসি একটু।"

--"কোন ইস্টিশন এটা, দেখি দাঁড়া" বলে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে গিয়ে সুন্দরী চমকে সরে আসে। তখনও প্ল্যাটফরম্ ছাড়িয়ে যায়নি গাড়ি। খাকি পোশাক পরা লম্বা-চওড়া দু'জন লোক গাড়ির হাতল ধরে উঠে পড়ে ওদেরই কামরায়, সঙ্গে মস্ত এক লাঠিধারী সেপাই। নিমেষে মেয়েদের মুখগুলো শুকিয়ে যায়, বুকের মধ্যে সবারই ধড়ফড় করে।

দু'জনেই দরজায় পিঠ দিয়ে একটু দাঁড়ায়। জামার বুকে অনেকগুলো ব্যাজে রোদ পড়ে ঝক্মক্ করে। একজন দাঁড়িয়ে ছুঁচলো গোঁফ জোড়াটায় পাক দেয় আর একজন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে মেয়েদের। সেপাইটা যেন কাঠের পুতুল--চুপ করে দাঁড়িয়েই থাকে--এ্যাটেনশনের ভঙ্গি নিয়ে। মাঝবয়েসী, কমবয়েসী মোটাসোটা অনেকগুলো মেয়ে পাশাপাশি বসে, তবু ওদিকের দরজার কাছে বসে থাকা সৌদামিনীর দিকেই যে ওদের চোখ পড়েছে—ফ্যাকাসে মুখখানা অন্যদিকে ঘুরিয়ে রেখেও সেটা সে বুঝে ফেলে। মেয়েরা ভোঁতা আর বোবা দৃষ্টি নিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকে—নড়ে না, শব্দ করে না একটাও।

সিগারেটে দু'টো বড় বড় টান দিয়ে পায়ের নীচে জুতো দিয়ে পিষে একজন অফিসার হঠাৎ অদ্ভুত ক্ষিপ্রগতিতে উঠে বাতাসীর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, "চাল নিয়ে ভাগছিস্ শালী! বার কর শীগ্‌গির।"

হাউমাউ করে বাতাসী আর্তনাদ করে, "ওবাবু, পায়ে পড়ি বাবু। আজকের মতো ছেড়ে দাও বাবু।"

দাঁত বার করে তৃপ্তির হাসি হাসতে থাকে পেছনের লোকটি, সেই আবার এগিয়ে গিয়ে বাতাসীর কাপড় চেপে ধরে। আর একজন সম্মতির দৃষ্টি নিয়ে সামান্য দূরে সরে দাঁড়ায়—রিভলবারটা বার করে হাতের ওপর নাচায়। মেয়েগুলোর ভয়ের আড়ষ্টতায় দম আটকানো ভাবটা ওরা যে খুব উপভোগ করছে, সেটা ওদের চোখ দেখেই বোঝা যায়।

সৌদামিনী হঠাৎ উঠে গাড়ি থামাবার শেকলটার দিকে হাত বাড়াতেই একজন এগিয়ে গিয়ে হ্যাঁচকা টানে হাত নামিয়ে দেয়, "বড় যে সখ চাঁদ। শেকল টেনে গাড়ি থামাবে! চুরি চামারির ব্যবসা করে আবার তেজ দেখ!"

সৌদামিনী রাগে হাঁপায়, চোখ দু'টো জ্বলে ওঠে "তালি নামো যাও। যা পার ইস্টিশনে নামো কর। পাঁচজন লোকের সামনে বিচার হোক—পুলিসে দাও হাজতে পোরো। তা না, চলন্ত গাড়িতে উঠে মেয়েগোরে কাপড় ধরে টানাটানি—একি চাল ধরা, না বজ্জাতি?"

—"চোপরাও", হুংকার দিয়ে এগিয়ে আসে অফিসার একজন, "ভারী যে গর্জন! সরকারী লোক দেখেও ভয় নেই একটু? ভাবছিস আমরা জানিনে চাল নিয়েছিস কোথায়! সব শালীর কাপড় খোলাব আজ।"

পেছনের দরজাটা বাতাসে কখন যেন খুলে গেছে কিন্তু সেদিকে তাকাবার অবসরও নেই। লোকটা যতই এগিয়ে আসে, বুকের কাপড় শক্ত করে চেপে ধরে বিস্ফারিত চোখে সৌদামিনী পিছিয়ে যায়।

এতটুকু কুণ্ঠা নেই, আঁচল চেপে ধরে সরকারী লোক বলে, "খোল্ কাপড়।" সেপাইটার মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে, সেই যে চোখ নামায়, আর তোলে না।

রুদ্ধ কান্নায় শরীরটা ফুলতে থাকে সৌদামিনীর। তীব্র ঘৃণায় ঠোঁট দুখানা কুঞ্চিত হয়। শেষে প্রাণপণ শক্তিতে লোকটার চুলের গোছা মুঠি করে চেপে ধরে দু'হাতে। অফিসার বারে বারে মাথা নাড়ায়, ছাড়াতে পারে না। কষ্ট হয় খুব, চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসে। শেষে উপায় হিসাবে বুটসুদ্ধ পায়ের একটি জোর লাথি কষিয়ে দেয় মেয়েটার পেটে। তাতেই কাজ হয়। কাপড়খানা থেকে যায় তার হাতে, খোলা দরজাটা দিয়ে সৌদামিনীই কেবল ছিটকে বেরিয়ে যায়। কাপড়ের শেষ প্রান্তটায় সামান্য একটু টান পড়ে। ভদ্রলোক নোংরা জিনিসে হাত পড়ার মতো চমকানো ভাব নিয়ে কাপড়খানাকেও জানালা গলিয়ে ফেলে দেয়—বাতাসে ভেসে ভেসে উড়ে যায় সেটা।

এক নিমেষে ভয়ের বাঁধ যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে—পাগলের মতো কলরব করে ওঠে মেয়েরা একসঙ্গে, অফিসারের উপস্থিতিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেই।

সুন্দরী ঠক্ঠক্ করে গাড়ির মেঝেতে মাথা কুটে কাঁদে, অভিসম্পাত করে, মেয়েরাও কাঁদে আন্তরিক সহানুভূতির কান্না। ইঞ্জিনের তীব্র হুইসিলের শব্দ একটানা বেজে চলে, গতিবেগ কমে আস্তে আস্তে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ে গাড়ি। কাঁদতে কাঁদতেই সুন্দরী মাথা তোলে, অফিসারদের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে পিচ্ করে থুথু ফেলে খানিক জানলা দিয়ে।

গাড়ি থামতেই লাফিয়ে নামে অফিসার দুজন, তারও আগে নেমেছে যাত্রীরা। চীৎকার, কান্না আর গোলমালের মধ্যে দু'জন অবাক হয়ে দেখে, সুন্দরীদের কামরাটার সামনেই ওদের পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়েছে অনেকগুলো লোকের একটা দল।

ইঞ্জিনের তীব্র বাঁশির শব্দ ছাপিয়ে ওঠে সবকিছুকে, কাছাকাছি ক্ষেতে-মাঠে কাজে ব্যস্ত কিষাণরাও ছুটে আসে কাস্তে হাতে করে।

নতুন মানুষ

অজিত মুখোপাধ্যায়

জেলের মধ্যে বিশেষ-বিশেষ ঘটনাব দিনগুলিতে আমরা বাইরে অর্থাৎ কোর্টে থাকতাম। এই ব্যাপারটা জেল-কর্তৃপক্ষের পূর্ব পরিকল্পনা কিনা বলতে পারব না। আমরা এ বিষয়ে কোন অনুসন্ধান চালাই নি, সুতরাং দৃঢ়ভাবে কিছু বলা বেশ কঠিন। সে যাই হোক, সেদিন যখন বন্দীগাড়ীতে আমরা কোর্ট থেকে শ্লোগান দিতে দিতে ওয়ার্ডে ফিরলাম, সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। কম্পাউণ্ডের বিশাল মাঠে নেমে গেছে কৃষ্ণপক্ষের ঘন অন্ধকার, আর সেই অন্ধকাবকে সরাবার প্রাণপণ চেষ্টা কবে চলেছে লাইট পোস্টেব ময়লা বাতিগুলো।

নবনীদার কোর্ট যাবার তারিখ ছিল না সেদিন। তিনি জেলেই ছিলেন। আমরা তাঁর কাছ থেকে সে দিনের খবরগুলো শুনতে পাব, এই আশাতে তাঁব সঙ্গে দেখা করার জন্য মনে মনে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলাম।

।কন্তু জেলে ঢুকতেই আবহাওয়াটা কেমন যেন থমথমে মনে হর্যেছিল, আর তার কারণটা জানতে পেরেছিলাম আমাদের ওয়ার্ডে পা দেবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই।

একজন কয়েদী ছুটতে ছুটতে এসে বললেন ঃ ''জানেন কমরেড, নবনীদা হাসপাতালে?''

''আমরা কী কবে জানব?''

''জানেন না? শুনুন—''

কয়েকজন কয়েদী মিলে যা বললেন, তা সাজালে এই রকম দাঁড়ায় ঃ এই জেলেরই একজন কয়েদী চাঁদপুর গ্রামের অধিবাসী গদাধব প্রতিহার খুনের কেসে বন্দী হয়েছিল। গদাধব এক দরিদ্র কৃষক। ওঁর বিষয়ে আমরা অনেক কথাই লোক মুখে শুনেছিলাম। চাঁদপুর গ্রামেব বামহরি চক্রবর্তী এক নামকরা জোতদার, যথেষ্ট জমিজমা আছে তার, দেড়-দুশ বিঘে জমির মালিক, দশটা গ্রামের মাতব্বর, গরীবেব গলাকাটার শিরোমণি। কৃষকের শ্রম সম্পত্তি ও ইজ্জত লুট করতে বিশেষ দক্ষ। এই চক্রবর্তীর বাড়িতে এক সময়ে গদাধর মানদার মুনিষের কাজ করতেন। গদাধরের হিসাব নিকাশের ব্যাপাবে চক্রবর্তীর সঙ্গে কিম্বা চক্রবর্তীর স্ত্রী ও ছেলে মেয়ের সঙ্গে প্রায়ই কথা কাটাকাটি হত। গদাধর নিরক্ষব কিন্তু তাঁর স্মৃতিশক্তিটি বড়ই পণ্ডিত। কবে, কোথায়, কখন, কত, কে-কে ইত্যাদি প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দিতে পারত তাঁর স্মৃতিশক্তিটি। আর দু-দশ বছর কি বিশ-ত্রিশ বছব আগেকার কথা বা ঘটনা এই স্মৃতিশক্তিটি প্রায় নিখুঁত বর্ণনা করতে পারত। সুতরাং গদাধরের হিসাব গরমিল করা প্রায় অসম্ভব। এই কারণেই, গদাধর অনেক বিবাদ বাধিয়েছেন, সংঘর্ষ কবেছেন এবং কাজে ইস্তফা দিয়েও এসেছেন।

এমন লোকের হিসাবে ফাঁকি দিয়ে চক্রবর্তী প্রায়শই ধবা পড়ে যায়, আবার স্বীকার করে, আবার ফাঁকি দেয়, আবার স্বীকার করে, শেষে একদিন একটা বড় হিসাবে ফাঁকি দিয়ে ধরা পড়ে আর স্বীকার করতে চায় না।

গদাধর চিৎকার শুরু করে দিয়েছিলেন সেদিন। রামহরির সম্মানের যদি কিছু অবশিষ্ট থেকে থাকে— সেই অবশিষ্ট সম্মানের সবটাই তখন যায় যায় অবস্থা।

এই ঘটনার কদিন পরেই জনগণ রামহরিকে গদাধরের বাড়িতে গভীর রাত্রে অনুপ্রবেশের জন্য ধরে ফেললেন, কারণ গদাধরের একমাত্র মেয়ে গীতা চেঁচিয়ে উঠেছিল। গদাধরকে চক্রবর্তী শহরে একটা জরুরী কাজে এমন কৌশলে পাঠিয়েছিল যাতে সে রাত্রে গদাধর বাড়ী ফিরতে না পারেন।

গদাধর শহর থেকে পরদিন সকালে ফিরে এসে সব শুনে একেবারে আগুন। তিনি চিৎকার করে বলতে লাগলেন, আমি এর ব্যবস্থা করবই করব, তাতে আমার যাই হোক। তোমরা দেখে নিও, আমি এর ব্যবস্থা করবই। এবং দশটা গ্রামে প্রচার করতে লাগলেন ঘটনাটা।

চক্রবর্তীর রাগই বাড়ল। রাগ হলে চক্রবর্তী কৃষককে হয় সর্বস্বান্ত করত, নয় খুন করত, নয় বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিত। কিম্বা ওই দুটো শাস্তি, কি তিনটে শাস্তি একসংগেই দিত। এ সব কাজে সে নিজেও যেমন হাত লাগাত, তেমনি তার সাঙ্গোপাঙ্গরাও থাকত সঙ্গে।

এমন মানুষ রামহরিকে ঘাঁটানো সহজ ব্যাপার নয়। রামহরি হঠাৎ একটা পাল্টা কৌশল কাজে লাগাল। সে গোপনে নিজেই গদাধরের দুটি ছাগলের দড়ি খুলে দিলে মাঠে। আর ছাগলগুলো রামহরিরই বিঘে দুই লকলকে গমের চারা দিলে একেবারে মুড়িয়ে। পাম্পের জল দিয়ে উন্নত প্রথায়, হিসাবে কোন কার্পণ্য না করে--রামহরি প্রতি বছর বিঘে পনের গম চাষ করে। তার মধ্যে বিঘে দুই জমি ছাগলগুলো দিলে একেবারে সাফ করে। বারোয়ারী তলায় ডাক করে রামহরি নিজে বিচার করে তেষট্টি বছর বয়স্ক কৃষকটিকে মনের সুখে জাংলা দিয়ে চাবকাল।

তার দিন কয়েক পরেই সন্ধে রাত্রে, খাল থেকে সান্ধ্য-স্নান সেরে পুজোর জন্য যখন রামহরি ঘরে ফিরে আসছিল, তখন তারই বাড়ির একশো হাত দূরে পেছন দিকে, তালগাছের ঘন অন্ধকারে নিঃশব্দে, কোন আর্তনাদ করার সুযোগ না পেয়ে রামহরি চক্রবর্তীর অকাল মৃত্যু ঘটল।

পুলিশ কিন্তু গদাধরকে পিছমোড়া করে বেঁধে মারতে মারতে সদরে চালান করে দিলে। সুদীর্ঘ দেড় বছর যাবত বিচারের পরে—যখন কোনো মিথ্যে সাক্ষ্যি দাঁড়াতে পারল না, তখন গদাধর নিজেই স্বীকার করে বসলেন। বেকসুর খালাস হয়ে যাবার কেস হয়ে গেল বিপরীত। ফাঁসীর হুকুম যে হবেই তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই।

এমন হিংস্র, প্রতিহিংসাপরায়ণ ও সমাজবিরোধীকে জ্যান্ত রাখলে সভ্যতা-সমাজ দেশ সমস্ত কিছুই যাবে জাহান্নামে, সুতরাং তার মরাই উচিত— তাকে ফাঁসীতে ঝোলানোই উচিত।

এ-ই হচ্ছে গদাধরের বন্দী হবার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

আমরা সবাই এই ইতিহাস জানতাম, নবনীদাও জানতেন।

ভবিষ্যত শাস্তির ভয়ে হঠাৎ আজ গদাধর, খুব উঁচু এক অশ্বত্থ গাছের প্রায় মগডালে এক ফাঁকে উঠে বসেছিলেন। তাঁকে সাধাসাধি করে, ধমকা-ধমকি করেও নামিয়ে আনা যাচ্ছিল না।

তখন কতকগুলো লোক কয়েকটা বাঁশের ডগায় বল্লমের ফলা ঢুকিয়ে, সেই বাঁশগুলো নিয়ে গাছের ওপর ক্রমশ উঠছিল আর গদাধরকে খোঁচা মারার চেষ্টা চালাচ্ছিল ঠিক বাদুড় শিকারের মতো।

নবনীদা কোথায় ঘাপটি মেরে সমগ্র বৃত্তান্ত লক্ষ্য করছিলেন, শেষ অব্দি আর সহ্য করতে না-পেরে একাই সুমুখে এগিয়ে গিয়ে চীৎকার করে উঠেছিলেন,—"এ্যাই এ্যাই খবরদার-খবরদার, একদম খোঁচা মারবেক নাই। ইয়ার প্রতিফল কিন্তু পেতেই হবেক। মানুষ কিন্তু কখনোই ছেড়ে দিবেক নাই—"

গদাধর তখনো মাটিতে লুটিয়ে পড়েন নি।

নবনীদার হাতে সামান্য একটা ইঁটের টুকরো।

সেলে সেলে, ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে সর্বত্র বন্দীরা সুতীব্র রোষে ও আক্রোশে জানলা দিয়ে নিষ্পলক চোখে তাকিয়েছিল অশ্বত্থ গাছটার শীর্ষে আর নিজেরা প্রাণ খুলে সমালোচনা করছিল বিচারের, ফাঁসীর এবং এই ভাবে খুঁচিয়ে নানানোর।

ইতিমধ্যে জেলারকে ডেকে আনা হয়েছে এবং সে নিজে গদাধরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে। হঠাৎ জেলারের চোখে পড়ে, নবনীদার হাতে একটা মাত্র ইঁটের টুকরো।

জেলার হেঁকে উঠল, "হোয়াটস দ্যাট, কে ওই লোকটা? এখানে এল কী করে? এ্যাঁ!"

কয়েকজন সিপাহী ছুটে এল নবনীদার দিকে আর গুঁতো মারতে লাগল ব্যাটনের ডগা দিয়ে।

নবনীদা তখনো উচ্চকণ্ঠে বলেই চলেছেন, "ছেড়ে দাও, উয়াকে ছেড়ে দাও। উয়াকে হত্যা করার কুনো অধিকার তুমাদের নাই—"

জেলার নিজে কোমর থেকে পিস্তল বার করে বাগিয়ে ধরল, আর—"হারামজাদা। খানকির বাচ্চা—বেরো, বেরো এখান থেকে। সিপাহী, একে এখখুনি ঢুকিয়ে দাও লক্আপে।"—বলে আরও কতকগুলো কুৎসিত ভাষায় গালাগাল দিতে লাগল।

নবনীদার হাত থেকে ইঁটের টুকরোটি ছুটে বেরিয়ে গেল বিদ্যুৎবেগে, এক পলকের মধ্যে জেলার "মাগো" বলে তীক্ষ্ণস্বরে আর্তনাদ করে বসে পড়ল মাটিতে, হাত থেকে ছিটকে পড়ল পিস্তলটা।

জেলারের বাঁ চোখে লেগেছে ইঁটের টুকরোটা।

তখন আক্রমণ করল সিপাহীরা।

ঠিক সে সময়, গাছের শীর্ষ থেকে গদাধর টুপ করে পড়লেন একেবারে মাটিতে, তাঁকে আর ফাঁসিতে ঝোলানোর দরকার পড়ল না।

নবনীদাকে সিপাহীরা ধরাধরি করে নিয়ে গেল হাসপাতালে।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার প [illegible] র, সারা গায়ে গোটা পাঁচেক ব্যাণ্ডেজ নিয়ে নবনীদা—সেই আশ্চর্য হাসির মালিক নবনীদা ফিরে এলেন খোঁড়াতে খোঁড়াতে, মুখের ভাবে অস্বাভাবিক দুঃখ আর চিন্তা।

আমরা সবাই মিলে তাঁর নামে শ্লোগান দিতে লাগলাম।

নবনীদা দু হাত তুলে থামিয়ে দিলেন।

"ক্যানে তুমরা শ্লোগান দিচ্ছ কমরেড? আমি কি গদাধরকে রক্ষা করতে পেরিচি? পারি নাই।"

"কিন্তু তুমি তো কাউকেই ভয় কর নি, কিছুতেই ভয় পাওনি, তুমি একলাই যে সংগ্রাম করেছ, তা আমাদের সা [illegible] স বাড়িয়ে দিয়েছে। কতটা বাড়িয়ে দিয়েছে, সে-কথা আমরা বলে বোঝাতে পারব না।"

নবনীদা আমাদের মতে একেবারে সায় দিলেন না, কিছুতেই মানলেন না, যে, তিনি বিশেষ কোনো সংগ্রাম করেছেন।

এ-ই হচ্ছে নবনীদার কিছু নমুনা। যিনি ভয় করেন না যমরাজকে, বরং যমরাজ যাঁকে ভয় করে। এমন লোকটিকে চুপ-চাপ কাজ করে যেতে দেখে, তাঁর ঠাণ্ডা কথা শুনে কিছুই বোঝার উপায় নেই যে—এই মানুষটির মধ্যে কী আছে।

সুদীর্ঘ শ্রেণী-সংগ্রামের সংগে যুক্ত নবনীদা, শ্রেণী-সংগ্রাম যেমন নবনীদাকে গড়ে-পিটে তুলেছে, নবনীদাও তেমনিই গড়ে-পিটে তুলেছেন অনেক শ্রেণী-সংগ্রাম। তিনি একটা কথা প্রায়শই বলতেন, "দ্যাখ কমরেড, চন্দ্র-সূর্য যেমন সত্য; ঠিক তেমন সত্য গরীবরাই দেশটির মালিক হবেক।"

এক-এক সময় আমারও আশ্চর্য বোধ হত, এই বন্দী অবস্থাতেও কোথা থেকে নবনীদা এমন অসীম সাহস পেতেন— যে-কোন মুহূর্তে শত্রু শেষ করে দিতে পারে জেনেও নবনীদা কী করে শত্রুকে একতিল তোয়াক্কা করতেন না।

এক দিন গভীর রাত্রে ঘুম আসছিল না আমার। ভ্যাপসা গরমে বারবার উঠে বসছিলাম, আর মাঝে মাঝে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে গায়ে হাওয়া লাগাবাব ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছিলাম। পরিষ্কার আকাশ, অসংখ্য তারা আমার দিকে ঝকঝকে চোখে তাকিয়ে ছিল। আমার মনে দার্শনিক চিন্তাগুলো উঁকি-ঝুঁকি মারছিল—কত বড়, কত বিপুল এই ব্রহ্মাণ্ড—তার মধ্যে আমি একটা বিন্দুর মতো মানুষ, আজ আছি, কাল কোথায় মিলিয়ে যাব এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে। মানুষ মরে গেলে কি তার কিছুই থাকে না। বিজ্ঞান বলে, কোনো শক্তিকে সৃষ্টি করা যায় না, ধ্বংস করা যায় না, শুধু তার রূপান্তর ঘটে। তবে আমার মধ্যকার শক্তিটার কী রূপান্তর ঘটবে মরে যাবার পরে?

যদি আমার কাজ, আমার কথা, আমার চিন্তা জনগণের কাজে লাগে আমার মৃত্যুর পর—তবে আমার জীবনের ফলটা হিমালয় পাহাড়ের মত ভারী, এটা সার্থক রূপান্তর। কিন্তু যদি আমার কাজ আমার কথা আমার চিন্তা জনগণের কোনো কাজে না লাগে, আমার মৃত্যুর পরে—তবে আমার জীবনের ফলটা হাঁসের পলকের মত হালকা—এটা বড় করুণ বড় ব্যর্থ রূপান্তর।

প্রতিটি মানুষকেই মরতে হবে। কিন্তু সে-ই মানুষ মরে গিয়েও বেঁচে থাকবে, মানুষেব কাছে যে হতে পারবে একটা বিপ্লবী গানের মতো, যাকে বারবার গাইতে ভালো লাগে, গেয়ে আনন্দ পাওয়া যায়, প্রেরণা পাওয়া যায়।

পায়ের শব্দে পাশ ফিরে তাকালাম—নবনীদা।

"ঘুম আসছে না কমরেড?"

"না।"

সেই প্রশ্নটা মনে পড়ল।

"আচ্ছা কমরেড, আপনি এত সাহস পান কোত্থেকে?"

"কুথাকে আমার সাহস দেখলে?" তাবার আলোতে দেখা গেল নবনীদার সাদা দাঁতগুলি—হাসছেন নিঃশব্দে।

নবনীদা কিছুতেই স্বীকার করবেন না। আমিও ছাড়ব না।

"আপনি যখন লড়াই করেন, তখন কি চিন্তা হয় বলুন তো—"

"কী আবার চিন্তা হবেক?" খুব হালকা ভাবে বললেন।

অনেক—অনেক প্রশ্ন করার পরে এই কথাগুলো বলেছিলেন নবনীদা : মানুষ নাকি কখনোই অন্যায়কে স্বভাবতই বরদাস্ত করতে পারে না। কারণ যে-কোনো অন্যায় সমাজের ক্ষতি করে। তাই যখন তুমি লড়বে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, তখন দেখবে তোমার পাশেই আছে অনেক মানুষ। লড়াই করার আগে মনে হতে পারে, তুমি ছাড়া আর সব তো চুপচাপ, কে আর লড়বে তোমার সংগে। কিন্তু কথাটা আদৌ সত্যি নয়। অন্যায় সর্বদাই মানুষের মনে বড় যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। মানুষ সব-সময় সংগে সংগে সে যন্ত্রণা প্রকাশ করে না বটে কিন্তু একটা কঠিন রোগের মতন যন্ত্রণাটা থেকে যায় মনের মধ্যে। যতক্ষণ মানুষ না লড়াই

করবে, ততক্ষণ যন্ত্রণাটা মনের মধ্যে কঠিন রোগের মত থেকে যাবেই। সুতরাং এই কঠিন রোগের মত যন্ত্রণাটার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য, অন্যায়ের প্রতিকার করতে মানুষকে লড়তেই হবে। লড়াই মানেই কঠিন যন্ত্রণার হাত থেকে মানুষেব মুক্তি।

অনেক গভীর চিন্তার বিষয় কী সুন্দরভাবে, কী সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন নবনীদা।

একদিন সকালে এক কয়েদী চুল কাটার পয়সার হিসেবটা তার কার্ডে লেখাচ্ছিলেন। এ-সময় এক মেট কিছু ঘুষ দাবী কবল। জেলের মধ্যে সিপাহীরা ওয়ার্ডাররা আর মেটরা কয়েদীদের কাছ থেকে বিভিন্ন কায়দায় পয়সা আদায় করে থাকে। এটাই তাদের অন্যতম স্বাভাবিক দাবি। আমাদের সংগ্রাম জেলের মধ্যে অনেক অন্যায়অবিচার বন্ধ কবতে পেরেছিল। কিন্তু দুর্বল জায়গা দেখতে পেলেই কোনো কোনো অন্যায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠত। কয়েদীটি নতুন, সুতরাং মেট তাকে দুর্বল ভেবে কিছু ঘুষ চেয়েছিল কিন্তু কযেদীটি ঘুষ-ফুষ দেবাব পক্ষপাতী নয়। তিনি প্রতিবাদ জানালেন। মেট কিছুতেই ছাড়বে না। শুরু হল কথা কাটাকাটি, ভিড় জমল, একদিকে সেই মেট ও দু-জন ওয়ার্ডার অন্য দিকে জনা বিশেক কযেদী। হঠাৎ এক ওয়ার্ডার গালাগাল দিয়ে এক কয়েদীর পিঠে বসিয়ে দিলে ব্যাটনের এক ঘা, বেশ জোরেই। আর যায় কোথায়! আট-দশজন কয়েদী প্রায় একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ওযার্ডারটাব ওপর, কেড়ে নিলেন তার হাতের ব্যাটন, দিলেন তাকে উত্তম-মধ্যম শিক্ষা। ওযার্ডাব দুটো আর মেটটা পলকে হাওয়া হয়ে গেল। প্রবল উল্লাসে ফেটে পড়লেন কয়েদীরা।

জনগণ একজোট এবং বেপরোয়া হয়ে উঠলে, শত্রু বাহিনী যে চিংড়ি মাছেরও অধম, এ অভিজ্ঞতা অনেকবার হয়েছে আমাদের। আর সে-অভিজ্ঞতার প্রায়শই মধ্যমণি ছিলেন নবনীদা।

গরীব কৃষক তিনি। শক্ত-সমর্থ কালো চেহারা, পেশীবহুল শিবা বের করা। মাঝারি আকাব, মাঝাবি উচ্চতা, ছোট কপাল, ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল, দারিদ্র্যে চোখের সাদা অংশটা হলদেটে। কালো মুখে ধপধপে সাদা দাঁত দেখবার মতো। আর মুখে নিঃশব্দ প্রকাশিত হাসি।

একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম তাঁকে, "আচ্ছা কমবেড, আপনাব স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা কী বলেন?"

হেসেছিলেন নবনীদা, "কী আবার বলবেক?"

"কিছুই বলাব নেই?"

"কুন বিষয়ে?"

"এই লড়াইয়েব বিষয়ে।"

"লড়চে আবার কি বলবেক।" বলেই এক মুখ আনন্দের হাসি।

নবনীদা অনেক কিছুরই নতুন নতুন ব্যাখ্যা করতেন। সব ব্যাখ্যাই যে চুলচেরা বিচারে অভ্রান্ত বা অকাট্য এমন কথা আমি বলতে চাই না। আমি কেবল তাঁব কিছু কিছু ব্যাখ্যা আপনাদের শোনাচ্ছি।

নবনীদা বলতেন, পৃথিবীর আছে দু'জন মিস্ত্রি। একজন প্রকৃতি আর একজন মানুষ। প্রকৃতির নেই বুদ্ধি আর মানুষের আছে বুদ্ধি। সুতরাং মানুষের কাছে প্রকৃতির শেষ পর্যন্ত হার হবেই, শেষ পর্যন্ত মানুষ প্রকৃতিকে জয় করবেই। আর আণবিক বোমাব বিষয়ে বলতেন, মানুষ যাকে গড়তে জানে, তাকে ভাঙতেও জানে। তোমার আমার মতো মানুষেই তো গড়েছে আণবিক বোমা, তবে কেন মানুষ তাকে ভয় করবে!

স্বল্প শিক্ষিত এক কৃষকের এমন চিন্তাশক্তি তথাকথিত শিক্ষিত মহল কল্পনাও কবতে পারে না। নবনীদার মধ্য দিয়ে আমরা জ্যান্ত মার্কসবাদকে দেখতাম। জেলের মধ্যে তাঁর

সংগ্রাম আমাদের সমস্ত মানসিক জড়তাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিত। আর আমরাও যে নবনীদার মতো একজন, এই বোধ আমাদের মনে বয়ে যেত গংগার স্রোতের মতো।

মাত্র দু-একবারই আমরা তাঁকে চিন্তিত দেখেছি।

তাব মধ্যে, একদিন বিকেলে, দক্ষিণ পশ্চিম আকাশের কোণ থেকে যখন এক চিলতে ঘন কালো মেঘ বেরিয়ে এসে গোটা আকাশটা ছেয়ে ফেলল আর প্রথমে শুরু হল ধুলোর ঝড় এবং কয়েক মিনিট পরেই বেশ বড়-বড় ফোঁটায় নামল তুমুল বৃষ্টি, তখন আমি রাজনৈতিক কাজ সেরে অন্য ওয়ার্ড থেকে ছুটতে ছুটতে নিজেদের ওয়ার্ডে ফিরছিলাম। দেখি নবনীদা কম্পাউণ্ডের মাঠে ভিজছেন—দাঁড়িয়ে।

আমি চিৎকার করে ডাকলাম তাকে, আসতে বললাম তাড়াতাড়ি। আমার কথার মধ্যেই একটা বজ্রপাত হল খুব কাছেই। আবার হাঁকলাম, "কমবেড—কমরেড বাজ পড়ছে, আসুন, তাড়াতাড়ি আসুন—"

আস্তে—আস্তে নবনীদা এগিয়ে এলেন, "ঝড় জলকে ভয় করবেক চাষী, নাকি চাষীকে ভয় করবেক ঝড় জল?"

"সে কথা পরে হবে, আগে ওয়ার্ডে চলুন—"

"তুমি যাও। শালারা কী বলদ জান কমরেড?"

"কেন—কেন?"

"হেথাকে যদি চাষাবাদের ব্যবস্থা রাখত, তইলে উয়াদের উপর আমাদের রাগটি বোধহয় কিছু কমই হত।"

"সেই জন্যই তো ওরা কোনো ব্যবস্থা রাখে নি।"

"শালারা বলদ বটে। উয়ারা লোকের মনের কথা বুঝতেই চায় না, আর বোঝেও না।"

বুঝতে পারলাম, কৃষক উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ফলে কেমন কষ্ট পাচ্ছেন মনে মনে। এখন তাঁদের গ্রামে কৃষকরা এই বৃষ্টি দেখে কত উৎফুল্ল, সেই উৎফুল্লতার সংগে নবনীদার কোনো সম্পর্ক নেই।

নবনীদা কাজের মানুষ। তাই তিনি জেলের মধ্যে সর্বদাই ব্যস্ত থাকতেন নানান কাজে। রাজনৈতিক ও সাংসারিক কাজ, অপরের জন্য কাজ, নিজে পড়া কিম্বা কাউকে দিয়ে পড়িয়ে নিয়ে শোনা। কোনো-না কোনো কাজে নবনীদা ব্যস্ত। দৈনিক সতেব ঘণ্টা আঠারো ঘণ্টা কাজ করতেন তিনি। তাঁব কর্মোৎসাহ দেখে বলা বড়ই কঠিন যে তাঁর তেষট্টি বছর বয়স চলছে।

আমরা জেলে খুব বিড়ি-সিগারেট খেতাম। আমাদের দেশলাইয়ের বড় অভাব দেখে নবনীদাব খুব দুঃখ হত। নবনীদা গভীর চিন্তা করতে লাগলেন। একদিন দেখি তিনি একটা চক্‌মকি যন্ত্র আবিষ্কার করে বসেছেন। খুবই সামান্য কয়েকটি উপকরণ—সিগ্রেটের টিন, এক বাণ্ডিল সুতো, লাইটাবের পাথর, বা একখণ্ড লোহা ইত্যাদি।

কাজ ছাড়া নবনীদা একেবারে থাকতে পারতেন না। ছটফট করতেন। আমরা বলতাম, কাজ মানেই নবনীদা, নবনীদা মানেই কাজ।

লেখাপড়া বিশেষ জানতেন না বলে বড়োই আফশোস ছিল তাঁর। শিক্ষার প্রতি ছিল তাঁর আকুল আগ্রহ। আমরা অধ্যয়নের জন্য ছোটখাট স্কুল চালাতাম, তাতে অল্প শিক্ষিত ও নিরক্ষর মানুষ সেখানে দৈনিক পড়াশুনা করতেন। নবনীদা ছিলেন সেই স্কুলের সব চাইতে নিয়মিত আর মনোযোগী ছাত্র।

সেখানে আমরা রোজ খবরের কাগজ পড়ে শোনাতাম।

একদিন সকালে যখন আমরা শীতের রোদে গা সেঁকছিলাম, যখন আকাশের ঝিলমিলে কুয়াশায় রৌদ্রের সোনালী সুতোগুলো কাঁপছিল থিরথির করে, তখন আমরা সেই বিখ্যাত শোকের খবরটি জানতে পেরেছিলাম খবরের কাগজে।

নবনীদা আমাদের মধ্যেই ছিলেন তখন।

কমরেড তমাল চেঁচিয়ে উঠলেন, "ঈশ্-শ্-শ্—"

আমরা সকলে "কি-কি" বলে বলে ঝুঁকে পড়লাম খবরেব কাগজের ওপর। মর্মান্তিক এক সংবাদ।

এক কৃষক নেতা পুলিশের গুলিতে নিহত।... অমুক তাবিখে অমুক স্থানে, একদল পুলিশ যখন পাহারা দিচ্ছিল, তখন একদল সশস্ত্র দুর্বৃত্ত অতর্কিতে বোমা পিস্তল ও বন্দুকসহ পুলিশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং আক্রমণ চালায়। তখন পুলিশ আত্মরক্ষার্থে গুলি চালায় ফলে এক প্রখ্যাত নেতা সুধীর শিকারী প্রাণ হারায। সুধীর ওই অঞ্চলে দীর্ঘকাল যাবত অনেক বে-আইনী সমাজবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল। পুলিশী সূত্রে জানা গেছে, এই সংঘর্ষে পুলিশের একজন সামান্য আহত হয়েছে। তাকে হাসপাতালে তৎক্ষণাৎ ভর্তি করা হয়েছে, সে বর্তমানে দ্রুত আরোগ্যের পথে। ইত্যাদি...

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে এক প্রগাঢ় শোকের ছায়া নেমে এল। বেশ কিছুক্ষণ আমরা কেউ-ই কোনো কথা বলতে পাবলাম না। যে কয়টি বিখ্যাত শোক আমাদের মনে গেঁথে আছে, সুধীর শিকারীর মৃত্যু তাদেব পাশে স্থান কবে নিল।

আমাদের সকলের চোখ অজ্ঞাতসারে নিঃশব্দে লাল হয়ে উঠল এবং নীরবে গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

সুধীর শিকারী এক প্রখ্যাত যোদ্ধা, শ্রেণীব যোদ্ধা— তাঁব সংগ্রাম তাঁর জীবন, তাঁর রাজনৈতিক ভূমিকা, মতাদর্শগত সংগ্রাম আজ ভারতের বিপ্লবী জনগণের মুখে মুখে ফিবছে। এমন দুঃসাহসিক, দীপ্ত ও উজ্জ্বল এক তরুণ সংগ্রামীব শহীদ হবাব খবর খুব স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের মনে গভীব শোকের উদ্রেক করেছে।

আমরা সবাই মনে মনে ভাবছিলাম, কি করা যায়।

নবনীদা পাশেই ছিলেন, উঠে দাঁড়ালেন, তিনিও অস্থির, ছটফট করলেন, কিন্তু কি বলবেন, কি করবেন সঠিক যেন বুঝে উঠতে পারছেন না। তাঁর ঠোঁট দুটো কাঁপছে, আর সারা মুখমণ্ডলে নতুন ঝড়েব পূর্বাভাস থমথম করছে।

আমরা সে সময় শুধু এটুকু জানতাম সুধীর শিকারী নবনী শিকারীর এলাকাব ছেলে, দু-জনে একই অঞ্চলের অধিবাসী। জানতাম না, সুধীর নবনীদারই ছেলে। সুতরাং তখন তাঁব দিকে আমাদের বিশেষ কোনো নজব ছিল না।

নবনীদার বিষয়ে এখন যা বলছি, তার অনেকাংশই পরবর্তীকালে নবনীদাব কাছ থেকে আমরা শুনেছিলাম।

ঠিক সেই মুহূর্তে, নবনীদার মনে পড়েছিল তাঁর গ্রামের এক বৌদিব সঙ্গে একদিনকাব বাক্যালাপের এক দৃশ্য।

শম্ভু বাউরির মা, বিধবা— গ্রাম-সুবাদে বৌদি। শম্ভুদের বাড়িটা নবনীদার বাড়ীব পশ্চিম দিকে, মাত্র কয়েকটা বাড়ী পার হযে। জমিদার সিংদের বিরাট দীঘিটার অপর পাবে। দীঘির উঁচু পাড় দিয়ে যেতে হয। চারদিকে ঘন বাঁশঝাড়, স্নিগ্ধ ছাযাব মধ্যদিযে গিয়ে প্রথমেই পড়ে শম্ভুদের বাড়িটা।

গ্রীষ্মকালের বিকেল, উজ্জ্বল ঝাঁঝালো রোদ বাঁশ গাছের শীর্ষে, শনশনে বাতাস বাঁশগাছের পাতায়-পাতায় সুর তুলছিল, কখনো আস্তে কখনো জোরে— দমকে দমকে। নবনীদা মাঠ

থেকে ফিরছিলেন কাজ থেকে, সারা গায়ে মাটি, শরীরে ক্লান্তি— আউষের জমি-চষার কাজ ছিল সে দিন।

একদিকে তখন চলছে কৃষিকাজ অন্যদিকে চলছে ছোট ছোট গেরিলা যুদ্ধ।

বৌদি ওদের ছাগলগুলো নেড়ে দিয়ে ফিরে আসছিলেন মন্থর গতিতে।

"শুন শুন ঠাকুর প—"

শম্ভুদের দাওয়ায় ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালেন নবনীদা।

"একটুন বস—"

নবনীদা বসবেন কিনা ভাবছিলেন, জানতেন কেন বৌদি ডাকছেন। বৌদির এই ডাক এবং পরবর্তী আলোচনার সঙ্গে নবনীদার— শুধু মাত্র নবনীদার নয়, এই গ্রামের কৃষকদের ভালোই পরিচয় আছে। এখন দাঁড়ানো, আর আলোচনায় যুক্ত হবার মানে, কথা-কাটাকাটির মধ্যে ফেঁসে যাওয়া!

তবু নবনীদা দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসলেন উবু হয়ে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সদ্য পাকানো দুটো চটা নিয়ে এল শম্ভু, একটা এগিয়ে দিল নবনীর দিকে। তারপর দুজনে দুটি চটা ধরাল লাইটার জ্বেলে।

"কী-কী হচ্চে তুমাদের এ্যাঁ—এ্যাঁ কী হচ্চে বল ত?" বৌদি স্বভাবসিদ্ধ উৎকণ্ঠার সংগে প্রশ্ন করতে লাগলেন, উত্তেজনার বশে মাথার চুল থেকে একটার পব একটা উকুন বেছে নখে টিপে মারতে লাগলেন।

"কী হবেক?" কাশতে-কাশতে বললেন নবনীদা। মনে-মনে তাঁর হাসি পেয়ে যাচ্ছিল, মুখে কিন্তু প্রকাশ করলেন না। তিনি জানতেন বৌদি কী কথা বলবেন, আর বলতে বলতে কেমন অংগ-ভংগি করবেন। ছেলেকে লড়াইযে অংশগ্রহণ করতে দিতে ছেলে-পাগল মেয়েটিব এতটুকু সম্মতি নেই। যদিও শম্ভুরা ভূমিহীন— পাঁচ ভাই-ই ক্ষেত মজুর। বৌদি নিজে করেন দাইয়ের কাজ, বাবুদের বাড়ি যেতে হয় দাইয়ের কাজে। আশংকা, বাবুরা জানতে পারলে কাজ বন্ধ করে দেবে, তাঁর রোজগার যাবে বন্ধ হয়ে, ভাতের কষ্ট বাড়বে।

শম্ভু অটল, ও মায়ের কথায় কর্ণপাত করে না। রাজনীতিতে বেশ সচেতন, স্কোয়াড গঠনে দক্ষ এবং দায়িত্বশীল। ও মাকে বলে, "দ্যাখ মা, তুমি গর্ভধারিণী বটে কিন্তু তুমার রাস্তাকে চললে আমরা আর বাঁচব নাই। যে রাস্তা আমরা ঠিক ভেবেচি সে বাস্তাকে আমাদেব চলতেই হবেক। ই ছাড়া আমাদের অন্য কুনো গতিক নাই।"

"নিজের চরকাটিতে নিজেই তেল দিগে যা—"

"উয়ার জন্যেই ত আমরা মরেচি। ইবারে দেশের চরকাটিতে তেল দিতে হবেক, তবেই নিজের চরকাটি চলবেক।"

শম্ভুকে বাগ মানাতে পারছেন না বৌদি, তাই মাতব্বরকে পাকড়াও করেছেন। এ-ঘটনা নতুন নয়।

"না-না, আমার ছা লড়াই-ফড়াই করবেক নাই, উয়ার মাথাটি তুমরা খারাপ করবেক নাই, আমার বুকের ধনটিকে আমি মিত্যু মুখে ঠেলে দিতে লাবব।" বলে, বৌদি হঠাৎ বুক চাপড়ে, কপাল চাপড়ে কাঁদতে লাগলেন।

"শুন-শুন বৌদি, লড়াই মানে মিত্যু মুখে ঠেলে দেয়া, ই কথাটা তুমাকে কে বলেচে। লড়াই মানে কি দুনিয়াসুদ্দ মানুষের মিত্যু? ই বাবা, তুমি যে অবাক করলে গ। ই মিথ্যা কথাটা তুমাকে কে বলেচে? হঁ কিছু মানুষকে লড়াইয়ে নির্ঘাৎ জীবন দিতে হবেক, ইয়াতে কুনো ভুল নাই। কিন্তু তার মানে ইটা লয় যে, সব্বাই মরবেক। কিছু লোক মানে সামান্য ক-জন লোক। আর উযাদের জীবনের দামে যে অসংখ্য মানুষ সত্যিকারের মানুষেব মতন

জীবন পাবেক, দেশের মালিক হবেক, স্বাধীন হবেক, আর উয়াদের কুনো দিন জন্তু জানোয়ারের মতন বাঁচতে হবেক নাই,— পকৃত মানুষের মতো মানুষ হতে পারবেক— ই ব্যাপারটা তুমি ক্যানে দেখচ নাই? ই ব্যাপারটা তুমি ক্যানে ভাবতে পাবচ নাই?"

"উ-সব কথা আমি ভাবতে লারব, তুমরা ভাব।"

"শুধু কটা মানুষ ভাবলেই চলবেক? ইটা কি দু চারজন মানুষের লড়াই? সমস্ত গরীব চাষী সমস্ত মজুর আব দুখী মানুষের লড়াই। তুমাকেও হাত লাগাতে হবেক। যদি তুমি হাত না লাগাও, আমরাও জিততে পারব নাই, তাহলে তুমিও দায়ী থাকচ গরীবদের কাছে।"

বৌদি রেগে উঠলেন, "আমি কুনো দিন হাত লাগাব নাই— আমি কিসের জন্যে দায়ী, এ্যাঁ?"

হেসে ফেললেন নবনীদা, "নিশ্চয় হাত লাগাবেক, নিশ্চয় তুমাকে পাব আমরা। ইটা যে তুমারও লড়াই বটে, যেমন তুমার সন্তান শম্ভু, ই লড়াইটাও তেমন তুমার সন্তান বটে।"

চেঁচিয়ে উঠলেন বৌদি, "না না, তুমরা আমাকে পাবেক নাই, লড়াই ছাডাই আমি বেশ রয়েচি—"

"বেশ রয়েচ?"

"হুঁ, হুঁ, আমি বেশ রয়েচি।"

"ভাব, আর একবারটি ভাব।"

"খুব ভেবেচি, দেখতে পাচ্চ নাই, ভেবে ভেবে চুলগুলি সাদা হইচে?"

"আব একবার ভাব। আব দু-বাব ভাব, বারবার ভাব, দেখতে পাবে লড়াই ছাডা কুনো দুখী মানুষের কুনো বিবেচক মানুষেব কিছুই বইতে পাবে নাই। দ্যাখ, দ্যাখ বৌদি, যে লড়াই করচে উযাব সবটুকুই বজায় থাকচে— উযার মনুষ্যত্ব, উয়ার স্বাধীনতা, উয়ার সম্মান, উয়ার অধিকার— সব— সবটুকু বজায় থাকচে— উই ত মানুষ বটে, বীর বটে।"

কযেক মুহূর্ত বৌদি কথা বলতে পারলেন না, জবাব দিতে পারলেন না। তার মতো বাক-পটু মেয়েকেও মাথা নীচু করে বসে কিছুক্ষণের জন্য পায়ের নখ খুঁটিতে হল। সন্ধ্যের তখন আর বেশী দেরী নেই। নবনীদার চটা কথা বলার ফাকে কখন নিভে গেছল, লাইটার জ্বেলে আবার ধরালেন চটাটি।

মাকে চিন্তিত দেখে শম্ভু মুখ টিপে মিটি মিটি হাসছিল, আর নবনীদার দিকে চোখ ঠারছিল।

উঠে দাঁড়ালেন নবনীদা।

বৌদি বললেন, "আমার ভাবনা আমাকে ভাবতে দাও। আমার ভাবনা কি দেশের মানুষ ভেবে দিতে আসবেক?"

"কুনো কালে মা বুঝবেক নাই কাকা, বাদ দাও মাকে।" শম্ভু বললে একটু ঝাঁঝের সঙ্গে।

বৌদি আবার চটে উঠলেন, "মা ত বোকা মুখ্যু, মা কি আর বুঝবেক?"

নবনীদা অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, শম্ভুরা কি আব ছোট আছে, শিশু? ওরা বড় হয়েচে, ওদেরও আছে একটা স্বাধীন মতামত। ওরাও বুঝতে শিখেচে যথেষ্ট। ওদের ওপরেই আমরা ছেড়ে দিই না কেন। ওরা নিজেরাই ঠিক করুক না কেন, লড়াই করাটা উচিত নাকি অনুচিত।

তবু বৌদির মত পাল্টাল না। বললেন, "মুখ টিপলে উয়াব দুধ বেরাবেক, এখন উ কি বুঝবেক?"

"বিয়া দিলে দু-ছেলেব বাপ হত, আর বলচ উ কী বুঝবেক! যে লড়তে চায় উয়াকে বাধা দিয়ে ক্যানে ঘরে অশান্তি করচ? তুমার ছেলেরা কি খারাপ কাজ করচে কিছু? যা কিছু

করচে উয়ারা— সব ত দেশের জন্য, দশের জন্য। ইটা ত তুমারও আনন্দের বিষয়, গর্বের বিষয় বটে।"

"আমার ছা-কে আমি মিত্যু মুখে ঠেলে দুব, অমন ডাইনি মা হতে আমি লারব।"

"ক্যানে তুমি নিজেকে ডাইনি বলচ বল ত। তুমি কি ডাইনি মা? তুমি ত দেশের মা বটে। ক্যানে ভাবচ শুধু শম্ভুরাই তুমার সন্তান, ক্যানে তুমি ভাবচ না, দেশের কোটি-কোটি ছেলে-মেয়ে, তুমারই ছেলে-মেয়ে?"

ঝাঝের সংগে বৌদি বললেন, "ই সব বাজে কথা ছাড়া কি তুমি অন্য কথা জান নাই? কিসে ঘরের সুখ হবেক, কিসে ঘরের শান্তি হবেক, ই-সব বিষয়ে একটি বুদ্ধি দিতে পার নাই?"

"কী করে নিজের ঘরের সুখ, নিজের ঘরের শান্তি হবেক? তুমি ত আর জংগলে থাক না। তমি ত থাক মানুষের মধ্যে। তুমার ঘরের সুখকে, তুমার ঘরের শান্তিকে আজ অনেক ঘরের উঠান পার হয়েই আসতে হবেক। উ-ই কথাটাই ত আমি এতক্ষণ বকবক করে মরচি। তুমি যদি বুঝতে না চাও, ত আমার বাপের সাধ্যি নাই তুমাকে বুঝায়।"

"থাম-থাম— উ সব কথা বলতেই মধুর, আর শুনতেই মধুর। কিন্তু—"

"কী কিন্তু, বল-বল, খোলাখুলি পষ্টাপষ্টি বল।"

"যখন নিজের একটা কিছু ঘটবেক, তখন টেরটি পাবেক হাড়ে হাড়ে— ই কথাটা কিন্তু ঠাকুর-প খুব ভাল করে চিন্তা কর।"

অনেক-অনেক লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছেন নবনী শিকারী। তেভাগা থেকে শুরু করে আজকের লড়াই পর্যন্ত। বৌদির কথাগুলি কিন্তু একটা খোঁচার মতো মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল, কিম্বা বলা যায় একটা আয়নার মতো। ওই কথাগুলোর মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রশ্ন করা যায়, দেখা যায়।

বিপ্লব বড় কঠিন কাজ আবার মানুষেই এই কঠিন কাজটা সম্পন্ন করেন, এই কঠিন কাজটার জন্য অসংখ্য মানুষ নিজের সমগ্র জীবন দিতে সামান্যতম দ্বিধা প্রকাশ করেন না। সুতরাং নবনী কেন প্রকাশ করবেন দ্বিধা?

বৌদি কিন্তু প্রশ্নটা ওভাবে করেন নি। বৌদি বলেছেন অন্যভাবে। নবনী শিকারীর পাঁচ ছেলেই লড়াকু। তাঁরা বেশ কয়েক বছর যাবত লড়ছেন সুনামের সংগে। 'যখন নিজের একটা কিছু ঘটবেক' মানে ব্যাপারটা নবনীদার বিষয়ে নয়, নবনীদার ছেলেদের বিষয়ে।

কয়েক মিনিট পরেই বৌদি এমন কথা বলার জন্য ভগবানের কাছে নিজেরই শাস্তি বারবার প্রার্থনা করতে লাগলেন। বৌদি যে নবনী শিকারীর ছেলেদের, শুধু নবনী শিকারীর কেন, পাড়ার ছেলেদের ভালোবাসেন নিজের ছেলের মতো। ওদের কারুরই কোনো বিপদের কথা যে বৌদি ভাবতে পারেন না। কামনা করতে পারেন না।

সে-দিনের সন্দেহটা এ-ভাবে উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। নবনীদা ফিরে আসছিলেন ভাবনার মধ্য দিয়ে সিং দীঘির উঁচু পাড় ধরে। তখন পুব দিকে উঠছিল গোলাকার চাঁদ, আর পশ্চিম দিকের আকাশ তখনো লাল। গগনভেড় পাখির দল ঝাঁকে ঝাঁকে চলেছে আরও দক্ষিণে, ঘুঙুরের বোলের মতো একটানা আওয়াজ তুলে। চলে গেল একটা দিন। পৃথিবী অবিশ্রান্ত ঘুরে চলেছে, দৈনিক পরিবর্তন হচ্ছে একটা, আমরা কিছু বলি আর নাই বলি, কিছু করি আর নাই করি। পরিবর্তনটা টের পাচ্ছি কখনো, কখনো টের পাচ্ছি না। নবনীর অন্তরও পরিবর্তনের আবেগে উথলে উঠেছিল। তিনি তখন ভাবছিলেন, এখনো অনেকের মনে প্রশ্ন, আমার স্বামী, আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার মা, আমার বাবা, আমার বোনকে বাদ দাও, ওরা পারবে না লড়াই করতে। কিন্তু যাদের প্রশ্ন তাদের অন্তরের মধ্যেই আবার গুমরে

গুমরে উঠছে লড়াইয়ে যোগদানের মহৎ আকাঙ্ক্ষাটাও। বিরাট পরিবর্তনের ঝড়ে এক একটা দমকা হাওয়ার মতো মিশে যাবার মত মহৎ আকাঙ্ক্ষাটা।

একদিকে সম্মুখ গতির প্রচণ্ডতম টান, অন্যদিকে পেছনের মায়া, আর আত্মচিন্তা।

কিন্তু সংগ্রামের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া যে জনগণেব অন্য কোনো জীবন থাকতে পারে না। সংগ্রামের বাইরে থাকা মানেই জীবনের বাইরে থাকা, সংগ্রামেব মধ্যে থাকা মানে জীবনের মধ্যে থাকা।

এ-সব কথা ভাবতে ভাবতে নবনীদা সেদিন সন্ধ্যেয় বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। এ-সব কথা আমরা নবনীদার মুখ থেকেই পরে শুনেছিলাম।

এ-দিকে জেলের মধ্যে তখন আমাদেব আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল, সুধীর শিকারীর মৃত্যুতে গ্রহণ করা যায় কী কার্যসূচী। এমনভাবে আমরা এই শোক পালন করতে চাই, যাতে অসীম শক্তিতে পবিণত করা যায় এই শোককে।

নবনীদা সে-সময়ে আমাদের হাত থেকে খবরেব কাগজটা টেনে নিয়ে চোখ বুলোচ্ছিলেন।

"কী, কী লিখেচে, নামটি একবার ভাল করে পড় ত। কুন গ্রামটির কথা লিখচে?"

কাগজটাতে আবার চোখ বুলিযে দেখে গ্রাম, থানা ও নিহত বিপ্লবীর নামটি জানালাম।— "কেন, আপনি ওকে চিনতেন নাকি?"

আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে, ডান হাতে কাগজটা ধরে উঁচুতে কয়েক বার তুলে নামিয়ে নিলেন নবনীদা। তিনি যেন কিছু বলতে চাইছেন, কিছু করতে চাইছেন। এই সময় তাঁর আচরণ আমাদের অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

স্পষ্ট টের পেলাম, নবনীদার চোখ ফেটে যেন জল বেরিয়ে আসতে চাইছে, আর সে শোক সংবরণ করাব জন্য তিনি মনের মধ্যে সুতীব্র সংগ্রাম করে চলেছেন।

মেজো ছেলের মৃত্যু-খবর, শহীদ হবার খবর তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে। বুক ভেঙে যেতে চাইছে তার।

শম্ভুর মা যেন তার বুকের মধ্যে বলে উঠলেন, 'কী ঠাকুর পো, আমি তুমাকে বলি নাই, নিজের কিছু ঘটলে তখন টেরটি পাবেক!'

হ্যাঁ, টেরটি পেয়েছি, নবনীদা ভাবলেন, হাড়ে-হাড়ে মর্মে-মর্মে টেব পেয়েছি। কিন্তু বিপ্লব কি এমনি-এমনি হবে? এক ফোঁটা চোখের জল ফেলব না, কেঁদে বুক ভাসাব না রক্তদান করব না, জীবনদান করব না, এমনি-এমনি হবে বিপ্লব? সেই জন্যই আমি কাঁদব না— না না আমি কাঁদব না। আমাব ছেলে তো মরে নি, শহীদরা মরেন না, কেন আমি কাঁদব? আমার ছেলে বেঁচে আছে এই তো, এই সব ছেলে যারা লড়ছে তাদের মধ্যে।

নবনীদা আমাদের মুখেব দিকে তাকাচ্ছিলেন বাববার, আব দেখছিলেন আমাদেব মুখে সুধীবের আদল পাওয়া যায় কিনা।

আমাদের মুখে সুধীরের মুখের আদল দেখতে পেয়ে নবনীদার চোখ থেকে আর জল গড়িয়ে পড়ল না। নবনীদা বুঝতে পারলেন, সুধীর এখনো কথা বলছে, কাজ করছে, লড়াই করছে আমাদের মধ্যে, সুধীর এখনো নিঃশ্বাস নিচ্ছে বিপ্লবের প্রতিটি নিঃশ্বাসে।

সুধীরের প্রাণ বিপ্লবের প্রাণ, বিপ্লবের প্রাণ সুধীরেরই প্রাণ।

নবনীদা খবরের কাগজটা রক্ত পতাকার মতো তার মাথার ওপরে ওড়াতে-ওড়াতে চিৎকার করে বার বার বলতে লাগলেন, "জান, জান তুমরা জান কমরেড, কে - কে শহীদ হয়েচে? হ্, হঁ, আমার ছেলে সুধীর— হঁ, হঁ, আমার ছেলে সুধীর শহীদ হয়েচে-—"

জনগণ জড়ো হতে লাগলেন আর সকলের কাছে নবনীদা খবরটা বারবার চিৎকার করে সর্বোচ্চ কণ্ঠে বলতে লাগলেন।

নতুন যুগের নতুন মানুষের নতুন পিতাকে আমরা সে দিন সকলে প্রত্যক্ষ করলাম।

ভালবাসা ও ডাউন ট্রেন

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

প্লাটফরমে তিনটে বাতি ছিল। তিনটেই দমকা হাওয়ায় নিবে গেল আমরা তিনটে লোক স্টেশনে। তিনটি চমক এল সঙ্গে সঙ্গে, তারপর স্টেশনবাবু জানালাটা বন্ধ করে দিলেন। এতক্ষণ বাইরে একটা ক্রুদ্ধ সজারু দেখছিলাম। তার ধারাল কাঁটাগুলি খাড়া হয়ে কাঁপছিল। আমি ও তৃপ্তি হঠাৎ নিক্ষিপ্ত হয়েছি সেই কাঁটাগুলির উপর। স্টেশনবাবু বেঁচে গেলেন। আমি ও তৃপ্তি হঠাৎ পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলাম আমরা ভয় পাচ্ছিলাম। যন্ত্রণার ভয় কিংবা ভয়ের যন্ত্রণা

তেলতেলে আলোগুলো আর নেই। আমাদের চারপাশে চাপচাপ অন্ধকার। কালো কুচ্ছিত ওল্টানো ড্রামের মতো আকাশ। কে যেন ধাক্কা মেরে আমাদের ফেলে দিয়েছে। ঢেকে রেখেছে ড্রামটা উপুড় করে, আর বেরুতে পারব না কোনদিনও। দমকা হাওয়ায় গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টি। বৃষ্টির ছাটে আমার পা দুটো ভিজে যাচ্ছে। তেলের মতো তরল চটচটে এক অদ্ভুত শৈত্যে যেন পা দুটো ডুবে রয়েছে। যেন নীচে কোন মাটি নেই। এবং যদি কথা বলি ড্রামের ছাদে গমগম করে বাজবে। আমার - আমাদের তাই চুপচাপ থাকার ইচ্ছে।

বারান্দার একটিমাত্র বেঞ্চে আমরা। আর কোন লোক নেই। কোন লোক নেই ট্রেনে এবং অন্ধকারে এবং ভয়ে তৃপ্তি আমার জানুতে মাথা রাখল লম্বালম্বি শুয়ে পড়ল তৃপ্তি বেঞ্চ বরাবর। অন্ধকারের কোন খোঁদলে তৃপ্তি যেন ঢুকে যাচ্ছিল। তাকে হাতড়ে কিছু খোঁজার মতো করে তার মুখ খুঁজলাম। আর, ভটে ঠোঁট ঘষা শ্যাওলা রঙ মাছের মতো তৃপ্তি আমার দুজানুতে ক্রমান্বয়ে মাথা ঘষছিল আমরা দুমাইল পথ হেঁটেছি। বৃষ্টির মাঠ জলজঙ্গল পেরিয়ে। হাওয়া ও পাঁকে-কাদায় শরীর ডুবিয়ে। তৃপ্তি আমার ডান হাতটা শক্ত করে ধরেছিল। তৃপ্তি বারকয় বলেছিল, 'পালিয়ে যেওনা, আমি মরে যাবো।' ওর এই স শয় আমাকে বিরক্ত করছিল। তবু আমি কোন কথা বলিনি আমি বারবার পেছন ফিরে দেখছিলাম। কোন আততায়ী আলো ও ধাবমান লোকজন কেউ ছিল না তবু আমি দেখছিলাম হঠাৎ হঠাৎ থেমে। তৃপ্তি কিছু দেখেনি। ওর চোখ ছিল সুমুখে। অনেক দূরে স্টেশনের পাশে উঁচু থামে লাল আলোটায় ওর চোখ ছিল। এবং একটু জিরোবার জন্যেই যখন সোনামুখীর পোলে দাঁড়িয়েছিলাম তৃপ্তি বলে ফেলল, 'কেউ আসবে না ওরা এতক্ষণ ...' ওরা এতক্ষণ কোথায় চলে যাচ্ছে, ওরা কী নিয়ে ব্যস্ত আমি জানতাম। ওরা এতক্ষণ শবযাত্রী', পীরবালির বাঁকে কোন গাছের নীচে একটা মৃতদেহ রেখে ওরা চিতা জ্বালাতে প্রস্তুত হচ্ছে। সেই মৃতদেহটা সেই প্রিয়তম শরীর আর আমি ভাবি নি। আমি ভাববো না। আমি কিছু ভাববো না। আমি সোনামুখীর পোলে হিজলগাছের নীচে বাইশটি বছরকে পুঁতে রাখলাম। ডুবিয়ে দিলাম আমার রুগ্ন মা ও বিপন্ন ছোট ছোট ভাইবোনদের। আমার সবটুকু স্মৃতিকে বিদ্ধ করে রেখে এলাম। পোলে দাঁড়িয়ে তৃপ্তিকে একটাই চুমু খেলাম। তৃপ্তি শুধু বলল, 'ভালবাসি।'

'ভালবাসা' শব্দের ধ্বনি যেন ছড়িয়ে যাচ্ছিল দূর থেকে দূরে। আমার সারা ভবিষ্যৎ জুড়ে বাজছিল। তারপর 'ভালবাসা'র গুরুতর ধ্বনিটি ধাক্কা মেরে জাগাল আমাকে, যেন দেখলাম পরবর্তী পৃথিবী একটি সোনালী পুতুল। এখন— যেন এখন মস্তো কালোবৃষ্টির অন্ধকারের বুরুশে তাকে পালিশ করা হচ্ছে। এবং এমনি করেই বার বার উত্থানের মুহূর্তেরা এতদিন ধরে আসত। আমাকে নিশ্চিত পতন থেকে রক্ষা করত তারা। 'ভালবাসা'র ধ্বনিরা যেন উজ্জ্বল রেণু— ভেবেছি কোন মহান ফুল থেকে উড়ে এল তারা। আমার চোখে, তৃপ্তির চোখে ছড়িয়ে থাকল। আমরা নিশ্চিত ভাবে জানলাম অন্যবিধ এক আরাম, ফুরোয় না কোনদিনও, রোদ-জ্যোৎস্না-নির্জনতার অন্তর্বর্তী।

তবু দ্বিধা পিছুছাড়া ছিল না। ঘরে আমার রুগ্ন বাবা ও মা। বিপন্ন ভাইবোনেরা। আমি কাজ খুঁজে পাচ্ছি নে। ছোট বোন রুণু চটে ও কাপড়ে রঙীন সুতোর নক্সাটা জানে। আমি সেগুলো বাজারে নিয়ে গেছি। কিছু পয়সা পেয়েছি বেঁচেছি। এবং তৃপ্তিও। তৃপ্তির বর এল না— আর কোনদিন আসবে না, ওর পিসীমা চেঁচাত। ওর পিসীমা তৃপ্তিকে দুবেলা খামচাত ওর বর আসছে না বলে। অথচ তৃপ্তির বিয়েই হয়নি। বাবা, আমার লোভী বাবা ফিসফিস করে বলত 'বুড়ির অনেক টাকা। সব পোঁতা আছে।' আমি তৃপ্তিকে বলেছিলাম কথাটা। তৃপ্তি কুৎসিতভাবে মাথাটা নাড়া দিয়েছিল। আমি জানতাম পুঁইশাক বেচে কতগুলো টাকা জমানো যায়। তৃপ্তির জন্যে, আমার দুঃখ হত। কোন কোন সময়ে ক্ষিদের জ্বালায় তৃপ্তিকে বুনো আলু তুলে কামড়ে খেতে দেখতাম। আমার কান্না পেত। এবং একদিন ঘরে যখন কেউ ছিল না, চুপিচুপি রান্নাঘরে ঢুকেছিলাম। হাঁড়ির তলায় ঠেসে-রাখা অল্প কিছু ভাত ছিল। ভাতগুলো কাগজে জড়িয়ে তৃপ্তিকে দিয়ে এসেছিলাম। তৃপ্তি সেগুলো ভয়ংকরভাবে মাথা নেড়ে গিলে ফেলল। একটুও নুন দরকার হয়নি ওর। আমি অবাক। তারপর হঠাৎ আমাদের বাড়ী থেকে প্রচণ্ড কান্নার রোল শুনলাম। পুঁটুর ভাগটুকু বেড়ালে খেয়ে গেছে বলে বাড়িসুদ্ধ কাঁদছিল। আমার মাথা ঘুরে উঠল। লজ্জা ও ঘৃণা যুগপৎ চাবুক মারতে থাকত দীর্ঘ সময় ধরে। সারাটি বেলা বাজারে ও বাজার থেকে মাঠে ঘুরলাম। এবং সন্ধ্যার মুখোমুখি তেলকলের সুমুখের ময়দানে বসে লাল আলো, হাওয়া, আকাশ, ঘাস, প্রজাপতি ও শিশুদের দেখতে দেখতে, আস্তে আস্তে, একটু একটু করে, 'আমি ভালবাসি, .. ভালবাসি' বললাম। আমার হৃদয় আপ্লুত হল আশ্চর্য এক সুখে।

'ভালবাসা' এমনি করে বাঁচিয়েছে আমাকে। ভেবেছি যদি আমরা—আমি ও তৃপ্তি পরস্পরকে ভালবাসি, ভালবাসা একমাত্র নিশ্চিত উদ্ধার। আমরা জ্বলন্ত পৃথিবী থেকে উড়ে পালাতে পারি। অন্য কোন গ্রহে। কোন মহতী উজ্জ্বল ব্যাপকতায়। রোদ-জ্যোৎস্না নির্জনতার আরামে। এবং আমাকে সাহস যোগাল 'ভালবাসা'। সেদিন সন্ধ্যায় তৃপ্তিদের বাড়ি গেলাম আবার। ওর পিসী উঠোনে বসে চেঁচাচ্ছিল। অকারণ চেঁচাত বুড়ি। আমি কিছু সংকোচ দ্বিধা না করে সোজাসুজি বলে ফেললাম, 'তৃপ্তিকে আমি বিয়ে করতে চাই।' বুড়ি ক'মুহূর্ত থেমে থাকল। সমস্ত পৃথিবী, আকাশ থমথম করছিল। গাঢ় নিঃশব্দ উত্তেজনা চারপাশে। তারপর—হঠাৎ তারপর দারুণ তীক্ষ্ণ আওয়াজে কান হিম হয়ে গেল আমার। বুড়ি রাক্ষুসীর মতো হাউমাউ করে তেড়ে এল। 'হাভাতে, অকম্মা, ভিখিরী' তারপর হঠাৎ বুড়ি হি হি করে হেসে উঠল। আঙুল তুলে দেখাল আমাকে। কাছে একটা রোগা কুকুর দাঁড়িয়ে ছিল। আমি কুকুরটার মতো লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছি। কিন্তু কুকুরটাও তীব্রভাবে চেঁচিয়ে বিদ্রূপ করছিল। লজ্জা ও ঘৃণা এমনি করে বারবার ছুরি মেরেছে আমাকে।

অথচ 'ভালবাসা' ছিল।

'ভালবাসা' ছিল, তাই আশা ছিল। আমি পাগল হয়ে কাজ খুঁজতে থাকলাম। কাজ খুঁজতে গিয়ে আরো অনেক মানুষ দেখলাম। তারা আমার মতোই। তাদেরও বাঁচার প্রয়োজন ছিল—'ভালবাসা'র জন্যে—হয়তো অন্য, অন্য অনেক 'ভালবাসা।' হয়তো প্রত্যেকের সুমুখে পাশে একটি করে 'তৃপ্তি' ছিল, না-পাওয়া, ভিন্নতর কোন কোন 'তৃপ্তি'। 'তৃপ্তিটা'কে পাওয়ার টিকিট কিনতে চায় প্রত্যেকে। প্রত্যেকে, আমরা প্রত্যেকে পরস্পর মুখ দেখে ব্যথিত। ব্যথিত—তবু ঈর্ষান্বিত। আমরা লাইনে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করলাম। আমরা কেউ কেউ পড়ে গেলাম কারুর কারুর ক্ষিপ্ত আঘাতে। আমরা কেউ কেউ ফিরে এলাম শূন্য হাতে। আমি জানতাম, এই ফিরে আসা লোকগুলি এবং আমি, এরপর কোন রাতে ঘুমোতে পারব না। প্রতিটি সকালে একটি সংবাদ পাবার আশায় জেগে থাকবো। সংবাদটি কোনদিনই এল না। আর, সবসময়ই মনে হত হঠাৎ একটা কিছু এসে যাবে। আসবেই! না, না, এ অসম্ভব। এ হতে পারে না। এভাবে বাঁচার অবস্থা কিছুতেই টিকতে পারে না। একটা কিছু ঘটবেই প্রত্যেকের জন্যে। পোষ্টাফিসের বারান্দায় আমার উত্তেজিত সকালগুলো কেটে যাচ্ছিল এমনি করে। না, কোন খবর আসে নি। কোন টিকিট।

তবু আমি অপেক্ষা করতে পারতাম। সারা জীবন ধরে প্রতীক্ষায় থাকতাম। তৃপ্তি বলল সে হয় না। আমরা চলে যাবো।

'কোথায় তৃপ্তি?'

'কোন দেশে। কোন বড়ো শহরে।'

'কলকাতা?'

'কী জানি। আমার মনে হয়। খুব বড় শহর আছে কোথাও।' তৃপ্তি নাক চুলকে বলল, 'সেখানে লোকগুলো খুব ভালো। সেখানে ...'

'পাগল!' আমি ওকে থামিয়ে দিয়েছিলাম। 'ঘরে আমার রুগ্ন বাবা-মা, ভাইবোন। তাদের কে দেখবে?'

তৃপ্তি আমার চোখে চোখ রেখে না কেঁপে মৃদুস্বরে বলল, 'ঈশ্বর।' আমি অবাক হয়ে ওকে দেখছিলাম। ওর উচ্চারিত—নির্বিঘ্নে কথিত, শান্ত সহজ শব্দটা আমায় ভাবাচ্ছিল। আমার মনের বালিতে কে যেন আঁক কেটে আঁক কেটে লিখছিল 'ঈশ্বর ঈশ্বর ঈশ্বর!' মুছে দিচ্ছিল। আবার লিখছিল।

ওর কথিত শব্দটা তৃপ্তিকেও সম্ভবত শক্তি যোগাল ক্রমান্বয়ে। তৃপ্তি আমাকে নিবিড় ভাবে, মোহ আর মোহ দিয়ে টানল ঘন থেকে ঘনতর। আমাকে মাতাল করল 'ভালবাসা' আর 'ঈশ্বর'। 'ভালবাসা' বলল, 'চলো'। 'ঈশ্বর' বলল, 'যাও'। আমি এলাম। আমি ওকে নিয়ে বৃষ্টিঝরা হাওয়া-কাঁপা অন্ধকার রাতের মাঠ পেরোলাম। সিগন্যালের লাল আলো আমাকে প্রলুব্ধ করছিল। তারপর আলোটা নীল হল। আমরা দৌড়চ্ছি। বাবোটা পঞ্চান্নর গাড়ি অন্ধকার গিলতে গিলতে ধাবিত হচ্ছিল। স্টেশনে থামল। আমরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছি। ঘণ্টা বাজল। ট্রেনটা চলে গেল। চেনা যাত্রীদের মুখোমুখি পড়ার ভয়ে আমরা পথ থেকে নেমে ঝোপে লুকিয়ে ছিলাম। তারপর নির্জন ষ্টেশনে এসে পৌঁছলাম। আমরা ভারী ক্লান্ত এতক্ষণে। আমরা ভীত। পরবর্তী কোন ট্রেন, যে-কোন ট্রেন, আপ কিংবা ডাউন, আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। গন্তব্যস্থানের কথা আর ভাবছি না। আমাদের শুধু বিশ্বাস, যেদিকে যাই, আমাদের জন্যে একটা সোনালী পুতুল পৃথিবী, একটি সুখী, বৃহত্তর শহর অপেক্ষা করে আছে। যেহেতু আমাদের 'ভালবাসা' বলেছে, 'চলো'; ঈশ্বর বলেছে 'যাও।' ....

তিনটে বাতিই নিবে গেছে দমকা হাওয়ায়। আমার জানুতে তৃপ্তির মাথা। পরবর্তী ট্রেনের খবর জানবার জন্যে আমি অস্থির হলাম একসময়।

তৃপ্তির মাথাটা নামিয়ে দিতেই তৃপ্তি ধড়মড় করে উঠল। আমার হাত চেপে ধরল। ফিসফিস করে বলল, 'বিজুদা, আমি ঘুমোই নি।'

'পালাচ্ছিনে। তোমায় ফেলে পালাবো না।' ওর কাঁধে মৃদু নাড়া দিলাম। 'ট্রেনের সময়টা জেনে আসি।'

'না, না।'

'ছিঃ, একথা এখনো ভাবতে পারো তৃপ্তি?' আমি ক্ষুব্ধ।

'আমার ভয় হচ্ছে।'

'কেন?'

'যদি ওরা কেউ আসে?' তৃপ্তি আস্তে আস্তে বলল। 'তুমি হয়তো ..'

'ওরা কেউ আসবে না।' অন্ধকার মাঠটা দেখে নিয়ে বললাম। 'ওরা এখন অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত।' শিশুর ভঙ্গীতে হাসলাম। অথচ একথা আমারও মনে হচ্ছিল। 'আমার বাবা' প্রিয়তম একটি শরীর। এখন ওদের শরীরের ওপর নিশ্চলভাবে গুরুভার। ওরা সেটি বহন করছে। আমার কথা ভাবছে। আমার ছোটভাই নিশ্চিত ওদের সঙ্গী। মুখে আগুন দেবে বলে ওরা তাকে কোলে করে নিয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টিতে আমার ছোটভাই, বাবা ও লোকজনের শরীর ভিজছে। হিম হাওয়ায় শীত বোধ হচ্ছে ওদের। আমার শিশুভাইয়ের কান্না শুনতে পাচ্ছি যেন। শিশুর কান্নাটা ডুবিয়ে দিতে আমি এক অতিকায়, অতিশয় শিশুর মতো ক্রমাগত ফিক্ ফিক করে হাসতে থাকলাম।

তৃপ্তি আমাকে ঝাঁকুনি দিল। 'এই, কী হচ্ছে? হেসো না।'

'কেন?'

'হাসতে নেই।'

'কেন?'

'ওরা কাঁদছে। তোমার মা।' তৃপ্তি চুপ করে গেল। ও জানে কেন হাসতে নেই, ও জানে মা আমার নাম ধরে কাঁদছেন। ওর পিসীমা, পিসীমাও কাঁদছে নিষ্ঠুর বৃষ্টি ও অন্ধকারে। তৃপ্তি কিছু বলতে পারছে না। জবাব নেই কোন। ওর 'ভালবাসা' ঐ সমবেত শোকের জলে ডুবে যাচ্ছে। ফলে তৃপ্তিও কেঁদে উঠল। আমার বুকে মাথা রেখে কেঁপে কেঁপে কাঁদতে লাগল।

'কেঁদোনা তৃপ্তি, কান্না না।'

তীব্র মত্ত হাওয়ার মত, বৃষ্টির মত, ঠিক মনে হল, অতিদূর পীরালির শ্মশানের চিতা থেকে উত্থিত অভিশাপ, স্টেশনের দেওয়ালে শব্দ তুলছিল! আমি ধারাবাহিক উচ্চারণ করলাম, 'কান্না না, কিছু না। আমাদের অন্য কিছু থাকতে নেই।'

তৃপ্তি মুখ তুলে বলল, 'তোমার বাবার জন্যে দুঃখ করো না।'

আমি হাসছিলাম।

'স্বর্গে উনি সুখী হবেন আমাদের জন্যে।'

'সব পাপ ভালবাসার জলে ধুয়ে যায়।'

তবু আমি হাসছিলাম। ওর কথাগুলো উদ্ভট শোনাচ্ছিল। 'বাবা' 'স্বর্গ' ও 'পাপ'। তারপর আমরা দুজনে উঠে দাঁড়ালাম। টিকিট ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বললাম, 'পরের ট্রেন ক'টায় বলতে পারেন?'

'পারি।' টেবিলে শুয়ে শুয়ে মুখ না তুলে স্টেশনবাবু বললেন। 'দুটো পাঁচ।' স্টেশনবাবু পাছে উঠে দাঁড়ান, তৃপ্তিকে ঠেলে সরিয়ে দিলাম। তৃপ্তি দরজার পাশ থেকে তবু আমাকে ছুঁয়ে থাকল। বিরক্ত হয়ে সরে এলাম আবার বেঞ্চে। চুপচাপ বসাই ভালো। আমি কিছুই ভাববো না। শুধু ভাববো বৃষ্টি, অন্ধকার ও হাওয়া। কিচ্ছুনা, কিচ্ছুনা।

তবুও ঘুরেফিরে পালিয়ে আসার দৃশ্যটা আমার চোখে ভাসছিল। মৃত্যুশয্যা, মা, লোকজন এবং লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে আসা তৃপ্তির পিসী। তৃপ্তির পিসী বাবার জন্যে সমবেত শোক-সঙ্গীতে যোগ দিতে আসছিল। আমি কান্নার রোল থেকে দূরে সরে যেতে যেতে হঠাৎ চমকে উঠেছিলাম। তৃপ্তি আমাকে আকর্ষণ করছিল। 'এই সুযোগ, এই সুযোগ।'

স্টেশনের ঘড়িতে শব্দ বাজল। বললাম 'এখনো পঁয়ত্রিশ মিনিট আপট্রেনটা আসতে।'

তৃপ্তি প্রশ্ন করল, 'কোথায় যাবে?'

চমকে উঠলাম, 'যেখানে খুশি।'

তৃপ্তি আচমকা হেসে উঠল, 'নরকেও?'

'নরক' শব্দটায় ভয় পেলাম। ভেজা চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠল। নিশ্বাস ফেলে বললাম, 'বরং কলকাতা যাওয়াই ভালো।'

'অত টাকা কোথায় পাবে?'

'আছে।' গম্ভীর হয়ে বললাম।

'দেখি।' তৃপ্তি আমার পকেট খুঁজতে থাকল। আমি বাধা দিলাম না। আমাব পকেট শূন্য ছিল। আমি কিছুই ভাবিনি। তৃপ্তি কিছু খুঁজে না পেয়ে বলল, 'বড্ড বোকা একেবারে। পুরুষমানুষ এত বোকা ভালো নয়।'

আমার রাগ হচ্ছিল। যেন দায় আমাবই। গজ গজ করে বললাম, 'তুমিই তো আনলে আমাকে।'

'আমি?' তৃপ্তি তবু হাসছিল। 'গবজ?' তৃপ্তি তাব হাতেব মুঠোয় কিছু আমার পকেটে রাখছিল। আমি অবাক। 'টাকা? কোথায় পেলে?'

'অনেকদিন থেকে জমিয়েছি। এই সুদিনেব জন্যে।' মিষ্টি করে বলল তৃপ্তি। 'কিন্তু — না জমালে কী করে যাওয়া হত?'

মুখ ফিরিয়ে বললাম, 'এসেছি যখন যেতামই। টিকিট না কেটে।'

তৃপ্তি দুলে দুলে হাসল। আমার বুকে জড়িয়ে গেল ওর মাথা। খোলা বৃষ্টিভেজা চুল। চুলে অচেনা গন্ধ। আমার ভাল লাগল। এই চুলগুলো যেন বা ভালবাসার, তৃপ্তির অস্তিত্বের ছড়ানো রেশমী শিকড়গুচ্ছ। বিহ্বল আমাব শরীরে, বৃষ্টিহিম কাতর ক্লান্ত মাংসে ভিন্নতর ক্ষুধা জাগছিল। তৃপ্তি বলল, 'গাড়ি থেকে যদি কোন চেনা লোক নামে?'

চেনা লোকের কথায় সচেতন হলাম মুহূর্তে। 'চল, দূরে কোথাও বসি।'

'কিন্তু বৃষ্টি যে,' তৃপ্তি বলল। 'নামুক চেনা লোক। কাকেও ভয় করিনে আর।' তারপব জুতোর শব্দ শুনলাম। স্টেশনবাবু বের হচ্ছিলেন অন্ধকারের খোঁদল থেকে। তাঁর হাতে ভুতুড়ে একচোখো আলো। তৃপ্তি সরে গেল তফাতে। আমিও কাঠকঠোর। সম্ভাবিত কোন আক্রমণকে রুখতে তৎপর। এবং স্টেশনবাবু তাঁর অদ্ভুত আলোর চোখে আমাদের কিছুক্ষণ ধরে দেখলেন। তাবপরই শ্লেষ্মাজড়ানো কণ্ঠস্বর এল। 'কোথায যাওয়া হবে?'

উত্তর স্পষ্ট ছিল। 'কলকাতা।'

'কোত্থেকে আসা হচ্ছে?'

'বিনোদিয়া।' স্পষ্টতর বললাম।

'ওটি কে?'

উত্তর স্পষ্টতর হল। 'বউ।'

'এত রাতে কেন?'

'আমাদের ইচ্ছে।' আমি বললাম বিড়বিড় করে। এবং আমাকে অবাক করে স্তব্ধ করিয়ে দিয়ে 'আমাদের ইচ্ছে' তৃপ্তিও বলে ফেলল হঠাৎ।

'ও।' স্টেশনমাস্টার একটু চুপ করে থাকলেন।

আমার কিন্তু আলাপ করতে ইচ্ছে করছিল। পকেটে একটিমাত্র সিগারেট ছিল, অবশ্য সেটি অন্যত্র সংগৃহীত, দেবার ইচ্ছেয় পকেটে হাত ভরলাম। সিগারেটটা ভিজে গিয়েছিল। তাই একটু হাসলাম ক্ষুব্ধ হয়ে।

স্টেশনমাস্টার আমার গায়ে গায়ে বসলেন। আমার শরীর কাঁপল অমনি। তৃপ্তি আরও একটু তফাতে সরে গেল। স্টেশনমাস্টার বললেন, 'যাচ্ছেতাই বিষ্টি কিন্তু।'

আমি খুশী হয়ে বললাম, 'হ্যাঁ।'

এরপর ওঁর গল্পগুলো শুনলাম। এর আগে যে-সব স্টেশনে ছিলেন সেখানের কথা। বাজারদর আর ওঁর বয়স, বিবাহ, সন্তানাদির কথা। কোন স্টেশনই ওঁর মনের মতো নয় সে কথাও শোনালেন। উনি সব-সময় শুধু বদলী হওয়ার কথা ভেবে থাকেন বললেন। 'কোথাও সুখ নেই—কোথাও।'

তারপর বললেন, 'ট্রেনগুলো যখন আসে যায়, চাকায় নাকি অদ্ভুত সব কথা বাজে।'

আমি খুশী হয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই যে, 'টিকিটবাবুর কত টাকা, টিকিটবাবুর ...'

স্টেশনমাস্টার হাসলেন। যে যা শোনে, ওই এক মজা কিন্তু। ইচ্ছেমতো কথা বাজায় ট্রেন।' আরো অনেকগুলো জানা শব্দ স্মরণ করছিলাম। কিন্তু স্টেশনমাস্টার বলতে থাকলেন, 'আমি বাপু ওসব কিস্‌সু শুনিনে। বুঝতেই পারিনে কিছু। শুনে শুনে সবই বাজে মনে হয়। প্রথম-প্রথম অবশ্যি . কাটোয়ায় এক পাগলা ট্রেন চলে গেলে চেঁচাত ঃ শালারা, কান পেতে শোন্‌রে, রেলগাড়ির চাকায় বলছে, নরকে নরকে . নরক থেকে নরকে, নরক থেকে... স্টেশনমাস্টার যেন কাঁদবার ভঙ্গীতে হাসলেন! 'নরক থেকে নরকে ... নরক থেকে ...'

'একবার আমি ইলেমগঞ্জে বদলি হয়েছিলাম। স্টেশনের পেছনে নদী। তখন এমনি বর্ষকাল।'

স্টেশনমাস্টার একটু থামলেন। কী যেন ভাবলেন।

আমি বললাম, 'তারপর?'

'এক বর্ষার রাতে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে ...'

আমি বললাম, 'তারপর?'

'ট্রেন ফেল করে স্টেশনে সময় কাটাচ্ছিল। পরের ট্রেন ...'

তবু আমি বললাম, 'তারপর?'

টেলিগ্রামের টক্‌টক্‌ শব্দ বেজে উঠলো এ-সময়। স্টেশনবাবু ভেতরে গেলেন। তৃপ্তি আমার কাছ ঘেঁষে বসলো। ফিসফিস করলো ঃ 'লোকটা ভালো না।' আমি ওকে আদর করলাম। ক্রমাগত আদর করার ইচ্ছায় ওকে বিশ্রীভাবে টানলাম আরো কাছে। ওকে ভেজা বেড়ালের মতো বোধ হচ্ছিল। তারপর অবশ্যই আমরা পরস্পর চুমু খাচ্ছিলাম। এবং আমাদের ভেজা স্যাঁতসেঁতে মাংস তাপ পাচ্ছিল। আশ্চর্য, এতক্ষণ পরে এই শারীরিক ঘনিষ্ঠতা আমাদের 'ভালবাসা'কে স্পষ্টতর ভূমিকা দিচ্ছিল। স্পষ্টতর ভূমিকায় 'ভালবাসা' সবকিছু কালো রঙে ঢেকে বাতি হয়ে জ্বলতে থাকলো। তৃপ্তি কাঁপতে কাঁপতে বললো, 'তুমি দেখে নিও, আমি শীগগির মরে যাবো।' অলৌকিক বাতিটা কাঁপছিল। তার নীলাভ দ্যুতির নীচে স্খলিত ছাইগুলো স্পষ্টতম হচ্ছিল। তৃপ্তি বিড়বিড় করলো, 'আমি মরতে চাইনে। অথচ মরে যাবো।' ও আবার কাঁদছিল। ওর কান্না দেখে আমারও কান্না পাচ্ছিল। পুরোনো ভয়টা আবার জড়িয়ে ধরছিল। আবার বাতাস এলো ঝাঁপিয়ে। বৃষ্টি এলো ঘোরতর! বৃষ্টি আমাদের ভিজিয়ে দিল! আমরা সরে যাচ্ছি না কোথাও। পরস্পর দৃঢ়ভাবে ধরে রয়েছি। আমার ভয় হচ্ছে আমরা দু'জনে এক অতল খাদে গড়িয়ে পড়ছি। দৃঢ়তর হচ্ছে শারীরিক বন্ধন। আমরা যেন শেষবারের জন্যে দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করলাম— ভালবাসি, 'ভালবাসি।'

আস্তে আস্তে ডাউন-ট্রেনের সময় নিকটবর্তী। যেন বা স্পষ্টতর হচ্ছিল তার চাকার ধ্বনি দূরে, যেন আমার বোধে স্পন্দিত ... 'নরকে ... নরকে ... নরক থেকে নরকে ... নরক থেকে ...।' আমি ভয় পেলাম, গভীর প্রগাঢ় ভয়, এবং ঘৃণা। ঘৃণা আমার ভালবাসাকে। কেন সবই 'নরকে ... নরক থেকে নরকে ...?' 'আঃ, আমি পালাতে পারছিনে, এবং তৃপ্তি আমাকে জড়িয়ে ধরে থাকলো নিবিড় বাহুতে, জাপটে ধরে রইল আমার ভালবাসা, আমাকে ক্ষিপ্র বিহ্বলতায় ... অথচ নিশ্চিত-ভাবেই সব পথই 'নরকে ... নরক থেকে নরকে ...'

'ভালবাসার জলে পাপ ধুয়ে যাবে না।' আমি বলতে চাচ্ছিলাম। আমার মুখে তৃপ্তির হাত। আমার ভালবাসার হাত। আমার ভালবাসা আমাকে ঢেকে রেখেছে।

স্টেশনবাবুর আলোর লম্বা তরোয়াল আমাদের ঐক্যকে দু'ভাগ করলো এসে। 'সেই গল্পটা—' স্টেশনবাবু গলা ঝেড়ে বলতে থাকলেন। 'ছেলেটি ও মেয়েটি পালিয়ে যাচ্ছিল। পরের ট্রেন রাত তিনটেয়। কিন্তু ...' স্টেশনবাবু হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ করে হেসে উঠলেন, 'ট্রেনটা আমি আর আসতে দিইনি। আগের স্টেশনে আটক রাখলাম।'

চমকানো স্বরে বললাম, 'ওরা তবে যেতে পারল না?'

'না।' স্টেশনবাবুর চোখদুটো জ্বলতে থাকলো। 'আমার ইচ্ছে।' এবং হঠাৎ উনি উঠে গিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেন। ঘণ্টার শব্দ কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছিল। এবং যতক্ষণ না দুটো পাঁচের আপ-ট্রেন স্টেশন ছাড়ল, কোন যাত্রী নামেনি ট্রেন থেকে, আমি ও তৃপ্তি পুতুলের মতো বসে থাকলাম বেঞ্চের দু'প্রান্তে।

গৃহবধূ স্বপ্না

ব্রজেন মজুমদার

দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামটুকুও আজ স্বপ্নার জোটেনি। প্রতিদিন যেমন হেঁসেল সামলে, ঘরদোর গুছিয়ে, কাচাকুচি সেরে, নাওয়া-খাওয়া শেষ করতে বেলা গড়িয়ে যায়, আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এখন আবার খেয়ে উঠেই উনোন ধরাতে বসেছে। কারণ রাত্রে মিলির বন্ধুরা খাবে।

মিলি এবাড়ির ছোট মেয়ে। আজ তার বি. এ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। সাফল্যের খবর পেয়ে একেবারে খুশির প্রজাপতি সে। ছুটতে ছুটতে এসে ধরেছে স্বপ্নাকে।

'আমার বন্ধুদের খাওযাবো। তোমাকে রাঁধতে হবে বৌদি।'

বন্ধুদের খাওয়াবে, সে আর বেশি কথা কি? মিলির বাবা মা এবং দাদা-দিদিরা আহ্লাদে মিলির বেলুনে ফুঁ দিতে থাকল। কারণ সংবাদটা শুনে তাঁদেরও কম আনন্দ হয়নি। সামান্য ঘটনা তো নয় মিলির বি. এ পাশ করা। বি এ পাশ করে মিলি ওর পরিবারকে একটা বিশেষ গৌরব দান করেছে। এবাড়ীর কোন ছেলেমেয়েকেই এখন আর কম শিক্ষিত বলা যাবে না। উপরন্তু স্ত্রী-শিক্ষার রেকর্ড স্থাপন করে মিলিরা চার বোনই বি. এ পাশ করেছে।

মিলির আগের প্রজন্মের অর্থাৎ মিলির মা-মাসীদের কেউই বিশেষ লেখাপড়া শেখেনি। মিলির বাবা কিন্তু গ্র্যাজুয়েট হয়েছিলেন। পাশটা তাঁর সাধারণ মানের হলেও এই নিরক্ষর প্রধান দেশে নিজেকে অসাধারণ ভাবতে কিছুমাত্র অসুবিধা ঘটেনি। উচ্চপদে চাকুরী না জুটলেও নজরটা যে উচ্চতায় খাট ছিল না, একথা স্বীকার করতে হবে। তাঁর এই উঁচুর দিকে চাওয়া যে ক্রমে ক্রমে তাঁর স্ত্রীর চরিত্রেও বর্তে গিয়েছিল, এ সত্য স্বপ্না প্রথম দিনই বুঝেছিল। মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা দিয়ে মিলির বাবা-মা পরিতৃপ্ত। এখন লক্ষ্য, উঁচু ঘর আর বর।

এসব ভাবতে বসলেই নাসিকা কুঞ্চিত হয় স্বপ্নার। মিলিদের আধিক্যেতা ওর সয় না। ওরা প্রত্যেকেই বি এ. পাশ করার পর খুব নাচানাচি করেছে। মিলির বড়দি রমা যেদিন এম. এ পাশ করল সেদিন তো ছোটখাট একটা জলসা বসে গেল। মিলিদের এসব ব্যাপার-স্যাপারে স্বপ্নার আদৌ কোন উৎসাহ নেই। কোন উচ্চ ভাব ওর মনে আসে না। কোন আবেগ ওকে আর দোলায় না। ওদের উচ্চাশা এবং সাফল্যে খুশি হয়ে ওঠার পরিবর্তে ওর মনে জাগে প্রায় নিষ্ঠুর এক ব্যঙ্গ! কি পরমার্থ লাভ হয়েছে বি. এ, এম. এ পাশ করে? কার কি উদ্ধার হবে অমন দুটো চারটে পাশ দিয়ে? বি. এ পাশ করে না হয় বিয়ের বাজারেই একটু দর বেড়েছে। তার দাম তো উলটো পথে মেটাতে হবে ষোল আনার ওপর আঠারো আনা। যতো উঁচু ঘরের বর, ততোই তো খরচের বহর। তাও না হয় হল। ভাল বিয়ে, ভাল ঘর, ভাল বর, সব প্রাপ্তিই জুটল বিদুষী মেয়ের আপন গুণে। তারপর? আর কোন মূল্য আছে মিলিদের বি.এ, এম.এ পাশ করার? ওই তো, রমার সঙ্গে বিয়ে হল ইঞ্জিনীয়ার পাত্রের। শাড়ী গয়না আসবাবপত্রের মতোই এম. এ ডিগ্রীটাও ওর সঙ্গে গেল। এখন রমার সঙ্গে স্বপ্নার এবং আর দশটি গৃহবধূর তফাৎ কি? মিলি এসব কথা শুনলে বলবে, 'ওরকম লাইফ আমি তো লিড করবো না। আমি চাকরী করবো, স্বাবলম্বী হবো। আমার মর্যাদা যে দিতে পারবে তেমন ছেলেকেই আমি বিয়ে করবো।'

স্বপ্নার হাসি পাবে। মর্যাদা একটা বিশাল শব্দ। একটি একটি করে অন্তত পঁচিশটি চাকরী করা গিন্নীর নাম এক নিঃশ্বাসে বলে দেবে স্বপ্না। তাদের জীবনের খোঁজখবর নিয়ে সে দেখেছে মর্যাদার ছিটেফোঁটাও যদি তাদের কপালে জুটতো তবে মিলিকে বাহবা দিতে তার এতটুকু আপত্তি থাকতো না। কিন্তু মিলি তো জানে না স্বপ্নার সঙ্গে ওদের তফাৎ মূলতঃ কিছুই নেই।

মিলি এসে খুব তাড়া লাগাচ্ছে। পাঁচটা বাজতে চলল যে বৌদি এখনো আঁচ ধরেনি যে।

'আঁচ ধরতে আর কতক্ষণ? কি কি রান্না হবে তার কিছু ঠিক হয়েছে'

মিলি এক পাক ঘুরে বলে, 'সে তুমিই ঠিক কর। আমি জানি না।'

জানে না! ওরা কেউই এসব জানে না! মিলি পলি, ডলি সবাই এক রকম। ওদের জানতে হয় না, জানতে চায়ও না।

স্বপ্নাও তো এসব জানতো না। এ সংসারে পা দেবার দিন মনের ত্রিসীমানায় কোথাও কোন হেঁসেলের চিহ্ন ছিল না! সেও তো ছিল তার বাপের বাড়ীর একটি ফুটন্ত গোলাপ বাইশ বছর বয়সে যেদিন স্বামীর ঘর করতে এল সেদিন তার দুচোখ ভরা ছিল গোলাপী রঙ স্বপ্ন, ছিল সুবাসিত আশা-সাধ-কামনা-বাসনা—

আজ কিন্তু সেই স্বপ্না নেই। সেই চোখ, সেই মন সেই স্বপ্ন হারিয়ে গেছে কোথায়। আজ এ বাড়ীতে স্বপ্না ছাড়া হেঁসেলের হাল ধরার আর কে আছে? অনেক দিনের ব্যবহারে এটা যেন একান্ত স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সবাই যেন ধরেই নিয়েছে, হেঁসেল নিয়ে কারোরই আর মাথা ঘামানোর কিছুমাত্র দায় নেই। স্বপ্নাকেও বুঝে নিতে হয়েছে নিষ্ঠুর সত্যটা। নিজের অজান্তেই কখন থেকে একটু একটু করে সবখানি দায় যে এসে পড়েছে জানতে টেরই পায়নি। এখন সবাই তাকে যেন নিঃশব্দে বোঝাচ্ছে, 'বাড়ীর বড়বৌ হলে তুমি সংসার তো তোমারই। তোমার হেঁসেলে আমরা কেন খেটে মরবো?' আর একই কথার প্যাঁচে তুমি স্বপ্নারও মন কবে কখন মেনে নিয়েছে, 'তাইতো এ সংসার তো আমারই আমার হেঁসেল তো আমাকেই সামলাতে হবে।'

রান্নার আয়োজন অনেকটা এবেলাই সারা হয়েছে। মাছ দুইরকম কুটে সাঁতলে রাখা হয়েছে। আনাজ পত্র সবই এসেছে। এবেলা মিষ্টি দই আর টাটকা মাংস পরিমাণ মতো নিয়ে আসতে বলা। মিলির ছোড়দা অমল আজ একটু সকাল সকাল ফিরবে। ফেরার পথে ওই এগুলো নিয়ে আসবে।

স্বপ্না মিলিকে ডেকে বলে 'এখানে বসে আলু কয়টা কেটে দাও না।'

মিলি ওঘর থেকে সাড়া দেয়, 'আমি যে ঘরটা গোছাচ্ছি বৌদি'

'ঘর গোছাবার অনেক সময় পাবে। এদিকে একটু হাত লাগালে আমার সাহায্য হয়'

মিলির জবাবের সঙ্গে সঙ্গে মিলির মায়ের গলা ভেসে আসে

'ও পারবে না বৌমা। ওকে কেন ডাকছ? রাখনা ওগুলো— আমিই কাটছি।'

শাশুড়ীর গলার ঝাঁজটুকু টের পেতে স্বপ্নার দেরী হয় না। ঠোঁটের দুরূহ কোণটা তীক্ষ্ণ চকিত হাসিতে বেঁকে ওঠে। বরাবর এই স্বভাব স্বপ্নার শাশুড়ীর। তাঁর মেয়েরা যে কেউই হেঁসেলের কুটোটি নাড়তে চায়না সেতো কেবল তাঁরই প্রশ্রয়ে। কেন তাঁর মেয়েরা এসব কাজ করতে যাবে? এসব কাজে সময় দিলে তারা পড়বে কখন, পড়তে যাবে কখন?

এসব ছিল পুরানো যুক্তি। এখন আবার যুক্তি পালটেছে। এখন মেয়েরা যে যা করছে পড়ার চেয়ে সে সকল কোনদিকেই খাটো নয়। পলি ছোটখাট একটা চাকরী পেয়েছে, ডলি করছে একটা প্রাইভেট ফার্মে অ্যাপ্রেনটিসশিপ আর মিলিও গুরুতর কিছু একটা করবে

ভাবছে না বাড়াব বৌদের কাজ ঝিযেবা কবাবে না এ বিষযে শাশুড়ী শ্বশুব, স্বামী, দেওব সকলেই একমত।

বাড়ীব বৌ বলতে এখনো স্বপ্না একাই দশ বছব আগে শাশুড়ীব হেঁসেলে শাবকানা জুটেছিল তাব। পুবোপুবি হস্তান্তবটা একদিনে হযনি প্রথমে নববধূ হিসাবে সাহায্যকাবিনীব ভূমিকা নিজেই বুঝে নিলে শাশুড়ীব হাতেব কাজ টেনে নাও পবপব একটু একটু কবে ভাগাভাগি হতে থাকল সব কাজ নিছক কর্তব্য নয় তাব খোলা মনেব উদাব স্বভাব সকলেব জন্যেই সুখ সুবিধা খুঁজে বেড়াত। সবাবই তাগিদে জন্য নিজ হাতে সে কাজ তুলে নিত। এব ফল ফলল খুব তাড়াতাড়ি। শাশুড়ীব হেঁসেলে বধূব পাকাপাকি হল প্রায অজান্তেই।

তখন সংসাবে আযেব চেয়ে ছিল ব্যয বেশি শ্বশুবমশাই অবসবেব দিন গুনছেন। স্বামীব চাকবী চাব পাঁচ বছবেব বেশি হযনি। সাহায্য কবাব জন্যে একটি ঠিকে ঝি ছাড়া আব কেউ ছিল না ব্যবস্থাটা এখনো যেমনি ছিল এখনো তেমনি আছে। শুধু স্বপ্নাব দায দাযিত্বগুলো গত দশ বছব ধবে পাতানিযত ডালপালা মেলে তাকে শতেক পাকে জড়িযে ফেলেছে।

কাটাকুটোব কাজটুকু শেষ কবে শাশুড়ী ঠাকরুন উঠে পড়েন এখন আব কোন কাজ তাকে দিযে হবে না। হাতমুখ ধুযে জপেব মালাটা নিযে শুযে বসে পাযচাব কবে সন্ধ্যেটা কাটাবেন। দীক্ষা নেবাব পব থেকে এই বেওযাজ চলছে। মাঝে মধ্যে কিছু অভিযোগ, কিছু নির্দেশ কি বা কাবোব সঙ্গে একটু আধটু আলাপচাবিতা ছাড়া তাঁব জপ তপস্যায আব কোন ছেদ নেই। শ্বশুবমশাই ওদিকে দিবা নিদ্রা সেবে উঠে চাযেব প্রত্যাশায অপেক্ষা কবছেন। স্বপ্না তাব শ্বশুব এবং মিলি এখন চা খাবে। বিকেলেব এই প্রথম প্রস্থ চাযেব জল চাপিযে স্বপ্না এক পলক ছেলেটাব খোঁজ নিযে আসে। বাইবেব উঠোনে খেলছে পাড়াব ছোট ছেলেমেযেবা। বঙ্কু ওদেব সঙ্গে আছে। এখনো বিকেলেব খাবাব খাযনি। দ্রুত হাতে চা দেবাব পব সেবে দুধটুকু গবম কবে অনেক কসবতে ছেলেটাকে ধবে আনতে হয। দুধটুকু খাওযাতে তব সযনা ছাড়া পেযেই স্প্রিং এব পুতুলেব মতো ছিটকে পড়ে উঠোনে।

এবাব বান্নাব কাজে হাত লাগায। ওবেলাব নিবামিষ তবকাবী গবম কবতে গিযে দেখে নষ্ট হযে গেছে। শ্বশুব শাশুড়ীব নিবামিষ আহাব। বাত্রে খাবেন কি দিযে? কাজ বাড়ল স্বপ্নাব। একটু কিছু আলাদা কবে বাঁধতে হবে আবাব।

কাজেব মেযেটা এবেলা এখনো আসেনি। সময উত্তীর্ণ হযে গেলে স্বপ্নাকেই হাত লাগাতে হয। ভাত চড়িযে দিযে বাসন কোসন মেজে ধুযে ঘবদোব মুছে একটু দম ফেলে। এতোটা কাজ এক সঙ্গে কবে হাফ ধবে যায।

ওদিকে অমল তাব জিনিসপত্তব নিযে এসেছে। পলি ডলিবা ফিবেছে। ওবা বাড়ী ফিবেই চটপট পোষাক পালটে হাত পা ধুযে খাওযাব জন্যে তৈবী হযে বসে থাকে। আবেক প্রস্থ চা এবং জলখাবাব তৈবী কবতে হয স্বপ্নাকে। খেযেদেযে ডলি আব পলি বেড়াতে বেবোয। এপাড়ায ওপাড়ায ওদেব বান্ধবীব সংখ্যা কম নয। যে যাব আড্ডায অনেকটা সময কাটিযে বাড়ী ফেবে যখন বাতেব খাবাব তৈবী। পলিবা যেমন এবাড়ী ওবাড়ী যায তেমনি এবাড়ীতেও লোকজন আসে। ঐতো অমলেব বন্ধুবা এসে গেছে। একটা তাসেব আসব বসবে ওব ঘবে। অমল এসে আবাব চাযেব ফবমাযেস কবে।

অমলদেব দ্বিতীয প্রস্থ চা শেষ হতে না হতে বাড়ী ফেবেন স্বপ্নাব কর্তাটি। তাঁব কিন্তু বাড়ী ফেবাব নির্দিষ্ট কোন সময নেই। যখন তাঁব বাড়ী ফিবতে মন চায একমাত্র তখনি ফেবেন। এমন একদিন ছিল যখন অফিস পালিযে দুপুবেলাও বাড়ী ফিবতেন। ইদানিং কখনো বাত কবে কখনো বা সন্ধ্যাব লগ্নেই বাড়ী ফেবা হয। বাত কবে ফিবলে বুঝতে হবে

আড্ডাটা বাইরেই সেরে আসা হল। আর তাড়াতাড়ি ফিরলেই বুঝতে হবে সেদিনকার আড্ডা পাড়ার ক্লাবে।

আবার একপ্রস্থ চা আর জল-খাবার সাজাতে বসে স্বপ্না। তার স্বামী অর্থাৎ কমল চন্দ্র স্নান সেরে ধোপদুরস্ত পাযজামা আর পাঞ্জাবি চড়িয়ে ড্রেসিং-টেবিলের লম্বা আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে চুল পাট করতে করতে হাঁকে।

— 'চা-টা হল?'

খাবারের প্লেট আর একগ্লাশ জল টেবিলের উপর রাখে স্বপ্না। বলে, 'না হওয়ার তো কারণ নেই, এ বাঁদী যতক্ষণ আছে।'

বলতে বলতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় এবং একটু পরেই চা নিয়ে আসে।

কমল চন্দ্র স্ত্রীর মুখে আজকাল এইরকম কথাবার্তা শুনে অভ্যস্ত। তাই ওসব নিচুমানের সংলাপ গায়ে না মেখে খুশিমনে অন্যকথা পাড়ে।

'মিলির বন্ধুরা আসবে কখন? তোমার রান্নার কদ্দূর?'

স্বপ্না গম্ভীর গলায় বলে, 'রান্নার দেরী হবে।'

'বেশি দেরী করো না। ওদের আবার বাড়ী ফিরতে হবে তো।'

'হাত তো আমার দশখানা নয়, দু'খানা। যতোক্ষণে পারি করবো।'

কথাটা বলে ফিরে যাচ্ছিল স্বপ্না। কমল তাকে ধরে ফেলে চিবুক নেড়ে বলে, 'আবে তুমি হলে সাক্ষাৎ দ্রৌপদী। একাই একশো।' স্বপ্না নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়।

'ক্লাবে যাওয়া হবে না?' গলার মধ্যে সূক্ষ্ম বিদ্রূপ লুকিয়ে আছে বুঝি।

এর জবাবে কমলের গলাটা শোনায় অনাবশ্যক মোলায়েম।

'না, আজ আর ক্লাবে যাচ্ছিনে।'

'কেন?'

'ভোজের গন্ধ পেয়েছি যে।'

স্বপ্না মুখ তুলে দেখে, তার স্বামীর চোখে যে লোভটা খেলা করছে তা মোটেই ভোজের লালসা নয়, অন্য কিছু।

ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে আসতে দ্রুত পা ফেলে স্বপ্না। স্বামীর এই রূপটা কখনোই ভাল লাগেনা তার। কতোদিন কতো কথার ছলে এই অপছন্দের চেহারাটার প্রতি স্বপ্না কটাক্ষ করেছে। কিন্তু তার স্বামী কখনোই তার রুচিবোধকে পায়ে না মাড়িয়ে চলতে পারেনি। স্বপ্না বুঝেছে ও ওইরকম স্বভাবের মানুষ।

আজ মিলির বি. এ পাশ করার দিনে স্বপ্নার এ কি হল? বারে-বারেই মনটা তার পেছনে ধাওয়া করছে। নানা ভাবনা ছিঁড়েখুঁড়ে খাচ্ছে। মিলি এখনো জানে না এদেশে জন্মে তার নারী জন্মটা শেষ পর্যন্ত সার্থক হবে কিনা। ওর কাছে সার্থকতার সংজ্ঞাই বা কি? কি হলে সার্থক, কি হলে নয়, এ সম্পর্কে মিলির চেতনাই বা কতোটা। স্বপ্না ভাবে, তার মতো ঘর-বর যদি মিলিরও ভাগ্যে জোটে মিলি কি সুখী হবে? বলতে পারবে সার্থকতা পেয়েছি? যা পেয়েছি তার বেশি কিছু চাইনি। হয়তো পারবে। কারণ নিজের মধ্যে খুঁজে পেতে কয়জন বলতে পারে, 'যা পেয়েছি তা চাইনি।'

স্বপ্নাও তেমন হলে বলতে পারতো, 'যা পেয়েছি তার বেশি কিছু চাইনি।' এ সংসারে কেউই বলবে না, হতভাগী স্বপ্নার বরাতে জুটেছে একটি অযোগ্য পাত্র। যাঁরা তার বর জুটিয়ে দিয়েছেন সেই তার বাবা মা এবং দাদারাও সাক্ষ্য দিয়ে বলবে, 'স্বপ্নাকে আমরা যোগ্য পাত্রেই দান করেছি।' কেউ কিন্তু জানে না কেমন করে কবে থেকে জীবনকে ভিন্ন চোখে দেখার একটা অভ্যাস গজিয়ে উঠেছে স্বপ্নার মধ্যে। সেই চোখটাই কিনা বাধিয়ে

তুলেছে গোল। সে দেখে আর ভাবে, আর মত খাড়া করে। এদেশে দান আর প্রতিগ্রহের বন্ধনে পড়ে নারীর সম্মান বিকিয়ে গেছে। দাতার কাছে যেমন সে একটি দাতব্য বস্তু গ্রহীতার কাছেও তেমনি সে একটি প্রতিগ্রহের বস্তু। চিরকালের স্বভাবে স্বামীর কাছে স্বপ্নাও তেমনি একটি বস্তু বই নয়। তার দেহটি ছাড়া আর কিছুর কোন মূল্য নেই স্বামীর কাছে। তার স্বামী কখনো তাকে বলে না, 'স্বপ্না তোমাকে আমি ভালবাসি।' কখনো বলে না, 'স্বপ্না তোমাকে আমার ভাল লাগে' অথবা 'স্বপ্না তুমি কি সুন্দর।' ওর ভাল লাগার একটাই প্রকাশ। সেটা হচ্ছে কানের কাছে মুখ বাড়িয়ে ফিস ফিস করে বলা, 'মাইরি তুমি দারুণ।' কথাটা শুনলেই স্বপ্নার দুকান লাল হয়ে ওঠে। আর কোন সম্ভাষণ ওর আসে না। ও শুধু জানে সম্ভোগ। সম্ভোগ শেষ হলে আর ওকে কাছে পায় না স্বপ্না। কোন সুখ-দুঃখের কথায় ও থাকে না। কোন প্রীতি, কোন আহ্লাদ, কোন আত্মীকতার ভাব বিনিময়ে ও কখনো একান্ত হয় না। ও শুধু চায় দেহভোগ। আর এই ভোগাকাঙ্ক্ষা এমনি নির্বোধ যে সময় অসময়, শোভন অশোভন কিছুই সে বিচার করে না। তাই বহু সময় স্বপ্নার মনে হয় সে ধর্ষিতা।

আহ্! ভাবনার স্রোত যে বাঁধ ভেঙ্গে ছুটছে। একেবারে তোলপাড় করে তুলছে ভিতরটাকে। রান্নাটা খারাপ করে ফেলবে নাকি।

নাঃ। মনটাকে গুটিয়ে ফেলে স্বপ্না দৃঢ় হাতে। আর যাই হোক রান্নার বদনাম সে সইতে পারবে না।

রান্নায় মন লাগিয়ে স্বপ্না আপাতত আর সব কিছু ভুলতে চায়। তাও কি নির্বিঘ্নে হবার জো আছে? এক ফাঁকে ছেলেটাকে ধুইয়ে মুছিয়ে সাজিয়ে দিতে হয়। নিরামিষ রান্নাটা সবে নেমেছে অমনি বাইরের ঘরে হাঁক-ডাক শুরু হয়।

'ও বৌমা, আমার পুজোর জিনিসগুলো দাওনি কেন? কি যে কর? একটা কাজ যদি ঠিকমতো হয়'—

হাতের কাজ ফেলে লাফিয়ে ওঠে স্বপ্না। শ্বশুরের ফরমায়েস সেরে আসতে না আসতেই শাশুড়ীর গলা বেজে ওঠে বাঁশীর মতো।

'ও বৌমা, তুলসীতলায় আলোটা দেওয়া হয়নি।'

অভিযোগটা আসলে আদেশ। তুলসীতলায় আলো যে কেউ দিতে পারে। কিন্তু এসব তুচ্ছ নির্দেশ তাঁর মেয়েরা কখনো কানেও তোলে না। ওদের মতো উদাসীন এবং কতকটা অবাধ্য হতে না পারায়, উপরন্তু স্বভাবসুলভ হৃদয়বৃত্তি বশত এ সংসারে সকলের ফরমায়েস খাটা যেন স্বপ্নারই জন্যে নির্ধারিত হয়ে গেছে।

রান্নার কাজ এমনি করে চলছে। একে একে মিলির বন্ধুরাও আসতে শুরু করেছে। মিলির বন্ধু সুতপা-শীলারাও পাশ করেছে। সীমার পড়তে পড়তে বিয়ে হয়ে গেছে। কল্পনার পড়াও হয়নি, বিয়েও হয়নি। এবেলা ওবেলা ছোটদের পড়িয়ে কিছু রোজগার করে। ওরা কিন্তু এ বাড়ীর ছেলেমেয়েদের মতো নয়। স্বপ্নাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধাও করে।

সুতপা হেসে বলে, 'কি বৌদি। আমরা তো এসে গেছি খেতে।'

স্বপ্নাও মিষ্টি করে হাসে।

'ভাল করেছ। যিনি খাওয়াচ্ছেন তাঁকে একবার জিজ্ঞেস কর, রান্নার কদ্দূর।'

সুতপা বলে, 'খাওয়াচ্ছেন তো আপনি। মিলি আবার রাঁধতে শিখল কবে?'

কল্পনা হাহা করে বলে, 'একা একা এতো কি করছেন বৌদি? আরে বাস!'

স্বপ্না বলে 'তেমন আর কি? বস ভাই তোমরা। আমার এই হয়ে গেল।'

'না বৌদি। আপনি একা একা খাটছেন। আমার খুব খারাপ লাগছে। আমি একটু সাহায্য করে দিই।'

'না, না। কিছু সাহায্য করতে হবে না। আমার সব হয়ে গেছে। এস তোমরা। মিলি, ওদের ঘরে নিয়ে বসতে দে।'

ওদের হাত ধরে মিলিদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসে স্বপ্না। তারপর দ্রুত হাতে সব গোছাতে শুরু করে। ভোজের খাওয়ার আগে শ্বশুর-শাশুড়ীর আলাদা নিরামিষ আহার চুকিয়ে দিতে হয়। ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়ার আগে দুমুঠো খাইয়ে বিছানায় শুইয়ে আসে। মিলি এসে জানায় নিমন্ত্রিত সবাই এসে পড়েছে। সুতপা, শীলা, মীরা, কল্পনা ছাড়া দুজন ছেলে বন্ধু আছে। তপন আর কৌশিক। খাওয়ার টেবিলে সবাইকে বসানো যাবে না। তাই টেবিলটা সরিয়ে নিচে আসন পেতে সবাইকে বসানো হয়।

ভোজ শুরু হয়। মিলির বি. এ পাশের আনন্দের ভোজ। স্বপ্নার হাতের রান্না এবং পরিবেশন দুটোই পরিপাটি। সবাই বেশ তারিয়ে তারিয়ে খায় আর তারিফ করে।

'চমৎকার রান্না বৌদি।' সুতপার স্বীকৃতি সবার আগে।

'মারভেলাস, মারভেলাস।' সুতপার প্রশংসাকে জোলো করে দেয় তপন। শীলার যেন তাতেও মন ভরে না। সে বাঁ হাতের মুদ্রায় সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে, 'ইউনিক, ইউনিক।' এটাও জুৎসই হল না ভেবে কৌশিক গলা চড়িয়ে বলে, 'সুপার্ব্!'

'ঠাট্টা হচ্ছে?' স্বপ্নার চোখে শানিত কৌতুক।

অমনি প্রতিবাদ একসঙ্গে। 'একটুও নয়।' 'বিশ্বাস কর।' 'সত্যি বলছি।'

স্বপ্না হেসে বলে, 'তা হলে একটা সার্টিফিকেট পেলাম। জীবনে আর কিছু না হোক ভাল একজন রাঁধুনী হতে পেরেছি।'

কিন্তু পরক্ষণেই তার কথা এবং হাসি এক সঙ্গে মিলিয়ে যায়। চোখ এবং মন ভোজনে নিয়োজিত থাকায় কেউই স্বপ্নার মুখের ছবিটা দেখতে পায় না।

শেষ হয়ে যায় ভোজ। হাসি, গল্প, কোলাহল সবই একসময় শেষ হয়ে যায়। সবাইকে বিদায় করে স্বপ্না ফিরে আসে সেই হেঁসেলে। খাবার দাবার যা অবশিষ্ট আছে তাই নিয়ে একা, নিঃসঙ্গ খেতে বসে। দীর্ঘ সময়ের শ্রমে শরীরে ক্লান্তি। খাবারের গন্ধে নষ্ট খিদেটা জানান দিচ্ছে। একটি একটি করে অনিচ্ছার গ্রাস মুখে তুলতে দেরী হচ্ছে। গিলতে আরো সময় নিচ্ছে।

এ বাড়ীর সবকটি মানুষ এখন যে যার ঘরে অথবা শয্যায় গা এলিয়ে দিয়েছে। হেঁসেলখানার সঙ্গে আর কারোর কোন সম্পর্ক নেই। আহারের তৃপ্তি এবং নিদ্রার আবেশ উপভোগ করছে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে। বাইরে ঝিঁঝিঁর ডাকে রাত গভীর হচ্ছে। হঠাৎ অবাধ্য দুফোঁটা জল একেবারে চোখের কোল টপকে খাবারের থালায় এসে পড়ে। আত্মবিস্মৃতির কোন ফাঁকে কতদিনের নিরুদ্ধ অভিমান জমাট বেঁধে ছিল আজ বুঝি তা প্রকাশ পায় চোখের জলে। মুখের গ্রাস তুলতে তুলতে স্বপ্না ভাবে, মিলির বি. এ পাশের ভোজ খাচ্ছে সে। একা একা। নিজের হাতের রান্না ভুক্তাবশেষ। বি. এ তো স্বপ্নাও পাশ করেছিল— কবে যে করেছিল, আজ আর যেন তা মনেও পড়ে না।

বজরা

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

পঞ্চাশ বছর আগে হলে দেখা যেত এই বজরাখানারই গমক কত। ঝাড় লণ্ঠনের নীচে ফরাস বিছিয়ে সারেঙ্গীর উপর ছড় টানতো বড়ে মিঞা। হারমোনিয়মের বেলো ছেড়ে দিয়ে ফাঁক বুঝে আতর মাখা পান তুলে নিত রূপলাল। রূপোর থালা সামনে মেলে ধরে রূপসী বাঈজীব বাতাস মাতাল করা গান শুনতে শুনতে মেজকর্তা চেঁচিয়ে উঠতেন— কেয়াবাত্ কেয়াবাত্। ফুলবাঈ মেরি জান্। হাঁ হে ওস্তাদ, অমন মিইয়ে পড়ছ কেন? সরাব টরাব ছোঁও না, শেষটায় বেলাইন পাকড়ে বসলে— আঁ? তারপর টুকরো টুকরো হয়ে ভেসে যেত হাসির লহরা।... কোমরে কানি গোঁজা ক্ষুদে ক্ষুদে জানোয়ারগুলি গেমো বনের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত— মেজকর্তা চলেছেন।

সেই মেজকর্তাও নেই, বজরাখানার ঠাটঠমকও ঘুচে এসেছে। গলুইয়ের সামনে পেতলের কাজ করা সিংহ মূর্তিটা চটা উঠে উঠে তেকোনা বল্লমের ফলাব মতো আজও উঁচিয়ে আছে। কাঠের গায়ে সোনার জলের কাজ করা নগ্ন নারী-চিত্রগুলিকে আর আর বলে না দিলে চিনবার উপায় নেই। বজরাখানার সর্বাঙ্গ ছেয়ে আছে অজস্র এবড়ো-খেবড়ো চল্‌টায়। রক্তদুষ্ট কোন রুগীর মতো যেন।

আনন্দ চাটুয্যে বললেন, "কত আব শুনবে। বলতে বলতে এক রামায়ণ মহাভারত হয়ে যায়। কি ছিলো আর কি হলো। বাঈজী আর সরাব, সরাব আর বাঈজী। আট নম্বর ঘেড়ির ঠিক মুখটায় কতবার যে লাস টেনে বার করল পুলিশ কে অত লিখে জুখে রাখে। পড়ে-পাওয়া বাপের সম্পত্তিতে মেজকর্তা ফূর্তি কবেই কাটিযে দিতে পারতেন, কিন্তু লছমী বিবির বিষচক্করে ফেঁসে গেলেন শেষটায়। সেইটাই হলো তার কাল। তিন তিনটে খুনখারাবি কবে লট্‌কে গেলেন পুলিশের জালে। শুনতে পাই একা টমাস দাবোগাই পঞ্চাশ হাজার রূপোর চাক্তি খেয়েছিল। রাঘব বোয়াল থেকে কৈ-খল্‌সে সবাইকে আক্কেল সেলামী দিয়ে জাল ছিঁড়ে মেজকর্তা বেরুলেন। কিন্তু সেই বেরুনোই তার শেষ বেরুনো। কেউ কেউ বলে মেজকর্তা সন্ন্যাস নিয়েছেন. কেউ বলে সোনা দলুইয়ের বল্লমের খোঁচায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

সোনা দলুই কে?

বজরাখানা দুলে দুলে চলছিল। ভারী গমকী চালে। হারিকেন উস্কে দিয়ে আনন্দ চাটুয্যে হাঁক দিলেন 'ও বিপিন তেল ভরিসনি হারিকেনে। নবাব চৌকিদার হয়েছিস দেখছি। হারামজাদা তেল ভরে দে।'

দবজা ঠেলে ঠেলে ভেতরে ঢুকল বিপিন চৌকিদার।

হ্যাঁ, সোনা দলুই? আরে মাস্টার ও অনেক কথা। সোনা দলুইয়ের বাপ ছিল এ তল্লাটের জবরদস্ত লেঠেল। লুটের মাল বেচে আটশ টাকা নগদ ঢেলে সোনার কালীমূর্তি বানিয়েছিল। কে বানিয়েছিল জানো তো— বৌবাজারের হীরেন কর্মকার। অনেক দিনের কথা। কেউ কেউ বলে প্রথম পুজোয় নাকি নরবলি দিয়েছিলো লোকটা। অত না হোক লোকটার ক্ষমতা ছিল। সারা তল্লাটখানা কাঁপত ওর ভয়ে। আটটি রাখ্‌নি পুষে কলকাতার ব্র্যাণ্ডী হুইস্কী

আনিয়ে লোকটার শেষ দিনগুলো ভালোভাবেই কাটছিলো. কিন্তু বুড়ো হাড়ে কি যে নেশা লাগল, নজর পড়ল মেজকর্তার বাঈজী লছমী বিবির ওপর।

বাঘের খাঁচায় হাত ঢুকিয়ে বাঘের মুখ থেকে খাবার টেনে আনা সইবে কেন? বুড়ো গুম্. হলো। সাত দিন পরে লাস যখন ভাসল, তখন আর কেউ না চিনুক সোনা দলুই চিনেছিলো ঠিক। বাপ্‌কা বেটা।

বুকের পাটা ছিলো একখানা।

বিপিন চৌকিদার আলো দিয়ে গেল। তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে রূপো বাঁধানো সাবেকী কালের গড়গড়ায় গুড়ুক গুড়ুক করে কয়েকটা টান দিলেন আনন্দ চাটুয্যে।

বাইরে আলকাতরার মতো গাঢ় অন্ধকার। ভূতে পাওয়া স্তব্ধ দু' পাশের গেমো বনগুলি। নদীর জল বজরার গা চাটতে চাটতে চলেছে। আকাশের তারার মতো জোনাকীগুলো চিকমিক করে জ্বলছে আর নিভছে। কত রাত? ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলাম সবে সাতটা।

'কিছু দিনের মধ্যেই মেজকর্তার বড় ছেলে বিলেত থেকে ফিরলেন।' আনন্দ চাটুয্যে আবার টানলেন গল্পটা। 'আশ্চর্য! বরানগরের বাগান বাড়িতে ফুলেব জলসা বসল না। বজরা ভাসিয়ে বাঈজী নিয়ে গোলাপ জলের হোলি খেলল না শ্রীমান চঞ্চল বসুরায়। রায় ফ্যামিলীর হীরের টুকরো ছেলে। চঞ্চল বললে কেউ চিনবে না ওঁকে। সবাই ওঁকে ডাকত বড় সাহেব। বিলিতি বিলিতি গন্ধ থাকত এই ডাকটায়।

লঞ্চ সিণ্ডিকেট তখন সবে হয়েছে। তিনটে স্পীড বোট কিনে ফেললেন বড় সাহেব। মাছ ধরার তদারকে লাগিয়ে দিলেন ও-সব। নিজে এসে ধান কাটার দু' চার মাস এই আবাদে পড়ে থাকতেন। দু' হাতে টাকা ছড়িয়ে প্রজারঞ্জন করতেন। সরাব ছুতে কেউ আমরা দেখিনি ওঁকে। কিন্তু— গড়গড়ায় আবার দুটো টান দিলেন আনন্দ চাটুয্যে। আগুন চলকে উঠল কলকেয়। হালের ঘর্ষণে মিহি সুরে শব্দ উঠছে একটা। আর সাথে সাথে চাবটে দাঁড়ের ভারী ভারী শব্দ ঝপ ঝপ, ঝপ ঝপ। তাকিয়ে দেখলাম আনন্দ চাটুয্যে এখন আর শুধু ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট নন, এ আনন্দ চাটুয্যের রূপ আলাদা।

পঞ্চাশ বছর আগেও এমনি করে শব্দ হতো দাঁড়ের। আজও সেই একই শব্দ। বিরামহীন সময়ের তালে তাল দিয়ে চলেছে। বোধ হয় এই শব্দটার সাথেই তাল রাখতে পারেননি মেজকর্ত্তা। হার স্বীকার করে পালিয়ে গেছেন বড়সাহেব। পালিযে যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে বসুরায ফ্যামিলীর সম্রাটকুল। জমা আছে, জমি আছে, কি নেই তবে? বুঝে উঠতে পারেনি কেউ। আজ এসেছে পি ইউ বি আনন্দ চাটুয্যের মরসুম। কিছু কিছু আমি আগেই শুনেছিলাম। শুনেছিলাম বলেই গল্পটা আমার কাছে অসত্য মনে হচ্ছিল না।

কি হে মাস্টার, অমন গুম্ মেরে গেলে কেন? ভাল লাগছে না বুঝি? ওরে বনশী, রাত ভোর করবি নাকি? জোরে জোবে টান।

না না বেশ লাগছে তারপর বলুন।

বেশ লাগবেই। আবাদের ইতিহাস কেউ যদি লিখত নাম করে ফেলত। যাক শোনো। বড় সাহেবের কীর্তিটাই শোনো। ভালোই গুছিয়ে গাছিয়ে বসেছিলেন বড় সাহেব। দুটো টিউবওয়েল বসালেন। ঢেড়া পিটিয়ে লোভ দেখিয়ে হাট খোলাটাও বসালেন। লেখালেখি করে লঞ্চ আনালেন কুমীরখালির রাস্তায। এ রাস্তায় না হলে লঞ্চ আসে? ঘাটা দিয়ে দিয়ে লঞ্চ কোম্পানী পাততাড়ি গোটাতো করে, কিন্তু বড় সাহেবের নজরানাই টিকিয়ে রাখল শেষতক্।

সেই বড় সাহেবও সাপেব লেজে পা দিয়ে বসলেন একদিন। হীরা প্রধানের বউটার দিকে নজর ফেললেন। বউটাও ছিল অপরূপ। প্রধানের ঘবে কি করে যে অমন গোলাপ ফুল ফুটেছিল কে জানে। সাবান তেল গায়ে পড়লে না জানি কি হতো! বউটাকে ছিনিয়ে এনে কাছারী বাড়িতে তুললেন বড় সাহেব।

তারপর দিন দুই পেরুতে না পেরুতে রক্তারক্তি কাণ্ড। বোষ্টমপাড়ার পুব দিকের চকে ঘোড়া নিয়ে বড় সাহেব বৈকালিক ভ্রমণে বেবিয়েছিলেন। ঘোড়া সমেত উলটে পড়লেন, মই না দেওয়া মাটির ডেলায়।

কিন্তু কি জানো মাস্টার, ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ার ছেলে বড় সাহেব ছিলেন না। এ-সবই হীরা প্রধানের কারবার। লোকটা তলে তলে গ্রামটাকে উস্কে রেখেছিল।

বড় সাহেবের বুড়ো মা রাণীবিবি খবর পেয়ে ছুটে এলেন। বড় সাহেবকে নিয়ে গেলেন কলকাতায়। তারপর থেকে কলকাতার সিংহাসনে বসে রাজকার্যের ভার নিলেন রাণীবিবি। লেঠেল নিয়ে নায়েব গোমস্তাই দেখাশুনা করতে লাগলো জমিদারি।

আর এই জানোয়ারগুলিরও গোঁ বলিহাবি। যে ভাববে তা করবেই। তবে আমার কাছে, বুঝলে মাস্টাব, ঢিট্ হয়ে গেছে ব্যাটারা। সকাল বেলা বিষ্টু নাপিতের কাণ্ডখানা দেখলে তো। এক মুঠো ধান চুরির দায়ে কি মাবটাই না খেল বিপিনের হাতে। আমি ছিলাম সামনে, ব্যাটা চুপ। যাবার বেলা পায়ের ধুলো জিভে ছোঁয়াতেও ভুলল না। মার খেয়ে খেয়ে এখন ওদেব শুয়োরের গোঁ কমেছে। দু'দিন থাকো সব দেখবে মাস্টার, সব দেখাবো।

কথায় কথায় কখন যেন নিজেব প্রসঙ্গে এসে পড়েছিলেন আনন্দ চাটুয্যে। সামলে নিযে হেসে উঠলেন। হাসিতেই তাঁর ব্যক্ত হয়ে উঠল আর এক অধ্যায়। ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করি, তারপর?

তার আগেই আনন্দ চাটুয্যে শুরু করলেন, 'হ্যাঁ যা বলছিলাম।' বলতে বলতে আবার তিনি থামলেন। রূপোর পাতমোড়া নলে টান দিয়ে বুঝলেন আগুন নিবে গেছে কলকেয়। ইতিহাসের স্তূপীকৃত জঞ্জালের মধ্যে হাবিযেই গিয়েছিলেন আনন্দ চাটুয্যে। চীৎকার করে উঠলেন 'এই শালা শুযোর বিপিন, তামাক দিযে যা।'

বিপিন ভেতবে ঢুকল।

টং হয়ে ঘুমুচ্ছিলি বুঝি? সামলে না চলতে পারিস গিলিস কেন অতো? শুয়োর কোথাকার।

আমি বললাম, বজরার কি হলো বলুন?

হ্যাঁ বজরা। কি বলব মাস্টার, এই যে জানোয়ারগুলি দেখছ—। বিপিন তার পোকায খাওযা দাঁতগুলি বের করে আত্মতৃপ্তিব হাসি হাসল। এগুলির স্বভাবই হযে গেছে বিটকিলে ধরনের। কেবল ছুঁক ছুঁক কোথায় মদেব আড্ডা, কোথায খানকিব বাড়ি। আর বলো না মাস্টার, মেজাজ খিচড়ে দিযে যায়।

বজরাখানা ককিয়ে ককিয়ে চলেছে।

পি ইউ বি আনন্দ চাটুয্যে আবার শুরু কবলেন, হ্যাঁ বজরাখানার আদর বড়সাহেবও কম করেননি। ইয়ার বন্ধুদের সাথে বন্দুক নাচাতে নাচাতে বজরা চলত সুন্দরবনের দিকে। বজরাতেই রান্না হতো, কলকাতাব খানসামাব হাতে রান্না, মানিকজোড়ের তুলতুলে মাংস, পোলওয়া। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। বড় সাহেব কলকাতার মিস্ত্রি এনে বার দু তিন সারাইও করলেন বজরাটা। বছব বছর গাব খাওয়ালেন। বাপের সখের বজরা, ছেলে তার অসম্মান করেনি কোন দিন।

তারপর?

হয়ত আনন্দ চাটুয্যে আরও অনেক কথাই বলতেন। এই একখানা বজরাকে কেন্দ্র করে কয়েক পুরুষের চটকদার ইতিবৃত্ত। কিন্তু একটা ঝাঁকি দিয়ে বজরাটা থেমে গেল।

'কোথায় এলাম রে বিপিন?'

অন্ধকারেব মধ্যে ভাল করে নজরে আসে না। 'বড় নদী ছাড়িযে একটা খালের মুখে এসে দাঁড়িয়েছি বোধ হয়।

বিপিন বলল, 'বউকাটার মুখে।'

'বউকাটা খাল' নামটা শুনলেই বইয়ে পড়া উপন্যাসের মতো মনে হয়। জমাট বাঁধা অন্ধকারের মধ্যে এই খালটা ভাল করে নজরে আসে না। দু' পাড়ে বসতি, কিছু কিছু জঙ্গল আর ক্ষেত—শাকআলু তরমুজ, মুলো কপির হবে হয়ত।

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল বিপিন। 'বউ-কাটার মুখে এলাম বড়বাবু।'

'তা থামলি কেন?' বড়বাবু অর্থাৎ আনন্দ চাটুয্যে উত্তর করলেন আমিরী চালে। 'এসেছে বুঝি শুয়োরটা।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ দেখা করতে চায়।'

'দেখা করে কি করবে? না না ভাগিয়ে দে হারামজাদাকে। যত সব ন্যাকা চৈতন।'

'বজরায় উঠে পড়েছে বড়বাবু।'

'উঠে পড়েছে, তবে আর কি নাচি। আচ্ছা ডাক শালাকে।'

বিপিন চলে গেল। আনন্দ চাটুয্যে বললেন, 'লোকটাকে দেখে রেখো মাষ্টার।'

পাথুরে কয়লার মতো কালো বিরাট লোকটা বজরার মধ্যে ঢুকল। তারপর টান টান হয়ে বড়বাবুর পায়ে হাত ছুঁইয়ে গড় করল।

চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে বয়সের। শ্লথ শিরাগুলো যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে লোকটাকে। গায়ে একটা আধ ময়লা ফতুয়া। পরনে দেশী তাঁতিদের হাতে বোনা ধুতি। কিন্তু চোখ দুটো দেখলে চমকে উঠতে হয়। অস্বাভাবিক। কাচের গুলির মতো টকটকে লাল রংয়ের। গন্ধটাও পাচ্ছিলাম।

লোকটা বাদী না আসামী বোঝা দায়।

'কি চাস বল?' আনন্দ চাটুয্যে কথার ঝাঁজে বিরক্তি প্রকাশ করলেন।

'আপনি মা বাপ বড়বাবু। চিরকাল ছেলের দিকে তাকিয়েছেন, আজ আমার'- –বলতে বলতে লোকটা পাকা অভিনেতার মতো কেঁদেই ফেলল।

বাইরে অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়ে রইলাম।

'কান্নাকাটি ছেড়ে নথিপত্র কি এনেছিস দেখা। এক একটা কাণ্ড করে বসবি আর মাপও চাইবি সাতখুনের। আবাদে আর টিকতে দিবি না দেখছি। বুঝলে মাস্টার পি ইউ বি হয়ে এক দিকদারিতেই পড়েছি।

দিকদারিটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন না আনন্দ চাটুয্যে। লোকটা ড্যাব-ড্যাবে চোখ তুলে তাকাল আমার দিকে। বড় অস্বস্তিকর সেই চাউনি।

আবাদ পত্তনের ইতিহাস ক'দিনেরই বা হবে। ষাট-সত্তর বড়জোর একশ-দেড়শ। বসুরায়ের আবাদ একশর ওপারে যায়নি। দানা বাঁধা উপনিবেশ তারও কম। পঞ্চাশ ষাট কি আর কিছু বেশী। অর্থাৎ পুরুষ দুই কেটে গেছে মাত্র। কিন্তু কি বিস্ময় এই আবাদের মাটিতে। এক হাতে নদীকে দাবিয়ে রেখেছে আবাদের মানুষ, আর একহাতে কচলে চলেছে খুন-রাহাজানি, জমিজমার দাঙ্গা, মদ মেয়েমানুষ। অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়ে থেকে বার বার আমার সে কথাই মনে হচ্ছিল। এই আবাদে মেজকর্তা টিকলেন না, বড় সাহেব পালিয়ে গেলেন, দুর্ভেদ্য লোহার প্রাচীর গড়েও রাণীবিবির হয়রানির একশেষ। নায়েব, গোমস্তা, লেঠেল, থানা, পুলিস অনেক হল, পি ইউ বি হলো, তবু যেন কি হচ্ছে না।

আমি চমকে উঠেছিলাম প্রায়। বজরাখানা ভারিক্কি চালে দুলে দুলে চলছিল আবার। বউকাটা খালের জল ক্লান্তিতে যেন নীরব হয়ে ঘুমুচ্ছিল। নাকের ডগায় চশমা তুলে বড় সাহেব খুঁটে খুঁটে দেখছিলেন লোকটার কাগজপত্রগুলি। লোকটার দু চোখ জোড়া আকুতি।

এমন সময় ভূত দেখার মতো আমি চমকে উঠলাম। খালের পাড়ে বড় বড় চার পাঁচটা ঝোঁপ-বাঁধা তেঁতুল গাছের ফাঁকে দুটো নিশ্চল মূর্তি যেন এ দিকেই তাকিয়ে আছে। বোধ হয় দেখছে, 'পি ইউ বি চলেছেন।' এই বজরায় বাঈজীর আসর দেখে ওরা বুঝত মেজকত্তা চলেছেন, এলোপাথারী বন্দুকের ফুটফাট শব্দ শুনে ওরা বুঝত 'বড় সাহেবের বজরা।' বজরাটা ওদের কাছে যেন চিরকালের বিস্ময়।

কিন্তু লোক দুটো অমন ছুপ ছুপ করে চলেছে কেন? গা ঢেকে ঢেকে। বজরাটাকে লক্ষ্য করে করে।

'কি হে মাস্টার, অতো কি খুঁজছে, অন্ধকারের মধ্যে, কাউকে দেখেছ নাকি?' যেন আনন্দ চাটুয্যে জানতেন কেউ এমন বজরা লক্ষ্য করতে করতে এগোবে সাথে সাথে।

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, দুজন লোক মনে হচ্ছে, বুঝতে পারছি না তো?'

হেঁ হেঁ হেঁ। রাশভারী আমিরী হাসি হাসতে হাসতে বড়বাবু বললেন, 'কি নাম রে হরিশ?'

হরিশ অর্থাৎ সে বুড়ো লোকটা বললো, 'বাতাসী আর বুনো।'

হ্যাঁ বুনো সর্দার আর বাতাসী। এই কেসটার বাদী।

বাদী? বাদী কেন অমন আত্মগোপন করে চলেছে। অবাক লাগল ঘটনাটা। বড় সাহেব বললেন, যাও না ছাদের উপর বসে লক্ষ্য করগে অনেক কিছুই আরো দেখতে পারো। আমি এই কাজটা সেরে ফেলি। রিপোর্টটা ভেবেচিন্তে করতে হবে। বড় গোলমেলে হে মাস্টার। ফিরবার পথে সব বলব।

হাঁপ ছেড়ে বজরার বাইরে এসে দাঁড়ালাম। আঃ ভারী মিষ্টি বাতাস।

আট দাঁড়ের বজরা। চার দাঁড়ে টানছে। পাটাতনের উপর পা ছড়িয়ে বসে কালো কালো মূর্তিগুলো তালে তালে দাঁড় ফেলছে জলে। আর সাথে সাথে শব্দ বেরুচ্ছে হাপুস হাপুস।

বিপিন চৌকিদার বজরার ছাদের উপর বসে বিড়ি ফুঁকছিল আয়েসে। আমাকে সতরঞ্চি পেতে বসতে দিলো। 'বসুন মাস্টার বাবু।'

উঠে বসলাম।

বউকাটা খালের যে ইতিহাস বিপিন বললো, তাতে চমকে উঠতে হয়। খালটা কেটেছিল সোনা দলুই। বাপের মতন রাখ্‌নি পোবেনি সোনা। বে' করেছিল একটাই। বাঁজা বউ। বাপের কুকীর্তির প্রায়শ্চিত্ত হলো যেন বউটা। মানসিক করল সোনা, পুজো দিল, কলকাতার ব্যান্ডপার্টি এনে, পঁচিশ হাত লম্বা কালী গড়ে সাতরাত উপোস করে জব্বর পুজো। পুজোর শেষে আদেশ পেল সোনা। এক ছেলের মায়ের, না না এয়োতি, লক্ষ্মীমন্ত বউ হওয়া চাই, এক ছেলের মায়ের রক্ত মাটিতে ছুঁইয়ে দশ মাইল লম্বা পঁচিশ হাত চওড়া খাল কাটা চাই। তাই করল সোনা। পুলিস বলল, খুনখারাবি হয়নি। লোকে বলে, বউকাটা খাল। খালটা আজ ছড়িয়ে গেছে পঞ্চাশ হাত। অপুত্রক বউরা আজো এর মাটি ছুঁয়ে আকুলি-বিকুলি হয়ে কাঁদে। ঝাঁপিয়ে পড়ে খালের জলে অবগাহন করে। বউকাটা খালের মিষ্টি জলে একটু একটু করে নোনা জল মেশে।

হাল টানছিল বিশ্বম্ভর। বলল, 'সোনা দলুই এখানে তার অঢেল সম্পত্তি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলেছিল। এখনো এই খালের নিচে মাটি খাবলালে সোনার ঘড়া পাওয়া যায়।'

বনশী দাঁড় থামিয়ে বলল, 'সোনার সিন্দুক উঠেছিল একবার। থানার বড় দারোগা সিন্দুকটাকে কোলকাতা চালান করেন। তাছাড়া হাতাখুন্তি কড়াই নজর রাখলেই পাওয়া যায়। তবে কেউ ওসব ছোঁয় না।

লোক দুটোকে আবার দেখা গেল। গর্জন গাছের ফাঁকে টুক করে আবার দুটো ক্ষুদে দৈত্য গা ঢাকা দিল।'

বিপিন বলল, 'ওরাই বাদী।'

'বাদী, তবে পালিয়ে বেড়াচ্ছে কেন?'

'পালানো নয় মাস্টার বাবু তক্কে তক্কে আছে। হরিশ উঠেছে বজরায়। কি জানি কেসটা কি হয়ে যায়। তাই ভয়।

—তা, ওরাই তো দেখা করতে পারতো আগে।

—হে হে মাস্টার বাবু নেড়ে ন্যাংটার বুদ্ধি। চাষাভুষো লোক, মাটিই চেনে। আটঘাট জানবে কোত্থেকে। কেস করতে হয় দিল করে, এখন বুঝছে তার ঠেলা।

—ভাগ চাষের খামার নিয়ে কেস নয়। কেস ভিটে উচ্ছেদের।

জিজ্ঞেস করলাম, 'হরিশ লোকটা কে হে?'

'হরিশ?' বিপিন আর একটা বিড়ি ধরাবার জন্য দেশলাই খুঁজতে লাগলো। বিশ্বম্ভর ট্যাক থেকে দেশলাইটা ছুঁড়ে দিয়ে বললো, একটা টান দিয়ো বিপিনদা। তুমি সেই থেকে তিনটে ফুঁকলে।

বিপিন বললো 'চল্ না হরিশের বাড়ি সিগ্রেট ফুঁকবি আজ। হরিশ আজ সিগ্রেট ছড়াবে। হ্যাঁ হরিশ কে জানেন মাস্টারবাবু, এই কেসের আসামী। টাকার কুমীর। ওর বাড়িটা দেখলেই তা বুঝবেন। চৌহদ্দির চারদিকে খামার। গোলা আছে অগুনতি। ছোটয়-বড়োয় অনেকগুলি। গোয়াল আছে পর পর তিন সার। তা ছাড়া আম কাঁঠাল তেঁতুল অজস্র। এক একটা গাছে হেসে খেলে খান কয়েক চিতা সাজিয়ে ফেলা যায়। লেখালেখি করে হরিশ হালে বন্দুক পর্যন্ত আনিয়েছে। টিউব-কল পুঁতেছে গোটা কয়েক। আত্মীয় কুটুম্বও কম নেই হরিশের। এবেলা ওবেলা মিলে শ' আড়াই পাত পড়ে। কলকেয় তামুক পোড়ে দু' দশ সের তো বটেই।'

এত ধনী!

'অথচ লেখাপড়া না শিখেও কলমবাজি করেই খেয়ে যাচ্ছে হরিশ।'

'সে কি হে মুখ্যুর আবার কলমবাজি?'

এঁজ্ঞে, বি এ পাশ মুহুরী আছে ওর। উকিল আছে আলিপুরে। হরিশকে দেখলে সবার কাজ ফেলে দিয়ে বলে, 'হরিশ যে, আবার কি হল?'

হরিশের কাজই করে সবার প্রথম।

বিপিন আরো বলতে যাচ্ছিল। বিশ্বম্ভর বললো, 'এই মোড়টা পেরুলেই হরিশের ঘাট।'

চকিতে আবার সেই লোক দুটো। বিদ্যুতের মতো আর একবার ঝিলিক দিয়ে মিলিয়ে গেল ঘন জঙ্গলের মধ্যে।

জমাটবাঁধা অন্ধকার ভেদ করে কয়েকটা লণ্ঠন এসে জমা হল ঘাটে। আর সেই সাথে বেশ কিছু লোকের গলার স্বর।

দাঁড়ের ফেসোগুলি খুলে ফেলতে লাগল মাঝিরা।

তর তর করে জল কেটে তবু এগিয়ে চলেছে বজরাখানা। হাল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঠিক ঘাটের গায়ে এনে হাঁক দিল বিশ্বম্ভর 'ঘাট ধর, ঘাট ধর'।

ঘাট ধরল বনশী। বজরার গতি আটকাবার চেষ্টা করল দু বাহুর জোরে। যেন মাহুত তার বিরাট হাতীকে হাঁটু গেড়ে বসবার আদেশ করছে। তাজ নামাও, সম্রাট নামবেন।

সম্রাট আনন্দ চাটুয্যের ভারী গানবুট শোনা গেল। পাটাতনের উপর শব্দ হলো বিশ্রী রকমের।

আগে আগে বেরুল হরিশ। সাবেকী কালের ফরাসখানা বিছিয়ে দিলো পাটাতনের উপর। ভেতর থেকে তাকিয়া দুটো এনে তার উপর পেতে দিল লখা। বিপিন ত্রস্ত হয়ে কেবল ভেতর বার করছে। কোথাও কোন ত্রুটি হয়ে যাচ্ছে কি না কে জানে। তাকিয়ে দেখলাম অদূরেই সেই দুর্গের মতো বাড়িখানা। হরিশের বাড়ি। লম্বায় চওড়ায় এত বড়

বাড়ি এ অঞ্চলে আর দেখেছি বলে মনে পড়ে না। মেটে দেওয়ালে নানা রংয়ের চিত্রিবিচিত্রি। এত দূর থেকে ভালো নজরে আসে না। তবু বুঝতে কষ্ট হয় না ওগুলো নিশ্চয়ই ফুল লতাপাতারই হবে। মামলাবাজ হরিশের বুকের মধ্যে ফুলপাতারও একটু স্থান আছে ভাবতে বেশ লাগে।

বিরাট উঠোনের ঠিক মাঝখানে তুলসী মঞ্চ। তারই একপাশে খড় বেরিয়ে পড়া মকর মূর্তিখানা। বুঝতে কষ্ট হয় না এটা হরিশের বাইবের বাড়ি।

আনন্দ চাটুয্যে বজরার ভেতব থেকে বাইরে এলেন। তারপব হাঁক দিলেন, 'কি হে মাস্টার এস। বস এখেনে।' তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসলেন উনি। আমিও বসলাম সঙ্কুচিত হয়ে ওরই পাশে। লোকগুলো বড় বড় চোখে তুলে তাকিয়ে আছে আমারই দিকে বোধ হয়।

ঘাট থেকে কেউ কেউ উঠে এল বজরায়। তারপর কথার জঞ্জালের মধ্যে কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা অসত্য খোঁজাখুঁজি চলতে লাগলো।

আমি খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম সেই তক্কে থাকা লোক দুটোকে।

কিছুক্ষণের জন্য হরিশ উধাও হয়ে গিয়েছিল। ফিরে এসে আনন্দ চাটুয্যের পা ছুঁয়ে বলল, 'বড়বাবু আমার মেয়ের অনেক দিনের সাধ—'

বাকীটা যেন বুঝিয়ে দিতে হয় না। বড়বাবু—অর্থাৎ আনন্দ চাটুয্যে বললেন, কোথায়? নিয়ে আয়।'

অল্প বয়স। মাথায় ঘোমটা টেনে কাঁপতে কাঁপতে এলো: হরিশের মেয়ে। হরিশ নাম বলল, কুমুদিনী। শ্বশুর ঘর থেকে ফিরেছে, মাসখানেক থাকবে।

কুমুদিনী পা ছুঁয়ে প্রণাম করল আনন্দ চাটুয্যের।

'কল্যাণ হোক।'

দুথালা ভর্তি শাকআলু আর কাটা ফল এলো। এলো কাচের গেলাসে চা।

হরিশ বলল, 'কুমুদিনী কিছু প্রণামী দিতে চায় বড়বাবু।'

'না, না প্রণামী কি হবে।' আনন্দ চাটুয্যে তাকালেন আমার দিকে। আমি সেই তক্কে তক্কে থাকা লোক দুটোকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। নাঃ, ধারে কাছে নেই ওরা। কোথায় যেন অন্ধকারের ভিড়ের মধ্যে হারিয়েই গিয়েছে। হুইস্কির বোতলটা আঁচলের ভাঁজ থেকে ধীরে ধীরে বার করল কুমুদিনী। ঘোমটাটা খোঁপায় এসে আটকে পড়েছে ওর। ফাঁপা নাকের পাটায় নথটা হারিকেনের আলোয় চিকচিক করে উঠল। মনে হল যেন একটা তক্ষক ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে সামনে। সুডৌল হাত মেলে বোতলটা এগিয়ে দিতে গিয়েছিল কুমুদিনী।

আনন্দ চাটুয্যে আমার দিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হেসে বললেন, 'দেখলে তো মাস্টার। শালারা ভাবছে আমিও বুঝি পুলিশ দারোগার মতই মদ খাই। ওষুধ হিসেবে করে একটু খেতে দেখেছে। ও হরিশ, রাত বাড়ছে, ফিরতে দিবি না বুঝি?'

'এঁজ্ঞে।' হাত কচলাতে কচলাতে হরিশ বলে, 'এস গো কুমুদ। বাবুর রাত বাড়িয়ো না।'

হারিকেন নাচাতে নাচাতে কুমুদিনী বজরা থেকে ঘাটে নামল। ঘাট থেকে পাড়ে। তারপর মেঠো পথ ধরে সটান দুর্গাটার দিকে।

আবার বজরা ছাড়ল। গুন টেনে এগিয়ে নিয়ে চলল বজরাকে আরো কয়েক শ' গজ ভিতরে।

এখানে ঘাট নেই। গ্রামের শেষ প্রান্ত। বড়বাবু জিজ্ঞেস করলেন 'বাদীর কি নাম যেন হরিশ।' কিছুতেই মনে থাকে না।

হরিশ বললো—বুনো সর্দার আর বাতাসী।

বুনো আর বাতাসীকে এবার দেখলাম। নিজের ভিটের উপর দাঁড়িয়ে: ছোট্ট গোল পাতার ছাউনী দেওয়া ঘরটা ভেঙে তছনছ হয়ে আছে একপাশে।

মনে হ'ল বর্বরতার চূড়ান্ত সাক্ষ্য।

আমরা পৌঁছুতেই বজরায় লাফিয়ে উঠল মেয়ে মবদে। — এ জমি আমার বাবা। ওদের দিস নি বাবা। কোথায় দাঁড়াব গো—বাবা—। হরিশের হাতে একটা হারিকেন দুলছিল বজরার দুলুনিতে। দৈত্যের মতো ওর বিরাট ছায়াটা কাঁপতে লাগল বউ কাটা খালের জলে।

জরিপ করা হোল চৌহদ্দি। খাতায় অনেক কিছু নোট টোকা হলো। সব কাজ চুকিয়ে বজরা ছাড়তে ছাড়তে রাতও হলো অনেক। হাতঘড়িতে তাকিয়ে দেখলাম—বাত দশ'টা।

বজরা ছাড়ল।

আনন্দ চাটুয্যে বললেন, 'ভিতরে গিয়ে কাজ নেই, এখানেই বসি। কি বল মাস্টাব। গড়গড়ায় গুড়ুক গুড়ুক করে টান দিতে লাগলেন।

আচ্ছা কি বুঝলে বল তো? দেখলে তো আসামীর চোট কতটা। এদেশে সব হয়। মেজকর্ত্তাই বল, আর বড় সাহেবই বল কিংবা তোমার রাণীবিবিই হোক না কারো ক্ষমতা নেই এদেশে সুবিচার করার। এই হবিশকে দেখলে তো কেমন জাল দলিল তৈরি করে সামলে নিচ্ছে, ভাব দেখি।

সে কি? আপনি বাদীকেই শাস্তি দেবেন? দলিল-পরচা নকল করা আসামীকে ঝুলিয়ে দিন।

দিয়ে লাভ? তোমাদের মাথায় অত ঢুকবে না মাস্টার। তোমরা এ লাইনে নেহাৎ ছেলেমানুষ। আমি না হয় বাদীকে জিতিয়ে দিলাম আমার ইউনিয়ন বোর্ডের কোর্টে। কিন্তু হরিশ আমায় কলা দেখিয়ে উপরে যাবে। লাভ কিচ্ছু নেই।

'তা হলে অত খেলাবারই বা কী দরকার ছিলো?'

'হরিশের কথা বলছ? বড় মাছ না খেলালে ওঠে না।' আনন্দ চাটুয্যে আড়চোখে আমায় দেখলেন।

বজরাখানা এগিয়ে চলেছে বড়নদীর দিকে। দাঁড়ের ভারী ভারী শব্দে বাতাস ঘুলিয়ে উঠছে। হঠাৎ আমার নজরে পড়ল রসালো আঙুরের ছবিআঁকা লেবেলের সেই মদের বোতলটা পাটাতনের উপর বজরার দুলুনির সাথে অস্থির হয়ে দুলছে।

আজ পঞ্চাশ বছর পরেও বজরার গমক যেন একটুও কমে নি।

অরণ্যের স্বপ্ন

সৌরি ঘটক

বাংলা দেশের দক্ষিণ প্রান্ত।

সমুদ্রের ধার।

সুন্দরবনের নিবিড় অরণ্য। ...

তার শাখা-প্রশাখার জটাজালে এক অন্ধকার জগৎ রচনা করে রেখেছে।

তারই এক প্রান্তে একদল আত্মগোপনকারী মানুষের ছোট্ট সমাবেশটা সেদিন সকালে এক তীব্র মতবিরোধে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

এই মাত্র খবর এসেছে সাতদিন আগে জমির ধানের উপর হামলা রুখতে গিয়ে মিলিটারির হাতে ধরা পড়া বাইশ বছরের মেয়ে পাখীকে কাল আবার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গিয়েছে গাঁয়ের কাছে। তাকে বাঁচাতে হলে সেখান হতে অবিলম্বে সরিয়ে আনা দরকার।

খবর শুনেই কৃষক সমিতির সেক্রেটারি ত্রিপুরারি মণ্ডল পাখীর স্বামী গুণধরকে আদেশ দিয়েছিল তাকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে। কিন্তু তার শ্বশুর হরিপদ তীব্র আপত্তি করেছে এই সিদ্ধান্তের,—এখানে আনা চলবে না। অন্য কোন গোপন ডেরায় পাঠিয়ে দাও। চিকিৎসা করাতে যত টাকা লাগে দেব আমি। কিন্তু এখানে নিয়ে আসা হবে না।

গুণধর ত্রিপুরারির আদেশ শুনে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে লেগেছিল কিন্তু বাপের তাড়া খেয়ে পিছিয়ে গিয়েছে। অন্য মানুষগুলো এ ব্যাপারে কেউ কোন মতামত দেয়নি— চুপ করে রয়েছে— বুঝতে পারছে না কি বলা যায়— কি করা উচিৎ।

এই বন মাইল খানেক পার হলেই এদেব গ্রাম— মাঠ— ধানের জমি। সেখানকার মানুষ এরা। বহু যুগ আগে এদের পূর্বপুরুষেরা বন-জঙ্গল কেটে— বাঘ-সাপ-কুমিরের সঙ্গে লড়াই করে আবাদ করেছিল সেই মাঠ— কিন্তু জমি পায়নি। আইনের খোঁচায় তার মালিক হয়েছিল লাটদার— কেউ ত্রিশ হাজার, কেউ চল্লিশ হাজার বিঘা। এখন সেই জমি পুনর্দখলের সংগ্রাম শুরু করেছে এরা।

একদিন এই অরণ্যেরই কোন এক প্রান্তে যেমন এক স্বজন পবিত্যক্ত মানুষকে এক সুন্দরী জিজ্ঞাসা করেছিল— 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ,' তেমনি তার চেয়েও এক রমণীয় কল্পনা আজ এই মানুষগুলির কাছে এসে আহ্বান দিয়েছে,— 'পথ খুঁজিতেছ। মামানুসর।' সুন্দরবনের দিগন্তে তাই আজ আর শান্তির কোন চিহ্ন নাই।

আজ এখানে লাটদারের কাছারিগুলো হয়েছে মিলিটারী আর সশস্ত্র লাঠিয়ালদের আস্তানা— আর গ্রামগুলো প্রতিরোধের দুর্গ। সংঘর্ষ হচ্ছে প্রতিটি দিন। গুলি চলছে— মানুষ মরছে— ধরা পড়ছে— আহত হচ্ছে। কত মেয়ের চাপা গোঙড়ানি একেবারে নীরব হয়ে যাচ্ছে মিলিটারী ক্যাম্পের ভেতর। লড়াই পরিচালনার সুবিধার জন্য এরা গ্রাম থেকে সরে এসে আস্তানা গেড়েছে বনের ভেতর। আইনে এরা সবাই ভয়ঙ্কর বিপদ্জনক লোক— পাখীর শ্বশুর হরিপদকে জীবিত কি মৃত ধরে দিতে পারলে হাজার টাকা পুরস্কার, ত্রিপুরারির

অবর্তমানে আদালত থেকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ হয়ে গিয়েছে— বুড়ো রসময়কে ধরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়েছে চোখ দুটো কানা করে— এমনি সবাই— এমন কি যে স্বেচ্ছাসেবকগুলো রয়েছে তারা পর্যন্ত। নির্দেশ আছে ওদের দেখতে পেলেই গুলি করে মেরে ফেলার।

এই গভীর বনে মিলিটারী ঢুকতে সাহস পায় না, তাই এখানেই খানিকটা জায়গা পবিষ্কার করে এরা সাময়িক ডেরা পেতেছে। ওপাশে একটা বড় খাড়ি নদী, তার ও তীরে বড় বড় সুন্দরী গাছের নীচে হোগলা আর বেতের ঘন বন। মাথার ওপর অরণ্যেব ঘন আচ্ছাদন।

শীতের রোদ গাছপালার ফাঁক দিয়ে এখানে পড়ে ঝিকমিক কবছে— মনে হচ্ছে একবাশ যুঁই ফুল ফুটে রয়েছে মাটির ওপব। স্বেচ্ছাসেবকরা সারা রাত জেগে গাঁয়ে গাঁয়ে মিটিং করে ঘুরে এসে কেউ বা ঘুমচ্ছে— কেউ বা বড় বড় হল্কা হাতে করে খাড়ির বুকে ডিঙির ওপর বসে পাহারা দিচ্ছে। ওপারের চরে ভেসে রয়েছে বড় বড় কুমীর, একটু অসতর্ক হলেই উঠে এসে টেনে নিয়ে যাবে মানুষকে। অনেকটা দূরে হোগলা বনের মাথাটা আপনি দুলছে, বোধ হয় কোন বাঘ চলাফেরা করছে সন্তর্পণে। একটা নুয়ে-পড়া গাছের ডাল থেকে একটা অজগর সাপ মাথা ঝুলিয়ে দোল খাচ্ছে একমনে। তারই ভেতর খানিকটা অপরিসর জায়গায় সমিতির বয়স্ক নেতারা ঘোঁট পাকিয়ে বসে বির্তক করছে— পাখীর সমস্যা নিয়ে।

সকাল থেকেই হরিপদ সেই এক কথা বলছে। তাই এবার ত্রিপুবাবি বিবক্ত হয়ে ঝেঁঝে উঠে বলল, — তোমার এ জিদ আমি বুঝতে পাচ্ছি না, কমরেড। এখানে তাকে নিয়ে এলে কি ক্ষতি হবে তাতো কই বলছো না। দুটো হাঁটুর ভেতর মাথা গুঁজে বসেছিল হরিপদ। ত্রিপুরারির ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনে সে মুখ তুলে বলে, — সে তুমি বুঝবে না, যদি তোমার হতো বুঝতে। এখানে ওকে আনলে আম্মার মাথাটা হেঁট হয়ে যাবে সবার সামনে।

— সে এলে তোমার মাথা হেঁট হয়ে যাবে। একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করে অন্ধ রসময়, মাথাটা উঁচু করে পাশেই বসেছিল সে। সমিতির হুকুমেই তো সে হামলা রুখতে গিয়েছিল।

— এটা সমিতির কথা নয়, রসময়, এটা সমাজের কথা। যা বোঝ না তা নিয়ে বেশী বকো না। কত বড় গায়েন-বংশ আমার জান, সাত রাত মিলিটারীর ক্যাম্পে থাকা বউ ঘরে নিলে কোথায় থাকবে মান-মর্যাদা। আমার গুরু পা ধোয় না যার তাব বাড়ি। ও বউ ঘরে নিলে আর কি সে জলস্পর্শ করবে আমাব ওখানে। যতকাল ও বেঁচে থাকবে, লোকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাবে— গায়েন বাড়ির ঐ বউটা সাত রাত মিলিটারীব ঘরে ছিলো। হেঁট হবে না আমাব মাথা। দুর্নাম পড়বে না আমার বংশে—

হরিপদর কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল সব। খানিকটা দূরে ডিঙির ওপর হল্কা হাতে করে পাহারা দিতে দিতে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে গুণধর। কথা শুনতে পাচ্ছে না— কিন্তু দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ কবে বুঝে নিতে চাইছে পাখীর ভাগ্য। হঠাৎ মানুষগুলোর এই ভাবান্তর দেখে সে চমকে ওঠে আনমনে।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে রসময় আস্তে আস্তে বলে,— মাথা হেঁট হবে তোমার—

হবিপদ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়,— শুধু আমার নয়, সবারই হয়। ও মেয়েকে নিয়ে এখন সমিতি করা যেতে পারে কিন্তু ঘরের বউ করা চলে না। কেউ করে না এখানে। তার মুখের ওপর কথাটা বলতে চাই না, তাই বলছি, ওকে অন্য কোথাও পাঠাও।

— সমিতি করা চলে, কিন্তু ঘর করা চলে না— তাহলে ঘর-সংসারের চাইতে সমিতি ছোট—। তীরের মতো সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায় রসময়।

হরিপদ বলে,— তা বলছি না কিন্তু সমিতি আর সমাজ তো এক নয়।

— তার মানে ওকে তুমি ত্যাগ করতে চাও? হরিপদর মুখের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করে ত্রিপুরারি।

— তা না করে উপায় কি। ওর দায়ে মান-মর্যাদা খোয়াতে তো আর পারি না।

আবার নীরব হয়ে যায় সব।

অন্ধ রসময় আস্তে আস্তে সরে যায় এক পাশে।

ত্রিপুরারি খুব আস্তে আস্তে যেন স্বপ্নের ঘোর থেকে কথা বলছে এমনিভাবে বলে,— যেদিন পাইক-বরকন্দাজ ঘরে ঢুকলে বউ ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াতে হতো ভয়ে— বাপ হয়ে মেয়েকে তুলে দিয়ে আসতে হতো কাছারিতে— ।

ত্রিপুরারির কথা বলার ধবন দেখে হরিপদ অবাক হয়ে তাব মুখের দিকে তাকিয়েছিলো। এইবার সে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে,— সে যাদের হয়েছে তাদের। কিন্তু আমাদের গাঁয়েন বংশে তা কোনদিন হযনি।

কিন্তু সে কথা ত্রিপুরারির কানে যায় না, তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে একটা ছবি— ক'বছর আগেকার— কিন্তু মনে হচ্ছে বুঝি এখুনি ঘটে গেল সেটা।

তার পাশের বাড়ির ঘটনা। তের-চোদ্দ বছবের ফুটফুটে মেয়ে। বাপ-মা আদর করে নাম রেখেছিল বাসন্তি। একদিন গাঁযেব কোলে ছাগল চরাতে গিয়ে নজরে পড়ে গিয়েছিল নাযেবেব। ছাগল ফেলে রেখেই বিব্রত হয়ে পালিয়ে এসেছিল মেয়েটা। কিন্তু তাতেও নিষ্কৃতি পায়নি। একটু পরেই নায়েবের ঘোড়া ঘুরে এসে দাঁড়াল তার বাড়ির সামনে। ঘবের খুঁটিতে ঘোড়ার লাগাম বেঁধে ঘরে ঢুকে সোজা আদেশ দিল সে, — এক গ্লাস জল পাঠিয়ে দেত বে মেয়েটাকে দিয়ে।

অসহায় মা-বাপের চোখের সামনে দিযে আতঙ্ক-বিহ্বল মেয়েটা ঘবে ঢুকেছিল জলেব গেলাস হাতে করে। একটু পরেই একটা আর্ত চিৎকার করে ছুটে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। শুধু সেমিজটা গায়ে বয়েছে, ঠকঠক করে কাঁপছে গোটা দেহ— ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকাব করে উঠল, — ওগো-মাগো— ওগো আমায় বাঁচাও গো— ওগো—বাবু ওকি কথা বলছে গো।

ব্যর্থতায় মুখ লাল করে ঘব থেকে বেবিয়ে এল নাযেব। শাড়িখানা তখনও হাতের মুঠোয় ধরা। সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিযে বেবিযে চলে গেল ঘোড়া ছুটিয়ে। একটু পবেই তিন-চারজন পাইক এসে হুকুম জারি করে গেল মেযের বাপকে,— আজ বাতেই ও মেয়েকে তুলে দিয়ে আসতে হবে কাছাবিতে, নইলে।— তারপর একটু থেমে বলেছিল— যদি পালাবার চেষ্টা কর— ত ঐ কোলের ছেলেটা পর্যন্ত রেহাই পাবে না।

বাকি গোটা দিনটা মেয়ের বাবা কেঁদে কেঁদে ফিরেছিল গাঁয়ের প্রত্যেকের দুয়োবে দুয়োরে। কিন্তু জলে বাস করে কুমীবের সংগে বিবাদ করবে সেদিন এত সাহস কেউ ধরতে পারেনি। কেউ বা বলেছিল,— ঐ ওর নিয়তি। নইলে এমনভাবে নায়েবের সামনেই বা পড়বে কেন। একটার দায়ে শেষে পাঁচটা না যায়।

তাদের নিরুপায় চোখেব সামনে দিয়ে মেয়ের বাবা আলো হাতে করে মেয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল গাঁ থেকে— । অন্ধকার মাঠে আলোর শিখাটা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে হতে মিলিয়ে গেল এক সময়। কাছাবির প্রান্ত থেকে একটা মর্মান্তিক কান্না বিদ্যুতের মত চমকে উঠল গাঁয়ে,- ওগো বাবা আমায় ধরল গো— বাঁচাও গো—।

পরের দিন মেয়ের বাবার লাস পাওয়া গেল খাড়ির জলে, গলায় কলসী বেঁধে ডুবে মরেছে সে। আব মেয়েটা— কে জানে কি তার পরিসমাপ্তি।

বর্বর ঔদ্ধত্য সেদিন এমনিভাবেই গোটা সুন্দরবনের মাথাটাকে পায়ের নিচে লুটিয়ে দিতে চেয়েছিল। এই অরণ্যই তার সাক্ষী। সব জানে সে। সমুদ্রের তট ঘেঁষা তার ঐ মৌন রেখার নিচে স্তব্ধ হয়ে আছে শতাব্দীর পর শতাব্দীর কত দৃশ্য! মগ, পর্তুগীজ, দিনেমারদের বীভৎস তাণ্ডব, অন্তরের অভ্যন্তরে হিংস্র পশুর নির্লজ্জ আস্ফালন। যুগ-যুগান্তরে অনেক রক্ত, অনেক অশ্রু ঢাকা আছে তার মর্মরে। আজও সে দেখছে— দেখছে আর একদল মানুষকে। ভাবছে তার কান্না-ভেজা মাটিতে আগুনের এই স্ফুলিঙ্গগুলো কোথা হতে উড়ে এলো। আজও দূরে ঘর জ্বলছে, মাঠে ধান পুড়ছে— অগ্নিশিখা রক্তের অক্ষরে শূন্য আকাশে এক লিখন লিখে যাচ্ছে— তেমনি আর্তনাদে আজও কাঁদছে মাঠের হাওয়া। কিন্তু এখানে এই স্ফুলিঙ্গর স্পর্শে অশ্রুজল কি আজও বাষ্প হবে না? আজও কি জীবনের চেয়ে মর্যাদার দাম বেশি হয়নি। ত্রিপুরারির কাছ থেকে একটু তফাতে একটা গাছে হেলান দিয়ে বসে আর একটা ছবি দেখছে রসময়।

আত্মগোপনের ডেরা থেকে একসঙ্গে ধরা পড়েছিল তিনজনে। সে আর দুজন মহিলা কর্মী— নিত্য আব কৌশল্যা। সাত মাস গর্ভবতী নিত্যের ভ্রূণটা মিলিটারীর লাথিতে সেখানেই ঝরে পড়ে মাটির ওপর লিখে দিয়েছিল 'আমি রক্ত'। আর তারা দুজনে চালান হয়ে গিয়েছিল কাছারি বাড়ির ভেতর।

সারা দিন মারের ঘোরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকার পর গভীর রাতে তাকে তুলে এনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল আর একটা আলো জ্বালা ঘরের ভেতর। একটা গোল টেবিল। সামনে চেয়ারে বসে রয়েছে নীল জামা গায়ে অফিসার। মাথার চুলগুলো ঘুরে কপালের ওপর এসে পড়েছে— নেশায় টকটকে লাল চোখ। একধারে বেঞ্চিতে বসে রয়েছে কাছারির নায়েব, লাটদারের ছোট ছেলে, আশেপাশের অঞ্চলের আরও দু-তিনজন ছোটখাট জোতদার। চারজন বন্দুকধারী মিলিটারী পাহারা দিচ্ছে দরজার সামনে, তাদের পেছনে একদল সশস্ত্র লাঠিয়াল। ঘরের ভেতরই মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ে রয়েছে কৌশল্যার অর্ধনগ্ন দেহটা। তার মাথার চুল থেকে দোমড়ান পায়ের পাতা পর্যন্ত অবিচার তার নির্লজ্জ স্বাক্ষর রেখে গিয়েছে।

সেদিকে তাকিয়ে হতবিহ্বল হয়ে গিয়েছিল রসময়। এই হাল করেছে কৌশল্যার। অনেক পুরুষের চেয়েও যে শক্ত কর্মী ছিল এই তার অবস্থা। কতক্ষণ যে সেদিকে তাকিয়েছিল হুঁশ নাই— হঠাৎ অফিসারের কড়া গর্জন শুনে ফিরে তাকাল,— এই শুয়ার, সিধা দাঁড়াও। দেখেছ ওর হাওলাত। বাঁচতে চাও তো সত্যি কথা বল। কোথায় থাকে তোমাদের নেতারা, কোথায় গোপন আস্তানা তাদের— চেন ত্রিপুরারিকে? কোথায় লুকিয়ে আছে সে? বলে আঙ্গুলটা তুলে কৌশল্যাকে দেখিয়ে নাচাতে নাচাতে বলেছিল,— ভগবান এলেও ওকে বাঁচাতে পারবে না এখানে। তবে সব যদি কবুল কর ত আর কিছুই বলব না— খালাস দিয়ে দেব।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইল রসময়। দুটো হাতই দড়া দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। টেবিল থেকে একটা আলপিন তুলে নিয়ে সেই বাঁধা হাতের একটা বুড়ো আঙ্গুলের নখের ভেতর টিপে ধরে অফিসার বলল,— বল। বলতে হবেই। বলিয়ে তবে ছাড়ব। দেখছ কি— ও প্রথমে তোমার মতোই করছিল, তারপর ক্যাম্পের ভেতর থেকে দুপাক ঘুরে এসে সব কবুল করেছে।

রসময়ের চোখ দুটো দপ করে জ্বলে উঠল। সব বলে দিয়েছে কৌশল্যা! অনেক কিছুই ত সে জানত। সব কথাই সে বলে দিয়েছে—! তাহলে ত অনেক অনেক কর্মী ধরা পড়ে যাবে।

হঠাৎ কৌশল্যার অসাড় দেহটা যেন একটু নড়ে উঠল। রক্ত আর ক্ষতের ভেতর থেকে বোজান পাঁপড়ি মেলে ধরল দুটো চোখ— স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে বোবা

দৃষ্টিতে তাকিয়ে সেই চোখই যেন অবশেষে কথা বলে উঠল,— না কমরেড, কিছুই বলিনি আমি। সব মিছে কথা। কথা বলাবার জন্যে ওরা সব কিছু করেছে— কিন্তু আমি কিছুই বলিনি— তুমি বিশ্বাস করো না।

ওরা একটু জলও খেতে দেয়নি আমায়। তুমি আমায় একটু জল খেতে দেবে কমরেড—

একটা হুঙ্কার যেন রসময়ের সমস্ত সত্তা ভেঙ্গে গর্জন করে উঠল,— চোখের ওপর এমনি করে খুন করবে মেয়েটাকে! কি ভেবেছ কি তোমরা!

বাঁধা হাত দুটো ঝাঁকিয়ে ছিড়ে ফেলে সে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল অফিসারের উপর। কিন্তু তার আগেই দুপাশ থেকে দুটো ঘুসি এসে তার মাথাটা যথাস্থানে ঠিক করে দিল। হিংস্র দৃষ্টিতে অফিসার অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে। তারপর বলল, —হ্যাঁ। বড় দামী চোখ তোমার। তার সামনে ত কিছুই করা চলবে না।— এই, বাহার লে যাও ইসকো। চোখ দুটো উপড়িয়ে ছোড় দেও। যাও— তোমার নেতাদের গিয়ে বলো, ধরা পড়লে এমনিধারা একটা একটা করে চোখ উপড়ে নেওয়া হবে তাদের।

রাতের সে অন্ধকার আর পরিষ্কার হয়নি তার কাছে। কৌশল্যাও আর ফিরে আসে নি। কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি তার। বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই তাকে মেরে ফেলেছে। শুধু তাকে ঐ কথা দুটো বলবার জন্যই অতক্ষণ সে বেঁচে ছিল। কিন্তু আজ যদি কৌশল্যাই ফিরে আসে— তাহলে? স্বামী সংসার সবাই ত্যাগ করবে তাকে। এত অত্যাচার সহ্য করে সেখানে যে মাথা নোয়াল না— আজ ফিরে এসে শুনবে তার জন্য তার স্বামী শ্বশুরের মাথা হেঁট হয়েছে।

এক মনে বসে বসে ভাবছিল সে। ত্রিপুরারি কখন যে পাশে এসে বসেছে খেয়ালই করতে পারেনি। হঠাৎ পিঠে হাত পড়তেই চমকে উঠল,— কে?

— আমি ত্রিপুরারি, বসে বসে কি ভাবছ কমরেড?

— ভাবছি— হঠাৎ সে উঠে দাঁড়িয়ে ত্রিপুরারির হাত দুটো চেপে ধরল— পাখীকে নিয়ে এস কমরেড। তাঁকে বাঁচাও। তুমি আমাদের সেক্রেটারি। তোমাকেই জোর ধরতে হবে। আমরা পুরুষেরা যাদের সঙ্গে লড়াই করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি ওরা মেয়েমানুষ কি করবে তাদের। কৌশল্যা শেষ সময় একটু জল চেয়েছিল আমার কাছে— তেষ্টা বুকে নিয়ে মরেছে সে—। আন্দোলন শেষ হলে আমরা ধান পাব, জমি পাব, হরিপদ আবার ছেলের বিয়ে দেবে— হাসবে— আর পাখী কেঁদে কেঁদে ভেসে বেড়াবে। না কমরেড, মহাপাপ হবে তাহলে। এ ঠিক কথা নয়— ঠিক নয়। মাথাটা দোলাতে দোলাতে অন্ধের চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়ল ত্রিপুরারির হাতের ওপর।

ত্রিপুরারির রোগা কাল দেহটা কেঁপে উঠল থর থর করে। তাড়াতাড়ি দুহাত দিয়ে রসময়কে জড়িয়ে ধরে সে বলল— কেঁদ না। চুপ কর। ছিঃ। আমাদের কাঁদতে নেই। পাখীকে নিশ্চয় আনব। আমাদের জন্যে যারা রক্ত দিচ্ছে তাদের হেনস্থা করলে বেইমান হয়ে যাব যে।

— কিন্তু হরিপদ যে তোমার কথা শুনছে না।

— শুনবে বইকি। শোনাব তাকে। কোথায় যাবে সে, গোটা সমিতি যদি একমত হয়।

— তাই কর। যাতে পাখীর কোন ক্ষতি না হয় তাই কর।

শীতের দিন এগিয়ে চলেছে ক্ষয়ের দিকে। আত্মগোপনকারী কর্মীদের এই ডেরাটায় স্বেচ্ছাসেবকেরা দ্রুত তৈরি হয়ে নিচ্ছে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য। হ্যাণ্ডবিল আর পোষ্টারগুলো কাপড়ে বেঁধে ভরে নিয়েছে পেটের তলায়, মাথায় জড়িয়েছে গামছার পাগড়ি। খাড়ির বুকে বাঁধা ডিঙি নৌকার হাল-দাঁড়ের বাঁধনগুলো পরীক্ষা করে দেখছে কেউ কেউ— কেউ বা মৃদুস্বরে সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করছে, — টর্চ লাইটটা নিয়েছিস ত।

— একখানা পতাকা সঙ্গে করে নে গুটিয়ে।

সারাটা রাত গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে সেখানকার রিপোর্ট আনতে হবে— করণীয় নির্দেশগুলো পৌঁছে দিতে হবে মানুষদের কাছে। তাই বিভিন্ন এলাকার নেতাদের কাছে আদেশ নিয়ে নিচ্ছে প্রয়োজন মত।

—রাখাল হালদার যদি দেখা করতে চায় নিয়ে আসবে তাকে।

— রাজেন গুড়িয়াকে নিতে বলব সমিতিতে।

এর ভেতর শুধু ত্রিপুরারি একটা গাছের গুড়ির ওপর চুপ কবে বসে বসে ভাবছে। সারাদিন হরিপদকে সে কিছুতেই বোঝাতে পারেনি। অন্য বয়স্ক কর্মীরাও চুপ করে রয়েছে। একমাত্র রসময় বলেছে বটে কিন্তু তার কথার কোন গুরুত্ব দিচ্ছে না হবিপদ। বসে বসে সে ভাবছে কি করবে, এমন সময় ক'জন স্বেচ্ছাসেবক তার কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল,— তাহলে আপনি যাবেন ত ও এলাকায়। মিটিং এর ব্যবস্থা করে আসব।

ত্রিপুরারি শান্ত গলায় বলে— না।

স্বেচ্ছাসেবকরা একটু অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকায়।

ত্রিপুরারি বলে,— সবার বেরিয়ে গেলে ত চলবে না। পাখীর একটা ব্যবস্থা কবতে হবে। তোমরা কানাই মোড়লকে একবার ডাক ত।

একজন স্বেচ্ছাসেবক গিয়ে কানাই গুড়িয়াকে ডেকে নিয়ে এল। লাটদারের দুটো লেঠেল নিখোঁজ হওয়ায় হুলিয়া ঝুলছে তার মাথার ওপর। এমনি নেতৃস্থানীয় না হলেও বয়স্ক লোক বলে সবাই সম্মান খাতির করে তাকে। সে আসতেই ত্রিপুরারি জিজ্ঞেস করে,— তাহলে পাখীর কি করা যায় বল। হরিপদ ত ত্যাগ করবে তাকে? এধারে অন্য কোথাও পাঠাতে হলে আগে খবর দিয়ে ব্যবস্থা করতে হবে। নইলে হুট কবে এ অবস্থায় তুলবেই বা কোথায়?

— সে ত ঠিকই। কানাই মোড়ল তার কথায় সায় দিয়ে মাথা নাড়ে।

— আরে গাঁয়েও এ অবস্থা নয় যে থাকে। শেষে মিলিটারীর হাতে রেহাই পেয়ে — আমাদের হাতে খুন হবে মেয়েটা।

— তাই কি হয়!

— তবে তাহলে নিয়ে আসতে বলি তাকে এখানে—।

— দাঁড়াও! ডাকি একবার হরিপদকে। বলে দাঁড়িয়ে থাকা স্বেচ্ছাসেবকদের একজনকে বলল— কই সে? ডাক ত তাকে।—

একধারে মাটির ওপর একখানা গামছা পেতে শুয়েছিল হবিপদ। ডাক শুনে উঠে আসতেই কানাই মোড়ল বলল— হ্যাঁ গো পাখীর তা হলে কি হবে? এখানে তাকে আনা ছাড়া আব ত কোন উপায় দেখছি না এখন।

কানাই মোডলের কথা শুনে হরিপদ ত্রিপুরারিব মুখের দিকে তাকায়। বোঝে, তারই প্ররোচনায় কানাই মোড়ল এ কথা বলছে। তাই তাকে উত্তর না দিয়ে সে সোজাসুজি ত্রিপুরারিকেই বলে,— সকাল থেকে বার বার বলছি এখানে ওকে এনো না— তা আমাব কথাটা শুনবে না।

ত্রিপুরারি সেই গাছের গুড়িব উপর উবু হয়ে বসে বসেই জবাব দেয— বুঝে দেখ! বিপদের সময় মানুষ তার আত্মীয় স্বজনের কাছেই যেতে চায। এখানে তুমি বয়েছ, তাব স্বামী রয়েছে— ।

হরিপদর মুখখানা কঠিন হযে উঠে। সে বলে,— তাব স্বামী হতে পারে কিন্তু সে ত আমারই ছেলে—।

সারাদিন এই একই বিরোধিতায় ত্রিপুরারিও এবার উত্তেজিত হয়ে বলে,— ছেলে তোমাব হতে পারে কিন্তু সে সমিতির কর্মী। সমিতি হুকুম দিলে সে তো ছেলেমানুষ, তুমি শুদ্ধ মানতে বাধ্য।

— সমিতির হুকুম দেবার তুমি কে হে—? চিৎকার করে রুখে দাঁড়ায় হরিপদ।

এক লাফে কাঠটার ওপর থেকে নেমে ত্রিপুরারি ওর সামনে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে বলে,— আমি সেক্রেটারি!

— সেক্রেটারি! বটে! আমরা পাঁচজন যেমন তোমায় করেছি তেমনি আবার ঘাড় ধরে নামিয়ে দিতে পারি জান।

— যখন দেবে দিও। কিন্তু এখন আমার কথা শুনতে হবে।

দুজনের চেঁচামেচি শুনে চারি পাশ থেকে সবাই ছুটে এসেছে। স্বেচ্ছাসেবকরা যারা প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল তারাও এগিয়ে এসে এক পাশে কুঁচ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমিতির নেতাদের এ রকম প্রকাশ্য কলহ তারা কোন দিন শোনে নি।

কানাই গুড়িয়া দুহাত দিয়ে দুজনকে ঠেলে দিয়ে বলল,— আরে ঝগড়া করো না তোমরা— ছিঃ ছিঃ। শেষে ভেঙ্গে দেবে নাকি সমিতিটা।

ত্রিপুরারি তার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে আবার গাছের গুড়িটার ওপর উঠে বসল, — সমিতি ভাঙ্গার কি আছে এতে! এই তো সবাই রয়েছে— জিজ্ঞেস করো মতামত। কি গো তোমাদের কি মত বল ত। পাখীকে আনা হবে এখানে? হরিপদ তো তাকে ত্যাগ করবে বলছে।

– ত্যাগ করবে কেন? স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা প্রশ্ন করে। সকাল বেলার ওদের আলোচনা এখনও কেউ জানে না।

— মিলিটারী ধরে নিয়ে গিয়েছিল বলে—।

— না গো আমি ত্যাগ করার কথা বলি নি—। ত্রিপুরারিকে থামিয়ে দিয়ে হরিপদ তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, — চিকিৎসা করাতে যত টাকা লাগে দেব বলেছি আমি। ক' বিঘে জমিও লিখে দেব তার নামে। যত দিন বাঁচবে — খাবে। তা বলে ঘরে কি ফিরিয়ে নেওয়া যায় তাকে— বল তোমরা।

— কেন, নেওয়া যাবে না কেন? স্বেচ্ছাসেবকদলের নেতাই আবার কথা বলল,— গুণধর তো তাকে নেবে বলেছে।

হরিপদ ওর কথা শুনে আবার রুখে ওঠে, — গুণধর বললেই তো আর হবে না। মানসম্মান বলে জিনিস তো আছে একটা— নাকি একটা বৌ হলেই হল—।

স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা এর জবাবে কি একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে কানাই মোড়ল বলে,— আরে বাপু নিস না নিস সে তো পরের কথা। আন্দোলনে জয় হোক - ঘর বাড়িতে ফিরে যাই তারপরে। কিন্তু এখন তাকে আনতে দোষটা কি?

—দোষ বুঝতে পারছ না। হরিপদ আঙ্গুল তুলে গুণধরকে দেখিয়ে বলে,— ওর কাছে থাকতে থাকতে যদি ছেলেপিলেই হয় দু-একটা, তখন সে বংশ পরিচয় দেবে না? ভাগ নেবে না সম্পত্তির— ।

—এ্যাঃ-হ্যাঃ হ্যাঃ-হ্যাঃ! এ যে এখন থেকে সম্পত্তির ভাগ কষছে মনে মনে — মরেছে রে— । স্বেচ্ছাসেবকদের ভেতর থেকে কে একজন মন্তব্য করে উঠল।

— এ্যাই কে রে? কানাই মোড়ল তাকে একটা তাড়া দিয়ে হরিপদর দিকে ফিরে বলল,—সে তখন একটা প্রায়শ্চিত্তি মতো করে নিস বাপু। যা হয়েছে সে তো আর ফিরবে না। এছাড়া তোর বেটার যখন মত আছে।

-- বেশ! বেশ! ভালো? স্বেচ্ছাসেবকদের ভেতর থেকে আবার মন্তব্য করে একজন। মাথায় পাগড়ি বেঁধে হাতে টর্চলাইট ঝুলিয়ে তারা দাঁড়িয়ে আছে পেছনে। ওধারে কাঠের গুড়ির ওপর বসে ত্রিপুরারি -- হরিপদ দাঁড়িয়ে মাঝখানে— আর তার খানিকটা তফাতে কানাই মোড়ল। রসময় ও আরও কয়েকজন বুড়ো বসে রয়েছে এক পাশে। মাথার ওপর

ডালপালায় বিকেলের ঘর-ফেরা পাখীরা চেঁচামেচি করছে। খাড়ির ওপারে বেতের বনের ভেতর একটা ফেউ ডাকছে। বহুদূরে সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে একটা জাহাজ ভেসে যাচ্ছে কোন দেশে।

স্বেচ্ছাসেবকদের নেতা বলল,— বেশ বিচার! সাপে খেলে তোমায় খাক, মানিক পেলে আমি ভাগ নেব।

—- কেন! এতে ঠাট্টার কথা কি হল? কানাই মোড়ল বোঁ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে তাকে।

— তাই তো বলছ তুমি? স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা কানাই মোড়লকে কথা ঘুরিয়ে দেয়।

— আমি তাই বলছি?

— বলছ না? গাঁয়ে গাঁয়ে তোমরা মিটিং করে মানুষকে বলবে হামলা রুখতে। তারপর কিছু হলে বলবে প্রায়শ্চিত্ত কর। তোমার নামেও তো হুলিয়া বেরিয়েছে। লাটদাবেব পায়ে ধরে প্রায়শ্চিত্ত করগে না। মাপ পেয়ে যাবে।

বয়সের জন্য কানাই গুড়িয়াকে সমীহ করে সবাই। তাই ব্যক্তিগত আক্রমণে সে যেন ক্ষেপে উঠল। কাঁপতে কাঁপতে বলল,— কি? কি? কি বললি তুই— আমি পায়ে ধরে মাপ চাইব লাটদারের—

ওপাশ থেকে ত্রিপুরারি ধমক দিয়ে ওঠে,— এ্যায় মুখ সামলিয়ে কথা বলবি।

ত্রিপুরারি কাঠের গুড়িটার উপর থেকে নেমে দাঁড়াল। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবক দলেব নেতা তাকে গ্রাহ্য না করেই বলল,— থামব কেন? সমিতির মিটিং-এ সবারই কথা বলার অধিকার আছে।

— তা বলে তুই যা খুশি তাই বলবি। ত্রিপুরারি আবার ফিরে কাঠের গুড়িটার উপব বসল।

পাগড়ি-বাঁধা মাথাটা নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা দু'পা সামনে এগিয়ে এসে বলল— যা খুশি তোমরাই বলছ। সকাল থেকে তাকে আনবার কোন ব্যবস্থা নেই, শুধু ঘোঁট পাকাচ্ছ বসে বসে। মান মর্যাদা কিসের শুনি। আগে তো কাছারিতে ধরে নিয়ে গিয়ে জুতা পেটা করত, এখনও ধরা প'লে যদি বেত মারে, কি ঐ রসময় খুড়োর মতন কানা কবে দেয়— তাতে মান যাবে না। মান যাবে ওকে ঘরে নিলে। তাহলে সমিতি থেকে কোন মেয়েকে আন্দোলনে ডাকতে পাবে না। তাবা ধরা পড়লেই তো ঐ হবে। বেটাছেলেদের ধরে কানা কি খোঁড়া করে ছেড়ে দিচ্ছে— কি মেরে ফেলছে— আর ওরা ধরা পড়লে শালা কুকুর ওদের মাংস চাটছে। ওদের দোষ কি তাতে।

— ঠিক। নেতার কথা সমর্থন করে দু-তিনজন স্বেচ্ছাসেবক। একজন বলে,— তা ছাড়া আমাদের মান তো আন্দোলনের ওপর। আন্দোলন যত জোর হবে তত আমাদের নাম-যশ। হেরে গেলে সবার মুখেই তো চুনকালি পড়বে— ধরে মেরে দেবে কুকুরের মতো গুলি করে।

— নিশ্চয়। বলে ওঠে আর একজন স্বেচ্ছাসেবক।

—তাছাড়া বংশ নিয়ে আমরা কি করব? ঐ যে ওপর থেকে আমাদের সমিতির নেতারা আসে— আমরা কি তাদের বংশ মর্যাদার খবর নিই, না কাব ক'বিঘে জমি আছে খোঁজ করি। আন্দোলন ভাল চালায় বলেই তো দেশের লোক তাদের মানে—।

— নিশ্চয়ই।

গোটা স্বেচ্ছাসেবক দলটা বিপক্ষে ঘুরে যাওয়াতে ঘাবড়ে গিয়েছে হরিপদ। বিশেষ করে গুণধর তাকে নেবে বলাতে আরও অস্বস্তি বোধ করেছে মনে মনে। কিন্তু সেটা বুঝতে না দিয়েই সে বলে ওঠে,— অত বোঝাতে হবে না আমায়। ছোট ছেলে নই আমি। গুণধরকে

তো উস্কিয়ে দিলে হবে না। জিজ্ঞেস করি— তোমাদের কারও বৌ যদি এ রকম সাত রাত মিলিটারীর ঘরে ভরা থাকত — নিতে তাকে?

— আলবৎ! আর আমরা ওসকাব কেন গুণধরকে। ও নিজে বোঝে না। কিরে গুণধর তোকে আমরা উস্কেছি—।

স্বেচ্ছাসেবকদের গোটা দলটা ঘুরে তাকাল তার দিকে। গুণধর সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল,— ওসকাবে আবার কে? আমি কি কচি খোকা নাকি? আমি তো বলেছি ওকে নেব!

— কিন্তু তোর বাবা যে অমত করছে—।

— সমিতি হুকুম দিক না আগে—।

— আর তোর বাবা যদি ঘরে না নেয়—।

— ঘর তো সে আমার সঙ্গে করবে— না। থেমে বাকিটুকু ঘুরিয়ে নিয়ে বলে,— ঘর বাঁধব আলাদা।

সকাল থেকে এই কথাটা জানিয়ে দেবার জন্য সে ছটফট করেছে। কিন্তু বয়স্ক নেতাদের কাছে বৌ এর কথা বলতে পারে নি সঙ্কোচে। আজ সাতদিন ধরে আগুন জ্বলছে তার মাথার ভেতর। অপলক দৃষ্টিতে পাখী যেন তাকিয়ে রয়েছে তার মুখের দিকে। চোদ্দ বছর বয়সে যখন তার বিয়ে হয় তখন পাখী ন'বছরের। কত ঘটনা, কত স্মৃতি সব মনে পড়ছে— একে একে। একদিন খেতে দিতে দেরি হয়েছিল বলে গুম গুম করে কিল মেরেছিল তার ঘাড়ে। আব সেই শোধ নিতে বাড়িব পাশেব এক বৌদিদির ওস্‌কানিতে পাখী একটা জুতোয় দড়ি বেঁধে তার গলায় ছুঁড়ে দিয়ে চেঁচিয়ে পালিয়েছিল ছুটে— বৌ-মারার সাজা।

চমকে উঠে রাগে অপমানে তাকে আরও মারবার জন্য এঁটো হাতেই তাড়া করেছিল সে— ধবেও ফেলেছিল দু'পা যেতে না যেতেই— কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাখী তার বুকে মুখ গুঁজে এমন করে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল যে সে আর মারতেই পারে নি তাকে। যতই তাকে ছাড়াবাব চেষ্টা করেছে ততই পাখী আরও জড়িয়ে ধরে বলছে— বল আগে মারবে না?

— ছাড়! ছাড় বলছি ভাল চাসত।

— না ছাড়ব না, বল মারবে না।

— ভাতের এঁটো লাগছে তোর গায়ে!

— লাগুক, তুমি মারবে না বল।

— করলি কেন এ-কাজ?

— বৌদিদি শিখিয়ে দিল যে।

পাখীকে মারতে পারে নি গুণধর. ভাত মাখা এঁটো হাতটা বেশ করে তার মুখে বুলিয়ে দিয়ে বলেছিল,— জুতো ছোঁড়া বৌ-এর সাজা।

সেই পাখী। হামলা রুখতে গিয়ে লাঞ্ছিত হয়েছে সে। আক্রোশের আগুন তার চোখে ধকধক করছে, তার সামনে কি সমাজের কোন বিধান দাঁড়াতে পারে! মুখ লাল করে সে হুঙ্কার দিয়ে উঠল— গুষ্ঠি বেচি শালা সমাজের। সে শালার গুরু খেল— আর না খেল বাড়িতে তাতে —।

— এ্যাও! ছেলেকে একটা কড়া ধমক দিতে চায় হরিপদ। কিন্তু তার রুদ্রমূর্তির সামনে কণ্ঠস্বর আপনি নির্জীব হয়ে যায়।

একজন জোয়ান স্বেচ্ছাসেবক দু'পা এগিয়ে এসে হরিপদর সামনে হাতটা নেড়ে বলে, — ও পুরানো বুদ্ধি আর চলবে না। ওই বুদ্ধি নিয়েই মার খেয়েছ চিরকাল, কিছুই করতে পার নি। সেদিন আর নেই। ওসব গুরু-পুরুতকে এবার টিকিট কাটতে বল। খুব মেরেছে শালারা।

তার কথা বলার ভঙ্গীতে খুক খুক করে চাপা হাসি হেসে উঠল দু'জন অল্প বয়সী স্বেচ্ছাসেবক। আর হরিপদ কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, —আমি নালিশ করব জেলা সমিতিতে। আমাকে অপমান করলি তোরা। ত্রিপুরারি, তুমি সেক্রেটারী। তোমায় জানিয়ে রাখছি আমি এর বিচার চাই।

— বিচার করুক জেলার নেতারা এসে। আর আমরা পাখীকে ঐ রসময় খুড়োর গাঁয়ে নিয়ে গিয়ে গলায় মালা পরিয়ে শোভাযাত্রা করে পায়ের ধুলো নেব। বলব, এরা কেউ চোখ দিয়েছে, কেউ ইজ্জত দিয়েছে তাই আন্দোলনে জয় হয়েছে আমাদের। দেখি লোকে কি বলে। স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা কথাটা বলেই বলল— এই চল! চল! রাত হয়ে এল যে—।

আনুষ্ঠানিকভাবে সে সেক্রেটারি ত্রিপুরারির অনুমতিটাও নিতে ভুলে গেল। বনেব এধার ওধার দিয়ে ডিঙি-নৌকো বেয়ে নিমেষের মধ্যে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল চার ধারে।

কিন্তু সংশয় তখনও কাঁপতে লাগল বনের হাওয়ায়। তাই ভোর রাতে বয়ে আনা পাখী গুণধরের কোলে মাথা রেখে প্রথমেই প্রশ্ন করল স্বামীকে,— কিন্তু আমায় কি তুমি ঘেন্না করবে না মনে মনে। বল সত্যি করে—।

— তার আগে তুই একটা জবাব দে।

— কি?

— এই আন্দোলনে আমি যদি কানা খোঁড়া কি অথর্ব হয়ে যাই, তুই আমায় ফেলে পালিয়ে গিযে বিয়ে করবি আর একটা।

— ছিঃ ছিঃ! কি কথা। পাখী তার শীর্ণ হাতখানা তুলে স্বামীর মুখটা চাপা দিল।

গুণধর আস্তে আস্তে হাতখানা সরিয়ে দিযে বলল,— ওসব ভেবে এখন মন দুর্বল করিস না। সেরে ওঠ তাড়াতাড়ি। বহু কাজ এখন। তারপর আন্দোলনে যখন জিতব তখন সে আনন্দে, তুইও ভুলে যাবি এসব।

— কিন্তু কেউ যদি ছিঃ ছিঃ করে।

— কে? আবার গুণধরের চোখ দুটো ধক ধক করে জ্বলে উঠল,— সমিতিব যারা বিপক্ষে— তাবা? মুণ্ডু ছিঁড়ে ফেলব না তাদের।

পাখী পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে স্বামীর দৃপ্ত মুখের দিকে তাকায়।

বাত শেষ হয়ে গিয়েছে।

নিরাভরণ উষা কপালে শুকতারাব টিপ পরে শুচিশুভ্র প্রভাতকে বন্দনা করছে বনের মাথার উপর দাঁড়িয়ে।

একদিন এমনি এক অরণ্যে এক শরাহত ক্রৌঞ্চির বেদনায় এক অমর সঙ্গীতের আবির্ভাব হয়েছিল এক মুনির কল্পনায়। কিন্তু অরণ্যের আজকের এ গান তার চেয়েও মহান, তাব চেয়েও গরিমাময়। ক্রৌঞ্চ এখানে আহত ক্রৌঞ্চির চারিপাশ ঘিরে ডানা ঝাপটিযে কাঁদছে না— তার পাণ্ডুর অধরে একটু করে সিঞ্চন করছে জীবনের অমৃত। আর তাই লাঞ্ছিত ক্রৌঞ্চির চোখের পাতায় ধীরে নেমে আসছে এক নূতন স্বপ্ন।

সে স্বপ্ন আনন্দের— আশ্বস্তির—সুখের —স্বস্তির।

দশাননের পঞ্চানন

শৈবাল চক্রবর্তী

সেই যে কথায় বলে যমে-মানুষে টানাটানি, আমাদের হাবুর সঙ্গে এ পাড়ার নতুন ডাক্তার পঞ্চানবাবুর হেঁচড়া-হেঁচড়ি চলেছে আজ কদিন ধরে।

মানে হাবুর রোগও সারবে না, আর পঞ্চানন ডাক্তারও তাকে ছাড়বেন না, দ্বৈত সমরে কার হার আর কার জিত হয় দেখার জন্য আগ্রহে অধীর ছিল সবাই।

হাবুর ছিল রাজ্যের ব্যামো। পেটের রোগ তো তার জন্মাবধি, তার ওপর তার দাঁতের গোড়া কনকনিয়ে ওঠে যখন তখন। বিকেল হলেই মাথা ধরে নিয়ম করে, আর পূর্ণিমা-অমাবস্যায় যখন বাতে কামড় দেয় তখন বেচারা কাবু হয়ে পড়ে একেবারে।

চিৎপুরের হেকিম মুৎসদ্দি মিয়া থেকে সাহেব পাড়ার একশো আট টাকা ভিজিটের ত্রিদিবেশ তলাপাত্র পর্যন্ত কেউ আর দেখতে বাকি নেই হাবুকে। প্রথম কদিন হয়তো এদের চিকিৎসায় ভাল থেকেছে হাবু তারপর আবার যে কি সেই। যত নামী আর দামী ডাক্তারই হোক তাকে বোকা বানাতে হাবুচন্দরের সাতদিনের বেশী সময় লাগেনি কোন বার।

ডাক্তার-বদ্যি রণে ভঙ্গ দিতে বাড়ির লোকজন যে যেভাবে পাবে চিকিৎসা সুরু করল হাবুর। হাবুর এক মেসো এসেছিলেন জলন্ধর থেকে। তিনি বললেন, অত বাছ-বিচার করে থেকেই তোর এই দশা হয়েছে। এই বয়সে কোথায় পেট ভরে খাবি, ফুর্তি করে বেড়াবি তা না ওষুধ আর নিয়ম। যা প্রাণ চায় সব খা দিকি, দেখবি ব্যামো বাপ বাপ করে পালিয়েছে দু'দিনে।

মেসোর কথামত পরের দিন নিজের বাঁধা পথ্যি ছেড়ে আর সবার জন্য যা রান্না হয়েছিল তাই দিয়ে ভাত খেয়েছে কি পেটের ব্যথায় 'বাপরে মারে' করতে করতে স্কুল থেকে বাড়ি পালিয়ে আসতে হয়েছে হাবুকে। দুদিন সে আর উঠতেই পারেনি বিছানা ছেড়ে। দেখে শুনে হাবুর ঠাকুমা বলেছেন, "রোগা পেটে কি অত সয়? খেলেই যদি সব রোগ ভাল হয়ে যেত তবে পেটুকদের কোন অসুখই হত না। অর্ধেক অসুখ হয় খাওয়া থেকে। উপোসের বাড়া আর ওষুধ নেই। ঝাড়া তিন দিন উপোস দে দিকি, দেখবি রোগ বালাই সব হাওয়া। আমাদের নিবারণ মিস্ত্রিরের ব্যামো তো ওই করে সারল।"

তিন দিন দূরের কথা উপোস দেওয়ার প্রথম রাত্তিরটি সবে কেটেছে কি হাবু এমনি চিঁহি চিঁহি ডাক ছেড়েছে যে চাকর পাঠিয়ে ডাক্তার ডেকে আনতে হয়েছে তখুনি তার জন্যে।

ডাক্তার মানে ওই পঞ্চানন হোড়। হুট্ বলতে তো আর একশো আট টাকা বের করে দেওয়া যায় না ত্রিদিব তলাপাত্রের জন্যে। হাতের কাছে আর কাউকে না পেয়ে চাকর তাঁকেই নিয়ে এসেছে ধরে। সবে তখন তাঁর নতুন ডাক্তারখানায় সাইন বোর্ড টাঙ্গিয়ে ধূপ-ধুনো দিয়ে বসেছেন কি পঞ্চানন, শম্ভু হন্তদন্ত হয়ে গিয়ে তাঁকে বলেছে সব কথা।

"ছেলেটাকে একেবারে শেষ করে এনেছেন দেখছি।" প্রথম হাবুকে তারপর তার চিকিৎসার কাগজপত্র পরীক্ষা করে কপালে চিন্তার রেখা ফেলে বলেছেন পঞ্চা-ডাক্তার—

"আসলে রোগ কেউ ধরতে পারেনি, অন্ধকারে হাতড়ে মরেছে কেবল। ডাক্তার তো নয়, ধর্মের ষাঁড় এক-একটি।" অল্পে অল্পে মেজাজ চড়তে থাকে যেন পঞ্চানন বাবুর,—মাথায় গোবর পোরা সব ক'টার; ছেলেধরা ঘুঘু এক-একটি ..."

দিগগজ দিগগজ সব ডাক্তারদের এক কথায় নস্যাৎ করে দেয় নতুন ডাক্তার, তবু পঞ্চাননের মুখের ওপর কথা বলতে সাহসে কুলোয় না কারো। যেমন গমগমে গলা লোকটার, নাকের নীচে গোঁফ জোড়াটাও তেমনি পেল্লায়। সবাই মুখ নীচু করে বসে শুনেই যায় তাঁর কথা। হাবুর অমন যে জলন্ধরের মেসো, তিনিও চুপ করে বসে নখ খুঁটতে থাকেন একমনে।

"এখন দেখছি গড়পার থেকে তালতলা এসে ভালই করেছি।" হাবুর মুখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে গোঁফের ফাঁকে এক মুঠো হাসি ছিটিয়ে বলেন পঞ্চানন, 'অন্তত একটি শিশুকে তো বাঁচাতে পারবো অকাল মৃত্যুর হাত থেকে। আহা, কতদিন এই রকম একটি রোগী খুঁজেছি। যতদূর মনে পড়ে এমনি একটি রুগী দেখেছিলাম উনিশশো ত্রিশ সালে। সে এখন,"—বলে হাসিটাকে গোঁফের আড়াল থেকে সারা মুখে ছড়িয়ে দেন পঞ্চানন, আর বুড়ো আঙুলখানা ওপরে তুলে নাড়াতে থাকেন ডাইন-বাঁয়ে।

"মারা গেল"! অবুবাবু মানে হাবুর বাবার মুখে কথা ফোটে এতক্ষণে। "অকালেই পটল তুলতে হল বুঝি তাকে?"

"আহা রে!" সমবেদনায় হাবুর ঠাকুরমার গলাও ভারী হয়ে আসে।

"মারা যাবে কেন, এ্যাঁ!" বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে ধমক দিয়ে ওঠেন পঞ্চাননবাবু,— "মারা অমনি গেলেই হল! আমার হাতে রুগী মরা অত সহজ নয়, বুঝলেন। উড়োজাহাজের পাইলট সে মশাই এখন। এরোপ্লেন নিয়ে হিল্লি-দিল্লী করে। এই গত মাসেও চিঠি দিয়েছে আমায় সিমলা থেকে।"

ততক্ষণে চা এসে গিয়েছিল। এক চুমুকে পেয়ালা খালি করে রুমাল দিয়ে গোঁফ জোড়াটি মুছে পঞ্চানন বলেন, "তাহলে কি ঠিক করলেন, বলুন। আমার হল স্পষ্ট কথা। ওর চিকিৎসার ভার যদি দিতে চান আমায় বলুন তাহলে। আপনাদের অমত না থাকলে ঝটপট কাজ সুরু করে দিতে চাই আমি"।

"সে কথা আর বলতে!" হাত কচলে বলেছেন হাবুর বাবা, "ভাগ্যে যখন আপনার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে তখন এ সুযোগ আর ছাড়ি কি বলে। এখন আপনি যদি দয়া করে—"

"বেশ।" হৃষ্টমুখে গোঁফ চুমড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন পঞ্চানন; "তবে একটা শর্ত! আমার চিকিৎসা পদ্ধতি কিন্তু একটু অন্য রকম। এম. বি. ডিগ্রী আছে বলে আমি যে কেবল এ্যালোপ্যাথী মতেই চিকিৎসা করে যাবো আপনার ছেলের এমন ভাববেন না। রোগ সারানো নিয়ে হল কথা। তার জন্য দরকার হলে মুষ্টিযোগও প্রয়োগ করতে পারি আমি।" বলে হাতের ঘুষি পাকিয়ে হাবুর বাবাকে তা দেখিয়ে পরক্ষণেই নিজের রসিকতায় হ্যা-হ্যা করে হেসে সারা হল। হাসির দমকে তাঁর গোঁফ জোড়াটি কাঁপতে থাকে, যেন ঝড়ে দোলা পাখির বাসা কোন।

"আর আমার চিকিৎসা যদ্দিন চলবে তদ্দিন আর কোন ডাক্তার এ বাড়িতে নাক গলাতে পারবে না, চোখ পাকিয়ে সবার দিকে তাকান পঞ্চানন, সে তলাপাত্রোর, ফুটোপাত্রোর যেই হোক। এতেও আপনি রাজী? বেশ তবে কাল থেকেই সুরু করা যাক।" গোঁফ চোমরানো সেরে এবার সামনে হাত বাড়িয়ে দেন পঞ্চানন। কড়কড়ে কুড়িটি টাকা পকেটস্থ করে "গুড নাইট" বলে হাত নেড়ে তড়বড়িয়ে নেমে যান নীচে।

"বাব্বা, কি চেহারা!" হাঁফ ছেড়ে বলেন জলন্ধরের মেসো। গোঁফ তো নয় যেন ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান।

"আর গলা।" ঠাকুমা বলে ওঠেন, "ঠিক যেন যাত্রার দলেব রাবণ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, এই রকম মনে হচ্ছিল আমার।"

অবুবাবু কিছু বলেন না। রাবণ হোক আর বিভীষণ, নতুন ডাক্তারের চিকিৎসায় হাবুর অসুখ যদি সেরে যায়, তবে তার চেয়ে সুখের আর কিছু যে হতে পারে না, এই ভাবনাটাই তাঁর মন জুড়ে থাকে।

হাবুর চিকিৎসা যা সুরু হল তা আর কহতব্য নয়। প্রথম দিনই ইয়া এক বোতল পাঁচন দিলেন পঞ্চানন। কী তেতো যে সেই পাঁচন তা হাবুই জানল। প্রথম চামচটি মুখে দিতেই যেন অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসতে চাইল। মরি বাঁচি করে তা শেষ করেছে তো সুরু হল মালিশ। যেমন বিটকেল গন্ধ সেই তেলের, তেমনি রং। প্রথম দিন বোতলের ছিপি খুলতেই নাকে কাপড় দিয়ে অবুবাবু ছুটে এসেছেন পঞ্চা-ডাক্তারের 'আরোগ্য-আলয়ে'।

তাঁব মালিশ নিয়ে নালিশ শুনে ভদ্রলোককে প্রায় মারতে বাকি বেখেছেন পঞ্চানন। "সামান্য গন্ধ নিয়ে এত বাতিক আপনাদের? গন্ধ বেশী বলে নাক সিঁটকোচ্ছেন, আপনার ছেলের ব্যামোটা কি কম? কুকুর যেমন, মুগুরও তেমনি হবে না কি? হাড্ডিতে অসুখ ওর, বুঝলেন মশাই, হাড় বজ্জাত রোগ। মালিশেব তেল হাড় পর্যন্ত ঠেলতে না পারলে শরীরে মাস গজাবে না জানবেন।"

কিন্তু হাবুর চেহারা দিনে দিনে হাড্ডিসার হতে থাকে। আর পঞ্চা-ডাক্তারের ওষুধ খেতেও তার আপত্তি ক্রমশ বাড়ে। পঞ্চাননের গলা পেলে এখন সে ছুট দেয় বাগানে। ধরে-বেঁধে আনতে হয় তাকে ওষুধ খাওয়ার জন্যে। দেখে শুনে বেশ ভাবনায় পড়লেন অবুবাবু। তাঁর চিকিৎসা চলাকালীন আর কোন ডাক্তারকে ঘেঁষতে দেবেন না এ বাড়িতে আগেই এ চুক্তি করে নিয়েছিলেন পঞ্চানন হোড়। এখন এঁকে ফেলবেন কোন উপায়ে আর রেখেই বা কি লাভ কিছুই যেন দিশে পান না তিনি।

সেদিন হাবুর ঘরে বসে এই আলোচনাই হচ্ছিল। ঠাকুমাও একধারে বসে শুনছিলেন সব। বললেন, "ওই যে বড় ডাক্তার কি যেন পাত্তোব, তাকেই খবর দে-না একদিন। কি হাল করেছে দুধের বাছাব দেখে যাক এসে।"

"পঞ্চানন বাবুর মানা আছে জানো তো।" অবুবাবু মনে করিয়ে দেন মাকে। "তাঁর চিকিৎসা যদ্দিন চলবে, ততদিন অন্য কোন ডাক্তারকে খবর দিতে পারবো না আমরা।"

"হ্যাঁ, মাথার দিব্যি দিয়ে রেখেছি একেবারে।" ফোঁস্ করে ওঠেন ঠাকুমা, "আমাদের ইচ্ছে হলে আমরা একটার জায়গায় দশটা ডাক্তার ডাকবো. ও বলার কে? ওর ভিজিটের টাকা পেলেই তো হল। কর তুই টেলিফোন—"

মার পীড়াপীড়িতে অগত্যা অবনীবাবুকে টেলিফোন করতে হয় ডাক্তার তলাপাত্রকে। তলাপাত্র চেম্বারেই ছিলেন। বললেন, "সেই হাবু? ঠিক এখনই তো যেতে পারছি না। আমার কম্পাউণ্ডার ক্যাশ ভেঙ্গে পালিয়েছে। থানা-পুলিশ করতে হচ্ছে রোজ।"

"তবু একদিন সময় করে আসুন দয়া করে। ছেলের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়।" মিনতি করে বলেন অবনীবাবু।

টেলিফোন নামিয়ে ঠাকুমাকে বললেন, "তলাপাত্রের তো দেরী হবে বলছে আসতে। ওঁর কম্পাউণ্ডার ক্যাশ ভেঙ্গে পালিয়েছে, চেম্বারের যন্ত্রপাতিও অনেক লোপাট। সেই ব্যাপারে ব্যস্ত।"

মেসো বললেন, "সে কি? কি রকম চেহারা? গোঁফ আছে নাকি?"

অবুবাবু হেসে বললেন, "গোঁফের কথা তো কিছু বললেন না। থানায় ফটো জমা দিয়েছেন, সেই কথাই বললেন..."

ঠাকুমা ভুরু কুঁচকে সব শুনছিলেন, এখন বললেন "যাই বলিস বাপু ও ডাক্তারের রকম-সকম আমার ভাল লাগে না। কখনও হাসে, কখনও খেপে যায়। আর ও কি গোঁফ! ডাক্তারে অমন গোঁফ রাখে শুনিনি।"

হেসে অবুবাবু বললেন, "ডাক্তারে কেমন গোঁফ রাখবে, তাও বলে দেবে তোমরা? তার চিকিৎসাই হল আসল কথা। সেটার বিচার করো। ইচ্ছে মতন গোঁফ রাখার স্বাধীনতা সব পুরুষেরই আছে। গোঁফের আমি, গোঁফের তুমি—শোন নি—।"

"চিকিৎসার নমুনাও তো দেখছি।" ঠাকুমা মুখ বেঁকান; ছোঁড়ার হাল দিন দিন কি করে তুলেছে দেখছিস না? তুই ধর দিকি একবার তলাপাত্তোর না ফুটোপাত্তোরকে, আমি কথা বলি।"

অবুবাবু অবাক। বললেন, "এই তো আমি কথা বললাম, তুমি আবার কি বলবে? বড় ডাক্তার বার বার ফোন করলে বিরক্ত হবেন।"

"তুই লাইনটা ধরে দেনা আমায়।" ঠাকুমা জোর দিয়ে বলেন, "কথা তো বলবো আমি। তলাপাত্তোর আমায় আজ চেনে না। তোর ছোটকার সঙ্গে পড়ত নীলরতনে। কতদিন আমার বাড়ি এসে দই-সন্দেশ খেয়ে গেছে। তখন একটু তোতলা ছিল, পরে চিকিৎসা করে সেরে গেছে।"

তলাপাত্র লাইনে আসতেই ঠাকুমা বললেন, "কে তিলু? আমি মিসেস খাস্তগীর বলছি, হাবুর ঠাকুমা। চিণ্টুকে মনে আছে তো? আমি তার রাঙা বৌদি। একবারটি এসে নাতিকে যে দেখে যেতে হয়।"

তলাপাত্র কথা দেন তিনি পরদিন আসবেন। ঠাকুমার প্রশ্নের উত্তরে জানালেন তাঁব কম্পাউণ্ডারের গোঁফ ছিল না। ক্লীন সেভ্‌ড্‌, লম্বায় পাঁচ ফুট, রং কালো, কথা বলে নাকি সুবে।

টেলিফোন নামিয়ে রেখে এক মুহূর্ত কি ভাবেন ঠাকুমা, তারপর অবুবাবুর দিকে তাকিয়ে বলেন, "পঞ্চানন হোড়ের নাম তো আগে শুনিনি এ পাড়ায়। এ্যাদ্দিন ছিল কোথায়?"

"গড়পার।" জবাব দেন অবনীভূষণ।

"ছেড়ে এল কেন?"

"এখানে বড় দোকানঘর পেয়ে গেলেন বিনা সেলামীতে, আব গড়পারেব চেযে তালতলা বর্দ্ধিষ্ণু এলাকা, সেই জন্যেই। পশারের সুযোগ বেশী এ পাড়ায।"

"পশাবেব সুবিধের জন্যে কি কেউ পুরানো পাড়া ছেড়ে আসে, ঠাকুমা বলেন কপাল কুঁচকে, গড়পার যদি হয় তবে তরুরা তো নিশ্চয়ই চিনবে, ওরা ও পাড়ায় আছে ছত্রিশ বছর। একবার দেখ তো টেলিফোনে তরুর বর বোধহয় এখনও বেরোয়নি অফিসে ...।

"ডাক্তারের ওপর গোয়েন্দাগিরি করতে চাও তুমি করো," অবনীবাবু রাগ করে উঠে পড়েন,—"ও আমার পোষায় না"। মার সঙ্গে অনেক বিষয়েই তাঁর মতের অমিল। এই কদিন মাত্র এসেছেন তরঙ্গিণী, ছোট ছেলের বাড়ি গাজিয়াবাদ ছেড়ে অবনীবাবুর কাছে। এর মধ্যেই বড় ছেলের সঙ্গে বেশ ক'বার খিটমিটি লেগে গেছে তাঁর।

"লোককে সন্দেহ করা তোমার বাতিক।" অবনীবাবুর অফিসের সময় হয়ে যাচ্ছিল, তোয়ালে হাতে বাথরুমের দিকে যেতে যেতে তিনি বলেন, "এতে লাভ কিছু হয় না। চিকিৎসা পছন্দ না হলে তাকে বাদ দিতে পারার অধিকার তোমার আছে, কিন্তু একজন মান্য চিকিৎসকের পেছনে টিকটিকি লাগালে রুগীব কি উপকার হয়, তা আমি বুঝে পাই না।"

ঠাকুমা শুনে যান সব, কিছু বলেন না। মনটা কিছুতেই সুস্থির হতে চায় না তাঁর। দুপুরে পুরুষরা যখন বাড়ির বাইরে এবং মেয়েরা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোচ্ছে, তিনি গায়ে চাদর, লেডিজ ছাতা হাতে বেরিয়ে পড়েন চুপি-চুপি।

এদিকে বিকেল নাগাদ বাড়িতে এক কাণ্ড হয়। পঞ্চানন নির্দিষ্ট সময়ে এসেছিলেন। হাবুর জন্যে হাতে ছিল নতুন ওষুধের শিশি। হাবু তা কিছুতেই মুখে দেবে না। অন্যদিন ঠাকুমাই বুঝিয়ে-সুজিয়ে ওষুধ গেলান তাকে। আজ তিনি না থাকায় হাবুর দাপানি আরও বাড়ে। পঞ্চানন তাকে জাপটে ধরে ওষুধ গেলাতে গিয়েছিলেন, বন্দী অবস্থায় মরীয়া হয়ে পঞ্চা-ডাক্তারের শ্মশ্রুদ্যান ধরে মেরেছে এক টান। গোঁফটা ফস্ করে খুলে আসতে পঞ্চানন বিমূঢ়, হাবুর তো চক্ষু চড়কগাছ। ভয়ে সে ঠক ঠক করে কাঁপছে। গোঁফ খোয়া যেতে পঞ্চাননের চেহারা শুধু নয়, মেজাজও পাল্টে যায় সঙ্গে সঙ্গে। ঘরের কোণে হাবুর স্কুলের স্যুটকেশ রাখা ছিল, তাই দু'হাতে তুলে উগ্রমূর্তি ধরে হাবুকে মারতে যাবে কি, দরজার কাছ থেকে তীক্ষ্ণস্বরে শোনা যায় 'হ্যাণ্ডস্ আপ'!

চমকে সে ফিরে তাকায়। দরজার মুখে দাঁড়িয়ে ঠাকুমা। তাঁর হাতের লেডীজ ছাতা বন্দুকের মত করে ধরা, চোখে দারুণ ভ্রূকুটি। লাফ দিয়ে পঞ্চানন দরজার দিকে যাবে কি ভেতরে ঢোকেন ত্রিদিবেশ তলাপাত্র। পঞ্চাননকে দেখে চোখ কপালে তুলে বলেন, "আরে এই তো দশানন দলুই। আমার দশটি হাজার গাপ করেছে। আপনি যে তবে গোঁফের কথা বলছিলেন মিসেস খাস্তগীর ...।"

"এই যে আমার হাতে"—ঘরের মাঝখান থেকে হাত তুলে দেখায় হাবু। পঞ্চাননের বিশাল গোঁফ জোড়া দেখে তলাপাত্রের মাথাব চুল খাড়া হতে বাকি থাকে।

বাইরে গলা বাড়িযে তিনি হাঁক দেন, "ইন্সপেক্টর পাকড়াশী, দু'জন সেপাই পাঠান জলদি .।"

রিভলভার হাতে তালতলা থানার দারোগা পাকড়াশী ঘরে ঢোকেন সেই দণ্ডে। পেছনে দুই ভোজপুরী সেপাই। পঞ্চানন, থুড়ি দশানন তখন ঘরের পেছনের দরজা অর্থাৎ বাড়ির ভেতবের দিকে পথ খুঁজছিল। পাকড়াশীর হাতের রিভলভার দেখে সে থমকে দাঁড়ায়। সেপাই দুজন তাকে বাগিয়ে ধরে তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিতে সে শান্ত হয়ে যায় একেবারে।

ঠিক তখনই বাড়ির সামনে আরও একখানা গাড়ি এসে দাঁড়ায়। হাবুর বাবার অফিসের গাড়ি। গাড়ি থেকে নেমে বৈঠকখানায় পা দিয়ে অবুবাবু অবাক।

ঠাকুমা ভেতরে গলা বাড়িয়ে বলেন, "একটু চায়ের জল বসিও বৌমা। কেট্‌লীতে কুলোবে না. ভাতের হাঁড়িতেই বসিও বরং।"

সকলে বসতে ঠাকুবমা বললেন, "প্রথম থেকেই আমার কেমন কেমন ঠেকেছিল। এ্যালোপ্যাথ ডাক্তার অথচ পাঁচন খাওয়াচ্ছে, মালিশের তেল পাঠিয়ে দিচ্ছে আর সব সময় কেমন একটা হামবড়া ভাব। ওদিকে তলাপাত্রকে ফুটো করে কম্পাউণ্ডার উধাও হল এদিকে এ পাড়ায় দেখা দিল নতুন ডাক্তার। তারপর দেখতাম গোঁফ। কেবল আকারেই অতিকায় নয় ও বস্তু, দশানন যে খুব বেশী সচেতন ছিল ওর গোঁফ নিয়ে তা আমার নজব এড়াত না। আমাদের এই ঘরে বসে ও প্রায়ই ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় উঁকি দিয়ে দেখে নিত গোঁফ জোড়া। আজ তরুর বাড়ি যেতেই সন্দেহটা জোরদার হল। গড়পারে ও নামে কি ও চেহারায় কস্মিনকালেও কোন ডাক্তার ছিল না।"

ঠাকুমা একটু দম নিয়ে ফের হেসে বলেন. "গড়পার না বলে ও যদি গড়িয়া বলত তবে আমার যাচাই করতে অসুবিধে হত একটু। তারপর তরুকে নিয়ে ট্যাক্সি করে সোজা তলাপাত্রের চেম্বারে। সেখান থেকে থানায়। এখানে এসে দেখি নাটক সুরু হয়ে গেছে। নায়কের হাতে ভিলেন কাবু অর্থাৎ হাবু ছদ্মবেশ খুলে ফেলেছে দশাননের। হাতে-নাতে ধরা বোধহয় একেই বলে। যাকে সবচেয়ে কষ্ট দিয়েছিল ও, তার হাতেই পড়ল ধরা। আচ্ছা, অমন একটা গোঁফ ও জোটাল কোত্থেকে বলুন তো?"

তলাপাত্র পাইপে তামাক ভরছিলেন। মুখ তুলে বললেন, "ওর দাদা চড়ানন, সাজমহলের মেক-আপ ম্যান। তার ওখান থেকেই সংগ্রহ করেছে মনে হয়। গলাটাও পাল্টে হাঁড়িচাচার মত করেছে বোধহয় থিয়েটারী কায়দায়। শনিবার, শনিবার ও ছুটি নিয়ে নাটক দেখতে যেত এখন মনে পড়ছে আমার।"

"ওটা যে ওর স্বাভাবিক গলা নয় সেটা মাঝে মাঝে সন্দেহ হত আমার, মাথা দোলাতে দোলাতে বলেন ঠাকুমা, সব সময় ঠিক একই রকম গলায় কথা বলতে পারত না ও।"

"ধন্যি আপনার চোখ আর কান।" তলাপাত্র ঠাকুমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন "তবে আপনি যেভাবে 'হ্যাণ্ডস্ আপ' বলেছিলেন আমি চমকে উঠেছিলাম।"

"তার ওপর লেডীজ ছাতা বাগিয়ে ধরে"—হাসতে হাসতে বলে ওঠেন রণজয় পাকড়াশী—"সে মারমুখোভঙ্গী এখনও আমার চোখে ভাসছে।"

"রহস্য গল্প পড়নি?"— ফোকলা দাঁতে হেসে বলেন ঠাকুমা,—"কিরীটি রায়, ব্যোমকেশ বক্সীরা তো অমনি ভাবেই হেঁকে ওঠে গল্পের শেষ দিকে। হাবুর আলমারীর সব বই আমার পড়া। আমি দেখছিলাম পাকড়াশী তখন ভ্যান ঘুরিয়ে সামনে পার্ক করাচ্ছেন, কয়েক মিনিট ওকে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দেওয়ার দরকার ছিল।"

"সত্যি ঠাকুমার জবাব নেই,"—পাকড়াশী হঠাৎ হেঁট হয়ে তার পায়ের ধুলো নিতে নিতে বলে,—"রহস্য-গল্পের গোয়েন্দারা আপনার ধারেকাছে লাগে না। আপনি শার্লক হোমসের জেঠী। যদি পেশাদারী গোয়ন্দাগিরি ধরতেন তবে লালবাজারের বেশ কিছু লোকের যে অন্ন মারা যেত তাতে সন্দেহ নেই।"

সকলে হেসে ওঠেন। চা এসে গিয়েছিল। অবুবাবু একটা পেয়ালা টেনে নিয়ে তলাপাত্রকে শুধোলেন "কিন্তু ওর ডিগ্রীটা? ওই এম. বি. (ক্যাল.)?"

তলাপাত্র পাইপে ধোঁয়া ছাড়েন। "ওটা বোধহয় বিশেষ করে হাবুর জন্য নিয়েছিল ও। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিধানে ওর যাই মানে হোক, এক্ষেত্রে এম. বি. মানে মারণ-বিশারদই ধরতে হবে।" মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে অবনীবাবুর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন তিনি, "হাবুকে তো প্রায় শেষ করে এনেছিল খুনেটা।"

আর এক প্রস্থ হাসির হরবা ওঠে। দশানন ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে কি বলতে চায়. সেপাই দুজন তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে ভ্যানে নিয়ে ফেলে।

ঠাকুমা উঠে পড়ে বলেন. "সাতটা বাজল প্রায়, আমার সন্ধ্যের জপটুকু সেরে আসি। কেউ কিন্তু উঠবে না। এতকাল চেনা-জানা লোকের মাসী-পিসি হয়েই ছিলুম, আজ যখন একটা ভিনদেশী আর কেউকেটা মানুষের জেঠী হওয়ার খেতাব পেলুম মিষ্টিমুখ না করিয়ে কাউকে ছাড়া ঠিক হবে না। পাকড়াশী দেখো, আমি না আসা পর্যন্ত একটা লোকও যেন এখান থেকে একচুল না নড়তে পায়।"

পাকড়াশী যেন হুকুমের অপেক্ষায় ছিল। সঙ্গে সঙ্গে এ্যাটেনশনের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে খটাস করে স্যালুট বাজিয়ে বলল, 'যো হুকুম'।

আবার সকলে হেসে ওঠে।

অপরাজেয়

কালিদাস রক্ষিত

বিপুল আগুন ছড়িয়ে একটু আগেই সূর্য অস্ত গেছে। ঘন শাল আর বাঁশবনে ঘেরা রেল স্টেশনটায় দিনের আলো দ্রুত নিভে আসছে। ছোট রেল স্টেশন। প্ল্যাটফরমটার বুক চেপে দাঁড়িয়ে আছে একটা ছোট আকারের মালগাড়ি। নিথর, নিশ্চল। একটু দূরেই প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে রেল ইঞ্জিনটা যেন আষ্টে-পিষ্ঠে রজ্জুবদ্ধ একটা আদিম জন্তুর মত অসীম আক্রোশে ফুঁসে চলেছে। গলগল করে কালো নিঃশ্বাস ধেয়ে উঠে যাচ্ছে রক্তিম আকাশে।

চতুর্দিক থমথমে। কোথাও জন-মানবের চিহ্ন নেই। শুধু রাইফেলধারী কয়েকজন সি. আর. পি. টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। ভারি বুটের খটাখট শব্দে ভয় পেয়ে রাত্রির আশ্রয়ে ফিরে আসা ক্লান্ত পাখিরা মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠছিল তারস্বরে।

—সব ঠিক আছে?

গম্ভীর বাজ্‌খাঁই গলায় বলতে বলতে তেজেন সেন প্ল্যাটফর্মে ঢোকে। বেঁটে, খাট, স্থূলকায় একজন মানুষ। চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা, মুখের এখানে সেখানে গোটা তিনেক কাটা দাগ। চওড়া গোঁফের ঘন লোম তার ঠোঁট ঢেকে রেখেছে।

স্যালুট ঠুকে কাছের প্রহরীটি জবাব দিল, ইয়েস স্যার। সব ঠিক আছে।

—খুব হুঁসিয়ার থাকবে। সবদিকে কড়া নজর রাখ।

— ইয়েস স্যার। রাইফেলের শক্ত বাঁট সিমেণ্টে ঠুকে আবার স্যালুট দেয় সাহেবকে।

তেজেন সেন গম্ভীর মেজাজে কয়েকবার পায়চারি করে। বাঁ হাতের তালুর উপর মুষ্ঠিবদ্ধ ডান হাত দিয়ে আঘাত করতে করতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, ইঞ্জিনে ঠিক মত কয়লা দেওয়া হচ্ছে?

— হ্যাঁ স্যার। সুভাষ আর মঙ্গল ইঞ্জিনে আছে।

— কে? অ। দোজ লয়্যাল ফায়ারমেন।

— ঐ দেখুন স্যার।

ইঞ্জিন থেকে একঝলক আগুনের হল্কা ছিটকে আসে বাইরে। ঘনিয়ে আসা অন্ধকারে আশপাশের ঘন ঝোপ-ঝাড় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তেজেন সেন আঁতকে উঠে চোখ সরিয়ে নেয়। ঐসব ঝোপ-ঝাড়কে তার বড় ভয়। ঐ জঙ্গল দিয়েইতো কুত্তাগুলো পালাল। সে একটা সিগারেট বের করে গোঁফের ঘন লোমের মধ্যে গুঁজে দিয়ে দাঁতে চেপে ধরে। তার মত একজন ডাক-সাইটে পুলিশ অফিসারকেও এভাবে বুদ্ধু বানিয়ে দিলে! আমি শালা কোন ছার, খোদ গভ্‌মেণ্টই কি বুঝতে পেরেছিল শালাদের কোমরে এত জোর? তেজেন সেন আপন মনে গজগজ করে। ভেবেছিল ষ্ট্রাইকই হবে না। হলেও দুদিনেই ভেস্তে যাবে। আজ কুড়ি দিন যাবত ধর্মঘট করে আছে! তামাম দেশটার রেল লাইনকে শালারা ডেডলক্ করে রেখেছে!

গুলি মার। হঠাৎ আত্মসচেতন হয়ে ওঠে তেজেন সেন। দেশের ভাবনার দায়িত্ব তার নয়। হুস্ করে একমুখ ধোঁয়া উড়িয়ে তেজেন সেন ঘুরে ফিরে ট্রেনটাকে দেখে নেয়। অস্বচ্ছ আলোয় চকচক করছিল তেলের ওয়াগনগুলো। হ্যাঁ, এই মালিগাড়িটাকেই চমনলাল স্টীল ফাউণ্ড্রিতে

পৌঁছে দেবার দায়িত্ব পড়েছে তার ওপর। দায়িত্ব নয়, মস্ত বড় সুযোগ। অফিসার সাহেব উত্তেজনায় ঘন ঘন পা নাড়ে। আর সে জন্যই তার সমস্ত শক্তি এবং বুদ্ধি প্রয়োগ করেছিল।

....বাতাসিয়া জংশনে মালিগাড়িটা আটকা পড়েছিল— সেই ধর্মঘট শুরু হবার দিন থেকে। গত পরশু হুকুম এল— যেমন করে পার চমনলাল স্টীল ফাউণ্ড্রিতে মালগাড়িটা পৌঁছে দাও। অবস্থা সংগীণ। ফুয়েল শেষ। যে কোন সময় ফাউণ্ড্রি ডেড্ হয়ে যেতে পারে। আর স্বয়ং এস. পি. অনুরোধ করলেন তেজেন সেনকে, "শো ইওর স্কিলনেস্।" তেজেন সেন তার দক্ষতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মুহূর্তে।... ড্রাইভার... রেলইঞ্জিন-ড্রাইভার .. যেমন করে পার— যেখান থেকে পার, ধরে আন। রেল কোয়ার্টার্সের প্রতিটি ঘর সে চষে ফেলেছিল। হানা দিয়েছে তাদের আত্মীয়পরিজনের বাড়িতে বাড়িতে। কিন্তু সব বেপাত্তা। যেন হাওযায় মিলিয়ে গেছে সব। কিন্তু ওতে তো দমবার পাত্র নয় জাঁদরেল পুলিশ অফিসার শ্রী তেজেন সেন। সে ভিন্ন জাল পাতল। সাদা পোশাকের পুলিশ আর ইন্‌ফরমার ছড়িয়ে দিল বাতাসের মত। সঙ্গে সঙ্গে ফল। একটা ডাক্তারখানা থেকে ধরা পড়ল তিনজন— একেবারে আসল মাল। তার মধ্যে দুজনই ছিল ড্রাইভার। রুগী সেজে গোপন যোগাযোগ কেন্দ্র বানিয়েছিল ডাক্তারখানাটাকে। কাজটা মিটে যাক্, তারপর ডাক্তার বাঞ্চোতকে অ্যায়সা টাইট— খকখক করে কেসে ফেলল তেজেন সেন। উত্তেজনায় হাঁ করা মুখের মধ্যে সুড়ুৎ করে একটা মশা ঢুকে পড়েছিল। সে কাছের সি. আর পিকে হুকুম দিল, এই, কি করছ? বাতি লাগাও। অন্ধকার হয়ে গেছে, দেখছ না? আর শোন, ইঞ্জিনের ঘরে একটা বাতি দাও।

তেজেন সেন চোখের সামনে হাতের কব্জিটা তুলে ধরে সময় দেখে। দুশ্চিন্তা আব উদ্বেগের কালো শিরা ফুটে উঠল কপালে। চ্যাটার্জীর এতক্ষণে তো এসে পড়ার কথা। তাহলে খবরটা কি— পরমুহূর্তেই সে দ্রুত মাথা নাড়ে, নো— নো পাক্কা ইনফবমেশন। চাষীদের বস্তিতে আশ্রয় নিয়েছে রতনলাল নামে একজন এক্‌স্‌পার্ট ড্রাইভার। মৈনুদ্দিন শেখের বাড়িতে আছে। পালাবার সুযোগ পাবে না বাছাধন। চাষীদের গোটা বস্তিটাকেই ঘিরে ফেলতে বলেছে তেজেন সেন। প্রয়োজনে গুলি চালাবার হুকুমও দিয়েছে। সে জানে— খালি হাতে ফিরে আসার ছেলে নয় চ্যাটার্জী।

গলগল করে ধোঁয়া উঠছিল ইঞ্জিনটা থেকে। বয়লারে জল ফুটছে। ক্রমে ক্রমে ঘন হচ্ছে বাষ্প। সুভাষ আর মঙ্গল ইঞ্জিনে কয়লা ঠেলছে। পালাবার সময় ইঞ্জিনেব কযলাও ফেলে দিযে গিয়েছিল বস্টার্ডগুলো। খটাখট বুটের শব্দ। তীব্র পাওয়ারের টর্চলাইন ট্রেনটাকে ঘুবে ফিবে অতর্কিতে ছুটে যাচ্ছিল। তেজেন সেন একজনের হাত থেকে একটা টর্চ নিযে ইঞ্জিনটাব কাছাকাছি এগিয়ে গেল। টর্চটা জ্বালল। সেই জঙ্গলটা স্পষ্ট হল। বাঁশঝাড়, তাবপব শালবন। শালবন পেবিয়ে পথটা চালু হয়ে গেছে ফসলের খেতে। উত্তেজিত টর্চলাইটটা কয়েকবার এদিক ওদিক ছুটোছুটি কবল। পলাতক পায়ের ছাপগুলি যেন এখনও স্পষ্ট করে দেখতে পেল তেজেন সেন। হিংস্র জন্তুর মত তার চোখ দুটো দপ্ করে জ্বলে ওঠে।

...বাতাসিয়া স্টেশন থেকে ওরা ভাল মানুষের মতই গাড়িটা ছেড়েছিল। তবু তেজেন সেন সতর্কতার কোন ত্রুটি রাখেনি। গার্ডেব কেবিন থেকে ইঞ্জিনের পাদানিতে আর্মস ফোর্সের ব্যবস্থা তো ছিলই, প্রতিটি স্টেশন, এমন কি প্রতিটি টারনিংপয়েন্টেও ফোর্স মোতায়েন করেছিল। পর পর দুটো স্টেশন নির্বিঘ্নে পেরিয়ে এসেছিল। তারপর গাড়িটা এই স্টেশন যখন অতিক্রম করে যাচ্ছে, গার্ডের কেবিনে দাঁড়িয়ে তেজেন সেন স্যালুট নিচ্ছিল সি, আর, পি-র, হঠাৎ বিকট শব্দ করে ট্রেনটা থেমে গেল। সামনে থেকে কযেকজনের অতর্কিত চিৎকার...আগুন —আগুন। তেজেন সেন সামনে তাকিয়ে দেখে— ধোয়ার অন্ধকার। লোকজনের ছোটাছুটিব শব্দ... কেবিন থেকে লাফিয়ে পড়ে সেও নিরাপদ দূরত্বে আশ্রয় নিয়েছিল। তেলের গাড়ি। এখনই হয়ত একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে যাবে। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই সহসা উপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। একজন প্রহরীর আর্ত চিৎকার, ভাগ গিয়া— আসামী ভাগ গিয়া...

হঠাৎ নিজের কপালে প্রচণ্ড চাপড় মারে তেজেন সেন। রক্তাক্ত মশাটাকে কপালের ওপর থেকে এনে দু আঙ্গুলের ক্রুদ্ধ চাপে পিষতে পিষতে দাঁত কড়মড় করে— এমন ভাবে বুদ্ধু বানাবে, আগে জানলে— আগে জানলে—

— স্যার।

— কে? অ! বল।

— মেসেজ এসেছে স্যার।

— মেসেজ? ও—ইয়েস। ভেরি গুড নিউজ।

প্রায় লাফাতে লাফাতে স্টেশনের বাইরে নেমে এল তেজেন সেন। পেট্রোমেক্সের আলোয় চতুর্দিক উদ্ভাসিত। দুটো জিপ দাঁড়িয়েছিল। পাশেই একটা ওয়্যারলেস ভ্যান।

সাবইনস্পেক্টর সরকার ছুটে এসে উত্তেজিত স্বরে জানাল, গুড নিউজ স্যার। পাখি ধরা পড়েছে। ভুগিয়েছে খুব। চাষীরা দল বেঁধে বাধা দিয়েছিল। কিছু ফোর্স এ্যাপ্লাই করতে হয়েছে। কিন্তু আজ ক্যাজুয়ালটি হয়নি। চ্যাটার্জী স্টার্ট করেছে। এস. পি. অন দি লাইন, স্যার। আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।

তেজেন সেন ছুটে গিয়ে ঢুকল ওয়্যারলেস ভ্যানে।

... তেজেন, বলছি... ইয়েস স্যার, ক্যাপচার্ড। ...হ্যাঁ...স্টার্ট করেছে।... রতনলাল...ইয়েস্, এক্সপার্ট ড্রাইভার...চাষীদের ঘর থেকে...তাই তো স্যার, আমিও বুঝতে পারছি না— বেল-ষ্ট্রাইকারগুলোর সঙ্গে চাষারা কেন জড়াতে গেল...আমার তাই মনে হয... লেসন নেবাব আছে স্যার ..ইয়েস, ইয়েস, ভেরি সিগ্নিফিক্যাণ্ট... না না, আর ভুল হবে না। সমস্ত প্রিকোশন নিয়েছি। আপনি মিঃ চমনলালকে বলে দিতে পারেন স্যার... সিওর, ঐ এসে গেছে ইয়েস, ইয়েস...আমরা এখনই স্টার্ট দিচ্ছি... থ্যাঙ্ক য়ু স্যার...

অন্ধকারেব বুক চিরে ভীম গর্জনে একটা কালো ভ্যান এসে দাঁড়াল। ত্রস্ত ব্যস্ততা দেখা দিল প্রহরীদের মধ্যে। মুহূর্তে তারা যে যার পজিশন নিল।

প্রথমে নামল সাব-ইনস্পেক্টর হারাধন চ্যাটার্জী। বিধ্বস্ত চেহারা, ইউনিফর্মের দু-এক জায়গায় ছেঁড়া। চোখ দুটো লাল। সে হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে বসের সঙ্গে করমর্দন করল।

— ক্রিমিনাল ইজ দেয়ার স্যার।

—ক্রিমিনাল? আও— নো, হি ইজ আওয়ার গেস্ট, চ্যাটার্জী, মাননীয় অতিথি। হা হা করে হেসে ওঠে তেজেন সেন। চ্যাটার্জী আর সবকারও যোগ দেয় সেই অট্টহাসিতে।

-- প্ল্যান মত সব ঠিক আছে?

— ইয়েস স্যার। এভবিথিং ও. কে। তবে মৃদু ফোর্স এ্যাপ্লাই করতে হযেছিল, স্যাব।

— দ্যাটস্ রাইট। এবার অতিথিকে নামাও। সরকার, তুমি দেখ একটা কাক-প্রাণীও যেন এদিকে গলতে না পারে। ট্রেন চলছে, রেডিও-র এই পাবলিসিটিতে কিছু প্যাসেঞ্জারের আসার পসিবিলিটি তো আছে।

— কিচ্ছু ভাববেন না স্যার। হেভি প্রটেকশন নিয়েছি।

চ্যাটার্জী নিজে গিয়ে ভ্যানের দরজা খুলে দিল। প্রথমে নামে একজন সশস্ত্র প্রহরী, তারপর নিচে নামান হল, 'মাননীয় অতিথিকে'। না, পালাবার কোন পথ নেই। প্রহবীরা সতর্ক হাতে রাইফেল নামিয়ে নেয়। রেল-ইঞ্জিনচালক রতনলালের হাত-পা লোহার শেকলে বাঁধা।

বহুদিনের পুরাতন রেল কর্মচারী রতনলাল। সুদেহী, সুদক্ষ ইঞ্জিন-ড্রাইভাব। ইঞ্জিনের আগুনে ঝলসে ঝলসে তার গায়ের রং হয়ে উঠেছে অদ্ভুত গাঢ় তামাটে। দৃঢ় কঠিন কব্জির ওপর লোহার বেড়ি কেটে বসেছে। মুখের একটা ধার কেটে এক ছিটে রক্ত জমে আছে। শরীরের অন্যান্য স্থানেও 'মৃদু' বলপ্রয়োগের জ্বলন্ত চিহ্ন। রতনলাল চারিদিকে তাকাল। মালগাড়িটা চোখে পড়তেই তার তামাটে চোখ দুটো দপ করে জ্বলে উঠল। দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, আমাকে আপনারা কেন বেঁধে এনেছেন?

— আপনাকে বেঁধে আনতে মোটেই ইচ্ছা ছিল না, রতনবাবু। তেজেন সেন দুপা এগিয়ে বিনীত স্বরে বলে। কিন্তু আপনারদের ঐ বেইমান কলিগগুলোই এর জন্য দায়ী। তারা ওভাবে পালিয়ে গেল বলেই—

— ভণ্ডামী ছেড়ে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলেন চলুন। এই নোংরা জানোয়াবগুলোর মাঝে দাঁড়িয়ে থাকতে গা ঘিনঘিন করছে।

— এইত, বাঃ, এইত লয়্যাল কর্মীর মত কথা। চলুন, চলুন রতনলালবাবু। হাঁটতে আপনার কষ্ট হচ্ছে না তো? দেশের এত বড় একটা দায়িত্ব আপনাদের কাঁধে, সেটা অবশেষে বুঝতে পেরেছেন জেনে কি যে আনন্দ হচ্ছে আমার। আমি আপনার রিওয়ার্ডের জন্য নিশ্চয়ই রেকোমেণ্ড—

— ওয়াক থোঃ—

তেজেন সেনের ঠিক নাকের ডগা ঘেঁষে হুস্ করে উড়ে গিয়ে কি যেন পড়ল। পেট্রোম্যাক্সের চমকা আলোয় সে দেখল— খানিকটা রক্তমাখা থুতু! ক্রুদ্ধ অফিসার সাহেব পিস্তলে হাত দিয়েও নামিয়ে নিল। না। এ সময় মাথা গরম করলে চলবে না। ট্রেনটা আগে পৌছোক স্টীল ফাউন্ড্রিতে, তারপর তোর সমস্ত তেল ফোঁটা ফোঁটা করে বার করে নেব বাঞ্চোৎ।

ইঞ্জিনঘরে ঢুকতেই ভূত দেখার মত চমকে উঠল রতনলাল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সামলে নিল। তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের স্বরে বললে, আচ্ছা, যা শুনেছিলাম, মিথ্যা নয় দেখছি!

সুভাষ বেলচা দিয়ে কয়লা জড়ো করছিল। মঙ্গল বসেছিল নিচে। ওরা হতবাক্ বিস্ময়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। একজন ড্রাইভার ধরে আনা হচ্ছে, এটা ওরা শুনেছিল। কিন্তু সে যে রতনলাল, এবং তাকেই যে এভাবে শেকল দিয়ে বেঁধে আনা হবে, এটা কল্পনাই করে নি। আতঙ্ক আর উদ্বেগে ওদের চোখগুলো বড় হয়ে গেল।

— তোরা বেইমানি করলি সুভাষ।

— বেইমানি করেছি তো বেশ করেছি। সুভাষ যেন মুহূর্তে গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। আত্মপক্ষ সমর্থন ছাড়া উপায় কি ওদের। কুড়ি দিন হয়ে গেল। কিছু হল? চাকরিটা গেলে পথে বসব। ছেলে-পুলে মা-বউ নিয়ে পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়াব?

— হ্যাঁ, তাই করবি। ঝনঝন করে বেজে উঠে হাতের বেড়ি। লাখো লাখো শ্রমিক-কর্মচারীর যদি চাকরি যায়, তোদেরও যাবে। লাখো লাখো শ্রমিকভাই যদি ভিক্ষে করে, তোরাও করবি। ইজ্জত আর ন্যায্য দাবী নিয়ে লড়নেওয়ালা শ্রমিককে মানুষ দুহাত ভরে সাহায্য দেবে। আর তোদের?

— থাম থাম। বলে মঙ্গল লম্বা লোহার শিকটা হাতে তুলে নিল। ইঞ্জিনের জ্বলন্ত কয়লা খুঁচিয়ে দিতে দিতে বলল, কাল যখন ফলাও করে কাগজে বেরোবে — ইস্টিল কারখানায় তেলের ওয়াগন পৌছেছে, আর গাড়ি চালিয়েছে নামী ডেরাইভার রতনলাল নিজে, তখন কোথায় থাকবে তোমার এই বুক্নি?

হা হা করে হেসে ওঠে রতনলাল। হাসতে হাসতে বলে, বাঃ! খাসা প্ল্যান। সহসা থেমে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে থাকে ইঞ্জিনের গনগনে আগুনের দিকে। তারপর ক্রুদ্ধ গম্ভীর স্বরে বলে, রতনলাল ডেরাইভারকে শেকল দিয়ে বেঁধে আনা যায়, লেকিন গাড়ি চালানো যায় না রে মঙ্গল। এই হাত — চেয়ে দ্যাখ, এই হাত কখনো মজদুর ভাইদের সঙ্গে বেইমানি করতে জানে না।

শেকলবাঁধা মুষ্টিবদ্ধ হাত দুটো তুলে লোহার দেয়ালে আঘাত হানে রতনলাল। ঝনঝন শব্দ ওঠে লৌহশৃঙ্খলের।

তেজেন সেন সিকিউরিটি ফোর্সকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে ব্যস্ত ছিল, শেকলের ঝনঝন শব্দ শুনে, "কি হল? কি হল?" বলে ইঞ্জিনের সামনে ছুটে এল। একটু দেখে— রূঢ় স্বরে বলল, অ, তুমি! বেয়াদপি শুরু করেছ। রতনলাল কি বলছিল সুভাষ?

— বলছিল—প্যাট্রোম্যাক্সে ঘন ঘন পাম্প দিতে দিতে সুভাষ বলে, বলছিল গাড়ি চালাবে না।

— আই সি। দুঃসহ ক্রোধে বার কয়েক লাফিয়ে ওঠে তেজেন সেনের চওড়া গোঁফ। কর্কশ স্বরে টেনে টেনে হুকুম দেয়, তোমাকে এখনি গাড়ি ছাড়তে হবে রতনলাল। ট্রেনটা সোজা নিয়ে যাবে চমনলাল স্টীল ফাউন্ড্রিতে। আমি তোমার হাতের তালা খুলে দিচ্ছি। চালাকির চেষ্টা কোরো না।

— আমি গাড়ি চালাব না। রতনলাল গর্জে উঠে এক পা পিছিয়ে গেল। জান কবুল, লেকিন রতনলালকে দিয়ে ধর্মঘট ভাঙানো যাবে না পুলিশ সাব।

— হোয়াট! উন্মত্ত ক্রোধে দিশাহারা তেজেন সেন চিৎকার করে ওঠে।

কয়েকজন রাইফেলধারী ছুটে এল। ঘাবড়ে গিয়ে মঙ্গল এক বেলচা কয়লা ছুঁড়ে দিল ইঞ্জিনে।

বুকের জামায় মুখের রক্ত মুছে রতনলাল রুখে দাঁড়িয়ে ফুঁসছে, মারবে? মার।

— আই সি! ভঙ্গি পাল্টে গেল তেজেন সেনের। চোখ মুখের অবস্থা হয়ে উঠল ভয়ানক হিংস্র কুটিল আর দানবীয়। সে চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে লাগল, ট্রেন চালাবে না রতনলাল?

— না।

— তোমার রূপসী মতিয়াকে উলঙ্গ করে যদি আমার লোকেরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়— তোমার সামনেই, তবুও না?

— মতিয়া! বিভীষিকার আতঙ্কে শিউরে ওঠে রতনলাল। তার গলাটা কে যেন লোহার সাঁড়াশী দিয়ে চেপে ধরে।

— তোমার পেয়ারের মুন্নাকে যদি ঐ ইঞ্জিনের আগুনে একটু একটু করে ঝলসে— হাঃ হাঃ হাঃ...

— তোর শির ছিঁড়ে ফেলব কুত্তার বাচ্চা—

গগন বিদীর্ণ চিৎকার দিগ্বিদিক কাঁপিয়ে রতনলাল তেজেন সেনের দিকে ধাবিত হতে গিয়ে শেকলে লেগে আটকে গেল। চোট লেগে মুখ থেকে বেরিয়ে এল ফোঁটা ফোঁটা রক্ত। বাষ্পভর্তি ইঞ্জিনের মত সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুঁসতে লাগল,

— কেন খালি খালি বোকার মত মাথা গরম করছ রতন!

সহসা তেজেন সেনের ভঙ্গি বদলে যায়। ধূর্ত হিংস্র চোখ দুটো নরম হয়ে ওঠে। জন্তুর কর্কশ কণ্ঠস্বর হয় মোলায়েম। সে বলে চলে, লক্ষ্মী ছেলের মত তেলের ওয়াগনগুলো চমনলাল স্টীল ফাউন্ড্রিতে পৌঁছে দাও— ব্যস। তোমার ছুটি। তারপর তোমার মতিয়া আর মুন্নাকে ফিরে পাবে। কেউ ছোঁবে না। সম্পূর্ণ অক্ষত দেহেই তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব। এস। শেকল খুলে দিচ্ছি। মাথা ঠাণ্ডা রেখে ট্রেনটা চালাও তো এবার।

এক আরণ্যক ক্রোধে হাঁপাচ্ছিল শৃঙ্খলিত রতনলাল। অগ্নিগর্ভ চোখ দুটোর কোণায় টলটল করছিল জল। সে থর থর কম্পিত হাত দুখানা পুলিশ সাহেবের দিকে এগিয়ে দিয়ে পরমুহূর্তেই টেনে আনল। তারপর শৃঙ্খলিত হাত দুখানা তুলে ধরল সহসা প্রজ্জ্বলিত চোখের সামনে।

পেয়েছে। এই হাত— হ্যাঁ, তার এই হাতই বন্ধ করে রাখবে রেলের চাকা।

লৌহ শৃঙ্খলের ঝনঝনাৎ শব্দে আর্তনাদের সঙ্গে সহসা গর্জে উঠল অপরাজেয় কণ্ঠস্বর, ডেরাইভার রতনলালকে বেঁধে আনতে পার। লেকিন তাকে দিয়ে ট্রেন চালানো যায় না।

চোখের নিমেষে ঝাঁপিয়ে পড়ল তেজেন সেন। এক ঝটকায় টেনে আনল তাকে। কিন্তু সুদক্ষ রেল-ইঞ্জিন-চালক রতনলালের হাত দুখানা ততক্ষণে লোহার শেকলের সঙ্গে দলা পাকিয়ে গেছে।

সাক্ষী

গুণময় মান্না

পোশাকী নাম আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু সবাই ওকে ডাকে বুড়ো বলে। বয়েস বোধহয় এগারো-বারো হবে, কিন্তু অপুষ্টির জন্যে আরো ছোট দেখায়। চোখের গড়ন বড় বড়, কিন্তু ঘোলাটে, ক্বচিৎ সে চোখে বিস্ময়ের চমক লাগে। তার কারণ, সবাইকে আর সব কিছুকে ও এত পরিচিত বলে মনে করে। সিঁথির মোড় থেকে একটু দূরে এই জায়গাটায় ও প্রসেসন দেখেছে, বি. টি. রোডের ওপর যানস্রোতের মাঝখানে অ্যাকসিডেন্ট দেখেছে, কত বাঙলাবন্ধ্ দেখেছে, ছুরি মারা দেখেছে, বোমা ছুঁড়তে দেখেছে। রাস্তার ধুলো, খোলা কাঁচা নর্দমাব বর্ষায় রাস্তা ও ঘরের মধ্যে অনধিকার অগ্রগতি যেমন, তেমনি এই এপ্রিলের প্রথম দিকে ঐ যে টিনের পাতের ওপর কাগজ সেঁটে হাতের লেখা অক্ষরে 'রাধা কেবিন' সাইন বোর্ড ঝুলানো চায়ের দোকান, তার পাশেই ঝাঁকড়া লাল-হলদে ফুলে ভরা কৃষ্ণচূড়া গাছটাও ওর চৈতন্যকে এড়িয়ে যায় না। বুড়ো সব কিছুই দেখতে চায়, জানতে চায।

ছেলেটা বেওয়ারিশ, কিন্তু কথাটার বিশেষার্থ আছে। চা-দোকানটাব মালিক গজেন মণ্ডল, কিংবা এই রকম আরো কেউ কেউ জানে যে, ওইখানটায গলির মধ্যে একটা পুরনো টালির ঘরের ছেলে ও, ওর বাবা বড়-বাজারের এক গদিতে খাতা লেখে, কিন্তু কথাটা স্মৃতির তলায় চাপা পড়ে থাকে। স্বয়ম্ভূ হয়ে বিরাজ করে ছেলেটা নিজেই, কেননা সর্বদা এই তল্লাটের সব জায়গাতেই তাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ও সব কিছুই করে, সবার সব কিছুতেই নাক গলায়। কিন্তু লিকলিকে চেহারার ওপর মস্ত মাথা আর বিবর্ণ মুখের ওপর বড় বড় চোখে এমন বোকা-বোকা তাকায় যে সকলে তা সরলতা বলেই মনে করে। বিরক্ত হতে গিয়েও লোকে আর বিরক্ত হয় না। যেমন, খুব ভোরে গজেন মণ্ডলেব দোকানে এসে ও হাজির। বলে 'গজা' তোমার আঁচটা আমি দিয়ে দিই, পল্টা তো আসে নি দেখছি'.... তারপর আঁচ দিতে গিয়ে ঘুঁটে কেরাসিন নিয়ে কাজ করতে লেগে যায়। কিছুক্ষণ পরে গজেন দেখে আঁচ নিবে গেছে, আর বুড়ো প্রাণপণে কখনো ফুঁ দিচ্ছে আর কখনো পাখা চালাচ্ছে। গজেন গর্জন করতে বুড়ো কাঁচুমাচু মুখে উঠে দাঁড়ায়, মুখে-চোখে কয়লার কালি লেগেছে, ছাই পড়েছে, চোখদুটো সেই রকম বোকা-বোকা। হাতের চড় তুলেও গজেনের আর মারা হয় না।

ওকে আবার স্কুলে যেতেও দেখা যায়। বড়-ছোট বই খাতা বগল থেকে পড়ে যাবাব উপক্রম, শার্টের বোতাম খোলা, জীর্ণ হাওয়াই চটি পা পেরিয়ে রাস্তায় এগিয়ে যাচ্ছে, বুড়ো এগোচ্ছে চারদিকে তাকাতে তাকাতে। বাড়ির জন্যে ও বাজারও করে, ফুটপাত আর রাস্তা জুড়ে বাজারটার সব জায়গায় দর করে, কেনে না, তারপর কতক্ষণ পরে ওকে ফিরতে দেখা যায়, চটের থলের কোণ দিয়ে পুঁই-ডগা উঁকি মারছে। খানিক গিয়ে আবার ফিরে আসে, মুদির দোকানটায় ওঠে, কিছু কেনে কিনা বোঝা যায় না।

রামভজন ঠেলাওয়ালা মোড় দিয়ে গাড়ি নিয়ে যেতে গিয়ে থামল, গজেন মণ্ডলের দোকানে চা কিনে খেল এক ভাঁড়। ফিরে দেখে বুড়ো তার ঠেলাটা কায়দা করবার চেষ্টা

করছে আর কতকটা এগিয়েও নিয়ে গেছে। তাও রাস্তার মাঝামাঝি ও মুখটা গিয়ে পৌঁছেছে, আর একটু হলেই কলিশন হত, স্টেটবাসটা চোখা বাঁক নিয়ে পেরিয়ে গেল। 'এ লেড়কা, এ হারামিকা বাচ্চা' বলতে বলতে রামভজন এল ছুটে, কিন্তু বুড়ো ছাড়বে না, সে ঠেলা চালাবে। রামভজন রগচটা মানুষ, এই বখামিতে তুলল একটা হাতুড়ির মতো চড়— মজা এই যে যেমন রামভজন বুঝল না তেমনি বুড়োও বুঝল না এই ঘা-টা যথাস্থানে পড়লে তার ফল কি হবে— বুড়ো কুতকুতে চোখে তাকিয়ে রইল। বুঝল পাশ কাটিয়ে যেতে গিয়ে নিখুঁত শার্ট-ট্রাউজার পরা চশমা চোখে এক মাতব্বর, 'আহা-হা, খতম হো যায়গা। আমাদের রাষ্ট্রের ভাবী নাগরিক...এরাই তো দেশ চালাবে...'

'মারেগা নহী তো কয়া.... উস্‌কো গাড়িপর চড়ানেকে...' বলতে বলতে রামভজন চড় নামিয়ে বুড়োকে দু বগলে ধরে ইঁদুরের মতো তুলে ঠেলার ওপর ছুঁড়ে দিলে আর তাকে সুদ্ধ ঠেলে নিয়ে চলতে লাগল। রক্ত চোখে রামভজন ওর দিকে তাকিয়ে রইল আর বুড়ো হাঁটু মুড়ে বসে দুহাত শূন্যে ছুঁড়ে মাইকে হাজারবার শোনা গান হাঁকতে লাগল, 'চলেছি একা কোন্ অজানায়...'

বুড়োর সব চেয়ে আগ্রহ তল্লাসী, গ্রেপ্তার, বোমা পাইপ গান এই সব নিয়ে। পুলিশ ভ্যান যদি পাড়ায় এল— আর হামেশাই আসছে সেই সব—তাহলে পাড়ার ছেলে-ছোঁড়ার দল যেন বাঘের পিছনে ফেউ লেগে গেল। বুড়ো সবার আগে। সেদিন শেষরাত্রে ঘুম ভেঙে গেল বুড়োব, বাইরে অস্বাভাবিক গোলমাল। তিড়িক করে লাফ দিয়ে বুড়ো ছুটল বাইরে। ঠিক ওদেব গলিটায কেউ নেই, তবু মনে হল সব বাড়িতেই লোকজন জেগেছে, কিন্তু কোনো বাড়িতেই আলো জ্বলে নি। পরক্ষণেই বুঝতে পারল, গোলমালটা আসছে পিছনের পাড়া থেকে। তখন লাফ দিযে ছুটল সেই দিকেই।

ফিবে এল যখন তখন সকাল হয়ে এসেছে। ওদের গলিতে ঢুকতেই ওর দোস্ত রুণু (তখন অনেকেই বেরিয়েছে বাইরে) ওকে খবর দেবার জন্য বলে উঠল, 'জানিস, পুলিশ রেড হয়ে গেল, সুজয়দাকে ধরে নিয়ে গেছে। পিটিয়েছে খুব—'

তাচ্ছিল্যে বুড়োর মুখখানা বেঁকে উঠল, 'কি বলছিস, আমি সেখেন থেকেই আসছি না—' লিকলিকে হাত ছুঁড়ে ভঙ্গি করল একটা 'পায় নি, ভেগেছে, কোথা দিয়ে যে গেল-' তারপর এগোতে গিয়ে বললে, 'আমি একটাও দেখতে পাই না—'

'কি রে—'

'যাব্ বাবা, তুমি শোনো নি, পুলিশ এ্যারেস্ট করতে এলেই সুজয়দারা বোমা ছুঁড়ে, গুলি মেরে বাছাধনদের হাটিয়ে দেয় — জান লিয়ে লেয়—'

এইবার রুণুর পালা, সে ওকে থামিয়ে মুখ ভেংচে বলে, 'বুদ্ধু, তুমি বুঝি এই জানো? পুলিশই আগে মারে, তারপর যুদ্ধ হয়—'

'হ্যাঁ, যুদ্ধ হয়, সে আমি জানি—' কাঁচুমাচু মুখে বুড়ো বলে, 'কিন্তু—' বুড়োর আপশোষ ও একটা যুদ্ধও দেখতে পায় না। পুলিশের সঙ্গে ছেলেদের যুদ্ধ, এপাড়ায় ওপাড়ায় কতই না সে শুনছে। ছুটে যায় সে, দিনে-রাত্রে যখনই শুনুক না কেন, কিন্তু গিয়ে দেখে কোথাও কিছু নেই। যা হবার নাকি সব ঘটে গেছে। হয় পুলিশ ঘেরাও করে আছে, ফাইট নেই, নয় তো ছেলেছোঁড়ারা গরম গরম জটলা করছে, পুলিশ নেই। বোমা ফাটছে, পাইপগান থেকে গুলি বেরোচ্ছে, তারপর বিভলবার, রাইফেল। না একটা ফাইটও সে দেখতে পায় নি।

।। ২ ।।

সেদিন রুণু বুড়ো আরো ছেলেরা 'রাধা কেবিন'-এর সামনে জটলা করছিল। কখনো ওরা জড়াজড়ি করছে, কখনো একজন আব একজনকে তেড়ে নিয়ে যাচ্ছে কিছু দূর পর্যন্ত।

ছেলেগুলো যেন পাঁকাল মাছ। বি. টি রোডের ট্রাফিকস্রোত কেটে বেরিয়ে গিয়ে ওরা পালাতেও পারে, তাড়া করতেও পারে। কখনো কখনো ওরা চা-দোকানটার পাশে কৃষ্ণচূড়া গাছটায় ওঠে, আর-একজন তাড়া করলে ওদিকের ডাল থেকে ঝুলে নেমে পড়ে। এক-আধটা ডালও ভাঙে, আর কতকগুলো ফুল ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ে।

এই সন্ধ্যার মুখটা শহরের সব জনস্রোত আর যানস্রোতের মাঝখানেও কেমন আর একটা রঙ এসে পড়ে। কোনো একটা নতুন পরিবর্তনের ভূমিকার মতো। একটু লক্ষ করলেই বোঝা যায়।

ছেলেগুলোর বোঝার কথা নয়, কিন্তু হঠাৎ ওদের ছোটাছুটিতে বাধা পড়ল— পুলিশ। একটা কালো ভ্যান মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে আর তার থেকে কয়েকজন রাইফেলধারী সিপাহীর সঙ্গে নেমেছে এক অফিসার। বাঙালি, বয়েস চল্লিশ পেরিয়েছে, শরীরে মেদ হয়েছে কিঞ্চিৎ। যথাসম্ভব স্মার্ট ভঙ্গিতে চায়ের দোকানটার সামনে এগিয়ে গেল।

গজেন মণ্ডলের দোকানে সব সময়েই খদ্দের থাকে, সন্ধ্যার দিকটায় বেশ জমজমাট। সব বয়সের লোকজনই আছে, তার মধ্যে ছোকরাদের সংখ্যা বেশি। অফিসার এগিয়ে গিয়ে সকলের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। সঙ্গে একজন ছিল। ধুতি-শার্ট পরা লম্বা-পানা লোক। তার চোখ একটা মুখের উপর স্থির হল। সেই অবস্থায় অফিসারের কানের দিকে একটু হেলে কিছু বললে।

অফিসার রিভলবারের খাপের উপর হাত চেপে এক পা এগিয়ে গেল। অত্যন্ত সৌজন্যের সঙ্গে সেই ছোকরাটিকে জিজ্ঞেস করলে, 'আপনার নাম অভীক বসুরায়?'

'হ্যাঁ,—' কুড়ি-একুশ বছরের একটি ছোকরা উঠে দাঁড়াল, হাতে আদ্দেক খাওয়া চায়ের ভাঁড়।

'তেইশ নম্বর পণ্ডিত পাড়ায় বাড়ি?'

'হ্যাঁ, কেন বলুন তো?—'

এদিকে বুড়ো, রুণু এবং তার সঙ্গীরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বুড়ো ফিসফিস করে বললে, 'একটা ফাইট হতে পারে—'

রুণু ওর কথায় কান না দিয়ে বললে, 'অভীক বসুরায়— চিনিস? পণ্ডিত পাড়া কোথা রে?'

যে-ছোকরাটিকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল, সেই অভীক বসুরায় এতগুলো চোখের সামনে কেমন বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। সবার চোখ (আর ভিড় ক্রমেই বাড়ছিল) ওর দিকে— পুলিশ ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে সে জন্যে তো বটেই— তাছাড়া চেহারাটা তাকিয়ে দেখবার মতো। বাচ্চা শাল গাছের মতো— লম্বা, দোহারা চেহারা, ফর্সা রঙ, অদ্ভুত লাবণ্য। মুখখানির দিকে তাকালেই মন টেনে নেয়, টানা ভুরু, কালো উজ্জ্বল চোখ, ছোট করে ছাঁটা গোঁফ, কথা বললেই পাতলা ঠোঁট আর শাদা দাঁত স্পষ্ট হয়। সাধারণ ট্রাউজার আর হাওয়াই শার্ট কিন্তু মানিয়েছে আশ্চর্য রকম।

অফিসার বললে, 'আপনাকে একবার থানায় যেতে হবে...'

'থানায়? কেন...'

'আপনি অনেকগুলো কেন জিজ্ঞেস করছেন, আমি তার কী জানি। আমি শুধু হুকুম তামিল করতে পারি...'

হঠাৎ শক্ত হয়ে উঠল অভীকের মুখখানা, হাতের ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলে বললে, 'তার মানে, কেন-কী তার ঠিক নেই, খামকা আপনি বলবেন আর আমাকে থানায় যেতে হবে?...'

অফিসার মাথার হ্যাটটা একটু নামিয়ে দিলেন। এখন সন্ধ্যা হয়ে আলো জ্বলে উঠেছিল, সেই আলোয় আড়াল পড়ল। কেবল মুখে ফুটে উঠল একটু হাসি।

'আচ্ছা অভীকবাবু, আপনি চাকরি করেন?'

অভীকের মুখের ওপর সব আলোটা পড়েছে, মুখখানা আরক্ত, বললে, 'না, আমি চাকবি করি না, সুরেন্দ্রনাথ নাইট সেকসনে পড়ি, কমার্সে...'

'ভেরি ওয়েল। আজ কলেজে যান নি কেন?'

'কেন, সেটা কি আপনাকে বলতে হবে?'

হাসল অফিসার, 'দেখলেন তো, সব কেন-র উত্তর সবার পক্ষেই দেওয়া সম্ভব নয়— আপনারও না, আমারও না। এখন চলুন...'

অফিসার ফিরে দেখল, তার নিজের লোকদের দিকে, আর কতটা ভিড় বাড়ল সেটার দিকেও। ওর নিজের লোক কী বুঝল কে জানে, হঠাৎ দুজন সিপাহী ওর কাছ ঘেঁষে এল। একটা লাফ দিল অভীক, পালাবার জন্য নয়, কেননা এল অফিসারের সামনেই। বললে, 'খবরদার, আমার গায়ে হাত দিতে বারণ করুন। দরকার হলে আমি নিজেই যাব, কিন্তু আপনি বলুন, কী জন্যে আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন?'

'সিম্পলি ফর ইন্টারোগেশন...নাথিং এল্স্... ঘণ্টাখানেকের ব্যাপার...'

'কী বিষয়ে?'

অফিসার একটু ভাবল। তারপর যেন গোপন কথা ফাঁস করছে এমনি অন্তরঙ্গতার স্বরে বললে, 'কাল রাত্রে পণ্ডিত পাড়ার নর্থে একটা মার্ডার হয়েছে, আপনি জানেন?'

'জানি, সবাই জানে। আজ কাগজে বেরিয়েছে...'

'সেই বিষয়েই...'

ঝটকা মেরে থামাল অভীক, 'ননসেন্স, আমাকে মার্ডারের সঙ্গে জড়িত করতে চান?'

মুচকি হাসল অফিসার, বোধ হয় অভীকের উত্তেজনা দেখে, 'বলেছি তো, আপনার যা বলার আমার অফিসারকেই বলবেন। আমি কিন্তু আর দেরি করতে পারব না। আপনি যদি না যান, তাহলে আমার লোকেরা আপনাকে জোর করেই ভ্যানে তুলবে...'

অভীকের সুন্দর মুখখানা কঠিন হয়ে উঠল, আগুন ছুটল চোখে। অসহায় আক্রোশে চারদিকে একবার তাকাল ও, তারপর কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল, 'আচ্ছা বেশ, যাচ্ছি আমি...'

বলে ভ্যানটার দিকে এগিয়ে গেল, তারপর হালকা পায়ে লাফিয়ে উঠে গেল ভেতরে। অফিসার ঢুকল সামনের দিকে, সিপাহীরা অভীকের পিছনে, পিছন দিকে। গাড়িতে স্টার্ট দিলে।

জনতার মধ্যে এতক্ষণে কথা ফুটল। একজন বললে, 'আছে কিছু গোলমাল, তা না হলে নিয়ে যাবে কেন?'

আর একজন বললে, 'তা বলবেন না। আজকাল কিসে কী হয়, আপনি-আমি বুঝব কী করে?'

রুণু বললে, 'ওই ও— অভীক কি রকম রেগেছে দেখেছিস?'

বুড়ো বললে...'কী রকম'

রুণু বললে 'কোথায়?'

'কী হয় দেখি চল না, অভীকদা (এর আগে চেনা ছিল না) নিশ্চয়ই বোম মারবে। ওর ডান দিকের পকেটটা কী রকম উঁচু হয়ে ছিল দেখলি...' বলে ও কারুর অপেক্ষা না করে ভ্যানটার পিছু ছুটল। তখন সেটা চলতে আরম্ভ করেছে। ও যে ছুটন্ত ভ্যানের সঙ্গে পাল্লা দেবে এরকম ইচ্ছে ওর ছিল না, কিন্তু ওর ধারণা ছিল, এখনই অভীক বোমা মেরে পুলিশের হাত থেকে পালাবে। এই রকম কথাই সবাই বলে। একটু ছুটে গেলেই তো দেখা যাবে।

সামনেই ক্রসিংয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল ভ্যানটা। বুড়ো পাশে এসে পড়ল। সিপাহীদের পিঠগুলো ছাড়া পাশের থেকে ভেতরে আর কিছু দেখতে পেলে না ও। ভ্যানটার গায়ে ও একবার হাত রাখল। হঠাৎ ওর চোখে পড়ল, একটা খাঁজের মতো আছে নিচের দিকে,

সচ্ছন্দে পা রেখে দাঁড়ানো যায়। বিচ্ছু ছেলে তৎক্ষণাৎ সেটাতে পা দিয়ে উঠে পড়ল, জানালার শিকের জাল ছোট্ট আঙুলগুলো দিয়ে জড়িয়ে ধরল। মাথাটা নিচু করে রাখল, যাতে ওকে দেখতে না পায়। একজনের পিঠের আড়াল পড়েছিল বলে ওদিক থেকেও ওকে দেখতে পেল না।

ওদিকে অভীক ভেতরে ঢুকে দেখলে, ভ্যানের দুপাশের বেঞ্চিতে আরো কয়েকজন বসে রয়েছে। সাধারণ পোশাক পরা, বোঝা গেল না তারা পুলিশের লোক, নাকি তারই মতো ধরে নিয়ে যাচ্ছে। সে বসতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার পিছনে যে সিপাহীগুলো ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে তারা বসে পড়ল, ওকে বসতে দিলে না।

ও একজনকে বললে, 'একটু সরে বসুন...'

'কেঁও, কাঁহা হটনা...' বলে সে আর একটু ভালো করে বসল।

মাথায় রক্ত চলকে উঠল অভীকের, 'ভদ্রতা জানেন না, আমি কি দাঁড়িয়ে থাকব না কি?' (আসলে ও দাঁড়াতেও পারছিল না, নিচু ছাদের জন্য কুঁজো হয়ে ছিল) বলে ও সিপাহীটির একটা হাঁটু পাশে ঠেলে দিয়ে বসতে চাইলে।

'কেয়া...' সিপাহীটি ধাক্কা দিয়ে ওকে মেঝেতে বসিয়ে দিলে 'ওঁহা বৈঠো..'

একটু ঝুঁকে পড়েছিল সিপাহীটি, অভীক ঠাস করে ওর গালে একটা চড় কষাল।

তারপর বেশ একটা খেলা শুরু হয়ে গেল। পা দিয়ে হাত দিয়ে ওকে ঠেলে ঠেলে এদিক থেকে ওদিক থেকে মেঝের ওপর ফেলতে লাগল, আর লেজ চেপে ধরা বিড়ালের আঁচড়ানোর কামড়ানোর মতো অভীক সেটা প্রতিরোধ করতে লাগল।

ইতিমধ্যে সামনের আসন থেকে অফিসার সব লক্ষ করছিল, বোধ হয় উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করছিল। ফাঁক গলিয়ে রিভলবারটা বের করে আস্তে আস্তে কোণের সাদা পোশাক পরা লোকটির হাতে চালান করে দিলে।

অভীক আর একবার মেঝেতে পড়তেই রিভলবারের শব্দ হল একটা, কিন্তু বি. টি. রোডের অনন্ত গর্জনের মধ্যে বাইরে থেকে তা শোনা গেল না। ভ্যানটা বেশ স্পীডে চলছিল।

'মা গো ..' চেঁচিয়ে উঠল বুড়ো। সে সব দেখেছিল। কিন্তু ওর ছোট্ট হাতের আঙুলগুলো অবশ হয়ে গিয়েছিল, খুলে গেল হাতটা। তারপর কী হল ও জানতে পারল না।

।। ৩ ।।

পুলিশী-সূত্র উদ্ধৃত করে তার পরদিন কাগজে খবর বেরোল, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য যখন অভীক বসুরায় ও কয়েকজন ব্যক্তিকে থানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন মধ্যপথে তারা একযোগে ভ্যানের দরজা ভেঙে পালাবার চেষ্টা করে। সিপাহীরা বাধা দিলে অভীক ছুরি বের করে তাদের আক্রমণ করে। তখন আত্মরক্ষার্থে পুলিশকে গুলি চালাতে হয়। অভীক বসুরায়ের মৃত্যু হয়। দুই জন সিপাহীকে পুলিশ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বুড়োও হাসপাতালে ছিল। ভ্যান থেকে পড়ে গিয়ে ওর গুরুতর চোট লেগেছিল। চব্বিশ ঘণ্টার পর তার জ্ঞান ফিরে আসে। পরের দিন তার বন্ধুরা তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, তাদের মধ্যে রুণুও ছিল। রুণু ওকে খবরের কাগজের কথা বললে। জিজ্ঞেস করলে, 'কী হয়েছিল রে...'

'না-না, কিছু হয় নি....' বলে ও উত্তেজনায় উঠে বসতে গেল, কিন্তু মাথা ঘুরে আবার অচৈতন্য হয়ে পড়ল। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখতে লাগল ও। রুণুরা, অনেক ছেলে, ওদের স্কুলের আর পাড়ার এবং আরো অনেক ছেলে 'রাধা কেবিন'-এর সামনে জড়ো হয়েছে আর তাদের দিকে লক্ষ করে ও বলছে, 'আমি সাক্ষী আছি... কিছু হয় নি.... কোনো ফাইট হয় নি...'।

বিশদ চিঠি

ইন্দ্র মিত্র

ছুটির পর স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে নিরুপমা শাড়িটাড়ি বদলে হাতমুখ ধুয়ে— রোজ যেমন করে— মেনীর ঘরের তালা খুলল। জানালাগুলো খুলে দিল।

একটা জানালার শিকের সঙ্গে সিল্কের শিকল দিয়ে মেনী বাঁধা আছে। স্কুলে যাবার সময় নিরুপমা রোজই মেনীকে এ-ভাবে বেঁধে রেখে নিজের হাতে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে যায়।

শিক থেকে সিল্কের শিকল খুলে মেনীকে শিকলসমেত কোলে তুলে নিল নিরুপমা। মেনীর কী আহ্লাদ তখন!

নতুন কিছু নয়, নিত্যদিনের ঘটনা।

মেনীকে কোলে নিয়ে আদর করতে-করতে নিরুপমা নিজের ঘরে এসে বসল।

ঠিক সেই সময়ে একবাটি দুধ নিয়ে পদ্মাবতী ঘরে ঢুকল। ঠিক এই সময়ে একবাটি দুধ নিয়ে হাজির হতে না-পারলে পদ্মাবতীর কপালে দুঃখ আছে— পদ্মাবতী সে-কথা মর্মে-মর্মে জানে। নিরুপমার বাড়িতে কাজ করতে হলে আগে মেনীর সেবাযত্ন, পরে অন্য কথা।

পদ্মাবতী সযত্নে দুধের বাটি রাখল টেবিলে। নিরুপমা আদর করে মেনীকে বলল, মেনীসোনা, তোমার দুধ এসে গেছে। খা—ও।

সিল্কের শিকল একটু আলগা করে দিল নিরুপমা। এগিয়ে এসে মেনী চকচক করে দুধ খেতে লাগল। দুধ আধাআধি খাওয়া হয়ে গেলে পদ্মাবতী আস্তে-আস্তে বলল, দিদিমণি, এবার কি তোমার চায়ের জল চড়িয়ে দেব?

— দাও। আজ কি কোনও খবর আছে?

দিনের পর দিন একই প্রশ্ন। পদ্মাবতী ঘাড় নেড়ে বলল, না, না, দিদিমণি, কোনও হুলো আসেনি। তা ছাড়া তুমি মেনীর ঘবের দরজা-জানালা যে-ভাবে বন্ধ করে যাও, হুলো তো দূরের কথা, একটা টিকটিকিব পর্যন্ত ও-ঘবে ঢোকার সাধ্য নেই।

নিরুপমা শান্ত গলায় হাসল। বলল, সে-কথা আমার চেয়ে বেশি আর কে জানে! আমি বেঁচে থাকতে কোনও হুলোর সাধ্য আছে যে মেনীর ঘরে ঢোকে! মেনীর ঘরের কথা ছেড়ে দাও, তুমি কড়া নজর রাখবে যেন আমাদের বাড়িতেও কোনও হুলোর টিকি না-দেখা যায়।

পদ্মাবতী ঘাড় হেলিয়ে বলল, দিদিমণি খুব কড়া নজর রেখেছি। আজ পর্যন্ত কোনও হুলো এ-বাড়ির ধারে-কাছে আসেনি। আমি থাকতে হুলো ঢুকবে? ঝেঁটিয়ে দূর করে দেব। তুমি তো জানো, দিদিমণি, হুলো আর পুরুষজাত আমাদের দু-চোখের বিষ।

. নিরুপমা খুশি হয়ে হাসল। সাধে কি আর নিরুপমা পদ্মাবতীকে এত পছন্দ করে। পদ্মাবতীর মেরুদণ্ড আছে। সে হুলো আর পুরুষজাতকে দু-চোখে দেখতে পারে না। পদ্মাবতীর সঙ্গে এ-দিকে নিরুপমার ষোলোআনা মিল।

নিরুপমা, বলা বাহুল্য, পুরুষ-জাতকে দু-চোখে দেখতে পারে না। বিয়ে করলে পুরুষমানুষকেই বিয়ে করতে হত— কেবলমাত্র এই কারণে নিরুপমা অবিবাহিত থেকে গেল। বেঁচে গেছে বাপু!

কিন্তু পুরুষজাতকে পুরোপুরি এড়িয়ে চলার তো উপায় নেই। রাস্তাঘাট আছে, হাটবাজার আছে, স্কুল-কলেজ আছে, ট্রাম-বাস আছে, ডাক্তার-বদ্যি আছে, কত কী আছে— সর্বত্র বলতে গেলে পুরুষজাতেব রাজত্ব। নিরুপায় হয়ে যেতেই হয় পুরুষমানুষের কাছে, দু একটা কথাও বলতে হয়। কিন্তু নিতান্ত দরকারি কথা ছাড়া কোনও পুরুষমানুষের সঙ্গে নিরুপমা একটি অক্ষরও খরচ করে না।

পুরুষজাতের প্রত্যেক মানুষের মনের মধ্যে দুরভিসন্ধি। সাবধান। নিজেকে সাবধানে বাঁচিয়ে-বাঁচিয়ে নিরুপমা এমন বয়সে এনে ফেলেছে যে এখন আর নিজের জন্য ভয়ের কিছু নেই।

এখন সব ভয় মেনীসোনার জন্য। সাবধান, কোনওদিক থেকে কোনও হুলো এসে যেন মেনীসোনার সর্বনাশ করে যেতে না-পারে।

যতক্ষণ নিরুপমা বাড়ির বাইরে থাকে, ততক্ষণ মেনীসোনা ঘরে বন্দি থাকে। গলায় সিল্কের শিকল, দরজা-জানালা বন্ধ। আর নিরুপমা যখন বাড়িতে থাকে, তখন আর কথা কী, তখন সিল্কের শিকলের একদিক মেনীসোনার গলায়, আর আরেকদিক নিরুপমার হাতে।

সে-দিন হঠাৎ নিরুপমার ছেলেবেলার বন্ধু শীলা এসে উপস্থিত। হঠাৎ শীলাকে দেখে নিরুপমা অবাক হয়ে বলল, আরে শীলা! বোস, বোস। পদ্মা, ও পদ্মা, শীলা এসেছে, দু-কাপ চা এনো।

রান্নাঘর থেকে পদ্মাবতী সাড়া দিল, আচ্ছা।

চেয়ারে গুছিয়ে বসে শীলা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, কী আরামেই আছ, নিরু। তোমাকে দেখলে হিংসায় বুক জ্বলে যায়। পুরুষজাতকে তুমি ঠিকই চিনেছ।

নিরুপমা সামান্য একটু হাসল, তুমি ঠিক চেনোনি?

শীলাও হাসল। বলল, চিনেছি। কিন্তু বিয়ের অনেক পরে। আগে যদি চিনতে পারতাম তো কিছুতেই বিয়ে করতাম না, তোমার মতো দিব্যি আরামে জীবন কাটিয়ে দিতাম। কী অসভ্য, কী অসভ্য!

— আসল কথাটা কী জানো?— যেন ক্লাসের মেয়েদের পড়াচ্ছে এমনি গলায় নিরুপমা বলল, সব মেয়েই একদিন-না-একদিন পুরুষজাতকে চিনতে পারে। কেউ বিয়ের আগে, কেউ বিয়ের পর। বিয়ের পর যারা চিনতে পারে, তারা পস্তায়। আগে যারা চিনতে পারে, তারা পস্তানোর রাস্তাতেই যায় না।

শীলা হতাশ হয়ে বলল, আমি ভাই প্রথম দলে, এখন পস্তাচ্ছি। কী আর করা, এ-জন্মে আমার আর উদ্ধার নেই।

পদ্মাবতী দু-কাপ চা দিয়ে গেল।

চায়ে চুমুক দিয়ে নিরুপমা বলল, যা হওয়ার হয়ে গেছে। নিজের জন্য তোমার তো আর কিছু করার নেই, আমার কথা শোনো, দু-একজন মেয়েকেও যদি পস্তানোর রাস্তা থেকে বাঁচাতে পার তো একটা কাজের মতো কাজ হয়। অন্তত একটা মহৎ সান্ত্বনা নিয়ে মরতে পারবে।

মহৎ সান্ত্বনা নিয়ে মরবার আশাতেই শীলা আজ নিরুপমার কাছে এসেছে। শীলা অতএব সরাসরি বলল, সেই কাজের জন্যেই আজ তোমার কাছে এসেছি। আমার বোনঝি মাধবীকে নিয়ে বিপদে পড়েছি।

— তোমার বোনঝি মাধবী কোথায় থাকে?

— মেদিনীপুরে।

— কী বিপদ হয়েছে?

শীলা একটু ঘন হয়ে বসল। বলল, চাকরি পেয়েছে কলকাতায়। এখানে আমার বাড়ি ছাড়া আর থাকবার জায়গা নেই, কিন্তু সে কিছুতেই আমার বাড়িতে থাকতে চায় না।

নিরুপমা অবাক হয়ে বলল, কেন?

— মাধবী বলে, 'মাসি, তোমার বাড়িতে পুরুষমানুষদের বড্ড উৎপাত, ওখানে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। বরং আমি গাছতলায় থেকে কলকাতায় চাকরি করব, কিন্তু কিছুতেই তোমার বাড়িতে থাকব না।' আসল কথা কী জানো, পুরুষজাত মাধবীর দু-চোখের বিষ, পুরুষমানুষের ছায়াটুকু পর্যন্ত সে সইতে পারে না।

নিরুপমা উদার গলায় বলল, এমন মেয়ে এখনও আমাদের দেশে আছে? এমন মেয়ে একটি থাকলেও মস্ত ভরসার কথা— দেশ এগিয়ে যাবে। এমন মেয়েকে দেখলে চোখ সার্থক হয়।

নিরুপমার চোখে চোখ রেখে শীলা বলল, তোমার ওপর মাধবীর অচলা ভক্তি। বলে, 'নিরুমাসির বাড়ি অথবা গাছতলা। এ-ছাড়া আমি কলকাতায় আর কোথাও থাকব না।' তা আমি এখন কী করি বলো তো?

নিরুপমা আশ্বাস দিয়ে বলল, এর মধ্যে আর করার কী আছে। মাধবীর মতো মেয়ে আমার বাড়িতে থাকবে না তো কি গাছতলায় থাকবে? এ তো খুব সুখের কথা। মাধবীর মতো মেয়ে আর মেনীসোনার মতো বিড়ালি যে-বাড়িতে থাকে সে-বাড়ি তো স্বর্গ।

স্বর্গসুখের কথা শুনে বাকি আধকাপ চা শীলা এক-চুমুকে শেষ করে দিল। দু-দিন বাদেই নিরুপমার বাড়িতে এসে উঠল মাধবী। নিরুপমার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলল, তুমি আমাকে বাঁচালে, নিরুমাসি। তোমার বাড়িতে জায়গা না পেলে আমার কী দশা হত কে জানে।

মাধবীর মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে নিরুপমা বলল, তোমার মতো মেয়েকে জায়গা দিতে না-পারলে এ-বাড়ি আছে কীসের জন্য? তোমার মতো মেয়ে তো আর গণ্ডায়-গণ্ডায় জন্মায় না।

নিজের প্রশংসা শুনে মাধবী লজ্জায় চুপ করে রইল।

কিন্তু নিরুপমা চুপ করল না। বলল, অনেক কুচ্ছিত মেয়ের চোখে পুরুষমানুষ দু-চোখের বিষ। তাতে পুরুষমানুষেরা খুব বেশি কাহিল হয় না। কিন্তু তোমার মতো সুন্দরী যখন পুরুষমানুষদের পায়ে ঠেলে তখন ওদের বুক ভেঙে যায়। ভাঙুক। তুমি পুরুষমানুষদের বুক ভাঙো, আর মেনীসোনা হুলোদের বুক চুরমার করে দিক। তুমি আর মেনীসোনা আমার গর্ব হয়ে থাকো।

পরদিনই নতুন চাকরিতে জয়েন করল মাধবী।

নতুন চাকরিতে এসে মাধবীর বুক দুর-দুর করতে লাগল। আপিসে কয়েকজন মেয়ে আছে বটে, কিন্তু সংখ্যায় তারা খুবই অল্প। চতুর্দিকে কেবল পুরুষমানুষ, কেবল পুরুষমানুষ, কেবল পুরুষমানুষ। দু-চোখের বিষ।

বড়বাবু মাধবীকে নিজের পাশের চেয়ারে বসালেন। বললেন, মিস মুখার্জি, আপনাকে গৌতমের সিটে দিলাম। আপনি গৌতমের কাছ থেকে কাজটাজ বুঝে নিন, কোনও অসুবিধে হবে না। গৌতমকে অন্য-একটা সিটে দিচ্ছি। গৌতম, এ-দিকে একটু শুনে যাও তো।

কী-একখানা বই পড়ছিল গৌতম। বইখানা টেবিলে রেখে ধীরেসুস্থে বড়বাবুর কাছে এসে দাঁড়াল।

ডিউটি লিস্টে চোখ বোলাতে-বোলাতে বড়বাবু বললেন, মিস মুখার্জিকে তোমার সিটে দিলাম। একেবারে নতুন তো, তুমি একটু কাজটাজ দেখিয়ে-শুনিয়ে দিয়ো। আর বাজেটের সিটটা তুমি নাও।

— বাজেটের ঝামেলার সিটটাই আমাকে দিলেন?

বড়বাবু অসহায়ের মতো ভঙ্গি করে বললেন, তা তুমি ছাড়া আর কাকে দেব বলো? যত ঝামেলাই থাক, তুমি ঠিক সামাল দিতে পারবে। গোড়ার দিকে তোমাকে হয়তো একটু বেশি খাটতে হবে, আমি বুড়োমানুষ আমার ওপর রাগ কোরো না বাবা।

গৌতম হেসে ফেলল। বলল, না না, রাগ করব কেন। ঠিক আছে।

বলে নিজের সিটে গিয়ে আবার বই খুলে বসল। মাধবীর দিকে একবার ফিরেও তাকাল না।

বড়বাবু স্নিগ্ধ গলায় মাধবীকে বললেন, হিরের টুকরো, হিরের টুকরো। গৌতমের মতো ছেলে লাখে একটাও মেলে না। দু-ঘণ্টার মধ্যে আপিসের কাজ নিখুঁতভাবে শেষ করে দেয়, তারপর আপনমনে বই পড়ে, কারও সাতেও থাকে না পাঁচেও থাকে না।

নিতান্ত দরকারি কথা ছাড়া কোনও পুরুষমানুষের সঙ্গে একটি অক্ষরও খরচ করতে চায় না বলে মাধবী চুপ করে রইল।

হপ্তাখানেক কেটে গেল। রাশি-রাশি চিঠি সই করে নিতে হচ্ছে মাধবীকে, চিঠিগুলি নিয়ে মাধবী সযত্নে বাণ্ডিল বেঁধে রেখে দিচ্ছে। চুপচাপ। বড়বাবু হঠাৎ একদিন চমকে উঠে বললেন, অ্যাঁ, মিস মুখার্জি, সব চিঠি আপনি বাণ্ডিল বেঁধে রেখে দিচ্ছেন, ডিসপোজাল দিচ্ছেন না? একটা-একটা করে ধরুন, ডিসপোজাল দিন, তা না-হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। কী করতে হবে গৌতমের কাছে বুঝে নিন। বুঝলেন, একশো তিরাশি নম্বরের চিঠিখানার জবাব আজ দিতেই হবে।

বাণ্ডিল থেকে একশো তিরাশি নম্বরের চিঠিখানা খুঁজে বের করল মাধবী। চিঠিখানা হাতে নিয়ে গৌতমের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

গৌতম একখানা বইয়ের মধ্যে ডুবে আছে। কোনওদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তার। অগত্যা মাধবী আস্তে-আস্তে বলল, এই চিঠিখানা নিয়ে কী করব?

— উঁ? বলে বইয়ের পাতা থেকে চোখ না-সরিয়ে হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা নিল গৌতম। বইখানা উল্টে রাখল। চিঠিখানা পড়ল। ভ্রূ কুঁচকে বলল, এই চিঠি ফেলে রেখেছেন?

— কী করব?

— তাড়াতাড়ি অ্যাডভান্সের ফাইলটা নিয়ে আসুন।

— অ্যাডভান্সের ফাইল?

এতক্ষণে মাধবীর মুখের দিকে তাকাল গৌতম। বলল, ওঃ হো, আপনি তো নতুন এসেছেন, কিছুই জানেন না। ঠিক আছে, বলে দিচ্ছি। আপনার টেবিলেই অ্যাডভান্সের ফাইল আছে— নাম্বার, সেন্ট্রাল অ্যাডভান্স ওয়ান-টুয়েন্টি। নিয়ে আসুন।

মাধবী নিজের টেবিলে এসে খুঁজে-খুঁজে বের করল ফাইল নাম্বার সেন্ট্রাল অ্যাডভান্স ওয়ান-টুয়েন্টি। ফাইল নিয়ে আবার যেতে হল গৌতমের কাছে। ফাইল খুলে দু-একখানা চিঠি পড়ে গৌতম বলল, সব ঠিক আছে। উত্তর দিয়ে দিন। ভেরি সিম্পল রিপ্লাই।

মাধবী নিরুপায়ের মত বলল, কী লিখব?

গৌতম গড়গড় করে একগাদা ইংরেজি বলে গেল, মাধবী কিছুই ঠাহর করতে পারল না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল গৌতমের মুখের দিকে।

যেন মাধবীর অবস্থা বুঝতে পারল গৌতম। বলল, ওঃ হো আপনি তো নতুন এসেছেন, কিছুই জানেন না। ঠিক আছে আপনি কাগজ-কলম নিয়ে আসুন, আমি মুখে-মুখে বলে যাচ্ছি, আপনি লিখে নিন।

কী আর করা, কাগজ-কলম নিয়ে, একখানা চেয়ার টেনে গৌতমের পাশে বসে পড়ল মাধবী। গৌতম আস্তে-আস্তে বলে গেল, মাধবী আস্তে-আস্তে লিখে নিল।

তারপর গৌতম আবার বইয়ের পাতায় ডুব দিল। আর গৌতমের এই নির্বিকার ভাবভঙ্গি দেখে মাধবীর মনে হল যে পুরুষজাত সত্যি-সত্যি দু-চোখের বিষ, পুরুষজাতের ছায়াটুকু পর্যন্ত সত্যি-সত্যি অসহ্য। নিরুমাসি পুরুষজাতকে ঠিকই চিনেছে, নিরুমাসির পায়ে শতকোটি প্রণাম।

দিনে অন্তত দু-একখানা চিঠি না-লিখলেই নয়। অতএব মাধবীকে রোজই বাধ্য হয়ে যেতে হচ্ছে গৌতমের কাছে। কাগজ-কলম নিয়ে বসতে হচ্ছে গৌতমের পাশে। গৌতমের মুখে শুনে আস্তে-আস্তে লিখে নিতে হচ্ছে চিঠির উত্তর। সব যেন লোকটার মুখস্থ।

কিন্তু কাজটুকু মিটে গেলেই গৌতম বইয়ের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। বইয়ের মধ্যে যেন গুপ্তধনের হদিশ লেখা আছে!

মাসখানেক বাদে গৌতম একদিন বিরক্ত হয়ে বলল, আপনার মাথায় কি কিছু নেই?

মাধবীর মুখখানা লাল হয়ে উঠল। বলল, কেন?

— মাসখানেক ধরে এত চিঠি লিখিয়ে দিলাম, এখনও নিজে-নিজে লিখতে পারেন না? সরকারি আপিসের চিঠি, সব চিঠিই তো প্রায় একরকম, একখানা চিঠি দেখেই তো দশখানা চিঠি লেখা যায়। সামান্য একটু মাথা খাটান, দেখবেন নিজে-নিজেই সব পেরে যাবেন। একেবারে জলভাতের মতো ব্যাপার।

মাধবী রাগ করে নিজের সিটে ফিরে গেল। দু-হাতে মুখ ঢেকে টেবিলের উপর মাথা রাখল।

সে-দিন আর গৌতম বইয়ের মধ্যে ডুব দিতে পারল না। নিজের সিট থেকে উঠে এসে মাধবীর সিটের কাছে দাঁড়াল। বলল, মাপ করবেন, কিছু মনে করবেন না, হঠাৎ মুখ থেকে দু-একটা কড়া কথা বেরিয়ে গেছে। একটা বাজে বই পড়ে মেজাজ খারাপ হয়ে আছে।

মাধবী মুখ তুলল। সামান্য জলে দু-চোখ ভিজে আছে। ভারী গলায় বলল, মনে করবার কী আছে? আমার মাথায় কিছু নেই। ঠিক কথা। কিন্তু আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। যা পারি নিজেই করব। না পারি তো চাকরি যাবে— যাক।

গৌতম মিষ্টি করে হাসল। বলল, সরকারি চাকরি অত সহজে যায় না। কাজ না-পাবলেই বা না-করলেই সরকাবি চাকরি চলে যাবে? ইংরেজ আমলে হয়তো সে-সব অবিচার চলত, কিন্তু আজকাল আমাদের স্বাধীন দেশে অমন অবিচাব অভাবনীয়, অচল। চলবে না, চলবে না। আপনি পাগল হয়েছেন!

মাধবী ফণা তুলে উঠল, একটু আগে বলেছেন যে আমার মাথায় কিছু নেই, এখন আবার বলছেন যে আমি পাগল?

গৌতম হতভম্ব হয়ে বলল, কখন বলেছি যে আপনার মাথায় কিছু নেই? হ্যাঁ, আপনি পাগল হয়েছেন কি না জিগ্যেস করেছি বটে, কিন্তু এ-পাগল তো সে-পাগল নয়।

সেকশনসুদ্ধ লোক তাকিয়ে আছে গৌতম আর মাধবীর দিকে, নিখরচায় রগড়ের নাটক দেখছে, কিন্তু নাটকের নায়ক-নায়িকার সে-দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

এই সামান্য সূত্রপাত থেকে আসল নাটক নায়ক-নায়িকাকে কোথায় নিয়ে যায়? রেস্তোরাঁয়, ইডেন গার্ডেনে, লেকে, ময়দানে, ব্যান্ডেলের গির্জায়, সত্যজিৎ রায়ের সিনেমায়, শম্ভু মিত্রের থিয়েটারে, জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ইত্যাদি ইত্যাদি। নিরুমাসি ও-সব দিকে যায় না। অতএব নিশ্চিন্ত।

বাড়ি ফিরতে কখনও-কখনও অবশ্যই মাধবীর দেরি হয়ে যায়। একদিন নিরুমাসি খুব ব্যস্ত হয়ে বলল, মাধবী, আজ তোমার এত দেরি হল কেন? আমি ভেবে মরি!

মাধবী অভয় দিয়ে বলল, ভাবনার কিছু নেই নিরুমাসি। উঃ কলকাতার পরিবহণের যা অবস্থা!

নিরুমাসি আশ্বস্ত হয়ে বলল, হ্যাঁ, কলকাতায় পরিবহণের দুরবস্থা একেবারে চরম। আজও তো কাগজে পরিবহণের ব্যাপার নিয়ে তেজি এডিটোরিয়াল আছে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মাধবী মনে-মনে ভাবল, ভাগ্যিস, কলকাতায় পরিবহণের দুরবস্থা আছে। ভাগ্যিস, তা নিয়ে কাগজে তেজি এডিটোরিয়াল থাকে।

না-বললেও চলে নিশ্চয়, আজকাল গৌতম বাদে পুরুষজাত মাধবীর দু-চোখের বিষ, গৌতম বাদে পুরুষজাতের ছায়াটুকু পর্যন্ত মাধবী সইতে পারে না।

এতদিনে মাধবীর মুখ থেকে গৌতমও নিরুমাসির কথা জেনে গেছে। ভেবেচিন্তে গৌতম একদিন বলল, তোমার নিরুমাসির সামনে তো আমি কস্মিনকালেও যেতে পারব না!

মাধবী ঘাড় নেড়ে বলল, কস্মিনকালেও না।

সব কাজ গোপনে সেরে ফেলতে হবে। কাজ শেষ হওয়ার আগে নিরুমাসি যেন ঘুণাক্ষরেও কিছু টের না-পায়।

গৌতমের মা-বাবা দিল্লিতে থাকেন। এখানে গৌতম একা একটা ফ্ল্যাটে থাকে। মা-বাবাকে আগে কি কিছু জানানো দবকার?

মাধবীর মাথায় হাত রেখে গৌতম বলল, আমার মা-বাবা খুব লিবার‍্যাল। আগে না জানালেও ওঁরা কিছু মনে করবেন না। রেজিস্ট্রিই করি আর পুরুতই ডাকি— ওঁদের কাছে সবই সমান। আমি বিয়ে করলেই ওঁরা খুশি। আমি তো ভেবেছিলাম যে জীবনে বিয়েই কবব না, কারণ বরাবর মেয়েজাত আমার দু-চোখের বিষ, মেয়েজাতের ছায়াটুকু পর্যন্ত আমার অসহ্য।

মাধবী মিষ্টি করে হাসল, এখনও?

— এখনও। তুমি বাদে।

গৌতম ও মাধবী নামী আপিসে কাজ করে। ছুটিফুটি নিতে হল না, দু-জনে নিঃশব্দে বেরিয়ে দুপুববেলা রেজিস্ট্রি করে আবার আপিসে ফিরে এল। শুভকর্ম গোপনে ও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে গেল।

আগেই টিকিট কাটা হয়ে আছে, আগেই সাব্যস্ত হয়ে আছে যে সে-দিন রাত্রির ট্রেনেই হনিমুন করতে দু-জনে দার্জিলিং যাবে।

নিরুমাসির আগেই সে-দিন আপিস থেকে বাড়িতে চলে এল মাধবী। বাক্সবিছানা বাঁধাছাদা করে তৈরি হয়ে বইল।

স্কুল ছুটির পর বাড়িতে ফিরে এসে নিরুমাসি অবাক হয়ে বলল, এ কী ব্যাপার, মাধবী?

মাধবী মাথা নিচু করে বলল, নিরুমাসি, তোমাদের বাড়িতে থাকার যোগ্যতা আমার আর নেই।

নিরুমাসি ব্যস্ত হয়ে বলল, কেন? বাড়িতে কি হুলো ঢুকে পড়েছে?

— না না, সে-সব কিছু না, আমি আজ হনিমুনে যাচ্ছি।

অবস্থাটা বুঝে নিতে নিরুমাসি একটু সময় নিল। তারপর বলল, ক-দিনের জন্য হনিমুন? কোথায়?

— ও তো বলেছে মাসখানেক। দার্জিলিং। ডানহাতের একটা আঙুল তুলে নিরুমাসি বলল, মাসখানেক লাগবে না। পস্তাতে তোমার পক্ষে পনেরোদিনই যথেষ্ট। পনেরোদিনের মধ্যেই তুমি হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারবে কেন পুরুষজাত দু-চোখের বিষ, কেন পুরুষজাতেব ছায়াটুকু পর্যন্ত মাড়াতে নেই।

মাধবী চুপ করে রইল।

বাঁ-হাত থেকে ছাতাখানা ডানহাতে এনে নিরুমাসি বলল, ভুল তোমার অবশ্যই ভাঙবে, তখন কারও কিছু করার নেই। যাকগে। তুমি শুধু আমাকে একটা কথা দিয়ে যাও।

— কী কথা?

— পনেরোদিন বাদে তোমার মনের আসল অবস্থা জানিয়ে আমাকে একখানা বিশদ চিঠি লিখবে। কথা দিয়ে যাও।

নিরুমাসির পায়ের ধুলো নিয়ে মাধবী বলল, কথা দিলাম।

ট্যাক্সি ডেকে মাধবী চলে গেল। এবং কথা রাখল।

ঠিক পনেরোদিন বাদে নিরুমাসি একখানা বিশদ চিঠি পেল। মাত্র দশটি শব্দে একখানা বিশদ চিঠি: "নিরুমাসি, তোমার পায়ে পড়ি, মেনীসোনাকে ছেড়ে দাও।— ইতি মাধবী বসু।"

খড়্গ

অজিতেশ ভট্টাচার্য

যেন একটানা দশ বছরের ভাতঘুম থেকে জেগে ওঠা। একটানে ছিঁড়তে চাইল জড়তা। এই মুণ্ডিতমস্তক আট বছরের শিশুটি কী বলছে তাকে? বিস্ময় থেকে বেদনা, বেদনা থেকে অগ্নিস্রাবী ক্রোধ কোষে কোষে সঞ্চরণ করে উন্মাদ করে তুলল।

--অর্ক, বাবা, এই দুর্গতি তোমার কে করেছে? যেন মা নয়, কোনো অপরিচিতা নারী পথের পাশে শিশুকে রোদনশীল দেখে মধুর কথায় ভোলাতে চাইছে। অর্কপ্রভ ফরসা, তার মুখে প্রভাত সময়ের সারল্য। কণ্ঠে নবীন কিশলয়ের প্রাণশক্তি।

হাতের উলটো পিঠে চোখের জল মুছে ফুঁপিয়ে উঠল অর্ক--বড়ো খোকা!

-- কেন?

—তার ভাইকে পরীক্ষার সময়ে আমার খাতা দেখে অঙ্ক করতে দিইনি, তাই।

আর প্রশ্ন করে না তার মা। একাগ্র দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে। শুধু অর্ক আরো বলে, স্কুল ছুটি হতেই আমাকে গেটের বাইরে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে নাপিত দিয়ে মাথা মুড়িয়ে দিল।

-আর কেউ ছিল না সেখানে?

-- ছিল তো। আমার বন্ধুরা অনেকে পালিয়ে গেল, অনেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল।

— কেউ কিছু বলেনি?

—না। তবে হেসেছে অনেকে। মজার হাসি।

বাথরুমে নিয়ে গিয়ে যত্ন করে সাবান মাখিয়ে অসময়ে স্নান করাল ছেলেকে। কথা বলল থেমে থেমে। গামছা দিয়ে গা মুছিয়ে দেবার পর অর্ক দুহাত দিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে। আবার উপচে আসে তার দু'চোখে জলের ধারা—মা, আমি আর স্কুলে যাব না। আমায় দেখে সবাই হাসবে!

গীতশ্রী নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করে বারবার। এই শিশুর সামনে সে চোখের জল ফেলতে পারে না। বরং এই অকরুণ লাঞ্ছনার স্মৃতি থেকে তাকে মুক্তি দিতে হবে। ফিরিয়ে আনতে হবে প্রতিদিনের স্বাভাবিকতায়।

অর্ককে প্রায় অসময়ে ঘুম পাড়িয়ে পাশের বাড়ির মৃদুলাকে বলে গেল সে একটু বেরোচ্ছে। অর্ক জাগলে যেন খেয়াল রাখে।

—এই অসময়ে মার্কেটে চললে বউদি? এখন তো চারটেও বাজেনি।

উত্তরে একটু হাসল শুধু। সে হাসি বিবর্ণ, নিষ্প্রাণ।

হেডমাস্টার্স রুমে সুন্দরীমোহন চৌধুরী একাই বসে ছিলেন। বিরাট টেবিল, তিন দিকে চেয়ার সাজানো। দেয়ালে টাঙানো আছে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং মহাত্মা গান্ধীর ছবি। শহরের ঐতিহ্যমণ্ডিত পুরোনো স্কুল।

হেডমাস্টারমশাই মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। সাদা ধবধবে ধুতি পাঞ্জাবি পরা সৌম্যদর্শন প্রৌঢ়। বুদ্ধিদীপ্ত আত্মসন্তুষ্টি দু'টি চোখে। শুনে চেয়ারে হেলান দিলেন তিনি—আচ্ছা, একটু

আগে কে একজন এসে বলে গেল। তাহলে অর্কপ্রভ আপনার ছেলে! স্যাড। ভেরি স্যাড। কিন্তু এখন আমি কী করতে পারি বলুন। আফটার অল, এই ঘটনা তো স্কুল-বাউন্ডারির বাইরে ঘটেছে। আর বড়ো খোকা আমাদের ছাত্র নয়। স্কুল এখানে কী করতে পারে?

আপাদমস্তক স্থবির হয়ে বসে রইল গীতশ্রী। কী বলছেন এই প্রভাবশালী মহামান্য শিক্ষাব্রতী? তাঁর কিছু করার নেই?

তাহলে কে করবে?

রিকশা দাঁড় করিয়ে একটু খুঁজতেই বেরিয়ে পড়ল 'প্রভাত আলো'র অফিস। সঙ্গে প্রেস। সম্পাদকের টেবিল ঘিরে চেয়ার, ফোন। পেছনে ভারতরত্ন বি আর আম্বেদকরের রঙিন ছবি। সম্পাদক প্রেসেই ছিলেন। আজই সন্ধ্যায় বেরোবে সাপ্তাহিক সংখ্যা। তিনি ব্যস্ত। তবু অফিসে সুবেশা সুন্দরী মহিলা দেখে চেয়ারে এসে বসলেন। এঁকে আগেও দেখেছে গীতশ্রী। ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজদের অনুষ্ঠানে নারী প্রগতি সম্বন্ধে অগ্নিগর্ভ ভাষণ দিয়েছেন। তাঁর সম্পাদক-জীবনের অভিজ্ঞতা বাইশ বছরের। সেদিন সদম্ভে তিনি ঘোষণা করেছিলেন—যে কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে প্রভাত আলো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ঘটনার বিবরণ শুনে আগুন জ্বলে উঠল সম্পাদকের দুই চোখে—কী! এতদূর! এ যে শিশুঘাতী বর্বরতা। কী ভেবেছে ওই স্কাউন্ড্রেলটা!

এতক্ষণে মায়ের প্রাণ শান্তি পায়—আপনি তাহলে প্রতিবাদ জানিয়ে লিখুন!

সম্পাদক হাসলেন—আপনি কী ভেবেছেন? আমি ছেড়ে দেব? প্রভাত আলো মাস্তানদের ভয় করে না। দয়া করে এই কথাটা মনে রাখবেন!

তারপর সম্পাদক মাথা নাড়েন—তবে!

—তবে?

—আমাকে ভেতরের খবর জানতে হবে। চাই প্রত্যক্ষদর্শী। একটা পুরো অন্তঃতদন্ত চাই। না, কাউকে ছেড়ে দেওয়া হবে না। আমি বলছি, এই শহর কখনো মাস্তানদের হাতে যাবে না। যেতে পারে না। এখানে ভদ্রজনের বাস। যা খুশি করা যাবে না। এই শহরের লোক তা করতে দেবে না।

সম্পাদক ক্রমশ উত্তেজিত হচ্ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চড়ছিল কণ্ঠস্বর। গীতশ্রী তাকিয়ে ছিল। নিয়নের ঝকঝকে আলোয় মঞ্চে ভাষণরত সদানন্দ চক্রবর্তীকে দেখতে পায় সে। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বলছেন—না, নারীকে আর শৃঙ্খলিত করে রাখা যাবে না।

আরো কিছুক্ষণ উদাত্ত ভাষণ শোনার পর ক্লান্ত স্বরে গীতশ্রী বলল, আমি একটা লোকাল ফোন করতে পারি? সম্পাদক উৎফুল্ল হলেন, নিশ্চয়ই।

ফোন এগিয়ে দিয়ে তিনি প্রেসের ভেতরে ঢুকে পড়লেন আবার।

এ শহর বড়ো শান্ত। যে যার মতো আছে। রাজনীতি নিয়ে, জনজীবন নিয়ে, আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়ে, সিনেমা, থিয়েটার এবং কেচ্ছা নিয়ে এখানে রাস্তায়, চায়ের দোকানে এবং বাড়িতে বাড়িতে আলোচনা হয়। সর্বজ্ঞদের তখন দেখতে পাওয়া যায়। তাঁরা চেতাবনী শোনান। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শোনান। তারপর আত্মপ্রসাদের হাসি হাসেন।

সন্ধ্যার মধ্যে এই ছোটো শহরের অধিকাংশ মানুষ জেনে গেল যে ক্লাস ফোরের একটি বাচ্চা ছেলের মাথা মুড়িয়ে দিয়েছে বড়ো খোকা। তার বাবা ব্যাঙ্কের অফিসার। তার মা একজন বিদুষী মহিলা। অতীশ রীতিমতো বিচলিত। উত্তেজিতভাবে সে বলে, তুমিই এর জন্য দায়ী। আরে, বাচ্চা বাচ্চা ছেলে সব! একটু দেখাদেখি তো করবেই। তাতে কোন্

মহাভারত অশুদ্ধ হয় শুনি। কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে গণ-টোকাটুকি হচ্ছে। যাও, বন্ধ করো তো দেখি! সামান্য ক্লাস ফোরের পরীক্ষা! ছেলেকে এমন শিক্ষা দাও, যাতে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে।

গীতশ্রী শুনে যাচ্ছিল সব। কথা শেষ হলে শান্ত স্বরে বলল, এবার চলো। থানায় যাব।

—থানায়? রীতিমতো চমকে গেল অতীশ, থানায় কেন?

—ডায়েরি লেখাতে। বড়ো খোকার নামে।

যেন পায়ের নিচে বিষাক্ত কাঁকড়া বিছে! লাফিয়ে উঠল অতীশ—তোমার মাথা খারাপ! বড়ো খোকার নামে থানায় ডায়েরি নেবে ভেবেছ?

শান্ত গলায় প্রতিপ্রশ্ন করে গীতশ্রী— কেন, নেবে না কেন? অতীশ প্রায় নেচে বেড়াল সমস্ত ড্রইংরুম জুড়ে। এমনিতে সে শান্ত প্রকৃতির মানুষ। ভদ্র। দায়িত্বশীল ব্যাঙ্ক অফিসার। ভালো মানুষ বলে অফিসে তার সুনাম আছে। কিন্তু একবার উত্তেজিত হলে তাকে শান্ত করা মুশকিল। বিকেল সাড়ে তিনটেয় যে পোশাকে বেরিয়েছিল গীতশ্রী, সেই পোশাক এখনো তার পরনে। তার মুখ শান্ত, কিন্তু কঠোর। সমস্ত শরীরে এক ধরনের অপরিচিত ঋজুতা।

রাগতে রাগতে অতীশ ভয় পেতে শুরু করে। তার এখন দারুণ দুঃসময়। হতে হতে প্রমোশন হয়নি। ছেলেকে এভাবে হেনস্তা করল বড়ো খোকা। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা, গীতশ্রীকে চেনা যাচ্ছে না। অমন হাসিখুশি, সব সময়ে প্রসন্ন, সমস্ত আবদার সহ্য করা তার ভালোবাসার বউ এমন হয়ে যাচ্ছে কেন।

গীতশ্রী উঠে দাঁড়াল। শান্ত স্বরেই বলল, তাহলে আমি একাই যাচ্ছি।

অতীশ নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে। এই অবুঝ নারীকে নিয়ে সে কী করবে।

অর্ক আছে মৃদুলা পিসির কাছে। বাইরে এসে অতীশ জানতে চাইল—বিজয়কে ডাকব? থানার বড়োবাবুর সঙ্গে ওর আলাপ আছে।

হাঁটতে হাঁটতে উত্তর দিল গীতশ্রী—না।

থানার ও সি চেনেন অতীশকে। ছোটো জায়গা। ব্যাঙ্কে সবাইকে যেতে হয়। সমাদর করে দু'জনকে চেয়ারে বসালেন। চা আনতে বললেন আবদালিকে। অতীশ স্বস্তি পায়।

যেমন করে হেডমাস্টারমশাই শুনেছেন, যেমনভাবে সম্পাদকমশাই শুনেছেন, ঠিক তেমনিভাবে মনোযোগ দিয়ে শুনলেন থানার বড়োবাবু। প্রায় একই ভাষায় বর্ণনা করে গেল গীতশ্রী। তারপর অপেক্ষা করে। সে প্রস্তুত। শেষ পর্যন্ত সে দেখবে। এই শহরে তারা আছে পাঁচ বছর। পাড়ার সবাই তাদের পছন্দ করে, ভালোবাসে। বাজারে শহরে অনেক পরিচিত। বাচ্চাদের নিয়ে অনেক অনুষ্ঠান সে করেছে। সেই শহর হঠাৎ অপরিচিত হয়ে গেছে তার কাছে। এই রহস্যের শেষ তাকে দেখতে হবে।

বড়োবাবু মৃদু হাসলেন—শুনুন মিসেস ঘোষ, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, বড়ো খোকার জ্যাঠামশাই এ অঞ্চলের বিধায়ক। মামা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। নিজেও আছে রাজনীতির আশ্রয়ে। আমরা বলি দুর্ভেদ্য ছাতা। অপরাধ তার কম নয়। পুলিশ সব খবর রাখে। কিন্তু তার গায়ে হাত দেওয়া যায় না। পুলিশের হাত অত লম্বা নয়। তবে আমি ওকে সাবধান করে দেব। ভবিষ্যতে আপনাদের যেন আর বিরক্ত না করে। আশা করি আমার এই অনুরোধ অন্তত সে রাখবে।

অতীশ খুশি হয়ে এক গাল হাসল—এই তো! এই-ই যথেষ্ট! ঝামেলায় আমরা যেতে চাই না।

কিন্তু গীতশ্রী স্থির হয়ে বসে আছে। যেন একখণ্ড কাঠ। ও.সি. টেবিলের সামনের দিকে একটু ঝুঁকে এলেন, আই অ্যাম সরি, ম্যাডাম। আমার ছেলে হলেও আমি কিছু করতে পারতাম কি না, সন্দেহ। আইন থাকলেই তার প্রয়োগ হয় না। আমার ওপর ডি এস পি, এস পি, এস ডি ও, ডি এম পর্যন্ত আছে। আমি বড়ো খোকাকে থানা পর্যন্ত ধরে আনতে পারব না!

বাড়ি ফিরে এসে অতীশ সমস্তক্ষণ কথা বলে। বোঝাবার চেষ্টা করে। গীতশ্রী তর্ক করে না। রাগে না। একে একে হাতের সব কাজ শেষ করে একসময়ে শুয়ে পড়ে। কিন্তু ঘুম আসে না। হঠাৎ একটা বল সে আকাশে লাফিয়ে উঠতে দেখে। তার মুখ বরাবর সজোরে নেমে আসছে বলটি. প্রচণ্ড বেগে। গীতশ্রী মাথা নাড়ে। তার তন্দ্রা ভেঙে যায়।

আবার ধীরে ধীরে সবাই আসতে শুরু করে। দু'চার জন এই অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য উচ্চকণ্ঠ। যারা বুদ্ধিমান তারাই শুধু বুঝতে পারে। তাল কেটে গেছে। আর নাচ হবে না।

তিনদিন পর অতীশ প্রশ্ন করে, তুমি অর্ককে স্কুলে যেতে দিচ্ছ না?

—না।

—সে কী!

অতীশ বিস্মিত, ক্রুদ্ধ—আরে, সামান্য একটা ব্যাপারের জন্য তুমি ওর স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিলে! ও কি মূর্খ হয়ে থাকবে নাকি?

অনেকে স্বয়ং এম এল এ সাহেবের কাছে নালিশ করতে বলেছিল। গীতশ্রী কোনো উত্তর দেয়নি।

একদিন বিকেলে অরুণোদয় ক্লাবের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। প্রবোধ, সুমন্ত, অনুনয় ছিল। এরা ভালো ছেলে। গীতশ্রীকে যথেষ্ট সমাদর করে।

গীতশ্রী সহজ গলায় প্রশ্ন করে, এই ক্লাবে তোমাদের বয়সি মেম্বার কত? বিশ-পঁচিশ?

—তা তো হবে, বউদি।

— তোমরা শুধু চাঁদা তুলে পুজো কর, রবীন্দ্রজয়ন্তী কর, পিকনিক কর। তা-ই না?

ওরা যেন একটু ক্ষুব্ধ হল। তা কেন? বউদি? আমরা দুস্থ ছাত্রদের সাহায্য করি। বই কিনে দিই। ফি দিই দরকার হলে।

—কিন্তু বড়ো খোকার নাম শুনলে ভয় পাও।

হাসল গীতশ্রী, তারপর পেছন ফিরে হাঁটতে শুরু করল। ছেলেরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

অনিমা এল একদিন দুপুরে। সবাই জানে, গীতশ্রীর দিবানিদ্রার দোষ নেই।

—এই যে বউদি! অনিমা হাসিমুখে বলে, আমার বড়ো ননদ শিলিগুড়ি থেকে বেড়াতে এসেছে। তোমার সেই টুর্নামেন্টের ছবিগুলো দেখাবে?

গীতশ্রী চা করে নিয়ে এলে। গল্প করল। শেষে অনিমা আবারও অনুরোধ করায় সহজ গলায় বলল, ওই ছবিগুলি আমি পুড়িয়ে ফেলেছি।

— সে কী? অনিমা বিস্ময়ে হতবাক। তারপর চিৎকার করে উঠল, পুড়িয়ে ফেলেছ, মানে! তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ স্মৃতি! পুড়িয়ে ফেললে?

—হ্যাঁ! স্মৃতির চেয়ে বর্তমান বড়ো!

সাতদিনের মাথায় সুখবর নিয়ে এল অতীশ। তার প্রমোশন হয়েছে, সঙ্গে ট্রান্সফার।

—চলো। এই নচ্ছার শহর ছেড়ে আমরা চলে যাই। নতুন জায়গায় নতুন স্কুলে ভর্তি করাব অর্ককে।

খবর ছড়িয়ে পড়ল। নিন্দুকেরা বলল, পালাচ্ছে। মুখ ঢেকে পালাচ্ছে। বেশি বাড় বেড়েছিল। ধরাকে সরাজ্ঞান করছিল। বড়ো খোকা গুমোর ভেঙে দিয়েছে।

কিন্তু খুশি হল না অনেকে। বিশেষত অরুণোদয় ক্লাবের ছেলেরা।

অল্প অল্প করে বাঁধাছাদা শুরু হয়েছে। পাঁচ বছরে জিনিস কম জমেনি। পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে কয়েকজন খেতে বলেছিল। গীতশ্রী রাজি হয়নি। এক কাপ চা-ও খেল না কোনো বাড়ি গিয়ে।

কিছু ঠিক ছিল না। হঠাৎ সন্ধ্যার পর রিকশা করে বাজারে গেল। কফি বিস্কুট সাবান পেস্ট এবং আরো টুকিটাকি কিছু কিনতে। বড়ো রাস্তার ওপরে দোকান। রীতা ভাণ্ডার। দোকানদার পরেশ মণ্ডল ভালো করেই চেনে। খাতির করে যথেষ্ট।

—আসুন বউদি, আসুন। আকণ্ঠ হাসে পরেশ, অনেকদিন পরে এলেন কিন্তু!

গীতশ্রীও মুখে ফুটিয়ে তোলে ভদ্রতার হাসি। দোকানে মোটামুটি ভিড়। তিনজন কর্মচারী আছে রীতা ভাণ্ডারে। তারপর পরেশ নিজে। জিনিস পছন্দ করা এবং কেনাকাটি চলছে। এমনি সময়ে হঠাৎ দোকানের একেবারে সামনে এসে সগর্জনে ব্রেক কষে থেমে গেল একটি মোটর সাইকেল। তার রং টকটকে লাল।

সবাই চকিত হয়ে মুখ ফেরাল। তার মধ্যেই ভেসে এল এক মত্ত কণ্ঠ—

—পরেশ, কাল তুমি টাকাটা পাঠাওনি কেন? চারদিকে একবার তাকিয়ে পরেশ মণ্ডল বলতে গেল—কাল একটু—

—চোপ্! তুমি নিজেকে বড় লায়েক ভেবেছ। খুব তেল হয়েছে তোমার! তেল বের করতে হবে।

পরেশের মাথা হেঁট হয়ে গেল। তার মধ্যেই কাতরভাবে বললে—না খোকাদা, আপনি শুধু শুধু আমার ওপর দোষ দিচ্ছেন!

—আবার কথা! দ্বিগুণ দেবে—চার হাজার!

—মরে যাব, খোকাদা—

ততক্ষণে স্থির দাঁড়িয়ে থাকা ক্রেতাদের পাশ কাটিয়ে সামনে এগিয়ে এসেছে গীতশ্রী—খোকার কথাটা তাকে চুম্বকের মতো সামনে টেনে এনেছে— কাউন্টারের একেবারে সামনের দিকে দাঁড়িয়ে দু'চোখ মেলে মোটর আরোহীকে দেখে—

—আরে!

আসনে বসেই মোটর সাইকেল আরোহী একবার দুলে উঠল—এ যে রাঙা বউদি। আপনি এ সময় এখানে? থানায় যাবেন না? ওই সম্পাদক রাঙা মুলোটার কাছে যাবেন না? যান যান, এখনো যা চেহারা আছে—

সবাই চুপ। দশ-বারো জন ক্রেতা। দোকানের কর্মচারী। শুধু হঠাৎ পরেশ মণ্ডল প্রতিবাদ করে উঠল—না খোকাদা, বউদিকে কিছু বলবেন না।

—শালা, তোমার জন্মের বউদি!

ততক্ষণে বলটাকে লাফিয়ে আকাশে উঠতে দেখল গীতশ্রী—তীব্রবেগে নিচে নেমে আসছে—থার্ড লাইন থেকে পরেশ মণ্ডল দুরন্ত সাহসে সেটা লিফ্‌ট করেছে—নেটে নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে আছে গীতশ্রী দত্ত—মেয়েদের ইন্টার কলেজ ভলিবল কম্পিটিশানের সেরা স্ম্যাশার। নেটে লাফিয়ে উঠল গীতশ্রী। সবাই স্তব্ধ হয়ে সবিস্ময়ে লক্ষ করল শাড়িপরা সেই সুন্দরী ভদ্রমহিলা দ্রুত এগিয়ে গেছেন মোটর সাইকেলের কাছে—শুধু ডান হাতটা চমক দিয়ে ওপরে উঠে গেল—

গীতশ্রীর সমস্ত শরীর এখন ইস্পাতের মতো কঠিন। তার দশ বছরের হলুদ বাটা, ফল কাটা, পায়েস বানানো নরম হাতে ফিরে এল জন্মান্তরের শক্তি। যেন কোন্ গহ্বরে ঘুমিয়ে ছিল কালসাপ। যেন বাঁধ ভেঙে ছুটে এল বন্যার জল। হাত তো নয়, যেন খড়্গ! হাত নয়

যেন কুঠার। তীব্র বেগে নেমে এল। মাথা-গলা-কাঁধ জুড়ে নামল। মুহূর্তের মধ্যে বিস্মিত সকলের চোখের সামনে মোটর বাইক থেকে গড়িয়ে পড়ল মহাশক্তিমান বড়ো খোকা—যেন গাছের পোকা-লাগা কোনো ফল।

বিস্ফারিত চোখে সবাই তাকিয়ে আছে। এও কি সম্ভব? তার মধ্যেই কাউন্টার থেকে নিজের দুটি প্যাকেট হাতে তুলে নিয়ে সকলের চোখের সামনে বড়ো রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াল গীতশ্রী—হাত তুলে রিকশা থামাল—তারপর রিকশায় উঠে চলে গেল।

এক ঘণ্টার মধ্যে আগুনের মতো বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল এই খবর। ছুটতে ছুটতে তাসের আড্ডা থেকে বাড়ি এল অতীশ।

—সর্বনাশ! করেছ কী? বড়ো খোকা হাসপাতালে। এখনো জ্ঞান ফেরেনি। কলারবোন নাকি ভেঙে গেছে। সর্বনাশ হল আমার।

গীতশ্রী শান্ত। অনেক শান্ত। মুখে সেই রুক্ষতার প্রলেপ আর নেই। বরং ফিবে এসেছে সেই স্বাভাবিক মাধুর্য এবং নমনীয়তা।

—ওরা এখন এ বাড়িতে আগুন দিয়ে দেবে। পুড়িয়ে মারবে আমাদের। কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না। আর দু'দিন তুমি অপেক্ষা করতে পারলে না? ট্রান্সফার অর্ডার তো হয়েই গেছে!

গীতশ্রী উঠে দাঁড়াল। চেষ্টা করল স্বামীর কাছাকাছি যাবার। কিন্তু অতীশ ততক্ষণে ছুটেছে দরজার দিকে। দরজা জানলা সব একে একে বন্ধ কবে দিল। সব ছিটকিনি সব শেকল তুলে দিল। তারপর বাইরের দবজার সামনে জড়ো করে টেবিল, চেযার, বেঞ্চ। তারপর একে একে ঘরের সব আলো নেভাতে শুরু করে।

গীতশ্রী দেশলাই জ্বালিয়ে একটি মোমবাতি ধরাল। অতীশ চিৎকার করে উঠল—না, না। আলো নয!

এতক্ষণে স্বামীর কাছে আসার সুযোগ পেল। দু' হাতে চেপে ধরল ওর একটি হাত। অতীশ হাত ছাড়িয়ে নিতে চায়। উত্তপ্ত নিশ্বাস, অস্থির চোখের দৃষ্টি। গীতশ্রী জোব করে ওর মাথা কাছে টেনে এনে চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দেয়। যেন জল-ভরা মেঘ। বর্ষণ তার স্বভাবধর্ম।

উদ্‌ভ্রান্ত অতীশ আবারও বলে, আমাদের কী হবে গীতু!

—এ ঘরে আগুন দিতে পারবে না। তাহলে আবো দুটি ঘব পুড়বে। পাড়াতে সে আগুন ছড়াবে। তুমি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছ।

অতীশ বলে, কিন্তু।

—আর যদি দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকে? তুমি এই লাঠিটা নাও, আমি নেব এই তরকারি কাটা ছুরি। কেমন? বলে হাসে গীতশ্রী।

অবাক হয়ে দেখে অতীশ। দশ বছর আগে বাসর ঘরে এমনি হেসেছিল নব-বিবাহিতা বধূ। সব ভুলিয়ে দেওয়া হাসি। নিজের ভয়ের কথা ভুলে গিয়ে সেই মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অতীশ!

রাত বারোটায় হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। বাড়ির চারদিকে পায়ের শব্দ। মৃদু কথা। অতীশ নিশ্বাস বন্ধ করে শোনে। গীতশ্রীও জেগেছে। ঘুমিয়ে আছে শুধু অর্কপ্রভ। নিশ্চিন্তে। গীতশ্রী উঠল। অতীশ চাপা আর্তনাদ করে, কোথায় যাচ্ছ তুমি?

— দেখি!

—দেখি মানে? কী দেখবে?

কথা না বাড়িয়ে জানলার একটা পাল্লা খুলে দিল গীতশ্রী। লাইট জ্বালাল।

বাইরে ছেলেরা দাঁড়িয়ে আছে। প্রবোধ, অরুণ, মোহন, দ্বিজপদ, অনুনয়। প্রায় সমস্বরে তারা বলে উঠল—আবার উঠলেন কেন, বউদি? লাইট নিভিযে শুয়ে পড়ুন। আমবা আছি।

একটি অশুচি মেয়ের গল্প

কবিতা সিংহ

বিভাস দেখল, হোটেলের পেতলের কারুকাজ করা ভারী দরজাটা খুলে প্রদীপ্ত ঢুকছে। এই দিনরাত্রিহীন রঙিন অনন্ত গোধূলি রং হোটেলের অন্তঃপুরের দরজায় প্রদীপ্তর শরীরের দীর্ঘ সুন্দর সুঠাম আউট লাইনটা দেখেই বিভাস সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপ্তকে চিনে ফেলল। প্রদীপ্ত সোজা হেঁটে আসছে। কারণ, সে জানে বিভাস এই হোটেল 'লা রুজ্'-এ ঠিক কখন, ক'টার সময় রবিবার তার লাঞ্চ খেতে আসে। প্রদীপ্ত আরও জানে, এবং হোটেলের অভিজ্ঞ ম্যানেজারও, যে বিভাস ঠিক কোন জায়গাটিতে, কোন টেবিলে বসা পছন্দ করে। এখানে দেওয়ালটা একটু কোটরের মতো করা। যাতে যে বসবে, সে কোটরের মধ্যে অর্ধেকটা ঢুকে যাবে। এবং সামনের টেবিলটা মাত্র দু'জনের। এখানে কোনো সদ্য বিবাহিত বা প্রেমে ডুবুডুবু জুড়ি বসবে এই কথাটা ভেবেই বোধহয়, এই সিট্ অ্যারেঞ্জমেন্টের প্ল্যান হয়েছিল। কিন্তু ববিবাব রবিবাব লাঞ্চ-টাইমে এই প্ল্যানটা কখনো কখনো বদলে যায়। বিশেষতঃ বিভাসেব যখন রুগী দেখতে দেখতে ক্লান্ত ব্রেনে আব কিছু ঢোকে না, এবং প্রদীপ্তর ব্রেন থেকে সৃজনশীল কোনো লেখা, কোনো কিছু বেরোতে চায় না।

তখন বিভাস প্রদীপ্তকে ফোন কবে কিম্বা প্রদীপ্ত বিভাসকে। কখনো কখনো দুজনেই দুজনকে। ফোন 'বিজি' থাকলে দুজনেই বোঝে যে পরস্পব পবস্পরকে 'ট্রাই' করছে। সুতরাং দুপুবের অ্যাপয়েন্টমেন্টটা ঠিক আছে। বিভাসের সামনেব চেয়ারটা টেনে বসে পড়ল প্রদীপ্ত। গোল ধরনেব কোটরটার মাঝখানে বাঙালি পোষাকপরা বিভাসকে একেবারে কার্তিক ঠাকুরের মতো লাগছে। প্রদীপ্ত হেসে বলল — 'ব্যাপাব কী? চিকনের পাঞ্জাবি, হীরের বোতাম, তলায় ধুতি না পায়জামা? মনে হচ্ছে একেবারে কালীঘাটের পট থেকে উঠে এলি?' বিভাস হাসল। 'মাথার উপর দিয়ে বড্ড চাপ যাচ্ছে। কালকে চাব চাবটে পেশেন্টকে দেখতে হল। রাতে মড়ার মতো ঘুমিয়েছি। তারপর তোকে মনে পড়ল। সকালবেলা তোকে ফোন করলাম। তারপর ঘন্টাখানেক বাথটবে। তারপর এইসব 'বাবু কালচার' করে চলে এলাম!'

প্রদীপ্ত বলল— 'একটা সিগারেট্ দে।' তাবপর বলল,— 'নাঃ, থাক্। এদিকে ওদিকে দুচারটে জানানা বসে আছে, সিগারেট ধরালে এখুনি খাই খাই করে উঠবে!'

চেয়ারে হেলান দিয়ে প্রদীপ্ত বলল— এই কোটরটা দেখলে ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে না? সেই গাঁয়ের ইছামতীব তীরে নদীর ওপর ঝুঁকে পড়া কোটরওয়ালা বটগাছটার কথা?'

বিভাস বলল— 'তখন তো ছোট ছিলাম, দুজনেই ঢুকে যেতাম। তাছাড়া আমাদেব কাচের গুলি, রবারের বল, লাটাই, তীর ধনুক, টিনের তলোয়ার— সব, সবই ঢুকে যেত। কী হাল্কা লাগত মাথাটা। যেন সব সময় শরৎকাল। সবসময়ই ননীর দলার মতো মেঘ। আর এখন? —ওফ্!'

প্রদীপ্ত বলল— 'টাকার তো আন্ডিল হয়ে গেছে। তাছাড়া তোর বাপেব টাকাই বা খায় কে? ছাড় না ওই সেলফ্ ইমপোজড্ শ্লেভারি। একটু রুগীর ভিড় কমা না!'

বিভাস বলল— 'আর তুমিই কেবল শালা দশভুজ হয়ে লিখে যাবে। মাসে চারটে করে নভেল, কাগজে তিরিশ দিনে চল্লিশ খানা ফিচার লেখা।'

প্রদীপ্ত বলল— 'লেখা একবার ধরলে 'কম্‌লি' হয়ে যায়। আব 'কম্‌লি' কভি নহী ছোড়তা। খবরের কাগজের সাহিত্যিক হলে নিয়মিত দুধ দেওয়া বন্ধ করলে চলবে না. দাদা। বস্ ভাববে গরুটা বাঁজা হয়ে গেছে।'

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল দুজনে। ঝুঁকে পড়ে হাতে হাতে তালি দিল একটা।

এটা কলকাতার সেই জায়গা যেটা আমেবিকাতেও হতে পাবত। ইউরোপেও। এয়ার কন্ডিশনড্। শব্দ নিরোধক। এবং কেবল ব্রিটিশ ও কন্টিনেন্টাল ফুড অতি কায়দা করে সার্ভ করে। এই দেয়ালের ওপাশে তুমি ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবি কিংবা আইফেল টাওয়ার আছে ভাবতে পার। অথবা 'স্ট্যাচু অফ লিবার্টি'।

কিন্তু আসলে অনেক নিচে ভিন্‌ভিনে মাছির মতো মানুষ, নিচের চৌরঙ্গীতে একটাকা করে প্লাস্টিকের খেল্‌না বিক্রির ভিড়। অদ্ভুত পেট্রল জীবনানন্দ দাশেব কবিতার অমোঘ লাইনের মতো, গাঢ়লের মতো কেশে কেশে চলে যাচ্ছে ট্যাক্সিগুলো। ভিখিরি আর স্মাগলারের কিচিমিচি এই অ্যাতো ওপরে, আর পৌঁছোচ্ছে না। বিভাস বলল— 'আজ শালা একটা ইমপর্টেন্ট্ কনফারেন্স থেকে কাট মারলাম। হোটেল হিন্দুস্তানে দশটার সময় শুরু হবে। ইণ্টারন্যাশনালি ফেমাস সব সাইকলজিস্ট আসছে— তাছাড়া লাঞ্চও—'

প্রদীপ্ত বলল— 'আর আমি শালা কাট মারলাম আমারই সম্মানে গ্র্যান্ডে একটা সাহিত্য-বাসর হচ্ছে— সেটা থেকে। রুপোব থালায়, চন্দন কাঠের বাক্সে দশ হাজাব টাকার চেক এবং গোলাপ ফুল দিত। তারপর সুন্দরী মেয়েরা নাচতে নাচতে এসে মালা পরাত। টিপ্ পরাত। বেশ একটা পবিত্র পবিত্র ভাব। তারপর বুফে। বেশি দূর নয়। এইতো দু'পা গেলেই। গ্র্যান্ডে। তবে চেকটা পাব। উদ্যোক্তারা ঠিক দিয়ে যাবে।'

—'যাক্‌গে লাঞ্চের অর্ডার দে—'

বেয়ারা কাছেই ছিল। ছুটে এসে মেনু বুক দিয়ে সালাম করে বলল— 'স্যর্'

প্রদীপ্ত বলল— 'আগে তো দু'কাপের মতো একপট কফি দাও। আর চিজ স্যান্ডুইচ। ততক্ষণে আমরা মেনুটা ঠিক করে ফেলি।'

খদ্দের এখন সময় কাটাবে। চালু বেয়ারা। বিভাস আর প্রদীপ্তকে বেশ ভালো করে জানে।

প্রদীপ্ত বলল— 'মাইরি! তুই যা এক একখানা কেস হিস্ট্রি ছাড়িস— আমি বড় বড় গল্প আর ছোট ছোট উপন্যাস যে তাই থেকে কত কী পেয়ে যাই! আব আমার দরকারও আছে। বস্ ডেকে বলেছে— এবার হোলি ইস্যুতে একটা জমাটি গল্প দিতে। কালার্ড ইলাস্ট্রেশন করে ছাপবে। লিখে দেবে— "উপন্যাসোপম" বড় গল্প। তা তোর আজকের গল্পে একটু অ্যাডভানস আবির গুলাল ছড়িয়ে ফোড়ন দিয়ে নেব এখন। এবার গল্পটা শুরু কর।'

বিভাস বলল— 'তুমি শালা! হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর হলে কী করে, যে তোমায় আমি গল্প বলতেই ডেকে এনেছি?— তুমি কি জান, যে আমার পকেটে একটা রিভলভার আছে! আমি আজ গল্পটল্প নয়। বদ্‌লা নিতে এসেছি!'

প্রদীপ্তর সামনে তখন হোয়াইট মেটালের কফি সেট। সে কফিতে সামান্য দুধ ঢেলে বলল— 'তুমি শালা রিভলবার ছোঁড়বার মতো বোকা নও। আওয়াজ হবে না? বরং, তুমি হলে বিষবড়ি মিশিয়ে দেবার পাত্তর। তা কোথায় রেখেছ বিষটা দাও না। চিনিটা গুলছি যখন, ওটাও গুলিয়ে নিই!'

বিভাস হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল। কফিতে একটা চুমুক দিল। তারপর বলল— 'নে এবার খাবারের অর্ডারটা বেশ একটা মৌজ করে দিয়ে দে। তোর আর আমার তো পছন্দ একই। আমি শুধু একটা চিকেন রোসট্ এর কথা ভাবছিলাম।'

খাবার অর্ডার দেওয়ার পর বিভাস বেযারাকে ডেকে নিচু গলায় বলে দিল— 'বেশি তাড়াহুড়ো করবার কিছু নেই। আস্তে আস্তে আনলেই হবে।' তারপর প্রদীপ্তকে বলল— 'তোকে মাইরি দ্যাখাচ্ছে কিন্তু খাসা। একেবারে কলেজের ছোঁড়ার মতো। সবুজ টি শার্ট, তাতে 'লাভ', লেখা। আর ব্লু জিনস' কে বলবে যে 'ফ্রানজ অ্যান্ড জেম্‌সের', চিফ একজিকিউটিভ নোস তোর দাদার মতো। নেহাতই একটা স্ক্যান্ডাল মঙ্গার খবরের কাগজে কাজ করিস।

—'এই বেশি কথা না। সামনের মাস থেকে আর একখানা গাড়ি পাচ্ছি। আর মোটা ইনক্রিমেনট্। তোর মতো ফ্যাবুলাস্ রোজগার না হলেও গুনতিতে এমন কিছু কম নয়। নে এখন গল্পটা শুরু কর।'

বিভাস বলল— 'মেয়েটার নাম ধর— সুধা!'

—'সুধা? নাঃ চলবে না। সুধা না, সুরমা না, কনক না। নীপা না। রমা না।'

—'আচ্ছা তাহলে জ্যোতি।'

—'আচ্ছা। চলেবল্। বলে যা।'

'আপাততঃ জ্যোতির বয়স পঁয়ত্রিশ। অবশ্য দেখায় ত্রিশ। ওজন একশো কুড়ি পাউন্ড, হাইট পাঁচফুট চার ইঞ্চি। তলপেটে চর্বি নেই। দুই ছেলের মা কিন্তু বুকের গড়ন একটুও স্থানচ্যুত নয়। মাথার চুল ব্রঞ্জ শেড্ দেওয়া কালো। লম্বা। কোমরে ভাঁজ পড়ে না। কোমর সরু, চমৎকার নাভি। আমার কেবল অপছন্দ ওর প্লাক্ করা ভুরু আর ব্লিচ করা মুখ। এবং থ্রেডিং করে আবার কপালের ওপর ঝুরো চুল ফেলে রাখে। সুন্দর বড় বড় চোখ। কিন্তু চোখের কোলে গভীর কালি। ওর প্রবলেম হল আজ একমাস হল ও ঘুমোতে পারে না।'

প্রদীপ্ত বলল- 'তা ঠেসে ঘুমের ওষুধ দিয়ে দে,—'

—'না আরও প্রবলেম আছে। ও নাকি সবসময়, সারা দিন-রাত সুযোগ পেলেই হাত ধোয়। আমি নিজে দেখলাম। ওর হাতের আঙুলগুলোর চামড়া সাবান সোডায় কুঁচকে কুঁচকে গেছে। ওকে নিয়ে এসেছিল কে জানিস? গুরু ট্রান্সপোর্টের সুরজ খান্না!'

একটু যেন চিন্তান্বিত হল প্রদীপ্ত।

—'লোকটার নাম খান্না। পেট মোটা। গলগল করে কথা বলে। ও-তো মেয়ে সাপ্লাইয়ের দালাল। হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে পড়েছে।'

বিভাস সান্ত্বনার সুরে বলল— 'আরে আরে সেটা সবাই জানে। "গুরু ট্রান্সপোর্ট" ওয়ালারাও জানে। কিন্তু একটা লোক দেখানো চাকরি দিয়ে রাখতে হবে তো। মেয়ে ট্রান্সপোর্টও গুরু ট্রান্সপোর্টের সাইড বিজনেস।'

প্রদীপ্ত বলল— 'হয়েছে! বুঝেছি! এবার বাতেলা ছেড়ে, আসল কথাটায় এসো দেখি বাছাধন!'

—'ওর স্বামীকে না জানিয়ে, সুরজ খান্না ওকে আমার কাছে দেখাতে নিয়ে এসেছিল।'

প্রদীপ্ত অর্থপূর্ণস্বরে বলল— 'ওঃ, তাই নাকি?'

—'আমি দু-একটা প্রশ্নটশ্ন করে কিছু ট্রাঙ্কুলাইজার প্রেসক্রাইব করে দিই। তারপর—'

— 'হ্যাঁ। তারপর?'

বেশ সিরিয়াস হয়ে জাঁকিয়ে বসল বিভাস। কাচের ল্যাডল্‌টা নিয়ে স্যুপ তুলল একটু। তারপর পেশাদারি ভঙ্গীতে বলল,— 'তারপর মেয়েটি একদিন নিজেই চলে আসে।' কথাটা

বলে বিভাস প্রদীপ্তর দিকে তাকাল একবার। আজকাল নিযম হচ্ছে যে, বেস্তোবাঁ যত দামি, সেখানে মৃদু আলো দিযে তত বেশি অন্ধকাব বানানো জরুবি। তাব ওপব হোটেলেব দেযালেব বং গাঢ 'পীচ্'। তাদেব টেবিলেব উপর নামানো আলোব শেডটা শুধু খাবাবেব ওপব আলো ফেলবাব জন্য। তাতে আবাব গাঢ পীচ শেডেব থেকে লালচুনিব মতো পুঁতিব ঝুবি ঝুলছে। এ হোটেলে কালাব সেনস্ এর কোনো একটা মা বাবা নেই। কে যে এই হোটেলের ইনটিরিয়ব ডেকবেশন কবেছে! কে জানে?

বিভাস স্যুপে চুমুক দিযে বলল-- 'তাবপব তাকে, আমি আমাব স্পেশাল সিটিং চেম্বাবে নিযে গেলাম। ও অবশ্য বলল— ও এমনি আলাপ সালাপ কবতে এসেছে। আমাকে ওব খুব আপন মনে হয়েছে তাই! কিন্তু আমি বুঝেছিলাম—ও সত্যিই খুব কষ্ট পাচ্ছে। সত্যি সত্যিই।'

তাই আমি ওকে নিযে গিযে স্পেশাল চেযাবে বসালাম। একটা নীল ভাযোলেট তরঙ্গাযিত আলো জ্বেলে দিলাম। খুব মৃদু একটা মিউজিক। ওব প্রিয় মিউজিক। তাবপব চাবি ঘুবিযে চেযাবটা আবও এলিযে দিলাম। আমি জ্যোতিকে বললাম— দেখুন খুব অন্তবঙ্গ বন্ধুব মতো আপনাকে একটা অনুবোধ কবব? সেটা আপনি যদি বাখতে না পাবেন, তাহলে আমি কিন্তু আপনাব কোনো উপকাবে লাগতে পাবব না। এবং আপনাব জীবনেব এই সব ঘটনাব শেষ পর্যাযটি হল— পূর্ণ মস্তিষ্ক বিকৃতি। এই কথাটি জেনে বাখুন। এমনিতেই ডাক্তাবেব কাছে কিছু লুকোতে নেই। যে সব ডাক্তাববা দেহেব বোগ দেখেন, তাবা তো নানাবকম টেস্ট কবেও বুঝে নেন যে বোগীব আসল বোগটা কী ও কোথায়? কিন্তু মনেব বোগ [illegible] বোঝা যায় না। যতক্ষণ না আপনি আপনাব সম্পূর্ণ মনটা আমাব সামনে মেলে ধবছেন। [illegible] বলছি, সত্যি যদি আপনি নিজেব ভালো চান, আমাব কাছে কিছু গোপন কববেন না। [illegible] মনোবিজ্ঞানী। আমবা গোপন বাখতে শিখি। কাবও কথা কাউকে কখনও বলি না।

[illegible] গলায বলল— 'আমি কথা দিচ্ছি ডাক্তাববাবু। আমি সত্যিই আপনাব কাছে কোনো কথা লুকোব না।'

আমি [illegible] ঠিক আছে। কথা লুকোলে আমি কিন্তু বুঝতে পাবব।'

তাবপব [illegible] চুপচাপ বসে বইলাম দুজনে। ঘবেব পবিবেশেব শান্তিটা থিতোতে দিলাম। তাবপব [illegible] বলুন। কী ভাবছেন?

ঘুম ঘুম [illegible] কথা বলছিল [illegible]

— কিছু [illegible] ডাক্তাব বাবু — কিন্তু ছবি দেখছি।

-- ফটো?

না। টুকবো দৃশ্য।

যেমন?

এই [illegible] দেখুন না। আমি কিচেনে। [illegible] কবছি। প্রেশাব কুকাবটা হুইসল [illegible] বেসিনে হাত ধুচ্ছি [illegible] প্রেশাব কুকাবটা শিগগিব [illegible] আমি এদিক ওদিক তাকিযে [illegible] চাবপব [illegible] কাছে গেলাম [illegible] হ্যান্ডেলটা কী কবে ধবব [illegible] বেডরুমে গেলাম। আলমাবি খুললাম। সবচেযে তলাব তাকে আমাব বাতিল [illegible] পুবনো শাড়িগুলো থাকে। একটা হলুদ বঙেব ফুলফুল জবপুবি শাড়ি ছিল। অনেকবাব পবা। দুতিন জাযগায় ছেঁড়া। সেটা তুলতে গিযে হাতে প্রচণ্ড শক্ খেলাম। হ্যাঁ। বিশ্বাস করুন ডাক্তাববাবু। ইলেকট্রিকেব শক। আমি শাড়িটা হাত থেকে ছুঁড়ে দিলাম। একটা ছেঁড়া পুবনো টাওযেল পেলাম। তাড়াতাড়ি সেটা নিযে কিচেনে গিযে, প্রেশাব কুকাবটা নামালাম। কিন্তু ওই হলুদ

ছাপা ছাপা জয়পুরি শাড়িটা, ওটা— ওই শাড়িটার কথা কিছুতেই মাথা থেকে গেল না। কিন্তু কী ছিল শাড়িটায়? শক লাগল কেন? ইলেকট্রিকের শক? না কি, কোনো বিছে এসে হুল বসিয়ে দিল আমাকে। শাড়িতে লুকিয়ে ছিল হয়তো!

আমি বললাম— ঠিক ওই শাড়ি। ওই শাড়িটার কথা আগাগোড়া ভাবুন তো। ঠিক ওই শাড়ি। কোথা থেকে কিনেছিলেন? কবে কিনেছিলেন? কেউ কি শাড়িটা উপহার দিয়েছিল আপনাকে? আপনি কি শাড়িটা পরতে খুব ভালোবাসতেন?

জ্যোতি অস্থির গলায় বলল— 'আমি জানি না। আমি জানি না ডাক্তারবাবু। কিন্তু একটা সুতোর শাড়ি। শাড়িটা আমায় হুল ফোটালো কেন? শক দিল কেন?'

প্রদীপ্ত একটু খাড়া হয়ে বসে, তার খাদ্যদ্রব্যের সদ্ব্যবহার করতে করতে বলল — 'ইন্টারেস্টিং! ভেরি ইন্টারেস্টিং! তারপর?'

হঠাৎ বিভাস রোস্ট থেকে বড় একপিস মুর্গার মাংস ছুরি দিয়ে কেটে, কাঁটা দিয়ে তুলে চিবোতে চিবোতে বলল— 'আমাদের ওই দস্যু রত্নাকর? ওই যে, পরে বাল্মীকি মুনি রে। তার গল্প ছোটবেলা থেকেই তো শুনে আসছি। তাই না?'

'বাল্মীকি মুনি যখন রত্নাকর ছিল, তখন সে ছিল এক ভয়ঙ্কর খুনি ডাকাত। মানুষকে মেরে তার সর্বস্ব হরণ করে সে সংসার চালাত। খুনই তার পেশা ছিল। হরণই তার পেশা ছিল।'

'হঠাৎ বাল্মীকি মুনি? এই প্রসঙ্গে সেই গল্প এল কেন? অর্থাৎ, তুই কি বলতে চাইছিস, এই মেয়েটি, মানে জ্যোতি— সে এতো আকাট ছিল, যে, দেহদান করে, টাকা জোগাড় করা ছাড়া তার গত্যন্তর ছিল না? তাই সে পরিবারকে লুকিয়ে .'

—'না মানে ওই খানটাতেই একটা কথা আছে। ওইখানেই মানুষে আর মাংসাশী পশু বা শিকারি পাখিতে একটা বড় তফাৎ।

মাংসাশী পাখি বা পশু শিকার করে, লোভে নয়, খিদের চোটে। যখন পেট জ্বলে। তারপর তাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়।

মানুষ শিকার বা সংগ্রহ করা প্রাণীকে বা তার মাংসকে, তেল নুন পেঁয়াজ, রসুন, মশলা দিয়ে রান্না করে, তারপর ফুলকাটা প্লেটে সাজায়, ক্রমশঃ খিদে তৈরি করে। তারপর তা তারিয়ে তারিয়ে খায়। আমাদের এই জ্যোতির স্বামী ছিল। খুব একটা বড়লোক নয় ধরনের স্বামী। কিন্তু জ্যোতির একেবারেই না খাওয়ার অবস্থা ছিল না। জ্যোতির মাথার উপর ছাদ ছিল। বাথরুমে কলের জল ছিল। বিদ্যুতের তারে বিদ্যুৎ ছিল। তাতে আলো-পাখা জ্বলত। জ্যোতির চুলোও জ্বলত এবং খাওয়ার-দাওয়ার রান্না-বান্নারও ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু জ্যোতি আর জ্যোতির স্বামী, এবং তার সঙ্গে থাকা কিশোর দেবরটি, এই "অন্ন লইয়া"— একদমই সুখী বা খুশি ছিল না।'

প্রদীপ্ত বলল— 'তুই কী করে জানলি?'

— 'জানলাম প্রশ্ন করে করে।'

— 'এখন আগে আমার প্রশ্নের একটা উত্তর দে! সেই হলুদ রঙের জয়পুরি ফুল ফুল শাড়িটা—'

— 'দিচ্ছিরে বাবা' দিচ্ছি! শনৈঃ, শনৈঃ। এই যে জ্যোতি পাকড়াশি! এর কিন্তু একটা নিজস্ব গল্প আছে। গল্পটা ওই লোভী বাল্মীকির ব্যাপারটাও এক্সপ্লেন করে দিতে সাহায্য করবে হয়তো।

জ্যোতির কাছ থেকে সেই সেদিনের সিটিং-এর পর এবং তারপর কদিন বাদে, আরও একটি সিটিং এর পর আমি তার ব্যাকগ্রাউন্ড সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হই। খুব মামুলি

কাহিনী। জ্যোতি আর জ্যোতির স্বামীর কিছু এমন লাভ ম্যারেজ নয়। জ্যোতির স্বামী কাগজের'পাত্র-পাত্রী' কলামে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল 'চাকুরিরতা স্ত্রী বাঞ্ছনীয়' বলে। জ্যোতি চমৎকার গান গাইত। একটা গানের স্কুলে চাকরিও করত। সে ওই বিজ্ঞাপনের বক্স নাম্বারে নিজেই একটা পোস্টকার্ড ছাড়ে। তারপর দুজনের আলাপ হয়। পরস্পরকে পছন্দ হয়। জ্যোতির চাকরিটাও ফুলটাইম নয় বলে ওর স্বামীর পছন্দ হয়। আর নিজের চাকরিতে ভবিষ্যতে উন্নতি করতে পারলে জ্যোতিকে ওই পার্টটাইম চাকরিও যে করতে হবে না, তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ওর স্বামী প্রদ্যোত ওকে বিয়ে করে।'

— 'অর্থাৎ বিয়েটাই 'দি এন্ড' নয়। তারপরও গল্পটা চলেছে!'

— 'হ্যাঁ। সেই রকমই। বরং বলতে পারিস, ওইখান থেকেই, গল্পটা গতানুগতিকতা থেকে বাঁক নিয়েছে নতুন রাস্তায়। ওরা বিয়ের পর বরানগরে একটা আস্তানায় থাকত। গানের স্কুলে গানের টিচারি করতে করতে কোনো এক ধনী ছাত্রীর জন্মদিনের পার্টিতে গান গেয়ে জ্যোতি ছাত্রীর ব্যবসায়ী পিতার চোখে পড়ে। এবং তার আমন্ত্রিত বন্ধু সুরজ খান্নার। খান্না তাকে রোজগারের নতুন দরজা খুলে দেয়। এবং দিতে থাকে। একটি একটি করে অনেক দরজা। প্রথমে ছোট ছোট জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী কিংবা বড় অফিশিয়ালদের ছোট প্রাইভেট ঘরোয়া পার্টিতে গান গাওয়ার নেমন্তন্ন। যে নেমন্তন্ন কেবল খাবারের বাক্স দিয়ে কর্তব্য সারে না। সঙ্গে নোটের গোছাও দেয়,— তারপর একটু বড় বড় বাড়িতে গানের টিউশনি, এবং তারপর ভালো ভালো ফাংশনে নেমন্তন্ন। পুজোয়, দেওয়ালিতে, অবাঙালিদের নানান ধরনের অনুষ্ঠানে। জ্যোতির গান কেবল শোনবার জন্যই ভালো নয়। দেখবার বস্তুও বটে। সে ঠিক সময় ঠিক মুডটা আনতে জানত। কোথায় তাকে ক্যাবারে গাইতে হবে, কোথায় তাকে চাঁদনীর শ্রীদেবী হতে হবে, কিম্বা কোথায় তাকে 'জোবাজোবি চানে কি খেত মে'-র মাধুরী দীক্ষিৎ, সে তা ভালো করে জানত। ক্রমশঃ এত টাকার আমদানি হতে লাগল যে— এবং শেষ পর্যন্ত কেবল টাকাই নয়,— খান্নার যা আসল ধান্ধা যাকে বলে কলগার্ল সাপ্লাই— সেখানেও ভিড়ে গেল জ্যোতি। চমৎকার! ঘুম ঘুম স্বরে বেশ বলছিল জ্যোতি। কী হয় ডাক্তারবাবু বলুন। যতই ময়লা মাখুন, একটা চমৎকার শাওয়ার নিলেই তো ব্যাস্। একেবারে আনকোরা। তাই না?

আর সবচেয়ে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল কে জানিস? ওই পোড় খাওয়া পাকা দালালটা। যার নাম খান্না। সুরজ খান্না। জীবনে ঢের ঢের মেয়ে সাপ্লাই করেছে, সব বিশ্ব সুন্দরী, মহা-বিশ্ব সুন্দরীদের মতো মেয়েছেলে। কিন্তু ওই ঘরোয়া চেহারার, গান জানা বাঙালি মেয়েটার মধ্যে লোকে কী পায়? যেসব অবাঙালি ব্যবসায়ীরা দুচার দিনের জন্য কলকাতায় ট্যুরে আসত, — তারা খান্নাকে ট্রাংককল করে দিত আগেভাগে। ভালো একটা হোটেল চাই। আর সেই বাঙালি গান জানা মেয়েটাকে চাই।

জ্যোতি তাদের সন্ধেবেলা, কিম্বা দুপুরবেলা দু-তিন ঘন্টার সুখ সাপ্লাই করে দিত। সুরজ খান্না একবার জিজ্ঞেসও করেছিল জ্যোতিকে— এত্‌না রূপিয়াসে কর্‌োগি কেয়া?

জ্যোতি বলেছিল— আরও চাই। বড্ড আটকে পড়েছি। লোভে পড়ে, 'স্বর্গারোহিণী' কমপ্লেক্সে একটা অ্যাপার্টমেন্ট বুক করে ফেলেছি। অবশ্য ওরা টাকা একসঙ্গে নেবে না। ইনস্টলমেন্টে নেবে। কিন্তু অনেক টাকা।'

— 'এই অনেক টাকা জ্যোতি পেল কোথায়? দেহ বেচে? আমি বিশ্বাস করি না!'

— 'না, না, ওর এক বৃদ্ধ ক্লায়েন্ট দয়াপরবশ হয়ে ওর স্বামীকে একটা ভালো কোম্পানিতে এগজিকিউটিভ-এর চাকরি দিয়েছিলেন।

সিটিং-এর চেয়ারে এলিয়ে জ্যোতি খুঁক খুঁক করে হেসেছিল।

-- জানেন ডাক্তারবাবু! মিঃ হোলকার না কী রকম সাজিয়ে গুছিয়ে মিথ্যে বলতে পারে। আমার স্বামীকে বেশ কেমন সাবানধোয়া গলায় বলে দিল, জ্যোতিকে আমার মেয়ের মতো দেখি কিনা? আমাদের ক্লাবের সবাই ওর হিন্দি উচ্চারণের খুব প্রশংসা করে!— তাই ও যখন বলল, আপনি এত হাইলি কোয়ালিফায়েড, অথচ একটা বাজে জায়গায় ফেঁসে আছেন। যেখানে এবিলিটি দেখাবার কোনো স্কোপ্ নেই — গুণের কদর নেই ..

জ্যোতি ঘুমের মধ্যেই জড়িয়ে জড়িয়ে বলছিল আসলে প্রদ্যোতও দেখুক। জানুক। এই শহর কলকাতায় কত ওপরতলা আছে। নিচুতলার যেমন শেষ নেই, ওপরতলারও তেমন 'অবধি' নেই। কী বলেন ডাক্তারবাবু?

প্রদীপ্ত মুরগির পা'টা কায়দা করে চিবোতে চিবোতে বলল— 'তাহলে নিজে ''নাগর'' করে আশ মেটালো না জ্যোতি। স্বামীকেও 'নাগোরদোলায়' চড়াতে গেল?' ''সুব্রত খান্না ভেবেছিল অ্যাপার্টমেন্ট বানানোর পর, দেওরের ভালো কলেজে ঘুষ দিয়ে দাখিলার পর, ছেলেমেয়েদের দামি 'ডে কেয়ার'-এ ঢোকানোর পর জ্যোতি আর প্রদ্যোতের 'কিং সলোমনস্ মাইন' হান্টিং শেষ হবে। আর তো কোনো চাহিদা নেই। সেই রূপকথা-- ফেয়ারি টেল?— তার গল্পের মতো— সো দে লিভড্ হ্যাপিলি এভার আফটার। বাংলায়--- তারপর তারা সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল।

প্রদীপ্ত বলল — 'গণ্ডগোলটা তো ওইখানে। ওই 'স্বচ্ছন্দে'। ভেবে দেখ একবার। 'আমরি বাংলা ভাষা।' কবি নীরেন চক্রবর্তী একবার হাসতে হাসতে বলেছিলেন -- সিগারেট খাবি? আমি বলেছিলাম-- সচরাচর খাইনে, তবে আপনি দিলে— খাব!'

-- এই-ই যায় কোথায়। উনি আরম্ভ করলেন,— 'সচরাচর' এতবড় কথাটা টক করে বলে ফেললি? মানেটা যে কত বড়? — তা একবার ভেবে দেখেছিস? -- সচরাচর, এই সম্পূর্ণ জীব ও প্রকৃতির পুরো ব্যবস্থাটা। যারা চরে এবং যারা চরে না। এই সব নিয়েই তো চরাচর। স চরাচর, দ্যাখ এত বিরাট, ব্যাপ্ত শব্দটাকে আমরা নামিয়ে এনেছি কোথায়। সেদিন সারা সন্ধে ওই 'সচরাচর' শব্দটা আমাকে পাগল করে রেখেছিল। আজ পাগল করল তোর ওই 'স্বচ্ছন্দে'। অর্থাৎ নিজস্ব ছন্দে। জ্যোতি এবং জ্যোতির পল্টন, স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল। শালা, গল্প যদি এই ভাবে শেষ হয় তো বলব-- একটা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বলে বসল—মিয়াঁও।''

- 'ঠিক তাই।' বিভাস বলল— 'তুই গল্প লেখক তো? ধরেছিস ঠিকই আমার গল্প, — মানে আমার মুখে শুনতে থাকা জ্যোতির গল্প, এত সহজে শেষ হল না। বরং গল্পটা আবার নতুন একটা মোড় নিল।— 'জ্যোতি সিনেমায় নামল! বিশাল মুভিস্টার হল, কিম্বা কুমার শানুর সঙ্গে প্লে-ব্যাক গাইতে গাইতে শানুর চেয়েও নাম করে ফেলল, কিম্বা—' মাথা হেলিয়ে হাসল বিভাস।

—'পাগল হয়েছিস? একি হিন্দি সিনেমা পেয়েছিস? কখনই না। জ্যোতি কী এমন গান জানত? কীইবা এমন দেখতে?'

'কিন্তু ক্লায়েন্টরা তার জন্য পাগল। আমি ফোনে যখনই জ্যোতির এই মানসিক ব্যাপারগুলো নিয়ে খান্নার সঙ্গে কথা বলতে গেছি— খুব স্নেহের সঙ্গে, মমতার সঙ্গে জ্যোতির সম্বন্ধে নানান তথ্য জানাত সে। উৎকণ্ঠা দেখাত। তার কল্যাণ চাইত। বলত — দেখুন ডক্টর চৌধুরি, মেয়েটা এত কষ্ট করে অ্যাপার্টমেন্টটা কিনেছে। আমায় নতুন অ্যাপার্টমেন্ট দেখাবে বলে, একদিন ডিনারে ডেকেও ছিল। কী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর করে সাজানো অ্যাপার্টমেন্ট। কী গোছানো সংসার। কী আন্তরিক ব্যবহার ওর স্বামীর। ভদ্রলোকের কী সুন্দর ম্যানলি চেহারা। দেওরটিও চমৎকার। স্মার্ট অথচ নম্র। আর বাচ্চা দুটো? যেন দুটো ফুল। বসবাই গোলাপের মতো। আর

কী সুন্দর রান্না করেছিল জ্যোতি। খুব ভালো কেটেছিল সন্ধেটা। কিন্তু সেটাই ছিল আমার ফেয়ারওয়েল ডিনার। পরদিন জ্যোতি আমাকে ফোন করেছিল। বলেছিল খান্না সাহেব আর নয়। এবার আমায় পেনশন দিন। আর কোনো নতুন কাজ আমি নেব না। নতুন গানের আসরে যাব না। পুরোপুরি এবার আমি হাউস ওয়াইফ হতে চাই। আমার ঘর সংসার দেখাতে বিশেষ করে ওই জন্যেই আপনাকে নিয়ে এসেছিলাম।

আমি হেসে বলেছিলাম —হ্যাঁ 'জিনি,' আমার বন্ধ বোতলের 'পরীবানি,' আজ আমি ছিপি খুলে দিলাম। এখন তোমার যেখানে ইচ্ছে সেখানে উড়ে যাও। খান্না কা বাৎ – হাথি কা দাঁত। আমার কথার নড়চড় কখনো হবে না। কিন্তু ডাক্তার চৌধুরি, কী করব বলুন, - পরদিনই আবার ফোন -

— খান্না সাহেব আমার সব কেমন অশুচি মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে এই অ্যাপার্টমেন্টের প্রতিটি ইট খুলে খুলে ধুয়ে ফেলি। বড় বড় লাইজল, ফিনাইল, ডেটলের বোতল কিনি।'

- 'ওয়ান মিনিট!' প্রদীপ্ত বাধা দিল। একটা কথার জবাব কিন্তু তুই এখনও দিস নি। সেটা হল সেই হলদে প্রিন্ট জয়পুরি শাড়িটার। যেটা জ্যোতিকে ছুঁতেই বিষের মতো হুল বসিয়েছিল,— ইলেকট্রিকের মতো শক মেরেছিল।'

বিভাস পুডিং খেতে খেতে বলল-- 'আসছি, অনেক কথাতেই আসছি, কিন্তু তা প্রথমে ওই শাড়িটার কথা।'

জ্যোতি তার সিটিং-এ ওই শাড়িটার কথা তুলল। একবার নয়। দুবার নয়। বারবার জ্যোতি ঘুমোতে ঘুমোতে বলল— হ্যা, গরম প্রেসার কুকার। আমার আমাকে বললাম চল তো লছিমা, আমার শোবার ঘরে চল!

আমাকে বললাম— ওই হলদে শাড়িটা খুব ভালো করে ঝাড় তো। — লছিমা ঝাড়ল। না। কিছুই নেই। আমার ষোলোতলার এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অ্যাপার্টমেন্টে বিছে টিছে থাকবেই বা কেন ডাক্তারবাবু? আপনিই বলুন? তবে? ওই হুল?

হঠাৎ, সবে চকোলেট পুডিংটা প্রেশার কুকার থেকে বের করেছি। আর সেটাকে বড় বড় ছোট ছোট 'লেমস' দিয়ে গার্নিশ করছি, এমন সময় আমার চোখের সামনে একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য ভেসে উঠল। সেই দৃশ্যটাকে আমি অনেক খুঁজেছি কিন্তু পাইনি। এখন পাচ্ছি। দৃশ্যটা হল— একটা ডাবল বেড হোটেল রুম। দামিঘর। এয়ার কন্ডিশন করা। ডাবল বেড খাট। খাটের পাশে একটা 'লাভসিট'। তার গায়ে একটা পেটিকোট, একটা ব্রা, একটা ব্লাউজ ঝুলছে। হলদে ব্লাউজ। আর নিখুঁত ভাবে পাট করা আছে একটা হলদে জয়পুরি প্রিন্ট শাড়ি।

হাঁ মনে পড়েছে সেদিন থেকেই শুরু!

আমি জিজ্ঞাসা করলাম— কীসের শুরু?

—এই স্নান করার, এই হাত ধোয়ার, এই ঘর পরিষ্কার রাখার। করুণ হতাশ গলায় জ্যোতি বলল— ডাক্তারবাবু আমি কী করে ধুয়ে ফেলব আমার ভিতরের এই ময়লা চিটগুলো? এই অন্ধকারের স্মৃতিগুলো? আমি ভেবেছিলাম সব পাপগুলো আমার নিজের ভিতরে থাক। সব পাপের নোংরা বাদ দিয়ে কেবল ঝকঝকে টাকাগুলো ওদের হোক। টাকাতে তো কখনো ময়লা লাগে না ডাক্তারবাবু। সে কোনো মেয়ের ব্লাউজের ফাঁকেই গুজে দিন, কিংবা শাড়ির ভাঁজে। আপনাকে যারা ফি দেয়, তারা কি ময়লা ছেঁড়া টাকা দেয় না? কিন্তু টাকা তো টাকাই থেকে যায়। ব্যাপারটা এখন সম্পূর্ণ অন্যখাতে বইতে শুরু করেছে। জ্যোতি বুঝতে পারেনি যে ব্যাপারটা এ ভাবে ঘটবে।'

বেয়ারা এসে প্রদীপ্তর সামনে 'শাহী পিস্তা ক্রীম' আইসক্রীমটা বসিয়ে দিল।

সেদিকে তাকিয়ে সবে, ছোট্ট কারুকাজ করা রুপোর চামচটা তুলেছে প্রদীপ্ত, এমন সময় বিভাস বলল— 'তুই রেবা হালদারকে চিনিস?'

চমকে উঠল প্রদীপ্ত। তারপর চামচ দিয়ে ছোট ছোট পিস্ করে আইসক্রীমটাকে নৃশংস ভাবে কাটতে লাগল। তারপর ছোট্ট একটা পিস্ মুখে দিল।

বিভাস আবার প্রশ্ন ছুঁড়ল— 'কী রে? বল? তুই রেবা হালদারকে চিনিস?'

প্রদীপ্ত সামান্য 'শ্রাগ্' করে বলল— 'হ্যাঁ। চিনি। চিনব না কেন? খান্নাই ওকে নিয়ে এসেছিল। তখন আমি ওর শরীরটাকে যথেষ্ট উপভোগ করেছি।'

'সাধারণতঃ ওসব মেয়েদের সঙ্গে তো গল্পগাছা করা যায় না। কিন্তু ওই মেয়েটার কিছু বুদ্ধি বিদ্যা ছিল। তাই কখনও কখনও গল্পগাছাও করেছি। আমি আবার আদর করে ওর একটা নামও দিয়েছিলাম। বেগম।'

হাসল প্রদীপ্ত। তেতো হাসি। 'তুই জ্যোতি জ্যোতি করছিলি। কিন্তু তোর গল্পের ওই হলুদ জয়পুরি শাড়িটাতে এসেই, আমি ওর আসল নামটা বুঝতে পেরেছিলাম। রেবা, পদবিটাও। হালদার। আমি এখনও ওর সব খবর জানি। একসেপট্ ওই মানসিক বিকৃতির খবরটা। ও কোথায় থাকে। ওর ঠিকানা কী? ওর দেওর কী করে? স্বামী কোথায় কাজ করে। কটি বাচ্চা। তাদের বয়স কত? তাদের ডাক নাম কী? তাদের পোশাকী নাম কী? এবং ওর ফোন নাম্বার কী?' বিভাস চোখ বড় বড় করে তাকাল প্রদীপ্তর দিকে।

প্রদীপ্ত বলল— 'হ্যাঁ। ওই তোর কথা মতো? শোন্। শোন্।— ওর দেওর আমার ছোট ভাই সুদীপ্তর সঙ্গে পড়ে। ভালো ফুটবল খেলে। বিশেষত হাফ ব্যাকে। তার কাছ থেকেই প্রথম আন্দাজ। তারপর ওদের পাড়ার পার্কটায় যেতে আরম্ভ করি। চিলড্রেনস পার্কটায়। সেখানে ওর বাচ্চা দুটো আর আয়ার সঙ্গে ভাব জমে ওঠে। বাচ্চাদের নাম তুই জানিস? চাঁদ আর সূর্য। ওই পার্কেই ওদের স্নেহাস্পদ কাকু হিসেবে ওদের বাবার সঙ্গেও ইনট্রোডাকশন। কতক্ষণ বাচ্চা নিয়ে ঘাঁটাঘাটি ভালো লাগে। দুজনে মিলে, মানে দুই অ্যাডাল্ট মিলে পার্কের বেঞ্চিতে বসে পরস্পরের প্রফেশন, এবং প্রফেশন সংক্রান্ত গ্রিভান্স নিয়ে গল্প। ফাইন লোকটা। বুদ্ধিদীপ্ত স্মার্ট। কতবার যে বলেছে- - আমার বৌ দারুণ রান্না করে, একদিন চলে আসুন!'

বিভাস বলল - 'তা তুই যাবি নাকি?'

প্রদীপ্ত হতচ্ছেদা কণ্ঠে বলল -- 'রান্না নিয়ে কী করব? শালা! ওর বৌ তো আরও অনেক কিছুই খুব ভালো ভালো-- '

বিভাস খুব ঠান্ডা গলায় বলল— 'তা তুই ওকে ক্রমাগত উড়ো ফোন করে যাচ্ছিস কেন? ওর লাইফ দুর্বিসহ করে তুলছিস? একটা মেয়ে পাঁক থেকে, নিজেকে সাফসুতরো করে উঠে আসতে চাইছে প্রদীপ্ত। তুই একজন রাইটার। একজন জার্নালিস্ট। তুই তো সাধারণ স্ক্যান্ডাল মঙ্গার নোস। তাকে সেই সুযোগটা দে।'

প্রদীপ্ত কোনো উত্তর দিল না। আইসক্রীম খেতে লাগল।

বিভাস বলল—'ও-ও তো দুটো বাচ্চার মা, একজন স্বামীর স্ত্রী। দেওরের বৌদি। তুই ওকে ভয় দেখাস ওর সব হিস্ট্রি ওর স্বামীকে বলে দিবি। বাচ্চাদের বলে দিবি। দেওরকে বলে দিবি!'

প্রদীপ্ত চোখ তুলল। তেতো একটা হাসল। তারপর বলল— 'চালে কাঁকর, ডালে পাথর, সরষের তেলে শেয়াল কাঁটার বীজ, ময়দায় তেঁতুল বীজের গুঁড়ো, এসব ভেজাল তুই সহ্য করতে পারবি? তোর পেট সহ্য করতে পারবে?'

বিভাস বলল— 'না। কিন্তু সে কথা আসছে কেন হঠাৎ?'

— 'আসছে এই জন্যে, যে, ওর দেওরের আদরের বৌদিকে আমার মা, আমার ভাই সুদীপ্তর জন্মদিনে নেমন্তন্ন করেছিল। আমি কার্ডটা পৌঁছে দেব বলে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিই নি।'

— 'কেন?'

— 'ও "ভেজাল" বলে। ও যে দিব্যি সতী সাবিত্রী সেজে, ভেজাল হয়ে, খাঁটিদের সঙ্গে ওঠা বসা, ছোঁয়াছুঁয়ি করবে। আমি তা চাইনি। আমি চাই ওর ওই মিথ্যে আর পাপ দিয়ে তৈরি সংসার তাসের ঘরের মতো ভেঙে যাক। সুখ শান্তি ভেসে যাক। সর্বনাশ হোক ওর। খান্নার থিয়োরির উল্টো আমার থিয়োরি। পৃথিবীর চরম সত্য হল পাপ কাউকে রেহাই দেয় না। শাস্তি দেয়।

আমি তো এবার ওর স্বামীর অফিসে ফোন করব। দেওরের বেস্ট ফ্রেন্ডদের, বাচ্চাদের স্কুলের প্রিন্সিপ্যালকে — ও যে 'স্বর্গারোহিণী' কমপ্লেক্সে থাকে, তার সেক্রেটারিকে— ফোন করে সব বলে দেব। আরে, ও কত বড় ঠগিনী। ও নিজের দেওরকে ঠকাচ্ছে, স্বামীকে ঠকাচ্ছে, ওর ফুলের মতো বাচ্চাদের ঠকাচ্ছে— বিভাস, তুই বুঝতে পারছিস না, এই ভাবেই আজ, আমাদের সমাজে আলোর সঙ্গে অন্ধকার মিশে মিশে যাচ্ছে। পাপ ঢুকে পড়ছে ঠাকুর ঘরে। বেডরুমে। তোর কি মনে হয় না, যে ওর সঙ্গে থাকলে, ওর হাতে খেলে ওই সহজ মানুষগুলোর মধ্যেও পাপ ঢুকে যাবে?'

বিভাস এবার ছুরি কাঁটা ফেলে হো: হো: করে হাসতে লাগল। তার হাসির আর শেষ হয় না।

প্রদীপ্ত বলল— 'হাসছিস কেন অমন পাগলের মতো?'

— 'আমি পাগল' না তুই? তুই-ই তো ক্রমশঃ পাগল হয়ে যাচ্ছিস। তোর মনে নেই কিন্তু আমার মনে আছে কিছু কিছু কথা। যেজন্য রেবা যখন আমাকে বলল যে, সে উড়ো ফোন পাচ্ছে,- - আমার দুয়ে দুয়ে চার করতে দেরি হয়নি।'

প্রদীপ্ত প্রশ্ন করল— 'মানে?'

— 'মানে, গাড়িতে উঠে বলছি। চল।'

বিল মিটিয়ে দিয়ে বিভাসের গাড়িতে উঠল প্রদীপ্ত।

গাড়ি চালাতে চালাতে বিভাস বলল— 'আচ্ছা, তোর হঠাৎ স্ট্রাইক করেনি যে, রেবা যে টেলিফোন কল পায়, তা তুই-ই করিস — এটা আমি কী করে ধরলাম?'

— 'সত্যিই তো। আমি তো এর আগে কখনও এধরনের ফোনে ভয় দেখানোর কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। তার— করা দূরের কথা।'

বিভাস বলল — 'সব কিছু সূত্র আটকে আছে ওই হলদে জয়পুরি শাড়িটায়।'

— 'মানে?'

— 'হ্যাঁ। মনে করে দ্যাখ। আজ থেকে তিন বছর আগে তুই তোর কাগজের কাজে জয়পুরে গিয়েছিলি। তুই যখন কলকাতায় ফিরলি তখন তুই তারপরের দিনই বম্বে রওনা হচ্ছিলি। একসঙ্গে সন্ধেটা কাটাবার জন্য আমি তোর বাড়িতে গিয়েছিলাম। তখন তোর দাদা বৌদি বম্বেতে পোস্টেড। সুদীপ্তকে নিয়ে মাসিমা আর মেসোমশাইও তখন বম্বে গেছেন। পরদিনই তোর বৌদির সিজেরিয়ান হবে। তুই ফোনেই বম্বের প্লেনের টিকিট বুক করলি— মনে পড়ছে?'

প্রদীপ্ত বলল — 'মনে পড়ছে?'

— 'তুই আমাকে একটা জয়পুরের পেন্টিং উপহার দিলি। বাবা-মায়ের জন্য, ভাইয়ের জন্য আনা উপহার দেখালি। বৌদির জন্য আনা হলদে প্রিন্টেড একটা জয়পুরি শাড়ি দেখালি!'

প্রদীপ্ত বলল— 'তারপর আমি তোকে বললাম, সরি! আমার জন্য একটা রঙিন সন্ধ্যা হোটেল 'সিলভার স্টার' এর একটা ডাবল বেড রুম ঘরে বুক করা আছে। খান্না বুক করে রেখেছে। সেখানে আমার 'বেগম' আসবে। তিন ঘণ্টার জন্য আমি তার 'বাদশা' হব। তারপর হঠাৎ কী যেন মনে হ'ল, একটা ফিরোজা পাথরের নেকলেস বের করে বললাম, — এটা বৌদির জন্যই রাখি। বরং এই হলুদ শাড়িটাই দিই বেগমকে।'

বিভাস বলল— 'হ্যাঁ। জয়পুরি প্রিন্টের, মিহি সুতোর চমৎকার একটা আর্টওয়ার্কের মতো হলুদ শাড়ি। শাড়িটার আমি খুব প্রশংসা করেছিলাম। শাড়িটা এখন ছিঁড়ে গেছে। কিন্তু বেচারি রেবা। ওর জীবনে এই সামান্য শাড়িটার ভূমিকা এত ইমপর্টেন্ট।'

বিভাসের গাড়ি বারান্দার তলায় গাড়ি পৌঁছে গেল।

বিভাস বলল - 'চল। আগে বাড়িতে নয়। সোজা আমার চেম্বারে।'

চেম্বারে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল বিভাস। নরম আলোটা জ্বেলে দিল।

মুখোমুখি দুটো সোফায় বসল দুজনে। বিভাস একটা টেপ রেকর্ডার বের করে, তার ভিতর একটা ক্যাসেট পুরে, চালিয়ে দিল।

প্রথমেই ভেসে এল বিভাসের কণ্ঠস্বর।

— বলুন! আর কি মনে পড়ছে আপনার?

— কিছু না।

— সত্যি বলছেন কিছু না? বন্ধ চোখের পাতায় কোনো ছবি ফুটছে না?

— না। কেবল লাল নীল সবুজ তারা।

— কোনো দৃশ্য নয়? তারা? ভালো করে, মন আলগা করে দেখুন তো।

— হ্যা। এবার দেখতে পাচ্ছি! আমার স্বামীর একজোড়া জুতো। আনকোরা নতুন জুতো। দামি। সবচেয়ে দামি। কলকাতা শহরে এর চেয়ে দামি জুতো — না, আমি তো কখনো আগে দেখিনি। জানেন ডাক্তারবাবু, জুতো জোড়া আমিই তাকে কিনে দিয়েছিলাম। আমি আমার ক্লায়েন্টের জন্য অপেক্ষায় হোটেল 'সিলভার স্টার' -এর আর্কেডে দাঁড়িয়েছিলাম। আমি আমার স্বামীর জুতোর নম্বর জানি। তাই জুতোটা কিনেই ফেললাম। ওই ক্লায়েন্ট আমায় অনেক টাকা দিত। কারণ আমি ছিলাম ওর টেম্পোরারি বেগম।

আমি যখন জুতো জোড়া আমার স্বামীকে উপহার দিলাম ও যেন কেমন একটা মেঘলা স্বরে বলল 'চমৎকার। হোটেল সিলভার স্টারের আর্কেডের 'গোল্ডেন শ্যু' হাউস থেকে কিনেছ না?' আমি আশ্চর্য হলাম। — তুমি কী করে জানলে।

ও বলল— আমিও সন্ধের পর ওখান দিয়ে যেতে যেতে বহুক্ষণ জুতোটা দেখছিলাম। আর ভাবছিলাম - দারুণ তো।

আমি বললাম কী করে দেখলে? আমি তো জুতোটা কিনে নিয়েছিলাম তার আগেই। বিকেল বেলা। আমার স্বামী বলেছিল— আমার খুকু বড্ড ছেলেমানুষ! ওদের কি কেবল ওই এক জোড়াই জুতো ছিল? আর নেই—

ওর সামনে আমি হাঁটু গেড়ে কার্পেটে বসেছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, ওর ডান হাতের তিনটি আঙুলে গাঢ় রঙের দাগ। নীল তেল রঙের।

আমি বললাম— আচ্ছা এই সব বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি জিনিস কোথা থেকে লাগাও বলো তো? আমার কাছে টার্পেনটাইন তেল ছিল। আর কেরোসিন! ছেঁড়া ন্যাকড়া ভিজিয়ে দাগটা পরিষ্কার করে মুছে দিয়ে বললাম— যাও, হাতে সাবান দিয়ে এসো!

রাতে যখন সব শান্ত। সবাই ঘুমে। আমার কেন যেন ঘুম আসত না। আমি চুপচাপ বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতাম। হঠাৎ মনে এল নীল তেল রং— নীল তেল রং?

কোথায়? — কোথায়?

মুহূর্তেই পুরো ব্যাপারটা বিদ্যুৎ চমকের মতো খুলে গেল আমার সামনে। আমি বুঝতে পারলাম ডাক্তারবাবু,— আমার স্বামী সব জানে। পরে খান্না আমায় বলেছিল যে, সে আমার স্বামীকেও মেয়ে সাপ্লাই দেয়। আমার স্বামীর নিজের ভোগের জন্য নয়। 'বস'দের খুশি করার জন্য। খান্না আরও বলেছিল যে, সে ভুল করে আমার ক্লায়েন্টের রুম নাম্বারটা আমার স্বামীকে দেয়!

আমার মনে পড়ল, আমি যখন আমার বাদশার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি, তখন ওই ফ্লোরের বেয়ারা সাবধান করে দিয়েছিল আমাকে। বলেছিল মেমসাহেব সাবধানে, কেবল পেতলের 'নব' ঠেলে দরজা খুলবেন। দরজায় সদ্য রঙ করা হয়েছে। রঙ এখনো কাঁচা আছে। 'নব' তাই লাগাবেনই না। আমি এই ফ্লোরে আছি। নিশ্চিন্তে দরজা আলগা করে ভেজিয়ে রাখুন। কেউ ভিতরে ঢুকবে না। সম্ভবত আমার স্বামী যখন ওই ঘরে আসেন তখন— আমি আর আমার বাদশা--

আর ডাক্তারবাবু জানেন তো, বড় বড় হোটেলে ঝাড়লন্ঠন, বা জোরালো আলোর আয়োজন থাকলেও, কেউ সেসব জ্বালে না। সেই আবছা আলোয় পরস্পরের মধ্যে বিলীন আমরা, কিছুই টের পাইনি। কে এসেছিল? কী দেখেছিল? কী শুনেছিল? কখন চলে গিয়েছিল? কেবল আঙুলে নীল রঙের ছাপ-- নীল ছাপ।

একটু চুপ করে থেকে, ঘুম ঘুম গলায় রেবা বলেছিল,-- ডাক্তারবাবু, আমার দেওরও সব জানে।

—কী করে জানলেন আপনি?

ক্লান্তস্বরে রেবা বলল — জেনেছিলাম?

বিদ্যুৎ একদিন রাতে এসে বলল,-- 'বৌদি, আজ তুমি গানের ফাংশন আছে বলে বেরোলে না?'

— হ্যাঁ!

-- 'তবে তুমি সন্ধেবেলা ময়দানে ঘুরছিলে কেন? কার সঙ্গে? দামি গাড়িতে?'

— ওঃ ফাংশনের পর বন্ধ স্টেজে মাথা ঘুরছিল। তাই খোলা হাওয়ায় -- ময়দানে ..আর একদিন বিদ্যুৎ আমাকে জিজ্ঞেস করল — তুমি চন্দননগরে ফাংশন আছে বলছিলে না? আমি কলেজের একজন বন্ধুকে বললাম। — জানিস আমার বৌদি কী দারুণ গায়!'

বন্ধু বলল, পোস্টারেও তোমার নাম ছিল না। আর তুমি ফাংশনেও যাওনি।

-- চন্দননগর নয়। তুমি বড় ভুলভাল শোনো বিদ্যুৎ। কোন্নগরে। কোন্নগরে ফাংশন ছিল। বিদ্যুৎকে ব্যাগ খুলে একটা ডিজিটাল হাতঘড়ি প্রেজেন্ট করলাম। ছেলেদের হাত ঘড়ি। আমার এক ক্লায়েন্ট সেই দিনই আমাকে উপহার দিয়েছিল। আমার স্বামীর জন্য ঘড়িটা বদলে নিয়েছিলাম, আমাকে প্রথমে প্রেজেন্ট দেওয়া, মেয়েদের হাতঘড়ির সঙ্গে।

আবার বিভাসের গলা শোনা গেল।

—নিশ্চয়ই বাচ্চারা এসব ব্যাপারে কিছুই জানে না। আরো কিছু কথা — ছবি — তথ্য? —ঘটনা?..

— আমার বাচ্চারা? আমার চাঁদ সূর্য। অদ্ভুত হাসি শোনা গেল রেবার কণ্ঠে। আমার চাঁদ সূর্য যে পার্কে খেলতে যায় সেখানে কতগুলো ড্রাইভার চাকর বেয়ারারাও গুলতানি করে। স্বভাবতই ঝি আর আয়াদের সঙ্গে ওদের নট ঘট। আমি একবার পার্ক থেকে বাচ্চাদের

আনতে গিয়েছিলাম। তখন আমার এক রেগুলার ক্লায়েন্টের ড্রাইভার আমাকে দেখে। সে ঝি আয়াদের তখনি জানায় রসালো খবরটা। ওই ম্যাডাম তো আমার সাহেবের 'রাখেল' আছে। আমার সাহেবের সঙ্গে হোটেলের ঘরে যায়। সেদিন চাঁদ পার্ক থেকে এসে কেঁদে কেঁদে বলল — মা আমি আর পার্কে যাব না। আয়ামাসিরা তোমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে।

সূর্যটা আবার আধো আধো ভাষায় বলল, —মা বেচ্ছা মানে কী?

টেপ রেকর্ডারটা বন্ধ করে দিল বিভাস।

---'বল প্রদীপ্ত, টেলিফোন করে তুই আর বাড়তি কী জানাবি? রেবার স্বামী, দেওর, এমনকি বাচ্চারা —

প্রদীপ্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, - 'হার মারলাম। সত্যিই আমার অনেকগুলো টাকাই ওই টেলিফোনের তার দিয়ে গলে গেল বিভাস। বিনা লাভেই।'

- 'কিন্তু ডাক্তার হিসেবে আমার কর্তব্যটা শেষ হয়ে যায় নি। আমি ভাবছি একদিন পুরো পরিবারটাকে -- বাচ্চাদের বাদ দিয়ে অবশ্য, নিয়ে, একসঙ্গে বসলে কেমন হয়?

প্রদীপ্ত বলল - 'আমি ভাবছি অন্য কথা। এদের মধ্যে সব চেয়ে দোষী কে?—'

'রত্নাকর দস্যুর বৃদ্ধ পিতামাতা, স্ত্রী, সন্তানেরা এসকেপিস্ট এর মতো বলেছিল তোমার পাপের ভাগ আমরা নেব না। কারণ সন্তানের কর্তব্য, স্বামীর কর্তব্য, পিতার কর্তব্য আমাদের ভরণ পোষণ করা, তোমার পাপ তুমিই বহন করবে। ভরণ পোষণ পাওয়া আমাদের হক। পাপ পড়ে তোমার হকে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল বিভাস। 'তাই ই করছে সে। তার পাপ সে নিজেই বহন করছে। রত্নাকরের ছিল পেশায় পাপ, রত্নাকরের পাপ অনেক লঘু। কিন্তু এদের ছিল লোভে পাপ। তাই সেই পাপেই তার তোদের সংসার থেকে মৃত্যুদণ্ড নিতে হল।'

প্রদীপ্ত চমকে উঠল— 'মৃত্যুদণ্ড?'

বিভাস বলল - 'সংসার থেকে নির্বাসন নিয়ে, আপনজনদের ছেড়ে, সে কাল পাগলা গারদে চলে যাবে। আমি নিজেই এই প্রেসক্রাইব করেছি। সেখানে গিয়ে সে যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন কেবল হাত ধোবে পা ধোবে আর স্নান করবে— তবুও নিজেকে পরিষ্কার ভাববে না। নোংরা-অশুচি ভাববে। কিন্তু টাকা তো অপাপবিদ্ধ। তার রোজগার করে পাওয়া টাকায়, তার স্বামী দেওর পুত্র ও কন্যা করে খাবে।'

একরাত

সুচরিত চৌধুরী

বায়েজিদ বোস্তামীর পাশের পাহাড়গুলো ঢেউ দিতে দিতে মিশে গেছে আকাশে।

এদিকে মিলিটারি ক্যান্টনমেণ্ট। চারদিকে তারের বেড়া। গেটে সেণ্ট্রি। তাঁবুর পর তাঁবু সাজান — যেন অসংখ্য ব্যাঙের ছাতা ফুটে আছে পাহাড়ের থলিতে। জিপ, লরি, ওয়াগন আসছে যাচ্ছে। সোলজাররা মার্চ করে একদল ঢুকছে, একদল বেরিয়ে যাচ্ছে।

গেটের কিছুদূরে ঝাপ মেরে দলা হয়ে বসে আছে লিকলিকে আধা লেংটা কতকগুলো লোক।

কারো হাতে হাঁড়ি, কারো হাতে ভাঙ্গা টিন, কারো হাতে কলাপাতা। ওরা বসে তাকিয়ে আছে তাঁবুগুলোর দিকে— ক্ষুধার্ত কুকুরের মত।

সূর্য আকাশ থেকে মুছে গেলে সামনের ডাষ্টবিনটায় এসে জড় হবে ছেঁড়াফাড়া সেকা রুটি, হাড়— তাতে কিছুটা মাংস ঝুলঝুল্ করবে, ঝোলমাখা ভাত, ভাঙ্গা মাছের টিন, ভেজা চায়ের পাতা। এগুলো ডাষ্টবিনে পড়বার সাথে সাথেই ওরা ঝাপ্টা ঝাপ্টি করে চেঁচাবে, একজন আরেকজনকে খাম্চাবে, বক্বে, কাঁদবে। ওরা সব আশেপাশের গাঁয়ের লোক।

একদিন নাকি ওদের সব ছিল-- ভিটেঘর গরু লাঙ্গল, পুকুর, নৌকো, নোলক পরা বউ, ধান। এখন কিছু নেই। আছে শুধু বুকভরে প্রাণ। আর সেই প্রাণটাও নাকি ওরা এই ডাষ্টবিনের পাশে দিয়ে যাবে। ওরা বলে — এই ডাষ্টবিনটাই এখন ওদের সব।

পশ্চিম আকাশ লাল।

এখান থেকে দুটো বিল্ পেরোলেই কাগের পাড়া।

বিরাট তেঁতুলগাছের গুঁড়িতে ঘাপ্টি মেরে বসে থাকা চালাঘরের দাওয়ায় হাঁটু গেড়ে বসে মাটির পুতুল বানাচ্ছে শ্রীনাথ। আর গুনগুন করে গাইছে তার কবিয়াল দোস্ত কানু ফকিরের গীতখানা।

> আরে, আখেরে হিসাব লৈবো
> পরভূ নিরাঞ্জন।
> চাঁন্দ মরিবো, সুরয মরিবো-
> আর মরিবো তারাগণ,
> আদমী সকল মরিয়া যাইবো —
> না থাকিবো ত্রিবভুবন।

গাইছে আর ভাবছে শ্রীনাথ।

না হোক মেলা। না কিনুক তার পুতুল। সে তার কাজ চালিয়ে যাবে। আকাল তো আর চিরকাল থাকবে না।

যুদ্ধ, যুদ্ধ, যুদ্ধ। যুদ্ধ কি আর ভগবানের তৈরী! মানুষই যুদ্ধ করে, মানুষই মরে, আবার মানুষই যুদ্ধ থামায়।

আহা! যুদ্ধের আগে এই পাড়ায কত হইচই না ছিল! ওই মাঠটায় ডাঙগুলি খেলতো বাচ্চা ছেলেরা। পুকুর ঘাটে বসে চাল ধুতে ধুতে ঘরের কথা বাইরে ছড়াতো বউ মেযেবা। দাওয়ায বসে তাস পিটতো জোযান মবদগুলো। গরমের জোছনা রাতে কত হাডুডু খেলা, বর্ষায় মাথায় জুঁই'ব চেপে মাছ ধবাব দুপাদুপি, শরতে ডুম্‌ডুমাডুম্‌ডুম্ ঢোলের কাঠি, মাঘ মাসে খেজুর বসের পিঠা আব বসন্তে 'রাত কাটাইয়ম বন্ধু কারে চাই'— গান।

আহা কি দিনই না ছিল!

ভাবতে ভাবতে শ্রীনাথেব চোখ দুপুবের পুকুরেব মত চক্‌চক্ করে ওঠে। আব এখন। সেই মাঠ আছে — সেই বাচ্চাগুলো নেই। কেউ না খেতে পেযে মরে গেছে, কেউ ভুখমিছিলের সাথে চলে গেছে শহবের সড়ক ধরে। পুকুবঘাটেব বউ মেয়েরা কেউ দিয়েছে গলায় দড়ি, কেউ গিয়েছে মিলিটারী ক্যাম্পে। তাগড়া জোযানগুলো এখন ঝিমিযে ঝিমিয়ে হাঁটছে।

গরম আসে, বর্ষা আসে, শবত আসে, আসে শীতবসন্ত— কিন্তু হাডুডু আর কেউ খেলে না, দেখা যায় না মাথায জুঁইর চাপা কোন মানুষ, আব শোনা যায না ঢোলেব শব্দ বা গান।

আহা কি দিনই না ছিল!

ভাত! কত খাবি খা। মলা মুড়ি খই দৈ— কত খাবি খা। এর দাওয়ায বসে চিতল পিঠা, ওর দাওয়ায বসে কলাপিঠা— কত খাবি খা। দিঘিতে বড় জাল দিয়ে ইয়া বিবাট বিবাট মাছ ধবা হযেছে- ঘরে ঘরে মাছেব গন্ধ। কত খাবি খা। খেতে খেতে গলা পর্যন্ত আটকে যেত। আব এখন।

স্বপ্ন। ভাত মাছ মলা মুড়ি দই খই— সব স্বপ্ন।

সেই ঢেঁকিব শব্দ। আহা সেই ঢেঁকির শব্দ আব শোনা যায না। ভোব বাতে মাঝ বাতে — কখনো সাবারাত শব্দ দিযে চলেছে, কত মেয়ের পা দুলেছে ঢেঁকিতে।

ধান। কত ধানেব ছড়াছড়ি। উঠানে, পথেঘাটে, দাওয়ায় কত ধানের ছড়াছড়ি। কত পাযবা শালিকের ভিড়। ধান, ধান, ধান— ধান থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে গান, জীবন হাসিকান্না।

ভাবতে ভাবতে শ্রীনাথ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বলে- আমার কাজ আমি করে যাব। দিন যাক বা দিন আসুক।

সন্ধ্যা তখন ঘবে ঘবে কালো হাওযা ছড়িযে দিচ্ছে।

ভেজা মযনাব মত কাঁপতে কাঁপতে উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে শ্রীনাথের একরত্তি মেয়েটা। কাঁদছে সে, একটানা। সারাদিন পুকুবে ডুব দিতে দিতে শাপলাব ভেট আব ডিগ খেযে পেট ভরিযেছে। এখন মনে পড়েছে ভাতের কথা। কাঁদতে কাঁদতে চেঁচাচ্ছে— অমা ভাত খাইযম, ভাত।

ঘবের ভেতব থেকে জবাব আসছে নারীকণ্ঠেব -- চুপ।

মেয়েটা গড়াগড়ি দেয উঠোনে।

শ্রীনাথ গিয়ে ওকে কোলে নিয়ে এসে বসে দাওয়ায। বলে— এই চা, কি সোন্দর পুতুল। মেয়েটা তাকায় না পুতুলের দিকে। একটানা কাঁদে আব চেঁচায়— ভাত, ভাত, ভাত। ঝলমলে শাড়িপবা একটি আধবয়সী বউ ঘবেব ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল দাওযায়। এক ঝাপটা মেবে মেয়েটাকে শ্রীনাথের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে হেঁচড়িযে চলতে চলতে বলল-- চল্, ভাত খাইবি। আঁযার রক্ত খাইবি। চল্, চল্ হাবামজাদী।

বলতে বলতে বউটা মেয়ের হাত ধরে উঠোন থেকে মুছে গেল পথে, পথ থেকে শুক্‌নো বিলে।

অন্ধকারে চোখ জ্বেলে সেদিকে চেয়ে রইল শ্রীনাথ।

তার সাধের বউটা। কত সাধ করে ওকে ঘরে তুলে এনেছিল তার বাপ মা। বিয়ের আগে বলেছিল শ্রীনাথ— না, না, ও বোঝা আমি বইতে পারব না। ধমকে উঠেছিল তার বাপ— বোঝা তোকে বইতে হবে না। ভগবানের বোঝা ভগবানই বইয়ে নেবেন। তুই আমি কে!

পাল্‌কি থেকে নেমে পাখির মত পা ফেলে ঘরে এসে বউটা সেদিন ঢুকেছিল।

অবাক হয়ে তাকিয়েছিল শ্রীনাথ। মনে মনে বলে উঠেছিল সত্যিই তো! এমন পুতুল কি আর মানুষের বানান কাজ!

সংসার নিয়ে কোনদিন ভাবেনি শ্রীনাথ। তার বাপ-মা চিতার কাঠে জ্বলে যাবার পরও তার বউটা তাকে আজ পর্যন্ত কিছু ভাবতে দেয়নি।

শ্রীনাথের ভাবনা শুধু মাটির কাজ।

তবু, মাঝে মাঝে শ্রীনাথ ভাবে। ভাবে— বউটা কি করে এই নৌকোটা চালায়! টিন ভরা দুধ মাংস রুটি ভাত শাড়ি এসব আসে কোত্থেকে। আর ভাবে— সেজেগুজে বউটা রোজ সন্ধ্যায় যায় কোথায়। ভাবতে ভাবতে মন যখন রোদে পোড়া মাটির মত গরম হয়ে ওঠে তখন গুন্‌গুন্ করে গেয়ে ওঠে— অরে, আখেরে হিসাব লৈবো পরভূ নিরাঞ্জন।

মন, মন তো মাটির মত।

উপড়ে ফেল, গুঁড়ো গুঁড়ো করে ছড়িয়ে দাও কাদায় কাদায় নরম কর, যেদিকে চালাও সেদিকে চলবে। মন যদি বলে - আমি ফসল ফলাব, মন বলবে— ফলাব। মন যদি বলে— আমি ভেঙ্গে দেব, মন বলবে— হ্যাঁ। যেদিকে ঘুরাবে সেই দিকে ঘুরবে মন - মাটির মত।

শ্রীনাথ বলে— আমি মনের কারিগর।

বউটা যাক, যেখানে খুশি সেখানেই যাক্। আমি আমার কাজ করতে পারলেই হল। আমার ফসল ফললেই হল। মাটি, আমার মন, পুতুলগুলো আমার ফসল।

যুদ্ধ লাগার সাথে সাথেই পাড়ার লোকজন বলেছিল— শ্রীনাথ, এই কাজ ছেড়ে দে। না ছাড়লে কদিন পর শুকিয়ে মরে যাবি। চল— দা কোদাল নিয়ে মাঝিগিরি করিগে। চল, শহরে চল্।

এতকাল মাটি নিয়ে কপচাতে কপচাতে ঠোঁটে ভোরের রোদের মত হাসি ফুটিয়ে শ্রীনাথ শুধু তাদের দিকে তাকিয়েছিল— বলেনি কিছুই।

যখন সমস্ত পাড়া উপোসে খা খা তখন মতি দালাল এসে বলেছিল - শ্রীনাথ চল কাজ করবি।

ড্যাবড্যাবে দৃষ্টি মেলে সাজান পুতুলগুলো দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল শ্রীনাথ - এগুলো কি কাজ নয়?

হো হো করে হেসে উঠেছিল মতি। বলেছিল মাটি দিয়ে পুতুল না বানিয়ে মাটি কেটে কুলী-মজুর হয়ে যা শ্রীনাথ। না হলে মরে যাবি হারামজাদা।

কিন্তু মরেনি শ্রীনাথ।

মরতে মরতে বেঁচে আছে। শ্রীনাথ বলে - আমি মরবো না। মরতে পারি না। আমি কারিগর। কারিগর মরে না। ঝড় আসে, তুফান আসে— আবার চলেও যায়। আজ আকাশ যুদ্ধের মেঘে ঢাকা। কিন্তু কাল তা কেটে যাবে। যুদ্ধ চিরকাল থাকবে না। একজনকে হার মানতেই হবে।

শ্রীনাথ বলে - মেলা আবার বসবেই। আবার তার পুতুল কিনবে লোকে।

সেই দিন আবার আসবে। সেই পৌষের দিন। ধানকাটা হয়ে গেলে শালী আর বীজ বালাম ধান জমি থেকে উঠে যাবে ঘরে ঘরে। সব গ্রামগুলোর একহাতে নতুন ধানের মঞ্জরী, অন্য হাতে সূক্ষ্ম বাঁশের তৈরী করা কুলো— ঠোঁটে লাজুকবাঙা হাসি, ধানের চোখের মতই চোখ ধাঁধাঁন। রূপে রূপে রূপবতী, ধানে ধানে ধানবতী। সারা বছর সাজবে, পৌষ এলে অভিসারে বেরোবে। রূপ যেন তার ছলকে পড়বে।

রোদে ঝলসে উঠবে জমি প্রান্তর।

মাটি ফুঁড়ে উঁকি দেবে মুগ কলাইয়ের চিকন চিকন পাতা। লাউ কুমড়োর সর্পিল ডগাগুলো খড়ের চালের ওপর লকলক করে বাতাসে দুলবে। সাদা, খয়েরী, কালো পালকের ওপর সরু নীল রঙ আঁকা পায়রাগুলো অকারণে ডাকবে, ডাকবে ঘুঘু। ভাটুই পাখিরা ধানঝরা জমিতে সতর্কে ঘুরে বেড়াবে।

আলের ধারে ধারে খেজুর গাছের সারি — তাতে হাঁড়ি বসান থাকবে। কয়েকটা শালিখ হাঁড়ির মুখে ঠোঁট লাগিয়ে কিচির মিচির শব্দ তুলবে— মায়ের স্তনে ঠোঁট বসিয়ে হঠাৎ খুশিতে কেঁদে ওঠা শিশুর মত।

খালের জলে ভাসবে মরা গরু, দু'তিনটে শকুন তার ওপর বসে মাংস খোটাবে।

দাঁতালো কুকুরটা ঘেউ ঘেউ শব্দ করে ডাক দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে শকুনগুলোকে তাড়াবে। খালের ধারে বসা অনেকগুলো শকুন দীর্ঘ গলা বের করে তাকিয়ে থাকবে ভাসমান গরুটার দিকে। কুকুরটা আবার সাঁতার কেটে ফিরে আসবে। কয়েকটা শকুন সাঁই সাঁই করে উড়ে চলে যাবে।

চকচক্ করবে দিঘির জল। কিনার ঘেঁষা সূক্ষ্ম সূঁচের মত সবুজ ঘাসের বনে উড়ে বেড়াবে রঙবেরঙের প্রজাপতি। মৌমাছিরা জটলা পাকাবে ঘন লালফুলে মেতে ওঠা মাদার গাছের ডালে ঝোলা মৌচাকে। শাপলা ফুলেরা শাদা শাদা পাঁপড়ি মেলে বিস্তীর্ণ পাতার ভিড়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকবে। ছোট ছোট রূপোলী মাছ সাঁতার কাটবে দিঘির সোনালী জলে। আর সেদিকে দৃষ্টি হেনে তাকিয়ে থাকবে মাছরাঙার লুব্ধ শিকারী চোখ।

শুকিয়ে যাওয়া অল্পজলে কচুরি পানার তলে তলে শিঙ আর মাগুর মাছের ঝাপট। বেতলতার ফাঁকে ফাঁকে জারুল গাছের ডাল থেকে ঝুলে পড়া চড়ুই পাখির বাসাগুলোকে দূর থেকে দেখাবে মৃদঙ্গের মত।

ঘর থেকে ঘরে, উঠোনে, গোলাঘর থেকে গোয়ালঘর পর্যন্ত গেরুয়া রঙের শুকনো খড় ধানের পালক হয়ে ছিটিয়ে ছড়িয়ে থাকবে। ঢেঁকির ছলাৎ ছলাৎ শব্দ, ঢেঁকির লেজ উঠবে নামবে— বউগুলো ঘামে নেয়ে উঠবে, ঘোমটা খসে পড়বে। কালো চুলের অরণ্যে ছেয়ে যাবে গুঁড়ো গুঁড়ো ধানের তুষ। খিলখিলে হাসি আর কলকলে ধানী গানের কথা। শাদা শাদা চালগুলো হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসবে ধানের কঠিন নির্মোক থেকে, দোল খাবে দু'পা ছড়িয়ে দেওয়া হাতের মুঠোয় চেপে ধরা কিষাণ বউয়ের কুলোর মধ্যে। লাল বা হলুদ আঁশের আবরণে কোনগুলো হয়ত নিজের শুভ্র সত্বাকে একটা লজ্জার মত আড়াল করে রাখবে— যৌবন ঢেকে রাখা কোন লাজুক মেয়ের মত।

ধান, ধান, ধান,

ভেতরে যতই দুঃখ থাকুক না বাইরে গ্রামগুলো তার পোষালি ধানের মতই আনন্দে মেতে উঠবে। যাদের জমি নেই— তারাও হলুদ হলুদ ধান দেখে মুগ্ধ হবে— এটা ওটার বদলে ধান কিনবে। খই ফোটাবে, চিঁড়ে বানাবে, মুড়ি ভাজবে। চাল গুড়ো করে হরেক রকমের পিঠা তৈরী করবে। ধুঁই, পাকন, নারকেল পিঠা--- কত কি। খেজুরের রসে চিবিয়ে চুবিয়ে খাবে, অন্যকে খাওয়াবে। দূর দেশে— মেয়ের বাড়িতে, বাপের বাড়িতে বা বেহাইয়ের বাড়িতে পাঠাবে।

কোন মেয়ে হয়ত বাপের বাড়ির পিঠার জন্য প্রতীক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকবে পুকুর পাড়ের ছায়াঢাকা সারি সারি কলাপাতার নিচে।

ধূ ধূ ধান উঠে যাওয়া শুকনো বিলের ওপার হতে মাথায় একটা বিরাট হাঁড়ি চেপে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসবে একটা লোক। লোকটা হয়ত তার বাপ কিম্বা সোদর ভাই।

মুহূর্তে মেয়েটার গলার হাঁসুলী উঠবে দুলে, কাঁখের কলসী থেকে ছলাৎ করে কয়েক আঁজলা জল ছিটকে পড়বে— পালাবে, খুশির আবেগে। তারপর বাপের বাড়ির সাধ-করা পিঠা খেতে খেতে মনে মনে ডানা মেলে উঠে যাবে মা বাপের সেই ফেলে আসা ভিটে-ঘরখানাতে।

আর, কোন মেয়ে হয়ত চোখের জলে সাজাতে বসবে পিঠার পরে পিঠা দিয়ে একটা কালো রঙের বিরাট হাঁড়ি।

গুনে গুনে সাজাবে— মা খাবে, বাপ খাবে, ভাই খাবে, বোন, পাড়া-পড়শি— সবাই খাবে। সঙ্গে দেবে একটা পানের বিড়া, সুপোরি, একহাঁড়ি মোষের দই, ছোট ছোট ভাইবোনের জন্য কয়েকমুঠো কাঁচাপাকা কুল দিতেও ভুলবে না। দাদীর দাঁত নেই— ছাঁচা সুপোরিও দেবে একটা কলাপাতায় মুড়ে। সব দেবে মুঠো ভরে— বিনি ধান, কামিনী ধান।

আর সেই সব পেয়ে তার মা মেয়েকে নাইয়র আনতে পাঠিয়ে দেবে কোন আত্মীয়কে।

থলোথলো খুশীতে মেয়েটা আবার চোখের জলে সাজাতে বসবে একখিলি পান। স্বামীর মুখে তা পুরে দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলবে— আঁয়ারে নাইয়র নিত্তো আইস্যে।

ঘরে ঘরে হানা দেবে ফিরিওয়ালা।

কাঁধের ভারটায় পুরো একটা মনোহারি দোকান তুলে আনবে। টিপ, সেপটিপিন, কালো নীল হলুদ রঙের চুলের ফিতে, নকল সোনার কানপাশা, লালরঙে আঁকা 'ভুলনা মোরে' লেখা ডালা বন্ধকরা আয়না, চুলের কাঁটা— কাপড়ও থাকবে হরেক রকমের, গোলাপি বেগুনি আসমানি রঙের মন কেড়ে নেওয়া শাড়ি, জ্বলজ্বলে ছিট্ কাপড়, পাতলা পাতলা ওড়নাও থাকবে।

পুকুর পাড়ে এসে ডাক দেবে ফিরিওয়ালা।

সেই ডাকে ছুটে আসবে ন্যাংটা ন্যাংটা ছেলেমেয়েরা, সোমত্ত বউরা খড়ের গাদার পেছনে গা আড়াল করে দাঁড়াবে।

দর-কষাকষি চলবে, ধান দিয়ে এটা ওটা কিনবে।

ফিরিওয়ালার কাছ থেকে আসমানি রঙের শাড়িখানা দু'হাতে সাপটে ধরে একটা ছেলে তার মাকে এনে দেখাবে।

বউটা ফিস্‌ফিস্ করে শুধাবে— কত?

ফিরিওয়ালা চেঁচাবে— পাঁচ আড়ি ধান।

— হেই ব্যাডা কয় কি! বউটা ছুড়ে দেবে শাড়িখানা। খাবলা মেরে জড়িয়ে ধরবে ছেলেটা।

মেপে মেপে ধান দেবে, দেখে দেখে শাড়ি নেবে— নেবে চিরুনি, খশবু তেল, আতরের শিশি। সোহাগ করে স্বামীকে দেখাবে, সাজবে — ধানে ধানে ধানবতী, রূপে রসে বর্ণে গন্ধে সপ্তকলায় হবে রূপবতী।

আসবে ছবিওয়ালা।

ছবি তোলার বাক্সটিকে দাঁড় করিয়ে তার ওপর কাপড়ের ঘোমটা দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াবে ছবিওয়ালা।

সামনে কাঠ হয়ে টুলের ওপর বসে থাকা আধবয়সী লোকটার চুল থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়বে সর্ষের তেল। গায়ের লালশালুর কামিজটা আগুনের মত জ্বলতে থাকবে। পরনের

লুঙ্গিটাও নানা রঙের কাজ করা, পায়ে একজোড়া ভারী বুটজুতো— কোন মিলিটারির কাছ থেকে সেটা বকশিস্ পাওয়া হয়ত, তাতে কাদাও লেগে থাকবে খানিকটা।

— হাসো, মিয়া সাব হাসো।

লোকটা মুখ বিস্ফারিত করে হাসবে। পেছনে মাদার গাছে টাঙানো একটা সিন্— তাতে আঁকা থাকবে সরু একটা নদী, নদীর ওপর একটা বিরাট জাহাজ, জাহাজের ওপর মাছির মত উড়ন্ত কতকগুলো ছোট ছোট এরোপ্লেন। দূরে নীল রঙের পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে সাদা সাদা দালান, দালানের গায়ে বড় বড় ফুল, ফুলগুলো দালানের চেয়েও বড়। আঁকা উড়ন্ত পাখিও থাকবে আকাশের কোণে— তবে সেগুলো চিত্রকরের খেয়ালী তুলির টানে এরোপ্লেনের মতই দেখাবে। কিছু সময়ের মধ্যে জলেভরা গামলা থেকে লোকটার ছবি বেরিয়ে এসে রোদে শুকোতে থাকবে। ছোট বড় মাঝারি — সব রকমের লোকের ভিড় করা চোখগুলোতে তাক লেগে যাবে।

ধানের টুকরীটা রেখে লোকটা ছবি নিয়ে চলে যাবে।

একজনের পর আরেকজন। বুড়ো থেকে জোযান, ছোট ছোট ছেলেরাও লুঙ্গির কোঁচায় ধান লুকিয়ে এনে ছবি তুলতে বসে যাবে।

একজন তার কামিজের বুকে একটা মেয়েলোকের ছবি ঝুলিয়ে হুকুম দেবে— চাই, তোল। কিন্তু মাইযা লোকও থাকন্ চাই, আতরের খশবুও উঠন্ চাই।

ছবি ঠিকই উঠবে— মেয়েলোকটাকে যেন বুকে ধরে রেখেছে। কিন্তু তবু তার পছন্দ হবে না। বলবে সে— ছবি ঠিক আছে, কিন্তু খশবু কোথায়!

ছবিওয়ালা শহরের ঝানু লোক। জোয়ানটাকে কিছুক্ষণ পর ঘুরে আসতে হবে। এই অবসরে ছবিটার গাযে আতর রাখবে মেখে। কিছুক্ষণ পর জোয়ানটা ফিরে এলে তার হাতে ছবিটা তুলে দিয়ে বলবে— ধরো, শুঁকি চ'ও।

ছবিটা শুঁকে দেখে জোয়ানটা তারিফ করে উঠবে— হ্, একদম ঠিক।

বলী খেলা হবে, কবির লড়াই হবে, যাত্রা হবে। শ্রীনাথ বলে— মেলা আবার বসবেই।

অন্ধকারে ডুব দেওয়া চালাঘরগুলোর দিকে সে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে— আহা! ওই বোকা গগন দেখতে পেলনা সব। নদীতে ঝাঁপ দেবার আগে এসেছিল তার কাছে। বলেছিল — ছিরিনাথ, আঁয়ারা আর ন বাঁচাম্।

ধমকে উঠেছিল শ্রীনাথ— মিথ্যে কথা।

একগাল হেসে পাথরের মত স্থির চোখ দুটি তুলে নদীর পথ ধরে চলে গিয়েছিল গগন।

শ্রীনাথ বলে— গগন বোকা। আর বোকা ওই বউগুলো। বৃন্দাবনের বউ, সনাতনের বউ, পাঁচকড়ির বউ। কথা নেই বার্তা নেই— অমনি গলায় দড়ি। ব্যাপার কি। ব্যাপার আর কিছু নয়— জীবনে আর খেতে পাওয়া যাবে না। মানুষ আর বাঁচবে না। জগৎটা ধ্বংস হয়ে যাবে।

বোকা বোকা— সবাই বোকা! এই বোকামীর জন্য ওরা সূর্য [illegible] ধানদোলা নদী পথ ঘাট মাঠ প্রান্তর আর মানুষের হাসি কান্না থেকে চির বিদায় নিয়ে চলে গেল।

একটা মেয়েলি ছায়া কেঁপে উঠল উঠোনে।

— হিবা কন্?

— ফুলরানী।

বলেই ছায়াটা ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগল মোহনবাঁশির ঘরের দিকে।

ফুলরানী মতি দালালের বড় মেয়ে। লম্বা। কালো। দীর্ঘ চুল। মূর্তিমতী কামনার শিখা যেন।

মতি ঘাঘু লোক।

কর্ণফুলির ওপারের এক বুড়ো জোতদারের কাছ থেকে এক হাজার টাকা নিয়ে মেয়েকে পালকিতে তুলে দিয়েছিল। দু'মাস ঘুরতে না ঘুরতেই ফুলরানী শাখা ভেঙ্গে শাদা থানে বাপের ঘরে এসে হাজির।

ফুলরানীর আক্রোশ বাপের ওপর নয়, মোহনবাঁশির ওপর।

বিয়ের আগের দিন কত সেধেছিল সে মোহনবাঁশিকে। বলেছিল — বাঁশি, চল্ আমরা পালিয়ে যাই। জবাবে মোহনবাঁশি বলেছিল— না। আমার এখন অনেক কাজ।

সাপের ফণার মত চিবুক উঁচিয়ে বলেছিল ফুলরানী— তুই তাহলে আমায় মন দিস্নি?

বলেই ঠাস্ করে এক চড় মেরে সেদিন চলে গিয়েছিল সে। তার পরদিনই সে দাঁতে ঠোঁট চেপে ধরে গিয়ে উঠেছিল বুড়ো জোতদারের পালকিতে।

আজ, এই অন্ধকারে চলেছে সে মোহনবাঁশির ঘরে। একটা বোঝাপড়া হবে।

বলবে— বাঁশি, কেন তুই ছেলেবেলায় আমায় ফুল ভালবাসতে শিখিয়েছিলি?

আমি যখন বার বছরের একটি শাপলাফুল, তখন তুই ঘাটে বসে বাঁশি বাজাতে বাজাতে বলেছিলি— আইজ যে দেখি ফোটা ফুল, কাইল দেইখাছি কলি— তুই কেমনে এমন হৈলি?

কেন বলেছিলি! বল্, কেন বলেছিলি।

শাওন মাসে বিল যখন বানের জলে ডুবুডুবু— তখন তুই নৌকো চেপে এসে দাঁড়িয়েছিলি আমাদের ঢেঁকিঘরের পিছনে।

দুপুর তখন কান্নার পর হেসে ওঠা বাচ্চা মেয়ের মুখের মত ঝক্‌ঝকে। চুপি চুপি বলেছিলি— চল্, বেড়িয়ে আসি। এক কথায় হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে কাদা ছড়াতে ছড়াতে তোর নৌকোয় গিয়ে উঠেছিলাম। লগি ঠেলে ঠেলে তুই আমায় নিযে গিয়েছিলি ধূ ধূ বিলেব মাঝখানে— যেখানে বানের জল সাগরের মত আকাশ ছোঁয়া।

ভয়ে ভযে বলেছিলাম— বাঁশি, চল্ ঘরে চলে যাই।

হো হো করে হেসে উঠে বলেছিলি— তোব ভয় করছে বুঝি?

মনকে শক্ত করে জবাব দিয়েছিলাম— না।

তুই নৌকোটাকে ইচ্ছা করে হেলিয়ে দুলিয়ে বলেছিলি— তুই হলি মতি দালালেব মেয়ে। তোর ভয় কবতে নেই।

আকাশে গর্জে উঠেছিল কালো মেঘ।

চোখেব পলকেই বৃষ্টি আর হাওযায দুলে উঠেছিল নৌকো। তুই ...াবে লগি মারতে মারতে হাঁফিয়ে উঠেছিলি। আর আমি গুটি গুটি হয়ে বসে বৃষ্টিতে ভিজছিলাম।

তোর মুখেও কথা নেই আমার মুখেও কথা নেই।

হঠাৎ চারদিক কালো হয়ে গিয়েছিল। কি হয়েছিল কিছুই বুঝিনি সেদিন।

চোখ মেলে দেখেছিলাম তার দু'দিন পর। এর ভেতব একদিন একবাও চলে গিয়েছিল। চোখ মেলে তোকে দেখতে না পেয়ে ডুক্‌রে কেঁদে উঠেছিলাম। বাপ মা ভাই বোন সবাই ধম্‌কে উঠেছিল।

বাঁশি, বল্, কেন তুই সেদিন নৌকোয় করে আমায় নিয়ে গিয়েছিলি জলে ডোবা থইথই বিলে!

সেই তেঁতুল গাছ এখনো সাক্ষী আছে। আব সাক্ষী আছে তোব কপালের কাটা দাগ। ডালে বসে তেঁতুল খেতে খেতে বলেছিলি— ফুলি, তুই আমার বউ হবি?

এক ধাক্কা মেরে তোকে নীচে ফেলে দিয়েছিলাম। অনেকদিন তুই আমার সঙ্গে কথা বলিস্নি।

আমার মনে হয়েছিল — যেন অনেক অনেক বছর।

একবার ঝাঁক বেঁধে সবাই গিয়েছিলাম সীতাকুণ্ডের মেলায়।

রেলগাড়ী থেকে নেমে আমার হাতে এক টিপ মেরে বলেছিলি— আয়, আমার পেছন পেছন চলে আয়। বাপ-মার হাত থেকে স্রোতে ভাসা কচুরিপানার মত তোর পেছনে গিয়েছিলাম।

তখন বয়স আমার তেরোয় পড়েছে।

কোকিলের ডাক শুনলে আমার কেমন কেমন লাগতো। চাঁদ, তারা, ফুল দেখলে হাততালি দিয়ে উঠতাম। বেশী ভাল লাগতো তোকে দেখলে— আবার ভয়ও লাগতো।

একটা চুড়ির দোকানের সামনে এসে তুই থমকে দাঁড়িয়েছিলি। আমার দিকে মিটিমিটি হেসে একগাছা চুড়ি কিনে নিয়ে আমার হাতে পরিয়ে দিয়ে বলেছিলি— চল্!

আমি যেন তোর বানানো কলের পুতুল। তুই টিপছিলি, আমি চলছিলাম।

তারপর কপালের টিপ কিনলি, রেশমি রুমাল কিনলি, কিনলি সুগন্ধি তেল— কত কি! এক বোঁদা বিড়িও কিনলি আমার জন্যে।

প্রেমতলায় গিয়ে একছিলিম গাঁজা টেনে এসে আমার হাত ধরে বলেছিলি— চল্।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পায়ের গোড়ালিতে হাত দিয়ে বলে উঠেছিলাম— না। আমি আর হাঁটতে পারব না।

পথের ধারে, একটা চাঁপালিশ গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে আমি বসে বসে হাঁফাচ্ছিলাম। তুই বিড়ি ফুঁকছিলি।

ভয়ে, ক্লান্তিতে, অজানা কৌতূহলে জিজ্ঞেস করেছিলাম— বাঁশি, আমরা কি তবে হারিয়ে গিয়েছি?

— আরে দুর! হারাব কেন! তোর মা-বাপের সাথে এক্ষুনি দেখা হয়ে যাবে।

কিন্তু দেখা হল না।

দিন চলে গেল। এল রাত। আমার বুক ভয়ে দুরু দুরু। তুই ওপাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লি। আমি গুটি গুটি হয়ে বসে রইলাম।

সারারাত পায়ের শব্দ এল আর গেল।

বল্ বাঁশি, কেন তুই ইচ্ছে করে আমায় নিয়ে সেদিন মেলায় হারিয়ে গিয়েছিলি!

আজ আমি বিধবা। তোর জন্যই বিধবা। তুই-ই তো তুলে দিয়েছিস সেই বুড়োটার ঘাড়ে। তোকে আজ সব কথার জবাব দিতে হবে।

ভাবতে ভাবতে ফুলরানীর পা-জোড়া এসে থামলো মোহনবাঁশির ঘরের দাওয়ায়।

শ্বাস পড়ার শব্দ হল। নড়ে উঠল দাওয়ায় বাঁশের খুঁটিটা। গতকাল পুকুরঘাটে দেখা হতেই মোহনবাঁশি তার কাছে লঙ্গরখানার জন্য চাঁদা চেয়েছিল।

— ফুলি, তোর বড় কত্তো বড় জোতদার। তোর চাঁদা পাঁচ টাকা।

মুচকি হেসে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল ফুলরানী।

আর মনে মনে বলেছিল— পাঁচ টাকা কেন! তোর জন্যে পাঁচশ' টাকা চাঁদা দিতে রাজি আছি আমি।

দু'হাতে আঁচলের কোণটুকু চেপে ধরে ফুলরানী ভাবে— টাকাটা বাঁশির হাতে দিয়ে বলবে— বাঁশি আর কি চাস্ তুই?

যদি বলে— তোকে।

তখুনি ঝাঁপিয়ে পড়বে সে মোহনবাঁশির বুকে।

ভাবতে ভাবতে দাওয়া থেকে ঘরের দিকে পা বাড়ায় ফুলরানী। কোমরের প্যাঁচে বিড়ি আর দেশলাই ছিল। বিড়ি জ্বালিয়ে ঝাপ খুলে ঢুকলো ভেতরে

কুপির সল্‌তে জ্বলে উঠতেই দেখা গেল— তার চোখে ভুরুতে নাকের ডগায় চিবুকে ঠোঁটের নীচে নয়া ঘাসের ওপর জমে থাকা ফোঁটা ফোঁটা শিশিরেব মত ঘাম।

ঘরের চারদিকে তাকালো সে।

পাটি, ছেঁড়া কাঁথা, তুলো বেরিয়ে যাওয়া তেল চিট্‌চিটে বালিশ, ভাঙ্গা টিনের বাক্স, সুরই, হাঁড়ি— টুক্‌রো টুক্‌রো আধপোড়া বিড়ি, ভাঙ্গা কল্‌কে, রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি।

কুপি নিভে যাওয়ার আগে দেখা গেল — সুরই, হাঁড়ি, কলসি সব ঘরের কোণে সাজানো। বাক্সটা একপাশে— তার ওপর যুগল মূর্তিটা দাঁড়ানো। মাঝখানে পাতা। তাতে শুয়ে আছে ফুলরানী।

ঝাপ খোলা।

শুয়ে আছে ফুলরানী।

যত রাত করেই ফিরুক মোহনবাঁশি— সে একটুও নড়বে না, জাগবে না।

দেশলাই জ্বালিয়ে যা দেখবে মোহনবাঁশি, তাতে তার শরীরের আগুন ধপ্‌ কবে জ্বলে উঠবে। যদি দেশলাই না থাকে— ঘরে ঢুকেই তার পায়ের পাতা এসে ঠেকবে ফুলরানীর বিরাট উরুতে।

চম্‌কে উঠে জিজ্ঞেস করবে মোহনবাঁশি— হিবা কন্‌?

কোন জবাব দেবে না ফুলরানী। মরাব মত পড়ে থাকবে। মোহনবাঁশি তখন তাব শরীর হাতড়াতে হাতড়াতে মানুষ চিনবার চেষ্টা করবে। বুকে চুলে কোমরে হাত দিয়েই মোহনবাঁশি চমকে উঠবে।

তখন?

তখন কি আগুন জ্বলে উঠবে না?

ফিস্‌ফিস্‌ করে বলবে ফুলরানী— আমি।

মোহনবাঁশি যদি লাগাম ছেঁড়া ঘোড়ার মত খট্‌ কবে উঠে দাঁড়ায় তবে অন্য কথা—

কিন্তু যদি ঢেউয়ের মত তার বুকে আঁছড়ে পড়ে, তবে সে তক্ষুণি শক্ত বাহুর আড়ে মোহনবাঁশির গলা চেপে ধরে বলবে— বাঁশি, এই তোর ভালবাসা! জানোয়ার, তুই জানোয়ার।

বলেই কিল চড় মেরে চেঁচাতে চেঁচাতে সমস্ত পাড়া জাগিয়ে তুলবে।

সবার সামনে তাকে বেইজ্জতি করে ছাড়বে।

ফাঁদ পেতে শুয়ে আছে ফুলরানী মোহনবাঁশির ঘরে।

মোহনবাঁশির মুখ তখন আঁতুরা ডিপোর এক চায়ের দোকানে লট্‌কানো হ্যারিকেনের আলোয় ঝল্‌সে উঠছে।

আরো কয়েকটি মুখ আলো আঁধারে কখনো স্পষ্ট, কখনো অস্পষ্ট। লক্ষণ, যামিনী দা, ইয়াকুব, শীতল পাল, মধু কামার, নিতাই শীল। সবাই ভাবছে— কি করে পাড়াগুলোকে দুর্ভিক্ষের কবল থেকে বাঁচাবে।

যামিনীদা বলছে— চল, আমরা মিছিল করে শহরে গিয়ে হাজির হই।

লক্ষণ বলছে— ও কিচ্ছু হবে না। ডাকাতি করতে হবে।

ইয়াকুব বলছে— আগে রিলিফের ব্যবস্থা কর।

মোহনবাঁশি কিছুই বলে না। সে শুধু ভাবে।

কথায় বলে— খালকুলের গাছকে যত্ন করতে হয় না। সে আপনি বেড়ে ওঠে, আপনিই গন্ধ ছড়ায়।

মোহনবাঁশিও ঠিক তেমনি।

ওকে ওর ঠাকুরদার কোলে রেখে ওর বাপ-মা মারা গিয়েছিল। কি করে দিন দিন বেড়ে উঠেছিল— এ এক আশ্চর্যের কথা। সবাই বলে— ছেলেটার গায়ে ফকিরের ফুঁক আছে।

মোহনবাঁশি— হাঁ, বাঁশির মতই তার গলার সুর। চোখে মোহন টান। কাঁচা, ঢল্‌ঢলে। ছিপ নৌকোর মত চলাফেরা, দিলখোলা হাসি। হাতের কাজ অদ্ভুত। চাকি ঘুরিয়ে হাত লাগাতেই এত সুন্দর সব সুরই কলসি বেরিয়ে আসতো— তা দেখে সবাই অবাক হয়ে বলতো— ইবা দেঁওতা, না মানুষ?

মোহনবাঁশির মা ছিল শঙ্খনদীর ওকূলের কোন এক কায়েত ঘরের বউ।

তার স্বামী ছিলেন বাঁকাবাবু। সকালে চিঁড়ে দই খেয়ে হাটে গিয়ে আড্ডা, দুপুরে ফিরে স্নান সেরে ভাত খেয়ে ঘুম, বিকেলে আবার আড্ডা, তারপর গভীর ঝিঁ ঝিঁ ডাকা রাত্রে বাড়ি ফিরতেন তিনি।

পান থেকে চুন খসলে বউকে ধরে বেদম মার।

এই মারের জ্বালায় বউটা মাঝে মাঝে পুকুরে গিয়ে ঝাঁপ দিত। কিন্তু মরতে পারত না। ডাঙ্গায় তুলে এনে আবার মার।

বউটা সব সহ্য করত। সবাই মনে করত সে ছিল বাঁজা।

এইসব যন্ত্রণা থেকে ছাড়া পাবার জন্য বউটা একদিন এক কাণ্ড করে বসল।

তখন মেলা বসেছে পদুয়ার বিলে। ঘোমটা পরা বউটা ইচ্ছে করেই হারিয়ে গেল মানুষের ভিড়ে।

সন্ধ্যায় ঝিমিয়ে পড়া মেলায় জোনাকির মত আলো জ্বলে উঠতেই যে যার ঘরে ফিরে গেল। বউটার সঙ্গিনীরা কেউ উঁচু গলায় শেষবারের মত ডাক দিয়ে চোখ মুছলো— কেউ দূর থেকে পেছন ফিরে বারবার মেলার দিকে তাকালো।

আর এদিকে বউটা হাতি ঘোড়া ময়ূর পাখি— পুতুলের বিরাট স্তূপের পাশে ঘুমে ঢুলুঢুলু চোখে কাত হয়ে শোয়া।

— হিবা কন্?

বাতাস-কাঁপা তেলের কুপিটা তুলে ধরে এগিয়ে এল মোহনবাঁশির বাবা।

বউটা একটুও নড়লো না। সে তখন ঘুমের ঘোরে খাঁচা থেকে বেরিয়ে আকাশে উড়ছে।

সকালে সব দোকানপাট উঠে গেছে।

এদিকে ওদিকে গুড়ের ভাঙ্গা কলসি— আঁখের ছোবড়া, তরমুজের খোসা, পচা ডিম, ভাঙ্গা উনোন, চিল আর কুকুরের ঝগড়া। চারদিকে শান্ত ঝিল্‌মিলে রোদ।

কাঁধে ঝাঁকা আর মাথায় পোটলা তুলে মোহনবাঁশির বাবা জিজ্ঞেস করলে— তুঁই কণ্ডে যাইবা?

বউটার পেছনের ছায়া নড়ে উঠল। ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে রইল কলাগাছের মত।

একথা ওকথা জিজ্ঞেস করার পর মোহনবাঁশির বাবা আঁচ করে নিল— বউটার একূলে ওকূলে কেউ নেই। নারায়ণ ভরসা। চল, আমার সঙ্গেই চল।

তার পেছন পেছন চলল মেলা থেকে মেলায়। যেতে যেতে ভুলে বসলো— সে ছিল এক কায়েত ঘরের বউ— তার স্বামী ছিল গ্রামের এক গণ্যমান্য ব্যক্তি— যিনি দিনরাত বউকে ধরে পিটতেন, আর শালিশে আড্ডায় মুরুব্বিয়ানা করতেন।

একদিন বর্ষার রাতে ধলঘাট স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বউটা ধরা দিল মোহনবাঁশির বাবার বুকে।

দু'বছর পরেই মোহনবাঁশির জন্ম।

মোহনবাঁশি কাউকে দেখেনি। না তার বাবাকে, না তার মাকে। তার বুড়ো দাদাকে জিজ্ঞেস করলে বলতো— ওরা মরে গেছে। পাড়ার লোকে জানে— তার বাবা আর মা তাকে তার ঠাকুরদার হাতে তুলে দিয়ে চলে গেছে বার্মায়। তার মায়ের বিশ্বাস— ওখানে গেলে শঙ্খকুলের সেই বাঁকা বাবুটা তাদের আর খুঁজে পাবে না। সে আজ অনেকদিন আগের কথা।

একটা লালপেড়ে সাদা শাড়ি যখন মোহনবাঁশির মনের দাওয়ায় দুলে উঠে আবার মুছে যায়— তখনি সে কাজ ফেলে দুম্‌দাম্ ঘাস মাড়িয়ে ধুলো উড়িয়ে কাদা ছাড়িয়ে গিয়ে বসে বোয়ালমারির চরে। যেখানে রোদ নরম হলে ঘাস থেকে মুখ তুলে গাইগুলো চলে যায়, ঝিঁঝিঁরা ঘুম থেকে জেগে ওঠে,—আর, আকাশের লাজুক মেঘ ধীরে ধীরে নীল হয়ে যায়। তখনি ভাবনার হাওয়া বইতে শুরু করে তাব মনে। ভাবে তার মায়ের কথা।

মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে তার চোখে ফুটে ওঠে ফুলরানীর ফুলের মত মুখখানা।

বিয়ের আগের দিন ফুলরানী যখন পালাতে চেয়েছিল তখন মোহনবাঁশির বুকে ছিল দুর্ভিক্ষের হাহাকার।

পাঁচ বছর আগের মোহনবাঁশিটি তাব মন থেকে মুছে গিয়েছিল। সেই নৌকো, সেই বিল, সেই মেলা আব সেই তেঁতুল গাছটাকে যুদ্ধের ধাক্কায় একেবারেই ভুলে গিয়েছিল।

না ভুলে উপায় কি! চোখের সামনে বৃন্দাবনের বউটা না খেতে পেয়ে মবে গেল।

ফুলরানী যেদিন তাকে পালাতে বলেছিল সেদিন সে ফিবছে সনাতনেব বউটাকে চিতায় তুলে দিয়ে।

তার বুকে তখন হাহাকার।

বৃন্দাবনেব চালাঘরে অন্ধকার, পাঁচকড়ির বাচ্চা মেয়েটা ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে, সনাতন ছটফট করছে ভাতের জন্য— আর ফুলরানী তখন জিজ্ঞেস কবছে, বাঁশি, তুই আমায় মন দিস্‌নি?

কি জবাব দেবে মোহনবাঁশি? চড় খেয়ে পাথরের মত দাঁড়িয়ে ফুলবানীব গর্জে উঠে চলে যাওযার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল।

কি হবে ওই ভুল্‌কো তারায়! ওতো আকাশেরও নয়, মাটিবও নয়।

পরদিন ফুলরানী যখন পাল্‌কিতে চড়ে চলে যাচ্ছিল তখন মোহনবাঁশি একদল লিকলিকে বাচ্চাকাচ্চাদের হাঁড়িতে ঢেলে দিচ্ছিল রিলিফেব চাল।

আব, পালকির দুয়ার খুলে ফুলরানী তার দিকে চেয়ে দৃষ্টির তীব হানছিল তীব্র আক্রোশে।

মনে মনে বলে উঠেছিল মোহনবাঁশি— মন, তুই সব ভুলে যা।

ফুলি, তুই আর তাকাসনে আমাব দিকে। যা, চলে যা। কি হবে ওই ভুল্‌কো তারায়! তুই আকাশেরও নস্‌, মাটিরও নস্‌। তোর চোখে মরণ নদী, চুলে সর্বনাশা ঝড়, রগে রগে সাপের টগবগানি।

ফুলি, আমি আর সেই মোহনবাঁশি নেই।

বদলে গেছি। অনেক বদলে গেছি। ওই চালাঘরটার মত, ওই কালো ছায়ার মত, সনাতন খুড়োর শরীরের মত বদলে গেছি। তোকে এখন আর স্বপ্নে দেখি না। স্বপ্নে দেখি— বিরাট বিরাট চালের পাহাড়, মাছ তরকারি। কখনো দেখি— রাত জেগে বসে আছি হাজার হাজার লাশ নিয়ে পাশে। কখনো দেখি— ঘরবাড়ি গাছ পাতা সব যেন ভাত ভাত করে কাঁদছে। কখনো দেখি— ভাতের সমুদ্রে সাঁতার কাটছে বৃন্দাবনের বউ সনাতনের বউ আর গগন জ্যাঠা।

আমার মা নেই।

ছেলেবেলায় বুকটা যখন খাঁ খাঁ করে উঠত তখন ছুটে যেতাম তোর কাছে। বৃষ্টির মত দৃষ্টি হেনে তুই আমার সব যন্ত্রণা ভিজিয়ে দিতিস্। কত আবদার করেছি তোর কাছে। যখন বলেছি, চল্— সঙ্গে সঙ্গে তুই বেরিয়ে এসেছিস্। এখন আর সেই সব জোর খাটাবার মনের জোর নেই। এখন অনেক বদলে গেছি। যখন মনে হয় কেউ আমার নেই এই জগৎ সংসারে— তখন চুপচাপ বসে থাকি, কাঁদি, শুয়ে থাকি।

ফুলি, তুই আমায় ভুলে যা।

ফুলরানীর মুখখানা মোহনবাঁশির চোখে ফুটে উঠলে আরেকটি মেয়ের ঝাপসা মুখ কেঁপে ওঠে তার চোখের তারায়— যার মুখ দেখেনি— যার গায়ের রঙ কাঁঠালের কোয়ার রঙের মত কি বিকেলের রোদের মত তা কোনদিন দেখেনি। এমন একটি মেয়ের মুখ উঁকি দেয় মাঝে মাঝে।

না দেখলেও তার নামটা জানে মোহনবাঁশি।

পুত্‌লি।

পুত্‌লি হরি যুগীর মেয়ে। যুদ্ধের আগুন লাগতেই প্রথমে জ্বলে গেল জানালিহাটের যুগীপাড়াটা। ঝাঁকে ঝাঁকে মেয়ে-মরদ বেরিয়ে গেল ভিটে ছেড়ে।

একদিন জানালিহাট ইষ্টিশনের চায়ের দোকানে বসে মোহনবাঁশি বিড়ি ফুঁকছিল— এমন সময় হরিযুগী এসে ভ্যা করে কেঁদে জড়িয়ে ধবল তার দু'টি পা। ঘটনা কি? ঘটনা ভয়ানক। আজ সকালে মতি দালাল তাকে লোভ দেখিয়ে গেছে— পুত্‌লিকে বেচলে পাঁচশ' টাকা পাওয়া যাবে।

কাঁদতে কাঁদতে হরি বলল— আঁয়ারে বাঁচা অ পুত। আঁয়ার পুর্তলি সাহেব পাড়ার খান্‌কি হইত্ ন পারিবো।

মুহূর্তে মোহনবাঁশিব মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল এক সরুগলি। তার এধারে ওধারে দাঁড়িয়ে আছে কতকগুলো মেয়েলি ছায়া। কাবো ঠোঁটে বিড়ি, কারো কাবো খোঁপায় চাঁপা বেলা জুঁই। কেউ গুনগুন কবে গাইছে— আমার এ সাধের বাগানে একজোড়া ডালম্ ধইরাছে।

শিউরে উঠল মোহনবাঁশি।

হরিকে জড়িয়ে ধরে বলল— কোন চিন্তা নাই। আঁই তোঁয়ার পুতলিরে বিয়া কইর্‌গ্যম্।

খোঁচা খোঁচা দাড়ি, উপোসী রোগা হবিযুগীর মুখাববণে ফুটে উঠল খুশির কান্না— রুক্ষ রোদেপোড়া জমির ওপর নেমে আসা এক পশলা বৃষ্টির মত।

তারপর কাঁপতে কাঁপতে বলল— তুই আঁযার বাপ, তুই আঁযাব বাপ।

মোহনবাঁশি কথা দিয়েছে— পুতলিকে সে বিয়ে করবে।

পুতলি— অর্থাৎ পুতুল— সেই পুতুলের দেহে মনে বইয়ে দেবে প্রাণের নদী।

দেহপশারিণীব সরু গলিটা মুছে গিয়ে মোহনবাঁশির চোখে ফুটে উঠল একটি সরু পথ— যার দু'ধারে কলাই মরিচ রাই সরিষার খেত।

সেই সরু পথ দিয়ে কাঁখে কলসি নিয়ে এগিয়ে আসছে একটা কলাপাতা রঙের শাড়িপরা বউ। নাকে নাকবোলক্, আধভাঙ্গা চাঁদের মত কপালে জ্বলজ্বলে টিপ— তার নিচে যেন দুটো কোকিল আছে বসে।

একটু স্বপ্ন, একটু মায়া, একটু ভালবাসা আর মাথায় টোপর ও গলায় রঙীন কাগজের মালা পরে— সাথে একজন পাতার সানাই একজন দগরওয়ালা নিয়ে মোহনবাঁশি যেদিন হরিযুগীর চালাঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল— তখন কেউ তাকে বরণ করতে আসেনি।

অন্ধকারে গুম মেরে বসেছিল চালাঘরখানা।

পাশের আমগাছটা একবার জ্বলছিল, একবার নিভছিল। সানাই শুনে কেউ এগিয়ে এল না। গতকাল দুপুরে বণিকদের বাড়িতে দরিদ্র নারায়ণ সেবার খিচুড়ী খেয়ে সারারাত যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে সকালে মারা গেছে হরিযুগী. হরিযুগীর বউ আর কচুর লতির মত বাচ্চাটা।

পুতলি বিকেল অবধি ছিল গোঙাতে গোঙাতে।

দূর থেকে পাতার সানাইর সুর শুনতে শুনতে কিছুক্ষণ আগে নীরব হয়ে গেছে।

পাড়াটা নিঝুম।

ভিটে সব ফাঁকা। একটা উজাল জ্বালিয়ে নিয়ে মোহনবাঁশি ঢুকেছিল হরিযুগীর ঘরে।

ঢুকেই সুপোরী গাছের মত স্থির হয়ে রয়েছিল। তার কল্পিত বউ চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। মাথায় জটা জটা চুল, মজা মুখ, চুপসে যাওয়া মাই, হাড় বের করা কাঁধ। সে ছবি মনে পড়লে মোহনবাঁশির মুখ আকাশের মেঘলার মত হয়ে যায়।

সে আর বিয়ের কথা ভাবে না।

কি হবে আর বিয়ের কথা ভেবে! যেদিকে তাকাও সেদিকেই চিতাব ধোঁয়া। সে বলে – বিয়ে তার হয়ে গেছে। সেই রঙীন কাগজের মালাটা যত্ন করে রেখে দিয়েছে টিনেব বাক্সে— যেখানে ভাঁজ করা আছে তার মায়ের লালপেড়ে শাড়িখানা।

মোহনবাঁশিব ভাবনা এখন কাহারপাড়াকে নিয়ে। কাহারপাড়া যেন তার বুকের ভেতরে ঢুকে গিয়ে ভাত ভাত করে চেঁচাচ্ছে। চেঁচিয়ে বলছে— বাঁচাও, বাঁচাও।

কি করে বাঁচাবে!

যেদিকে যাও সেদিকেই একই কান্না। তেলিপাড়াব একদল লোক ভাত ভাত করে এখানে সেখানে ঘুবে জানোয়ারেব মত হয়ে গিয়েছে। চেনাই যায় না। ময়লা লম্বা লম্বা নখ, জটবাঁধা চুল, লেংটা।

মোহনবাঁশি ওদেব বলেছিল— মিলিটারী ক্যাম্পেব বাইবে দাঁড়িয়ে— খুডা, তোঁযাবা ঘরৎ য।

ওরা হা করে তাকিয়েছিল মোহনবাঁশির দিকে।

মোহরার ঢুলী পাড়ায় সন্ধ্যা হলে আগে ঢুমঢুমাঢুম্ বোল শোনা যেত।

এখন শেয়াল ডাকে সেখানে। ভিটের ঘরগুলো কাত হয়ে পড়া। সূর্য ওঠে কি ডোবে— মাটি আছে কি নেই,— তা আর জানে না ঢুলীপাড়ার লোকেরা।

পাঁচলাইশের হাঁড়িপাড়ার চালাঘরগুলো একদিন সাঁৎ করে জ্বলে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড হাসি— খেঁদু পাগলার। তাব হাতে জ্বলন্ত উজাল। সেই-ই ধরিয়ে দিয়েছে আগুন। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে— খা, খা। সব খেয়ে যা। মরা মানুষ সব খেয়ে যা।

মোহনবাঁশি তাকে ধরতে গিয়েছিল। ইয়াকুব আর নিতাই পাল তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল— তুইও পাগল হলি নাকি।

আগুন না লাগালে মরা মানুষের গন্ধে টেকা যেত না।

হু হু করে উঠেছিল মোহনবাঁশির বুক।

মোহনবাঁশির ভাবনা এখন — কি করে বাঁচানো যাবে সবাইকে! যামিনীদা, লক্ষ্মণ, নিতাই শীল, ইয়াকুব, শীতল পাল— সবার দিকে তাকিয়ে সে উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল— মিছিল টিছিল আর নয়। যারা ধান চাল জমা করে রেখেছে তাদের কাছে যেতে হবে আমাদের। বলতে হবে— বাঁচাও সবাইকে।

বলেই মোহনবাঁশি কারো কাছে কোন জবাবই পেল না। সবাই তাকিয়ে রইল তার দিকে হা করে। হ্যারিকেনটা দুলছে সবার মুখের সামনে।

গভীর রাত তার হাত বাড়াচ্ছে কাহারপাড়ার দিকে। গাছে জোনাকী, আকাশে তারা। ঝিম ধরে বসে আছে ঘরগুলো।

বড় সড়ক থেকে নেমে বিলের আল্ ধরে এগিয়ে আসতে লাগল মতি দালাল। পেছন পেছন দুটো মূর্তি, দুটো গোরা সোলজার। টর্চের আলো কখনো জ্বলছে, কখনো নিভছে।

মতির কাছে এ কাজ নতুন নয়। কত সোলজারকে সে এমনি পেছন পেছন লেলিয়ে নিয়ে এসে কত মেয়েকে ধরিয়ে দিয়েছে তাদের জিবের সামনে।

মতি বলে— এ কাজে পয়সা আছে। কুম্ছাড়া কাজ— একটু হুসিয়ার থাকলেই হল।

মতি দালাল।

বাপ পর্যন্ত পালকির বেয়ারা ছিল। বুদ্ধি বাড়াব সাথে সাথেই মতি জানিয়ে দিল— ও কাজ আমার দ্বারা হবে না। আমি অন্য কাজ করব। এর জিনিস ওকে দেব, ওর জিনিস একে— বাস, মাঝখান থেকে আমি পাব টাকা। দুনিযাটাই তো এই দালালির ওপব চাক্ দিচ্ছে।

মতিব প্রথমে হাতেখড়ি হয়েছিল বিন্দু খুড়ীর পায়রা জোড়া দিয়ে।

কচি পায়রাগুলো উঠোনে বসে ধান খাচ্ছিল।

মতি এসে বলল— খুড়ী কইতর বেচিবা?

— না।

— বহুৎ দাম পাইবা। এক টাকা।

এক টাকা শুনে বিন্দু খুড়ীর আমের আঁটির মত চিবুকখানা নড়ে উঠেছিল। রাজী হয়ে গিয়েছিল তখুনি।

বিকেলে আমগাছের ছায়ায় একটি লোককে দাঁড় করিয়ে রেখে একটি টাকা খুড়ীর হাতে তুলে দিয়ে পায়রাগুলোকে নিয়ে চলে গিয়েছিল মতি।

মতির বয়স তখন দশ কি এগারো বছব।

পায়রা থেকে ছাগল, ছাগল থেকে গরু, গরু থেকে ধান, ধান থেকে জমি— তারপর জমি থেকে মেয়েমানুষ। এই সবের দালালী করতে করতে মতির বযস এখন পঞ্চাশটা খাল বিল পেরিয়ে গেছে।

মতির বউটা বলে— ওই কাজ ছেড়ে দাও। তোমার মেয়ে আছে, ছেলে আছে, ছেড়ে দাও।

দাঁত দিয়ে জিবের ডগা চেপে ধরে বলে মতি— ছাড়ি দিয়ম্।

মতি অনেকবার চেষ্টাও করেছে। পারেনি।

সোল্জারদের টাটকা নোটগুলো দেখলে সে তার সব কিছু ভুলে যায়— ভুলে যায় সে একটি মানুষ, তার সাজানো গোছানো সংসার আছে, ছেলে-মেয়ে আছে. আছে টিনের ছানি দেওয়া দোতালা মাটির ঘর, লাঙ্গল জোয়াল গোলাঘর গোয়ালঘর।

টর্চের আলো ছড়িয়ে এগোচ্ছে মতি। পেছন পেছন গোরা সোল্জার দুটো। রাত বাড়ছে।

হঠাৎ একটা মেয়েলি চিৎকার শুনে অন্ধকার দাওয়ার ওপর চম্কে উঠল শ্রীনাথ।

নকুলের বউয়ের গলা বলেই মনে হল।

নকুল আজ তিনদিন হল উধাও। বউটা সকালে শ্রীনাথের বউয়ের কাছে এসেছিল দু'সরা চালের জন্য। শ্রীনাথের বউ বলেছিল— এখন তো কিছু নেই, রাত্রে আসিস্। চাল কেন— তোকে আমি রুটি মাংসও দেব।

আহা! বউটা খুব লাজুক।

লক্ষ্মীছাড়া নকুলটা এমন সতীলক্ষ্মীকে একলা ফেলে চলে গেল। গাল দিতে দিতে শ্রীনাথ দাওয়া থেকে উঠে ঘরে গেল। সেখান থেকে বাতি জ্বালিয়ে এনে দাওয়ায় এসে বাঁশের ফালি দিয়ে একটা উজ্জাল ধরিয়ে নিল।

উজ্জাল হাতে শ্রীনাথ চলল নকুলের ঘরের দিকে।

নকুলের বউটা সকালে শ্রীনাথের ঘর থেকে এসে সেই যে দাওয়ায় খুঁটি ধরে বসেছিল আর নড়েনি। নড়বেই বা কেমন করে! আজ তিনদিন উপোস। সমস্ত শরীর বেশদ্।

দুপুরে মতি এসে হাজির।

— এই নকুল!

বউটা ঘোমটা টেনে ঘরের ভেতর গিয়ে বলল— নেই। নকুলের কাছ থেকে দুটো টাকা পেত মতি। সেই প্রসঙ্গ না তুলে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল— চাইল্ ডাইল্ আছে তো?

— না!

একটা পাঁচ টাকার নোট দাওয়ায় রেখে বলল মতি— ধরো, লও। রাতিয়া সাজিগুজি থাইক্য। এই কাম কর— নইলে মরি যাইবা।

বলেই মতি দালাল ছায়ায ছায়ায সরে গিয়েছিল।

বউটা ফ্যাল্ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে রইল নোটটার দিকে। ওটা দিয়ে অনেক কিছু পাওয়া যাবে— চাল ডাল কুমড়োর ডগা, শুটকি মাছ,— সব।

বউটা নোটটার দিকে চেয়ে রইল দুপুর থেকে বিকেল অবধি। সন্ধ্যা হতেই সেটা উড়ে গিয়ে উঠোনে পড়ে তার দৃষ্টি থেকে মুছে গিয়েছিল।

তারপর কি মনে কবে বউটা চারদিকে হাতড়ে বের করল একটা তালপাতাব ঝাঁপি।

তার থেকে একটা শাড়ি নিল তুলে। শাড়িটা তাব বিয়েব। ওটা পবলো। বাঁশেব চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে খিল্খিল্ ক'রে হাসলো, কাঁদলো, গুনগুন কবে গাইলো— ওরে ও বন কইতরা। এ জনমে তার লগে আর ন হৈব দেখা। তুমি তারে কইও আমার কথা।

গাইতে গাইতে হঠাৎ তার চোখে ভেসে উঠল কতকগুলো গোরা সোল্জারের বীভৎস মুখ।

তখুনি সে পরণের শাড়িটা নিজের গা থেকে খুলে নিয়ে দড়িব মত পাকিয়ে ঘরের ভেতরেব চালের সঙ্গে বেঁধে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একটা করুণ চিৎকার দিয়ে চিরকালের জন্য চুপ হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর উঠোনে টর্চের আলো।

সোল্জার দুটোকে নিয়ে মতি এসে দাঁড়িয়েছে। একজনকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে মতি বলছে— গো আন্ সাব।

সোল্জারটা ভেতরে ঢুকেই টর্চ মেরে ফাঁসে ঝোলা বউটাকে দেখে শিউরে উঠে তাড়াতাড়ি পা ফেলে উঠোন পেরিয়ে চলে গেল।

মতি অবাক।

সে ঢুকল ঘরে। টর্চের আলো জ্বেলেই আবার নিভিয়ে দিল। তারপর তার সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। পালিয়ে গেল সে।

আরেকজন গোরা সোল্জার, যে দাঁড়িয়েছিল উঠোনে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে, সে ব্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে ঢুকল ঘরে।

টর্চ জ্বেলে তাকিয়ে রইল সে নকুলের বউয়ের ঝোলান নগ্ন দেহটার দিকে।

একটুকুও নড়ল না, একটুও শিউরে উঠল না ভয়ে বা আপশোষে।

বরং অর্ধদগ্ধ সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জড়িয়ে ধরল মৃত বউটাকে।

আর, তখুনি উজাল হাতে দাওয়ায় এসে দাঁড়াল শ্রীনাথ।

গলা খাঁকারি দিল, ডাক দিল নকুলের নাম ধরে— তারপর ঘরে ঢুকেই তার দুই চোখ পাথরের মত স্থির।

শ্রীনাথের দেহে কে একজন আক্রোশে জ্বলে উঠল। মুহূর্তে উজালের জ্বলন্ত আগুন সে ওই গোরা সোল্‌জারের চোখে মুখে লাগিয়ে দিল।

বিকট চিৎকার দিয়ে জানোয়ারের মত লাফাতে লাফাতে ছুটে চলে গেল সোল্‌জারটা।

শ্রীনাথ থ। কি জানোয়ার। আহা বউটা মরে গেল! বুকে তার শোকের নদী— কাঁদতে কাঁদতে যেন একূল ওকূল ভেঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে।

বিড় বিড় করে কি বলতে বলতে শ্রীনাথ পা বাড়িয়ে দিল পথে— যে পথে তার বউ আর মেয়েটা চলে গেছে সন্ধ্যায়।

দু'ধারে ঝাউগাছ রেখে বৃহৎ সড়কটা চলে গেছে রাঙামাটির দিকে।

সেখানে এসে হাঁফাতে লাগল শ্রীনাথ।

সড়কের ওপর সাঁ সাঁ করে একটার পর একটা জিপ লরি চলে যাচ্ছে— তার আলোয় ঝলসে উঠছে শ্রীনাথের ঘর্মাক্ত মুখ। কিছুদূরে একটা বাচ্চা মেয়ের কণ্ঠস্বর শুনে সে চমকে ওঠে।

— অমা, মারে, আইও।

তার মেয়ে।

লুকিয়ে ছায়া হয়ে সে ঝোপের ধারে গিয়ে বসল। আর, ঝোপের ওপাশেই সোল্‌জারটা কাকে যেন বলছে— এই চিকো, হাম্ টুম্‌কো বহুৎ রুটি দেগা।

সঙ্গে সঙ্গে খিল্‌খিলে মেয়েলি হাসি।

হাসির শব্দ শুনে তার শরীর অবশ।

এতদিনে সে বুঝতে পেরেছে— রোজ সন্ধ্যায় বউটা সেজেগুজে যায় কোথায়। রুটি মাংস টিনভরা দুধ রোজ আসে কোত্থেকে। সব ভেবে তার নিজের ওপর ঘেন্না ধরে গেল। বউয়ের গা বিক্রির রোজগার সে এতদিন খেয়েছে। আর না। ঝোপের ধারে ওৎ পেতে বসে রইল সে।

সোল্‌জারটা টর্চের আলো ফেলে চলে গেল। ওদিকে মেয়েটা চেঁচাচ্ছে— অমা, আইও।

বউয়ের ছায়া ঝোপের ওধার থেকে এধারে আসতেই তাকে লাফিয়ে জড়িয়ে ধরে নিচে ফেলে দিল শ্রীনাথ। ছটফট করতে করতে চেঁচাতে চেষ্টা করল বউটা। পারল না। শ্রীনাথের শক্ত থাবা তখন তার গলা টিপে ধরেছে।

তবু অতি কষ্টে বলেছিল— আমি কি করব বল! তুমি তো বারদিন পুতুল নিয়েই মশগুল। ভাত আসবে কোত্থেকে। কবে তোমার মেলা বসবে— তা ভেবে তো পেট ভরবে না। তাই আমি এই পথ ধরলাম। আমি—

আর কিছুই বলতে পারল না বউটা।

ওদিকে মেয়েটা চেঁচাচ্ছে— অমা, মারে, আইও।

শ্রীনাথ এসে দাঁড়াল মেয়ের সামনে।

খুশিতে ডগমগ হয়ে বাপকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল মেয়েটা— অমা, বাবা আইসো।

একটানে মেয়েকে কাঁধে তুলে নিয়ে শ্রীনাথ চলতে শুরু করে দীর্ঘ সড়ক ধরে।

মেয়ে জিজ্ঞেস করে— মা ন যাইব?

ঝোপের দিকে চোখ ফেলে আবার চোখ ফিরিয়ে নিয়ে চলতে চলতে জবাব দেয় শ্রীনাথ—না।

একদল গোরা সোল্‌জার ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে বুটের শব্দ তুলে এসে দাঁড়ায় কাঁহারপাড়ার ঘরগুলোর সামনে।

এসেই তিনভাগ হয়ে গেল। সবার হাতে রাইফেল।

ফাঁদ পেতে বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়েছে ফুলরানী।

ঘুমোতে ঘুমোতে স্বপ্ন দেখছে— ভোরের নদী, সূর্য উঠছে পাহাড়ের চূড়ো বেয়ে—মায়ের স্তনে ঠোঁট লাগান শিশুর মত। ঝাঁক বেঁধে পাখিরা উড়ে চলে যাচ্ছে পশ্চিম দিকে। ঠাণ্ডা হাওয়া।

ছইয়ের নিচে বসে আছে সে। সাম্পান বাইছে মোহনবাঁশি। জিজ্ঞেস করছে ফুলরানী—বাঁশি, তুই আমায় কোথায় নিয়ে চলছিস্?

মোহনবাঁশির দাঁড়টানার শব্দই যেন জবাব দিচ্ছে— তোর দেশে।

বাঁকের পর বাঁক পেরোচ্ছে— খেজুর আম জাম কাঁঠাল সুপারি নারিকেল গাছগুলো পেছনে সরে যাচ্ছে— সব সরে যেতে যেতে একটা ঘাটে এসে নৌকো লাগতেই ফুলরানী চেঁচিয়ে উঠল— না, না, আমি যাব না।

মোহনবাঁশি শব্দহীন হেসে ছইয়ের ভেতর ঝুঁকে তাকিয়ে বলল— ফুলি, তোর দেশ এসে গেছে।

ফুলরানী মাথা দুলিয়ে বলল— না।

ঘাটে দাঁড়িয়ে তার বুড়ো জোতদার স্বামী চেঁচাচ্ছে— ওগো এস।

ডুক্‌রে কেঁদে উঠে মোহনবাঁশিকে জড়িয়ে ধরে বলল ফুলরানী— বাঁশি আমি ওই বুড়োর ঘর করব না। আমি তোকে ভালবাসি। তুই ছাড়া আমার কেউ নেই, বাঁশি, আমি তোকে ভালবাসি।

মোহনবাঁশি ফিস্‌ফিস্ করে জবাব দেয়— ফুলি, আমার অনেক কাজ। তোকে নিয়ে ঘর করা আমার সাজে না।

ফুলরানীর মুখ জলে ডোবা।

তাকে ঘাটে তুলে দিয়ে মোহনবাঁশি নৌকোর ছপছপ শব্দ তুলে চলে গেল।

তার বুড়ো স্বামী খক্‌খক্ করে কাশতে কাশতে বলছে— বউ, চল্ ঘরে যাই।

আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদছে ফুলরানী— বাঁশি, তুই আমায় নিয়ে যা। বাঁশি, বাঁশি, বাঁশি। ..

স্বপ্নের ঘোরে চেঁচাচ্ছিল ফুলরানী।

এমন সময় একদল সোল্‌জার এসে ঢুকল সেই ঘরে। কয়েকটি টর্চের আলোয় ফুটে উঠল ফুলরানীর দেহের ভরা গাঙ।

একজন গিয়ে চেপে ধরল তার মুখ। আরেকজন গিয়ে শাড়িখানা ছিনিয়ে নিল গা থেকে।

তারপর একজনের পর একজন।

বিধ্বস্ত জমির মত চিৎ হয়ে পড়ে রইল ফুলরানী।

বাইরে রাইফেলের গর্জন।

মতি ভাত খেতে বসেছিল। তড়াক করে এক লাফ দিয়ে সে গুদাম ঘরে চলে গেল।

ডাকাত এসেছে। তার ঘর লুঠ করবে। গুদামঘরে একটা রাইফেল আছে— ওটা সে এক মিলিটারির কাছ থেকে কিনেছিল।

রাইফেলটা নিয়ে সে চুপি চুপি সবাইকে ডেকে একঘরে বেঁধে রেখে দোতলার ওপর উঠে গেল।

সেখান থেকে এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে লাগল।

এদিকে একসাথে গর্জে উঠল দশবারোটা রাইফেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভারী জিনিস দোতলা থেকে মাটিতে পড়ল। শব্দ হল ঝুপ।

মতির ঘরে গিয়ে ঢুকল সোল্‌জাররা। ব্যাঙকোহাল্‌ করে উঠল সবাই।

লক্ষ্মণের মা আশি বছরের থুড়থুড়ে বুড়ি। খাওয়া নেই দাওয়া নেই— তবু কোনমতে বেঁচে আছে। রাইফেলের শব্দ শুনে বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল— কি মুস্‌কিল। এত বাইতে বাজী কেয়া পুড়ের্‌।

বলেই আরেকটা গুডুম করে শব্দ হতেই উপুড় হযে পড়ে গেল।

সনাতন আর তার মেয়ে সকালে গিয়েছিল ষোলসহব ইস্টিশানে।

প্ল্যাটফর্মে ভিক্ষে করে চার পাঁচ সের চাল পেয়েছিল। মেয়েটা উনোনে হাঁড়ি চাপিয়ে বসে আছে। সনাতন ক্লান্তিতে চাটাইয়ে শোয়া।

আব, বাইরে গর্জন-– রাইফেলের।

মেয়েটা চিংকাব করে লাফ মেবে জডিয়ে ধবল বাপকে।

চাবজন সোল্‌জার এসে ঢুকল ঘবে।

মেযেটা মুখ লুকাল সনাতনেব বুকে — ভযার্ত কুকুবছানার মত।

গুডুম্‌ গুডুম্‌ গুডুম্‌।

দাওযার ওপর সাজানো পুতুলগুলো ভেঙ্গে গেল শ্রীনাথেব। ঘরে কাউকে না পেযে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল সোল্‌জাররা। সেই ঘরপোড়া আগুনে দেখা গেল উঠানে দাঁড়িযে মতির ছাগলের বাচ্চাটা একটানা চেঁচাচ্ছে।

কসাইপাড়ায় হৈ চৈ।

ভাঙ্গা সাঁকোটা পেরোলেই কসাই পাড়া। সেখানে গিযে ঢুকেছে সোল্‌জাবরা।

গুডুম্‌ গুডুম্‌ গুডুম্‌ শব্দ।

দূর থেকে গুলির শব্দ শুনে মোহনবাঁশি একলাফে বেরিয়ে পড়ল আঁতুরাব ডিপোব চায়েব দোকান থেকে।

লক্ষ্মণ, যামিনীদা, ইযাকুব, নিতাই, মধু কামাবও ছুটতে লাগল কাঁহারপাড়ার দিকে।

ওরা চুপিচুপি এসে থামল লক্ষ্মণের ঘরেব পেছনে।

সবাইকে ফিস্‌ফিস্‌ করে মোহনবাঁশি কি বলল। তা শুনে যামিনীদা, শীতল, নিতাই, মধু কামার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে চলে গেল।

মোহনবাঁশি আর ইয়াকুব বুকে ভর দিয়ে কখনো হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যায় তার ঘরের দিকে।

গোরা সোল্‌জাররা তখন কসাইপাড়ার ঘরে ঘরে।

নিজের ঘরে এসে ঢুকতেই মোহনবাঁশির পাযে ঠেকল ফুলরানীর অচেতন দেহ।

বক্তাক্ত, ভেজা।

— কে?

দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাল ইয়াকুব। পবমুহূর্তেই তা কাঁপতে কাঁপতে নিভে গেল।

— ফুলি?

থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে মোহনবাঁশি গিয়ে বসল ফুলরানীর শিয়বে। ডাকল— ফুলি, ফুলরানী।

জবাব নেই।

মোহনবাঁশি তাড়াতাড়ি দেশলাই জ্বেলে তালপাতার ঝাঁপি থেকে মায়ের লালপেড়ে শাড়িটা বের করে এনে ফুলরানীর শরীরে পরিয়ে দিল। সুরই থেকে আঁজলা ভরে জল নিয়ে তা ছিটিয়ে দিল ফুলরানীর চোখে মুখে চুলে। পাখার হাওয়া দিল। ফিস্‌ফিস্ করে ডাকল কয়েকবার।

রাগে ফুলতে ফুলতে ইয়াকুব তখন ছুটে গেছে বাইরে। যে করে হোক চুপেচাপে একজন সোল্‌জারকে সে আজ রাত্রে ধরবেই।

চারিদিকে হৈ চৈ শব্দ।

এ গ্রাম ও গ্রাম ভেঙ্গে লোকজন আসছে লাঠি নিয়ে, শেল্ বল্লম্ নিয়ে। হাতে হাতে জ্বলন্ত উজাল। হাজার হাজার জ্বলন্ত চোখ যেন জোনাকির মত ধেয়ে আসছে।

সোল্‌জাররা গুলি ছোঁড়া বন্ধ রেখে কসাইপাড়ার পুকুরের অন্ধকার পাড়ে এসে দাঁড়াল।

উন্মত্ত তরঙ্গের মত চারদিক থেকে লোকজন ছুটে আসছে। সোল্‌জাররা লাইন করে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে ছুড়তে লাগল রাইফেলের গুলি।

ধড়াৎ ধড়াৎ করে পড়ে গেল একঝাঁক লোক।

চিৎকার, কান্না, কোলাহলে কেঁপে উঠল কসাইপাড়ার অন্ধকার। পেছন থেকে সোল্‌জারদের ওপর বর্ষণ শুরু হল লাঠি, ছোরা, আর জ্বলন্ত আগুন।

ওরা আর দাঁড়াতে পারল না। হাজার হাজার লোকের গর্জন শুনে ওরা পালাতে শুরু করল। কেউ পালিয়ে গেল, কেউ ধরা পড়ল।

তারপর জনতরঙ্গের বিরাম নেই।

ষোলসহর, পাঁচালাইশ, ফতেয়াবাদ, নাসিরাবাদের লোকজন পায়ের শব্দ তুলে গমকে গমকে এগিয়ে আসছে।

মোহনবাঁশি মৃত ফুলরানীর শিয়রে বসে তখন ডাকছে এক একজনের নাম ধরে।

— ও মতি খুড়া!

মতি দালাল ব্যাঙের মত উঠানে চিৎ হয়ে শোয়া! জিব বেরকরা।

— ও নকুল ভইস্ত।

নকুলের বউ ফাঁসের দড়িতে শুকোতে দেওয়া ধোবার কামিজের মত লটকাচ্ছে।

— ছিরিনাথ জ্যাডা, ও ছিরিনাথ জ্যাডা।

শ্রীনাথ তখন মেয়েকে কাঁধে নিয়ে হেঁটে চলেছে দীর্ঘ সড়ক ধরে। দুধারে ঝাউ, পলাশ, জারুল গাছ। পাখি ডাকছে। পূর্ব আকাশ লাল।

সূর্য আসছে রাতের অন্ধকার ঢেকে দিতে।

বয়সের কথা

চিত্ত ঘোষাল

আদিকথা

ন'বছরের তোতারানীর একটি ধাক্কায় বার বছরের টিংটিংয়ে গোপাল তিনটে ডিগবাজি খেয়ে ছড়ে যাওয়া কনুই আর থুতনি নিয়ে ভেউ ভেউ কান্না জুড়ে দিল।

মোটাসোটা চিনে পুতুলের মতো তোতারানী ঘাড় বেঁকিয়ে গোপালকে একটুক্ষণ দেখল। তারপর দড়িছেঁড়া পেন্টুলের খুঁটদুটো শক্ত করে কোমরে কষতে কষতে বলল: 'আমারে মুটকি বললি তোর মাথাডা আমি ভেইঙে ফেলাব।' বলে তোতারানী তার গোলগাল শরীরের তুলনায় অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে হেঁটে চলে গেল।

বস্তির একদঙ্গল রোগা হাড্ডিসার ছেলেমেয়েদের মধ্যে তোতারানীকে দেখে সত্যিই অবাক হতে হয়। ওর তের বছরের দাদা নীলকণ্ঠ, এগার বছরের দিদি আতারানী আর ছোটভাই ছ'বছরের বেজাও বস্তির আর পাঁচটা ছেলেমেয়ের মতই— রোগা-রোগা খেতে-না-পাওয়া চেহারা। ওদের মধ্যে যে কোথা থেকে অমন স্বাস্থ্য আর শক্তি নিয়ে এল মেয়েটা তাই মাঝে মাঝে ভাবে তোতারানীর মা বিধুমুখী। খাওয়ার লোভ নেই অন্য বাচ্চাদের মতো, যা পায় দুটি ভাত রুটি সোনামুখ করে তাই খেয়ে নেয়। এটা দাও সেটা দাও, আরো দাও, বেশি দাও বলে না কখনো। অথচ তাতেই স্বাস্থ্য টসটস করছে মেয়েটার শরীরে। জলে ফোলা শরীর নয়, রীতিমতো শক্তি রাখে, খাটতে পারে দুটো সোমত্ত মেয়েমানুষের খাটুনি। তোতা না থাকলে পাঁচ বাড়িতে ঠিকে কাজ করে কি করে যে ঘর সামলাতো বিধু। দু'বেলার সব রান্না করে ঐ মেয়ে, কাপড় কাচে, ঘর নিকোয়, বাসন মাজে। এত সব করেও খেলে বেড়ানোর দম থাকে ওর।

গোপালের মা ডাকসাইটে ঝগড়াটি। বস্তির অন্য মুড়ো থেকে সে এল বিধুমুখীর সঙ্গে ঝগড়া করতে। তার ছেলের গায়ে হাত দেয় কার এত বড় মাথা। বিধুমুখী পাল্লা দিয়ে পারল না গোপালের মায়ের সঙ্গে— না গলার জোরে, না বাক্যির বাহারে। তখন বিধুমুখী ঘরে গিয়ে পিটতে সুরু করল তোতাকে। তোতা কাঁদল বটে, কিন্তু নিজের যুক্তি থেকে এক চুলও সরল না, 'আমি ওরে পিয়ারা দিছি, জাম দিছি, ও আমারে মুটকি কইল্ল কেন। মুটকি বললি আমি মারব।' মেয়ের কথায় আরো চটে গেল বিধু, আরো মারল। তোতা দাঁড়িয়ে মার খেল, ফোঁপাতে ফোঁপাতে হাতের উলটো পিঠ দিয়ে চোখ মুছল, তবু যা বলেছে তার নড়চড় করাতে পারল না বিধু। তখন হয়রান হয়ে সে ক্ষান্ত দিল।

তোতাকে নিয়ে জ্বালা হয়েছে বিধুর। যেমন ভালোবাসা তেমনি দস্যিপনা ঐ মেয়ের। কিছু পেলে সবাইকে দিয়ে-থুয়ে নিজের জন্যে না থাকলেও দুঃখ নেই। বস্তির বাচ্চাগুলো ওর এই স্বভাবটা জানে, ভাব দেখিয়ে ওর কাছ থেকে এটা সেটা নেয়। ওরাই আবার মুটকি বলে ক্ষেপায়। তখন রণ-রঙ্গিণী তোতারানী। ওর হাতে দু'চার ঘা খায়নি এমন ছেলেমেয়ে বস্তিতে কম। বড় জেদও মেয়েটার। তোতার তুলনায় ওর দিদি আতা অনেক

শান্ত। আতা এক বাড়িতে থাকে, খায়, কাজ করে। ওরা বিধুকে মাসে পাঁচ টাকা করে দেয়। পারলে তোতাটাকেও বিধু কারো বাড়িতে রেখে দিত। কিন্তু ওর স্বভাবের কথা ভেবেই ভরসা পায় না। ওর সুন্দর শরীরটাই কাল হয়েছে। বাচ্চা বুড়ো কেউই গরীবের ঘরে এত ভালো স্বাস্থ্য দেখতে অভ্যস্ত নয়। বাচ্চারা পিছনে লাগে। বড়দের ঈর্ষা নানাভাবে প্রকাশ পায়। আর তোতাও মোটা বললে ক্ষেপে যায় দারুণ। কাউকে রেয়াত করে না।

এখন আর কাঁদছে না তোতা। ঘরের কোণে পা ছড়িয়ে গাল ফুলিয়ে গোঁজ হয়ে বসে আছে।

— আয়, খেয়ে যা। বিধু ডাকল।

উঠল না, সাড়াও দিল না তোতা। বিধু জানে এখন আর মার-ধর করে লাভ নেই। মেরে ফেললেও মেয়েকে ওঠানো যাবে না, খাওযানো তো দূরের কথা। আদর করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করাতে হবে। বিধুর মনে হয় মেয়েটা এই অদ্ভুত জেদ পেয়েছে ওর বাপের কাছ থেকে। নবদ্বীপের পায়ে শুধু মাথা খুঁড়তে বাকি রেখেছিল বিধু। 'ওগো তোমার পায়ে পড়ি, এ কাজ তুমি ছেড়ি দাও। না হয় কষ্ট কইরে থাকব। কলকাতায় চল, দু'জনে খেটে-খুটে চালিয়ে নেব।' কোনো কথা শোনেনি নবদ্বীপ, বনগাঁর বাস তোলেনি, বর্ডাব পেরিয়ে এপার-ওপার চোরা চালানের কারবারও ছাড়েনি। 'এই না হলি মেইয়েছাওযালেব বুদ্ধি। এমন রোজগার ছেড়ি তোমাদের নে কলকেতায় গে ভিক্ষে করি আর কি।' সেই কলকাতাযই কিন্তু আসতে হল সবাইকে, শুধু নবদ্বীপ ছাড়া। শেষ যেবার বর্ডার পেরোল নবদ্বীপ তারপর থেকে নিখোঁজ। কেউ হদিশ দিতে পারেনি। বিধুর মন কুডাক ডেকেছে ও বুঝতে পারে নবদ্বীপ নেই।

দত্তবাবুদের বাড়িব বড়বৌদি তোতাকে দেখে কথাটা পাড়ল বিধুব কাছে। বিধুব যদি মত থাকে তোতাকে সে দিতে পারে তার বোনের বাড়িতে। খুব ভালোমানুষ বাযবাবুবা। তোতা আরামে থাকবে। বউদের ফুটফরমাস খাটবে, খাবে দাবে খেলবে। মেয়েব জামা কাপড, অসুখ-বিসুখে চিকিৎসা সব ওরা দেবে। তার ওপব মাসে মাসে দশ টাকা দেবে বিধুকে। প্রস্তাবটা মনে ধরল বিধুর। অবশ্য মেয়েটা চলে গেলে কষ্ট হবে, একা হাতে ঘব-বার দুইই সামলাতে হবে তাকে। তবু মেয়েটাতো ভালো থাকবে। মাস গেলে দশটা টাকাও কম না অভাবের সংসারে। এখন মেয়ে যদি বেঁকে না বসে—

অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তোতাকে নিমরাজী গোছের কবাল বিধু। মেয়েব জেবার জবাব দিতে গিয়ে নাকাল হল বেশ।

— কত্‌দূর যেতি হবে?

— এই তো কাছে। মাইলটাক।

— কত্‌খানটা গেলি মাইল হয়? পুকুরটার তিন পাক?

পুকুরটার তিন পাকে সিকি মাইল হয কিনা সন্দেহ, তবু বিধুকে তোতাব আন্দাজেই সায় দিতে হয়।

— রাত্তিরি তোমার কাছে ঘুমুতি আসপ।

প্রমাদ গণল বিধু। দশ বার মাইল রাস্তাকে মাইলটাক বলে আর তোতার মাইলের আন্দাজে সায় দিয়ে এখন পাকবার মুখে ঘুঁটি না কেঁচে যায়। অনেক কষ্টে ফাঁড়া কাটায বিধু। শেষ পর্যন্ত রফা হয় তোতা আসবে না, বিধুই যাবে আর মাঝে মাঝে ছুটি করিয়ে নিয়ে আসবে ওকে।

— মা কালীর দিব্যি, তুমি আমারে দেখতি যাবা?

— বলিছি তো যাব।

— না গেলি আমি চলি আসপ।

— খবরদার তোতা, তুই একলা চিনি আসতি পারবি না। বাসে যেতি আসতি হয়।

— আমারে ওরা মোটা বললি মারলি কিন্তুক আমিও মারব।

তারপর ভালো পেণ্টুল আর ফরকখানা পরে, ছেঁড়া ফরক, একটা ছোটো ফাটো-ফাটো পাওয়া-পেণ্টুল, সখের টকটকে লাল ইস্‌কাট আর ছেঁড়া-খোঁড়া বর্ণপরিচয়খানা কাগজে মুড়ে মায়ের হাত ধরে দত্তবাবুদের বাড়ির বৌদির সঙ্গে তোতা রায়বাবুদের বাড়ি গেল।

রায়বাবুদের সংসার আজকের মাপে বড়ই। কর্তা মারা গেছেন, গিন্নি আছেন। তিন ছেলে। বড় দু'জনের বিয়ে হয়েছে। বড় ছেলেব তিন মেয়ে, এক ছেলে। মেজোর এক ছেলে, এক মেয়ে। ছোট ছেলের বিয়ে হয়নি। তোতাব বয়সী বাচ্চা চারজন। তোতা আসতেই ওরা আশেপাশে ঘুরঘুর করতে সুরু করে। তোতাও প্রথম থেকেই ওদের সন্দেহের চোখে দেখে। মায়ের কোল ঘেঁষে দাঁড়ায়।

— আয়, আয়, রায়দের বড়বৌ আদর করে কাছে টানে তোতাকে, ওমা এ যে জাপানী পুতুল গো। ওরে, তুই পারবি তো কাজ করতে?

—তুই কি বলছিস্, নিলু, দত্তবাবুদের বৌদি বলল, সব কাজ পারে ও। আমি কি না জেনে দিচ্ছি তোকে।

— বুঝলে গো, তোমার মেয়েকে ভারি কাজ করতে হবে না। আমাদের ঠিকে ঝি আছে। বাসন মাজা, কাপড় কাচা, ঘর মোছা সেই সব করে। রায়বাবুদের বড়বৌ বলল বিধুকে।

মধ্যকথা

অল্প ক'দিনেই রায়বাবুদের সংসারে তোতা একই সঙ্গে অনেক সমস্যা ও অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে ওঠে।

কাজ-পাগল তোতাকে দেখে ঠিকে ঝি প্রায়ই কামাই করতে সুরু করে। তার সব কাজ চাপে তোতার ওপর। একটি কথাও না বলে তোতা সে-সব কাজ করে দেয়। ঝি না আসায় কারো কষ্টই হয় না। বরং পরের মাস থেকে ঝিকে ছাড়িয়ে দেওয়াই ঠিক হয়। মেয়েটা যখন কাজ করতেই ভালোবাসে ..

হেঁশেলের ভার বড়বৌয়ের। বড়বৌ আর মেজোবৌয়ে বয়সের তফাৎ অনেকটাই। মেজোবৌ সুন্দরী, তার ওপর মেজোকর্তার রোজগারও ভালো। কাজেই উননের আঁচে মেজোবৌয়ের সোনার বর্ণ কালি হতে দেওয়া যায় না। বড়বৌয়ের মনে এই সব জ্বালা অনেক সময় স্বগতোক্তির মতো তোতার সামনেও বেরিয়ে পড়ে। তোতা এখন হেঁশেলে বড়বৌয়ের মস্ত সহায়। বেশির ভাগ সময় তোতারও কাটে বড়বৌয়ের সঙ্গে হেঁশেলে। কাজে যেমন চটপটে মেয়েটা, তেমনি গোছানো স্বভাব। বড়বৌয়ের কৃতজ্ঞতা একটু একটু করে স্নেহের চেহারা নেয়। বড়া ভাজতে ভাজতে দুটো বড়া তোতার হাতে তুলে দেয় বড়বৌ, 'টুক করে খেয়ে নে। তোর জামাটা ময়লা হয়েছে তোতা, কেচে নিস্।' 'আমার সাপান থাকলি তো।' 'আমার সাবান দিয়ে কাচিস্। হ্যাঁরে তোতা, তোর এত কাজ করতে কষ্ট হয়?' বড়বৌয়ের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকায় তোতা, 'কাজ করতি আবার কারো কষ্ট হয়?' বড়বৌ হেসে ফেলে।

একদিন বড়বৌ বলে, 'তুই রান্না করতে পারিস, তোতা?' কথাটা কিছু ভেবে বলেনি বড়বৌ। 'দিলি পারি।' তোতার উত্তর শুনে বড় বৌয়ের মজা লাগে। 'হুঁ, তুই করবি রান্না। সে আর কাউকে মুখে তুলতে হবে না।' 'তোমার ঠেনে ভালো না হলি আমার কানডা মুলি দিও।' 'বটে! রাঁধ তবে এই তরকারিটা তুই।'— বড়বৌ হাসতে হাসতেই বলে। তোতা

রাঁধে। বড়বৌ নজর রাখে। একবার একটু দেখিয়ে দিতে গিয়েছিল, অমনি খিঁচিযে ওঠে তোতা, 'তালি তো তোমার রান্না হল।' 'আচ্ছা বাবা আচ্ছা, তোর যেমন ইচ্ছে বাঁধ্।' খেতে দেবার সময় তোতার রান্নার কথা সবাইকে বলে বড়বৌ। খেয়ে সবাই তারিফ করে, বিশেষ কর ছোটভাই নিরুপম। 'তুই অবাক করলি, তোতা, তুই তো পাকা রাঁধুনী রে। তোকে একটা পুরস্কার দেব।' একগাল লাজুক হাসি নিয়ে টেপাটোপা তোতারানী রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে। অফিসে যাবার সময় তোতাকে সামনে পেয়ে ওব গাল টিপে একটু আদর করে নিরুপম। রান্নাঘরে গিযে তোতা বড়বৌকে বলে, 'ছোডমামাডা ভালো।' 'কেন. তোকে পুরস্কার দেবে বলেছে, তাই?' 'পুরস্কাব কারে বলে, বড়মামী? খাবার জিনিস?' 'হ্যাঁ, খাবার জিনিস।' — হাসি চেপে বড়বৌ বলে।

একান্নবর্তী পরিবারে নিজের স্বামীর আর্থিক অক্ষমতা প্রাণপাত পরিশ্রমে পুষিয়ে দেবার চেষ্টা করে বড়বৌ। অতিরিক্ত পবিশ্রমে শরীরে ঘুণ ধরেছে, তবু স্বামীর মুখ চেয়ে আব ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে অনুযোগ সে কখনো কবেনি। মেজোকর্তা অনেক টাকা মাইনে পায়। একটা ব্যাপাবে তাকে উদার বলতেই হবে, আলাদা থাকলে ওরা অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে পারত, কিন্তু দাদাব অবস্থার কথা ভেবেই সে আলাদা হয়ে যায়নি। বড়বৌ অকৃতজ্ঞ নয়। মেজোবৌ যে সংসাবের কুটোগাছটি নাড়ে না সেজন্য মনে তাব যত জ্বালাই থাক, সামনা-সামনি প্রকাশ কখনো ঘটেনি। কিন্তু দিনে দিনে শবীব মনেব তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে যাওয়া সে নির্বাক ক্ষোভে উষ্মায় সহ্য কবেছে। তোতা এসে ক'দিনেই তাব বোঝা প্রায় অর্ধেক হাল্কা করে দেওয়ায় শক্ত-সমর্থ প্রায় প্রাবণ্যকভাবে সবল অথচ জেদী মেয়েটাকে বড়বৌ ভালোবেসে ফেলে। হয়তো এই ভালোবাসাব অনেকটাই স্বার্থপবতা। ও চলে গেলে আবার তার অবস্থা কি হবে ভাবতেও বড়বৌয়েব ভয় হয়। তাই নিজেব ছেলেমেয়েদেব সে সাবধান করে রাখে, তোতাকে যাতে ওবা বিবক্ত না কবে, না ঘাঁটায়। নিজেব অসহায় অবস্থাব কথা বোঝার মতো বুদ্ধি নেই মেয়েটাব। ওব ভালো লাগা না লাগাব প্রকাশে ও এখনো নির্ভেজাল শিশু। কিন্তু মেজোবৌয়ের ছেলেমেয়েবা বোকা-সোকা তোতাকে উত্ত্যক্ত কবলে তা নিয়ে মাথা ঘামানোব দবকাব পড়ে না মেজোবৌয়েব। বড়বৌয়েব দায়। সই যতদব সম্ভব তোতাকে আগ্‌লে আগ্‌লে রাখে।

কিন্তু একদিন মাথা ঘামানোব দবকাব হল মেজোবৌয়েব-ও। নাব ই লিশ মিডিয়াম-স্কুলে পড়া দিনে-তিন-দফে-ভিটামিন খাওয়া দশ বছরেব ছেলে এক ছুটিব দুপুরে তোতাব চিলেকোঠাব এক চিলতে ঘরটাতে উঁকি দিল। তোতা তখন তাব দ্বিপ্রাহরিক পাঠাভ্যাস কবছিল। দিদি প্রাতাব কাছ থেকে তোতা পেয়েছে একখানা ছেঁড়াখোঁড়া বর্ণপবিচয়। বইখানা ও খুব যত্ন কবে বেখে দিয়েছে। কে যেন ওকে বলেছিল লেখাপড়া শিখলে লোকেব আব কোনো কষ্ট থাকে না। কথাটা ওব মনে ধরেছিল। কিন্তু শেখাব ব্যাপাবটা কি ভাবে হয় সে ধাবণা ওব নেই। ওর বোধহয় বিশ্বাস রোজ বইখানা সামনে বেখে যে কটা শব্দ ও জানে সেগুলো কিছুক্ষণ এলোমেলো আউড়ে গেলেই একদিন ওব লেখাপড়া শেখা হয়ে যাবে। সেদিনও দুপুরে সব কাজ শেষ হবার পর তোতা বইখানা সামনে বেখে দুলে দুলে ওব পড়া আওড়ে যাচ্ছিল।

মেজোকর্তার ছেলে ইন্দ্র দবজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ তোতার পড়া শুনল। তোতা এমন ডুবে গিয়েছিল ওব পড়ায় যে ইন্দ্রকে ও দেখতে পায়নি। এমন মজাটা একলা উপভোগ করতে মন চাইল না ইন্দ্রর। অনেক কষ্টে হাসি চেপে পা টিপে টিপে ফিবে গিয়ে ডেকে আনল বোন রূপাকে। আড়ালে দাঁড়িয়ে দু'জনে কিছুক্ষণ তোতাব পড়া শুনল। তারপর আর হাসি চাপতে না পেরে হাসতে হাসতে হুড়মুড় কবে দু'জনে ঢুকে পড়ল তোতার ঘরে।

— কি করছিলিরে, তোতা?

তোতা ঝট করে বালিশের নিচে বইখানা লুকিয়ে ফেলল।

— তোতা খুব সুন্দর পড়ে, নারে দাদা? রূপা বলল।

কথা নেই তোতার মুখে।

— কোন্ ইস্কুলে ভর্তি হবি? লবেটোয?

ইন্দ্রর কথার মানে বুঝতে পারে না তোতা, তবে ওরা যে ঠাট্টা করছে সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না ওর। তবু চুপ করে থাকে।

— কি নিবি? সায়েন্স না হিউম্যানিটিজ?

ঠোঁট চেপে চুপচাপ বসে থাকে তোতা।

— কি বিউটিফুল প্রনানসিয়েশান দেখেছিস দাদা। ফুট কাটে রূপা।

তোতা তবু পাথরের মতো ব'সে।

তখন ইন্দ্র ওকে ধাক্কা দেয় একটা— এই ধুম্‌সি, কথা বলছিস না কেন?

এবার লাফিয়ে ওঠে তোতা। ওরা দুটোতে ভয় পেয়ে ছিটকে যায় দু'পাশে।

— তোর বাবারডা খায়ে আমি ধুমসি হইছি?

ঠাস করে তোতার গালে একটা চড় বসিয়ে দেয় ইন্দ্র রূপা পিছন থেকে দুম করে কিল মারে পিঠে।

- দাঁড়া মুট্‌কি দেখাচ্ছি তোর মজা। তুই বাবা তুলে গাল দিয়েছিস মাকে বলব তোকে আজ জুতিয়ে বার করে দেবে বাড়ি থেকে।

বলা বাহুল্য, আর সহ্য করেনি তোতা। এক ধাক্কায় উলটে পড়ে ইন্দ্র ছাল ওঠা কনুই নিয়ে ছুট দিয়েছিল মা'র কাছে আর সপাট এক খানা থাপ্পড় খেয়ে রূপা ভ্যাঁক করে কেঁদে উঠে ছুটেছিল দাদার পিছু পিছু।

বাড়ির ঝি, হোক তার বয়স ন'বছর তবু তার এতবড় স্পর্দ্ধা সহ্য হয়নি মেজোবৌয়ের। হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে স্বামীর শৌখিন মণিপুরি ছড়িখানা নিয়েই মেজোবৌ গিয়েছিল তোতার ঘরে।

তুই ইন্দ্র রূপাকে মেরেছিস্?

ওরা আগে আমারে মারিছে, ধুমসি বলিছে মুট্‌কি বলিছে।

— তা বলে মনিবের ছেলেমেয়ের গায়ে তুই হাত তুলবি?

মুট্‌কি বললি আমার রাগ হয়।

- এতই যদি মেজাজ তবে পরের বাড়িতে কাজ করতে এসেছিস্ কেন?

এসব তত্ত্ব তোতার মাথায় ঢোকে না।

— তোমারে শুঁটকি বললি তোমার রাগ হয় না?

আর সহ্য হয় না মেজোবৌয়ের। তাকে কিনা শুঁটকি বলা! যে ফিগার এখনো মেজোকর্তা যে ফিগার দেখে এখনো পাড়ার ছোঁড়াগুলোর ভাবতে নেই এযোতিদের ও সব কথা, তাই তাকে কিনা শুঁটকি বলল ঐ হদকুচ্ছিৎ গাইয়া মেয়েটা অসম্ভব। সপাং করে ছড়িটা একেবারে তোতার মুখের ওপর বসিয়ে দেয় মেজোবৌ। তারপর এলোপাতাড়ি পিটতে থাকে। প্রথম আঘাতের আকস্মিকতায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল তোতা। সামলে নিয়ে দু'হাতে যথাসম্ভব নিজেকে বাঁচাতে বাঁচাতে বলে চলে— কি আমার দেখতি ভ্যালো দেমাকে মরতিছে হেঁশেলে ঢুকলি রং জ্বলি যাবে. খাটতি খাটতি বড়মামীর পেরাণডা বেরয়ি যাতিছে আমারে মুট্‌কি বললি আবার মারব অ্যাকেবারে মেরি ফেলাব

বড়বৌ একটু ঘুমিয়েছিল। হৈ হট্টগোলে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল, ছুটে এল সে। এসে মেজোবৌকে থামাল। মেজোবৌ তখন মারের পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে, মুখ টকটকে লাল, কথা বলতে পারছে না রাগে, উত্তেজনায়।

— কি হয়েছে, মেজো? বড়বৌ জিজ্ঞেস করল।

— জিজ্ঞেস কর না হারামজাদা মেয়েকে। কোনোমতে মেজো বৌ বলল।

এবার তোতার দিকে তাকাল বড়বৌ। মুখের উপর মোটা লাল দড়ি মতো একটা দাগ। দু'হাতেও অমনি দাগ পাঁচ সাতটা। এলোমেলো চুলগুলি মুখের ওপর এসে পড়েছে। একটা শব্দ নেই মুখে। শুধু গাল বেয়ে টসটস করে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। তবু ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তোতা।

— ইস্, এইটুকু বাচ্চাকে....

বড়বৌকে থামিয়ে দিয়ে মেজোবৌ বলল— তুমি থাম, বড়দি। তোমার ছেলেমেয়ের গায়ে হাত তুললে তুমিও ছাড়তে না। আরেকটা কথা, আমি দেমাকে মরি, হেঁশেলে ঢুকলে আমার গায়ের রং নষ্ট হয়ে যাবে, এসব কথা বলার সাহস ও পায় কোথা থেকে? কে শিখিয়েছে ওকে ?

— তুই কি বলছিস্, মেজো?

— থাক্... যথেষ্ট হয়েছে। যা বলার ওঁকেই বলব...

— মেজো, শোন্, মেজো...

মেজোবৌ আর দাঁড়াল না সেখানে।

তোতাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল বড় বৌ। জেরা করে সব বার করল ওর মুখ থেকে।

— সব্বনাশী, তুই আমারও সর্বনাশ না করে ছাড়বি না দেখছি। ইন্দ্র রূপাকে মেরেছিলি মেরেছিলি, মেজোবৌকে যা তা বলতে গেলি কেন?

— হেঁশেলে কাজ করতি করতি তুমি বল না ওসব কথা? আমি তো সত্যি কথাই বলিছি। আমার পিছনে লাগলি আবার বলব।

অবুঝ জংলী মেয়েটাকে আরেকদফা পিটুনি লাগাতে ইচ্ছে করে বড়বৌয়ের। কিন্তু সামলে নেয় নিজেকে। মারধর করে এ মেয়েকে শোধরানো যাবে না। ওর মনটা যে দুনিয়া-ছাড়া সোজা সরল নিয়মে চলে সেখানে ও কখনো আপস করতে শেখেনি। বড়বৌ তাই ওর আঘাতের জায়গাগুলোতে মলম ঘষতে ঘষতে অন্য কথা ভাবে। মেজোবৌ যদি মেজোকর্তাকে সব বলে দেয়...

মেজোবৌ ভেবেছিল সেদিনই কর্তাকে বলে একটা হেস্তনেস্ত করবে। অপমান সহ্য করার পাত্রী সে নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা চেপেই যেতে হল। মেজোকর্তা বাড়ি আসার আগেই ধুম জ্বর এসে গেল তোতার। মেজোবৌ তখন আর কর্তাকে জানাতে সাহস পেল না। কর্তা যদিও এখনো তাকে আদরে সোহাগে একটু ব্যতিব্যস্তই রাখেন, প্রায় প্রতি রজনীতেই, তবু লোকটার উচিত-অনুচিত নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করার স্বভাব আছে। এবং অভিজ্ঞতা থেকে মেজোবৌ অনুমান করতে পারে আজকের ব্যাপারে উচিতের পাল্লাটা তার দিকে ভারি হবে না। তাছাড়া লোকটা একটু গেঁতো স্বভাবের, আলাদা সংসার করার অনেক ঝামেলা, সুখের চেয়ে সোয়াস্তিই ওর পছন্দ। এখনতো যাবতীয় দায়-দায়িত্ব ঝুট ঝামেলা দাদা বৌদি পোহায়. উনি শুধু টাকা কিছু বেশি দিয়েই খালাস। তোতাকেও হুট করে ছাড়ানো চলে না। ও আসতে সংসার খরচ কিছুটা কমেছে। ঠিকে ঝিকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। একটা বাচ্চা চাকর আছে, তাকেও ছাড়িয়ে দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে।

তিন দিন জ্বর গায়ে ওর চিলেকোঠার ঘরে পড়ে রইল তোতা। বড়বৌ আর নিরুপম শুধু ওর দেখাশোনা করল। আর কেউ খবরও নিল না। নিরুপম ডাক্তারকে বলে ওষুধ নিয়ে এল। মেয়ে ওষুধ কিছুতেই খেতে চায় না। অনেক বলে কয়ে শেষ পর্যন্ত রাজী করাল নিরুপম। বড়বৌ কাজের ফাঁকে ফাঁকে আসে। খাবার, ওষুধ খাইয়ে যায়।

প্রথম দিন জ্বরের তাড়সে ঝিম মেরে পড়েছিল মেয়েটা। কথাই বলেনি তেমন। দ্বিতীয় দিনে একটু সুস্থ হতেই বড়বৌকে বলল— আমি এখেনে থাকপ না। আমারে মার কাছে দিয়ি এস।

বড়বৌ চুপ করে রইল। কি বলবে? একটা শিশুকে এ ভাবে নির্যাতন করার পর ওর মন যে আর এখানে টিকবে না এতো জানা কথাই। কিন্তু ওর মা ব্যাপারটা জানতে পারলে নিশ্চয়ই ছেড়ে কথা কইবে না। ঝি ক্লাসের যা মুখ!

অফিসে যাবার মুখে তোতাকে দেখতে এসে নিরুপমও কথাটা শুনেছিল। বড় বৌদির অবস্থা বুঝতে পেরে ও বসল তোতার পাশে।

— তুই চলে গেলে আমার খুব কষ্ট হবে যে, তোতা। নিরুপম বলল।

— আমি তার কি করব।

— আমার কষ্ট হলে তোর কষ্ট হবে না?

— তালি তুমি মেজোমামী, ইন্দর আর রূপারে মারি দাও।

সোজা হিসেব, নিরুপম ভাবে, আমার কষ্টে যদি তোমার কষ্ট, তবে আমাকে যারা কষ্ট দিয়েছে তাদের তুমি শিক্ষা দাও।

— মেজোমামী যে আমারও বড়— আমার বৌদি। আমি তাকে মারতে পারি? তুইই বল। নিরুপম বলে।

— তালি ও আমারে আবার মারবে।

— না, আর তোকে মারবে না। তুইও কাউকে আর মারিস্ না, তোকে কেউ বকলে মারলে আমাকে বলিস্, কেমন? উঠতে উঠতে নিরুপম বলে, হ্যাঁ, তোর একটা পুরস্কার পাওনা আছে আমার কাছে। আজ নিয়ে আসব।

— কি দেবা, ছোডমামা?

— সে এখন বলে দিলে আর মজা থাকবে না।

জ্বরে ম্লান মুখখানাও তোতার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

নিরুপম চলে যাবার পরও বড়বৌ কিছুক্ষণ তোতার বিছানার পাশে বসে থাকে। যাবার বায়না বোধ হয় আর ধরবে না মেয়েটা। কিন্তু মাস শেষ হতে আর মাত্র ক'দিন বাকি। তারপরই মাসকাবারি দশ টাকা নিতে আসবে তোতার মা। এর মধ্যে যদি মারের দাগ না মিলিয়ে যায়, কিংবা তোতাই যদি মাকে বলে দেয় সব কথা, তাহলে নিশ্চয়ই মেয়েকে এখানে আর রাখবে না ও। কথাতো শোনাবেই। তা শোনাক, কিন্তু মেয়েটাকে নিয়ে গেলে সত্যিই বড়বৌয়ের কষ্টের শেষ থাকবে না।

— একটা কথা বলব, তোতা? ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বড়বৌ বলে।

— বল।

— আমি তোকে ভালোবাসি তো?

— হুঁ।

— ছোটমামাও তোকে খুব ভালোবাসে।

— হুঁ। ছোডমামাডা ভালো।

— তোর মাকে কিছু বলিস্ না, কেমন?

উত্তর না দিয়ে তোতা মুখ ঘুরিয়ে নেয়। বড়বৌ ঝুঁকে দেখে ওর চোখে জল।

— বোকা মেয়ে, কাঁদছিস্ কেন?

— মাডা আমারে ভুলি গেছে। আমারে দেখতি আসে না। তোতা ফুঁপিয়ে ওঠে।

— দেখছ পাগল মেয়ের কাণ্ড। পাঁচ বাড়ি কাজ করে, সংসার দেখে সময় পায় না তাই। দেখিস্ ঠিক আসবে।

— বলিছিল হপ্তা হপ্তা আমারে দেখতি আসপে। মাডা মিথ্যুক। এবার আলি খুব বকি দিওতো, বড়মামি।

— দেব, খুব বকে দেব এবার। বলব প্রত্যেক রোববার যেন আসে। তুই কিন্তু কিছু বল্লিস না, তোতা, লক্ষ্মী মা আমার।

— আচ্চা।

সারাদিন অফিসে একটা বিশ্রী অস্বস্তি নিয়ে কাটিয়ে ছুটির পর নিরুপম রং বেরংয়ের সুন্দর এক বাক্স টফি কিনে বাড়ি ফিরে প্রথমেই গেল তোতার ঘরে।

— এই নে তোর পুরস্কার। বাক্সটা খুলে তোতার হাতে দিল নিরুপম।

খুশিতে ঝলমলে হয়ে উঠল তোতার মুখখানা। সারাদিনের অস্বস্তিটা কেটে গেল নিরুপমের।

— ছোডমামা, বাস্কোডা তোমার কাচে রেখি দাও। আমার খেতি ইচ্চে কর্বলি চেইযে নেব। মা আলি বেজার জন্যি এই বাস্কোডা আর কডা লজেন প্যাটয়ে দেব।

— বেজা কেবে?

— আমার ছোড ভাই। আমার তিন বচ্চারের ছোড।

এই মুহূর্তে মেয়েটাকে আরো ভালো লাগে নিরুপমের। ও বসে পড়ে তোতার বিছানায়। বসে বসে গল্প করে। টুক্রো টুক্রো ভাঙা ভাঙা কথায়, উজ্জ্বল চোখ, ওর সুঠাম হাতের সুন্দর নানা ভঙ্গিতে ওর স্বপ্নের জগতে নিরুপমকে নিয়ে যায় তোতা। গাছগাছালি, কালি গাই, ওর পোষা কুকুর ভজা, ছাগল সরস্বতী, পুকুরের কাদা ছেনে মাছ ধরা, শুকনো মরা নদীর বুকে দৌড়ে বেড়ানো, তেষ্টা পেলে বালি খুঁড়ে জল বের করা, দু-মুখো সাপ, বাঁশঝাড়ে নাপিত বৌয়ের পেত্নী—স্বপ্নোন্মেষ কালের বাস্তব-অবাস্তব আরো কত গল্প বলে যায় তোতারানী। ওর স্বপ্নময় দু'চোখে বিস্ময় আর স্মৃতি। একটা আশ্চর্য নতুন আবিষ্কারের মতো তোতাকে দেখে নিরুপম। অপাপবিদ্ধ চিরকালীন শৈশবের এমন ছবি যেন নিরুপমেরও স্বপ্নের।

একটা অদ্ভুত দুঃখময় মমতা বুকে নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে গেল নিরুপম।

ক'দিন পরে তোতার মা এল। তোতা কথা রেখেছিল। মাকে কিছু বলেনি।

কথা শেষ

বড়বৌ আর নিরুপম আশা করে মেয়েটা একদিন বুঝতে শিখবে, অর্থাৎ মানুষে মানুষে মেলামেশার কপট নিয়মগুলিতে ও অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। ওর ভালো-মন্দ লাগার প্রকাশগুলিকে নিজের অবস্থা বুঝে বল্গা ধরে শাসন করতে শিখবে। কিন্তু হায়, তোতা বদলায় না। দিন যায়, পর পর কয়েকটা মাসও। তবু তোতার কোনো পরিবর্তন নেই। তবে একটা 'প্রয়োজনীয় আপদ' হিসেবে ওকে মেনেও নিয়েছে রায়বাড়ির সবাই। ঝিকে ছাড়ানো হয়েছিল আগেই, ছোকরা চাকরটাকেও ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সম্প্রতি। বাসন মাজা, বাটনা বাঁটা, সেদ্ধ কাপড়ের ডাঁই কাচা— এসব ভারি কাজতো আছেই। তার ওপর অগুণতি ফুটফরমাস। নিরুপম মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবে এত শক্তি, কাজ করার এই আগ্রহ কোথা থেকে পায় ঐটুকু মেয়েটা। সংসারে অন্তত একশো থেকে দেড়শো টাকার সাশ্রয় হয়েছে মেয়েটা

আসায়। হিসেব তোতার মাথার আসে না, যদি আসত তাহলে মোটা মাস-মাইনে দাবি করত ও। নিরুপমের ইচ্ছে করে ওকে বুঝিয়ে বলতে যে ওকে ভীষণভাবে ঠকানো হচ্ছে, বঞ্চনা করা হচ্ছে। কিন্তু কোথায় যেন বাধে। না, পারিবারিক স্বার্থ নিয়ে নিরুপম মাথা ঘামায় না। তোতার টলটলে জলের মতো মনটার মধ্যে সাংসারিক হিসেবী বুদ্ধির আবর্জনা ঢেলে দিতে ইচ্ছে করে না। নিরুপম জানে, তোতা একদিন বুঝবেই, বুঝতে ওকে হবেই। কিন্তু ও নিজে সে কাজটা করতে চায় না। ও তাই স্নেহ থেকে, হয়তো বা কিছুটা অপরাধবোধ থেকেও তোতাকে প্রায়ই এটা ওটা কিনে এনে দেয়, হাতে সময় থাকলে নিয়ে বসে গল্প করে। এবং তোতাকে নিয়ে খিটিমিটি বাধলে সেটা মিটিয়ে দেবার চেষ্টা করে, সামনে না পারলেও আড়ালে ওর পক্ষ সমর্থন করে। এ নিয়ে নিরুপমকে ঠাট্টা করতেও ছাড়ে না মেজোবৌ। তোতা-প্রসঙ্গে নিরুপমের সঙ্গে নেপথ্য আলোচনায় মেজোবৌ তোতার উল্লেখ করে 'তোমার মেয়ে' বলে। নিরুপমও খোঁচা দিতে ছাড়ে না। 'সত্যি মেজোবৌদি, ওরকম একটা মেয়ে আমার থাকলে তোমাদের কাছ থেকে খোরপোষের ওপরেও অন্তত পঞ্চাশ টাকা মাইনে না নিয়ে আমি ছাড়তাম না।' মেজোবৌ আর ঘাঁটায় না নিরুপমকে।

প্রতি সপ্তাহে তোতাকে দেখতে আসার সেই প্রতিশ্রুতি কিন্তু বিধুমুখী রাখতে পারেনি। মাসের প্রথম দিকে ও একবারই আসে। এবং তোতাও শেষ পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই মেনে নিয়েছে।

কিন্তু এক মাসে সাত তারিখ হয়ে যাবার পরও বিধুমুখী এল না। সাধারণতঃ এত দেরি ওর হয় না। মাস তারিখের হিসেব তোতার স্পষ্ট নয়, কিন্তু কেমন করে যেন মা'র আসার সময়টা ওর মোটামুটি খেয়াল থাকে। বড়বৌ আর নিরুপমকে ও বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগল— মা আসতিছে না কেন? ওরা বোঝাল— আসবে, আসবে। এমনি করে আরো চার পাঁচ দিন চলে গেল। তোতা যেন কেমন অস্থির-অসহায় হয়ে উঠছে। নিরুপম ভাবল পরের রবিবার ও তোতাকে নিয়ে যাবে ওর মায়ের কাছে। বড়বৌদির কাছে ঠিকানা আছে। খুঁজে বের করা এমন কিছু শক্ত হবে না।

কিন্তু তার আগেই একটা ঘটনা ঘটল।

মেজোকর্তার অপিসের এক বন্ধু তার বৌ আর মেয়েকে নিয়ে এক সন্ধ্যায় এসেছিল বেড়াতে। গাড়ি চড়ে। মেজোকর্তা নিজে নেমে এসে ওদের অভ্যর্থনা করেছিলেন। তোতাকে দেখে মেজোবৌকে ভদ্রমহিলাটি জিজ্ঞেস করেছিল— মেয়েটা কে ভাই?

— আমাদের বাড়িতে থাকে। কাজ-টাজ করে।

— কি কোঁদলা শরীর ভাই। আর আমার তিন্নিটাকে এত ডাক্তার দেখাচ্ছি, কিন্তু কিছুতেই গায়ে একটু মাংস লাগছে না। ছোটলোকের ঘরে..

বলতে বলতে ওরা সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়েছিল ওপরে। তোতা শুনেছিল। তখন কিছু বলতে পারেনি। ফেরবার সময় যখন ওরা নিচে নেমেছে, তোতা তক্কে তক্কে দাঁড়িয়েছিল দরজার পাশে, হঠাৎ ভদ্রমহিলার সামনে গিয়ে, 'তোমার মাইয়েডারে চামচিকির মতো দেখতি' বলে ঠোঁট বেঁকিয়ে একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করে দুমদুম করে চলে গিয়েছিল একদিকে।

ঠাণ্ডা মাথার রাশভারি মানুষ মেজোকর্তা যা কখনো করেন না তাই করেছিলেন সেদিন, কেন না তিনি ভীষণ অপমানিত বোধ করেছিলেন। সস্ত্রীক সকন্যা বন্ধু চলে যাবার পর তোতাকে ডেকে আনিয়ে, মাত্রাতিরিক্ত জোর না দিয়ে ওর দু'গালে দুটি চড় মেরে বলেছিলেন, 'আর কখনো এ রকম করলে এ বাড়িতে তোমার থাকা হবে না।' এ সব ক্ষেত্রে তোতা সাধারণতঃ নীরবে মার খায় না। হাত না চালালেও মুখ চালাতে কসুর করে না। কিন্তু মেজোকর্তার কাছে চড় খেয়ে ও নিঃশব্দে চলে গেল নিরুপমের ঘরে।

নিরুপম কাগজের ওপর কিছু একটা মক্‌সো করছিল। তোতাকে দেখে বলল— কি রে? কি হয়েছে? চোখে জল কেন?

— মেজোমামা আমারে মারিছে।

— কেন?

— এড্ডা মাইয়েলোক আসিছিল। ঐডা আমারে কোঁদলা বলিছিল, ত আমি বলিছিলাম অর মাইয়েডারে চামচিকির মতো দেখতি। তাইতে মারিছে মেজোমামা।

কষ্টে হাসি চেপে নিরুপম বলল— তোকে নিয়ে যে কি করি...। কাঁদিসনে, কাল দুটো গরম আলুর চপ এনে দেব।

— না। ছোডমামা, তুমি আমারে বিয়ি কর।

আকাশ থেকে পড়ল নিরুপম— দূর বোকা... তা বিয়ে করলে কি হবে?

— কেউ ত্যাখন আমারে গাল দিতি পারবে না, মারতি পারবে না।

— বুঝলাম। কিন্তু বোকা মেয়ে, মামাকে কেউ বিয়ে করে?

— তা ঠিক। মামাতো বাবার মতো।

— তুই বড় হলে খুব ভালো জায়গায় আমি তোর বিয়ে দেব।

সেই রাত্রে তোতা পালাল। আরণ্যক প্রাণীর সহজাত শক্তির মতো হয়তো ওর স্মৃতির মধ্যে পথের নিশানাগুলি ধরা ছিল। নইলে নিশুত রাতের অন্ধকারে দশ-বার মাইল পথ পেরিয়ে প্রায় শেষ রাত্রে বিধুর দরজায় ও ধাক্কা দিল কি করে?

লম্ফ জ্বালিযে দরজা খুলে মেয়েকে দেখে চমকে উঠল বিধু।— তুই! এই রাত্তিরি?

— তুমি আমারে দেখতি যাওনা, আমি চলি আলাম।

— একলা? একলা এই রাত্তিরি চলি আলি তুই?

— আলাম। আর ফিরি যাব না আমি।

— তোতারে, তোরে আমি খেতি দেব কি? বেজাডারে বড় খারাপ রোগে ধরিছে রে, তোতা... তুইও চলি আলি... কেমন করি চালাব...

— তোমার কাচে আমারে থাকতি দিতি চাও না।

— চাই, চাইরে মা, বিধু হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে, কিন্তুক পারি না...। তোতাকে কোলে টেনে নেয় বিধু।

অনেকক্ষণ চুপ করে মায়ের কোলে বসে থাকে তোতা, তারপর বলে — তুমি কাঁদোনি মা, আমি আর একা একা আসপ না।

— তুই রাত্তিরি একা চলি আলি, তোরে ওরা আর রাখপে না।

তোতা কপাল কুঁচকে ভাবে, অনেকক্ষণ ভাবে, তারপর বলে— রাখপে, ওরা নিচ্চয় আমারে রাখপে। মা, এরপর তুমি যখন যাবা বলবা আমার মাইনে বাড়ায়ে দিতি। হাঁ, ঠিক বলবা।

আধ-অন্ধকারে মেয়ের মুখের পানে তাকিয়ে কি যেন খোঁজে বিধু। কি যেন হারিয়ে গেল তার... আজ... এখনই।

অনাগত

কার্তিক লাহিড়ী

নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর থেকেই উত্তাপ ক্রমশ চড়তে থাকে।

নির্বাচন-কুশলী দল সেই আঁচ পেয়ে তার আগেই নিজেদের প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারটা চূড়ান্ত করে নেয়, তারপর নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে, এবং মুহূর্তমাত্র নষ্ট না করে নেমে পড়ে প্রচার কাজে।

কিন্তু নির্বাচন-কুশলী হয়েও কোনো কোনো দল অন্তর্দলীয় কোঁদলে এমন ব্যতিব্যস্ত ও ছিন্নভিন্ন থাকে যে প্রার্থীদের নাম প্রত্যাহারের শেষ দিন পর্যন্ত জানা যায় না— ঐ দলের প্রার্থী কে হবে। বিবৃতি পাল্টা-বিবৃতি তো আছেই। উপরন্তু নিজেদের মধ্যে মারামারি খেয়োখেয়ি চলতে থাকে শেষ দিন পর্যন্ত। তবু দেয়াল দখলের লড়াইয়ে এসব দল পিছিয়ে থাকে না।

দেয়াল দখল নিয়ে ছোট থেকে মাঝারি ধরনের সংঘর্ষ হয়। কখনো-সখনো পুলিশকে মৃদু লাঠি চালনা করতে হয়, অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে যুযুধান পক্ষ ও পুলিশের মধ্যে বৈঠক বসে— দেয়াল অধিকারের নিয়ম নীতি নিয়ে, কিন্তু সব পক্ষই জানে দেয়ালে আগে থেকে 'অলওয়াল' লিখে একটা বিরাট তীর চিহ্ন দিয়ে তীরের আগায় দলের নাম ও বছরের ছাপ মেরে দিলে সেই দেয়াল তাদেরই থাকে। হাতছাড়া হয় না।

ফলে এ সময় এ ব্যাপারে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। দুর্বলপক্ষ পুলিশের সাহায্য বহুবার চাইলে আইন শৃঙ্খলার অবনতির প্রচণ্ড আশঙ্কা থাকলে কিংবা শাসক পক্ষ ইঙ্গিত দিলে তবে পুলিশ সমেত ত্রি বা বহুপক্ষীয় বৈঠক বসে।

দেয়াল দখল ও দখলের পর অনেক ছেলের দরকার হয়, যেমন— দেয়াল ঘষে ঘষে পরিষ্কার করা, চুনকাম করা, লেখার সময় যাতে বিপক্ষ দল হামলা না করতে পার তারজন্য কাছে দূরে পাহারায় থাকা ইত্যাদি। হয়ত অনেক সময় লেখার জন্য বাঁশের মাচাও তৈরি করে নিতে হয় নর্দমার উপর। কিছুদিন আগে পর্যন্ত দেয়াল লেখার ছিরি ছাঁদ খুব নিচু মানের ছিল। বানান ভুল তো ছিলই উপরন্তু; কিন্তু এখন বানান ভুলের হার অনেক কম, লেখাগুলো নয়ন-বিকর্ষক তো হয়-ই না। বরং সময় সময় লেখার গুণে রঙের ব্যবহারে পথচারী চলতে চলতে থেমে পড়তে বাধ্য হয়।

এরপর শুরু হয় স্কোয়াডিং। পাঁচ-ছ জন ছেলের ছোট্ট একটি দল, পোস্টার নিয়ে বা না নিয়ে শ্লোগান দিতে দিতে পথ পরিক্রমা মাত্র।

এরপর অবশ্য স্কোয়াডিং-এ লোক সংখ্যা বাড়তে থাকে, তখন ঐ দলটি নির্দিষ্ট এলাকা পরিক্রমা করে, তারপর পরিক্রমার পরিধি বাড়ে। তখন আরও লোক অংশ নিলে একটা ছোটখাটো মিছিলের মত হয়।

কিন্তু তখনও বক্তৃতার কোনও ব্যবস্থা করা হয় না, হয়ত জমায়েতের শুরুতে কিংবা শেষ হওয়ার মুখে স্থানীয় নেতা আগামীকালের করণীয় সম্পর্কে কিছু বলেন মাত্র।

স্কোয়াডিং থেকে ছোট্ট মিছিল— এতে আস্তে আস্তে 'ইলেকশন্ টেম্পো' উঠতে থাকে, ততদিনে দেয়াল লেখার পালা প্রায় শেষ হয়ে যায়, শুরু হয় এ লাইটপোস্ট থেকে সে-পোস্টে, টেলিফোনের এক থাম থেকে আর এক থামে দলীয় প্রতীক চিহ্ন পতাকা ও মধ্যে মধ্যে প্রার্থীর নাম সুতলিতে গেঁথে গেঁথে লটকানোর পালা।

এর সমান্তরালে চলতে থাকে চাঁদা তোলা, 'ভোটার লিস্ট' থেকে শ্লিপে নাম তোলা ও বিলি করার কাজ। অবশ্য অনেক দল এমন সুশৃঙ্খল ভাবে কাজ করতে পারে না। যে দলে অন্তঃকোঁদল প্রচণ্ড সেখানে একজন এই করলে দ্বিতীয় জন তাতে শুধু বাগড়াই দেয় না, তা বানচাল করে দিতে চায়, ফলে ঐ দলের কাজ এই পর্যায়ে ঠিক মত চলে না।

এখনও পর্যন্ত অবশ্য কোন পক্ষই বক্তৃতার পাট শুরু করে না। প্রতি দলেব কিছু কিছু বাছাই করা বক্তা আছেন। নির্বাচনের সময় তাদের বিশেষ দরকার পড়ে। সাধারণভাবে রাজ্যের রাজধানী কিংবা কোন জেলার সদর শহরে প্রথমে কেন্দ্রীয় সমাবেশের আযোজন করা হয়। দূর-দূরান্ত থেকে ট্রাক-লরি-জীপ-বাস ইত্যাদি চেপে মানুষ আসে দলীয পতাকায শোভিত হয়ে, এবং ঐ উপলক্ষে প্রতি দলই তার যথাসাধ্য বা সাধ্যাতীত চেষ্টা করে বিরাট জনসমাগমের জন্য, যেন যে দল যত বড় সভা করবে, তার জয় তত নিশ্চিত।

সমাবেশ উপলক্ষে প্রধান শহরে প্রচুর উত্তেজনার সৃষ্টি হয় দলীয় কর্মী ও সমর্থকদেব মধ্যে। বিরাট মিছিল শহরের প্রধান প্রধান বাস্তা পরিক্রমা করে। রাস্তায় তোরণ বানানো হয়। আর পোস্টার পতাকা প্রতীক ইত্যাদিতে মুড়ে ফেলা হয় শহর। কখনো সখনো সাংস্কৃতিক দল মিছিলের আগে থেকে উদ্দীপ্ত সংগীত পরিবেশন করে থাকে। অবশেষে মিছিল শেষ হয় সভা প্রাঙ্গণে, সেখানে দারুণ মঞ্চ তৈরি করা হয়— মাইক, জল, ভলিণ্টিয়ার ইত্যাদিব এলাহি ব্যবস্থা থাকে এবং উত্তোলিত হাত ও শ্লোগান যেন ঐ মুহূর্তে অংশগ্রহণকারীব ইচ্ছা পূরণ করে দেবে— এমন মনে হয়। মানুষের জোয়ারে ময়দান উপচে ওঠে। মাইকে ভাসতে থাকে নানা ঘোষণা।

আর শ্রোতৃমণ্ডলীর বৃহদাংশ অপেক্ষা করে থাকে— কাগজে পোস্টাবে মাইকে প্রচারিত বক্তার বক্তৃতা শোনার জন্য; ঘোষণা হয়— আমরা দুঃখিত। তিনি এখুনি এসে পডবেন, আপনাবা শান্ত হোন... ইত্যাদি।

তারপর ঘেমে নেয়ে ক্লান্তি বিরক্তি যখন একেবারে চূড়ান্ত সীমায় ফেটে পড়াব মুহূর্তে পৌঁছয়, তখন দারুণ গুমোটের পব এক পশলা বৃষ্টির মত আরামদায়ক ঘোষণা হয়— তিনি এসে পড়েছেন, আমাদের সভা এখুনি শুরু হচ্ছে।

মাইকের স্বর ভেসে ছড়িয়ে পড়ে।

তারপর অসংখ্য হাততালি ও শ্লোগান হলে বোঝা যায়— আসল ব্যক্তিটিকে দেখা গেছে, এবং তিনি এবার সামনে আসছেন ..

প্রতিবারের মত এবারও অ-দলই প্রথম কেন্দ্রীয় সমাবেশের আয়োজন করে। বিরাট মিছিল বের হয়; রাস্তাঘাট অলিগলি তোরণে তোরণে মালায় পতাকায প্রতীক চিহ্নে প্রার্থীর নামে একটা অন্য শহর হয়ে ওঠে যেন। রাজ্যের এ-প্রান্ত থেকে সে-প্রান্ত কাছে দূরে গ্রাম-গঞ্জ অন্যান্য শহর ও শহরতলী থেকে অভূতপূর্ব জনসমাগম হয়, তখন রাজধানীর চেহারা দেখে যে-কেউ ধারণা করে নেবে— অ-দলই এবার ক্ষমতায় আসবে, কারুর ক্ষমতা নেই এই অগ্রগতি রোধ করার।

এবং যথারীতি অনেক অপেক্ষা ঘাম ক্লান্তি ইত্যাদির পর প্রধান বক্তা রামকিংকর স্বভাবসিদ্ধ হাসি মুখে এসে দাঁড়ান মাইকের সামনে। দারুণ ধ্বনি ওঠে আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে।

রামকিংকরের হাসি প্রসারিত হয়। তিনি হাত তুলে সকলকে শান্ত ও চুপ হতে ইঙ্গিত করেন, এতে আরও ধ্বনি ওঠে, রামকিংকর বিজয়ীর মত দেখতে থাকেন সিংহাসন থেকে।

তারপর শুরু করেন বক্তৃতা।

আমাদের জানতে হবে আমাদের প্রধান সমস্যাটি কি। তারপর ... মাইকের আওয়াজ তাঁর কানে এসে গমগম করতে থাকে, তিনি বুঝলেন— মাইক ঠিক কাজ করছে, এবং তিনি কখনো গলা চড়িয়ে কখনো নামিয়ে কখনো অতিনাটকীয় ভাবে শূন্যে হাত ছুঁড়ে দিয়ে বক্তৃতা করে চলেন অনর্গল।

ভীষণ হাততালি হয়, সভা গর্জে ওঠে দারুণ।

বক্তৃতা শেষ হলে অনেকে ছুটে আসে তাঁকে অভিনন্দন জানাতে। দলের ছোট বড় মাঝারি সকলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তাঁর বক্তৃতার এবং এ ধরনের বক্তৃতা এবারের নির্বাচনের পক্ষে যে অতি জরুরি ছিল তা জানাতে সদস্যরা ভোলে না।

দলের লোকের মুখে মুখে ঘুরতে থাকে রামকিংকরের বক্তৃতা।

এরপর শুরু হতে থাকে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সমাবেশ ও বক্তৃতা। নির্বাচনী যুদ্ধে সভা ও বক্তৃতা একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা জুড়ে থাকে। প্রথমে পাড়ায় তারপর ওয়ার্ডে, তারপর কিংবা সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে গঞ্জে চলে মিটিং। এইসব মিটিঙে স্থানীয় নেতারা বক্তৃতা দিয়ে থাকেন, কিন্তু এলাকার অধিবাসীরা চায় রাজধানী ও জেলাশহর থেকে নেতৃস্থানীয় কাউকে পেতে, তাই রাজ্যের বড় বড় নেতাকেও আসতে হয় এইসব জনসভায়। স্থানীয় অধিবাসীদের অভিমান প্রচণ্ড। তাই আসার অনিচ্ছা থাকলেও করার কিছু উপায় থাকে না।

রামকিংকর ব্যস্ত বক্তা, এবং দলের মধ্যে জনপ্রিয়ও বটে, সেজন্য সকলে তাঁকে চায়, তিনি অবশ্য এতে খুশিই হন। কেন না এতে এক ঢিলে অনেক পাখি মারা যায়। উপরন্তু দলের মধ্যে উপরের দিকে ওঠার পথটি সুগম হয়। তবু জনপ্রিয়তার হেপাও কম নয়। চরকির মত কেবল ঘুরতে হয়, তবে তাঁকে বেশির ভাগ সময় বড় বড় শহর নিদেনপক্ষে একটি-দু'টি মহকুমা শহর পর্যন্ত যেতে হয়। কোন কোন সময় গ্রামে গঞ্জে যেতে হলেও, সেই গ্রামগঞ্জ বড় রাস্তার ধারেই অবস্থিত থাকে এবং তিনি মিটিং সেরেই ফিরে আসেন কাছের বড় শহরে।

রামকিংকর এই প্রদেশের মানুষ নন, তবে তিনি প্রদেশের সন্নিহিত অঞ্চলে কাজ করতেন এবং এখানকার অনেকের সঙ্গে জানাশোনা থাকায় দলের কর্তৃপক্ষ তাঁকে এ-অঞ্চল সম্পর্কে অভিজ্ঞ লোক বলে ধরে নেন। বিশেষ করে কাগজে তিনি এই প্রদেশ সম্পর্কে দু-চারটি রিপোর্ট লেখার জন্যই দল তাঁকে এ-অঞ্চলের প্রাদেশিক কমিটির পরামর্শদাতা হিসেবে নিযুক্ত করে। সেই সুবাদে রামকিংকর এখানে বছরে অন্তত দু-তিনবার এসে থাকেন, তবে তিনি রাজধানী, রাজধানীর বুকে অবস্থিত প্রদেশের কেন্দ্রীয় অফিস এবং যে নেতার বাড়িতে ওঠেন— এ তিন জায়গা ছাড়া তাঁকে আর কোথাও বিশেষ যেতে হয় না, কেবল গত উপনির্বাচনের সময় তিনি মহকুমা সদৃশ দু-টি শহরে বক্তৃতা দেন এবং সেদিনই ফিরে আসেন রাজধানীতে।

রামকিংকর এ-অঞ্চল সম্বন্ধে অভিজ্ঞ— প্রাদেশিক নেতারা তা খুব বিশ্বাস করেন, এবং রামকিংকর কম কথা বলে, সামান্য হেসে, অন্যের কথা ধৈর্য ধরে শুনে ও স্থানীয় পত্রপত্রিকা পড়ে ঐ জানার ভাবটি বেশ বজায় রাখেন। রামকিংকর বিলক্ষণ জানেন এক প্রদেশের বাসিন্দা হয়ে অন্য প্রদেশের দলের তত্ত্বাবধায়ক ও পরামর্শদাতা হওয়া তা-বড় অনেক নেতার ভাগ্যে ঘটে না, তাই প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দকে খুশি রাখেন তাঁদের কাজকর্মে হস্তক্ষেপ না করে, এমন ধারাটি বজায় রাখতে পারলে তিনি জানেন— অচিরেই তাহলে তিনি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হতে পারবেন।

তবু এহেন রামকিংকর এবারের সফরসূচী দেখে মনে মনে ঈষৎ বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হন। যদিও মুখের হাসিটি ম্লান হতে দেন না। শুধু একবার 'আমাকে এতদিন আটকে রাখবেন' বলাতে নির্বাচনের ভারপ্রাপ্ত নেতা 'আপনাকে ছাড়া চলবে না, কে আর পারবে বলুন?' বললে বেশ শ্লাঘা বোধ হয়; তবু সফরসূচী জেলার সদর ও মহকুমা শহর ছাড়া আর দু-একটি অ-চেনা নাম দেখে (বস্তুত কয়েকটি শহরের নাম ছাড়া সবই তাঁর অজানা) মনে মনে তেমন শান্ত থাকতে পারেন না, কারণ ইদানীং প্রদেশের কিছু কিছু প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে কিছু অশান্তির খবর তার কানে আসছিল, কিন্তু এখন কিভাবে জিজ্ঞেস করা যায় এ-সব কথা। জিজ্ঞেস করার মানেই হচ্ছে ভয়-পাওয়ার বিষয়টি প্রকাশ পেয়ে যাওয়া, আর রামকিংকর জানেন— যতই ভয় থাক না কেন, নিজের দুর্বলতা গোপন করাই হচ্ছে সাফল্যের চাবিকাঠি।

তাই মনে মনে বিঘ্নিত হলেও তিনি হেসে তাঁর মৃদু আপত্তি যাতে অন্যের মনে কোন সংশয় তুলতে না পারে— তার পথ মেরে দেন। বাহ্যিকভাবে আগের চেয়ে নিজেকে বেশি হাসি খুশি দেখাতে থাকলেন, যেন স্থানীয়রা মনে করে— তিনি আগের চেয়ে আরও নির্ভীক ও দৃঢ় হয়েছেন, আর এদের সম্ভ্রম-শ্রদ্ধা বেড়েছে দেখে তিনি খুব খুশি হন মনে মনে।

রাজধানীর বাইরে ১ নং জেলার ক-শহরের প্রকাশ্য জনসভা থেকে রামকিংকরের প্রদেশব্যাপী নির্বাচনী বক্তৃতা শুরু হয়। যদিও আদতে রাজধানীর কেন্দ্রীয় সমাবেশের বক্তৃতাই হচ্ছে প্রথম প্রকাশ্য নির্বাচনী বক্তৃতা। তবু রাজধানী বাদে প্রথম সভাটিকে স্থানীয় অধিবাসীরা প্রথম নির্বাচনী সভা ভাবতে ভালোবাসে এবং তা এখানকার দস্তুরও বটে, বোধহয় মফস্বল শহরে বক্তৃতার ধরন-ধারণ একটু আলাদা বা এইসব সভায় প্রদেশের আসল সমস্যা বা অভাব ইত্যাদি বক্তৃতায় ঠাঁই পায় বলে হয়ত এমন মনে হতে পারে, কিংবা বক্তৃতা শেষে রামকিংকর শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছ থেকে প্রশ্ন আহ্বান করেন এবং প্রশ্ন করলে তার উপযুক্ত জবাব দেন বলে একটা হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। যা রাজধানীর সভায় কোন কারণে সম্ভব হয়ে ওঠে না। যাইহোক ক-শহরেই তিনি প্রথম ঠিকমত সভা করলেন নির্বাচন উপলক্ষে।

এবার খুব রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠেছে, তাই সফরসূচী দেখে প্রথমে যেটুকু বিরক্ত হয়েছিলেন এখন দলের কর্মী, সমর্থক ও মানুষজনের অভিনন্দন পেয়ে তার সবটুকু একেবারে উবে যায়, তিনি একটু বেশি কথাই বলে ফেলেন সকলেব সঙ্গে।

এই আনন্দের রেশ নিয়ে রামকিংকর আসেন খ-শহরে। তারপর ২ নং জেলার চ, ছ, ও জ শহরে। এবার দলের বন্দোবস্ত বেশ চমৎকার; তাঁর থাকা-খাওয়া যাওয়ার ব্যবস্থা যতদূর সাধ্য স্বচ্ছন্দ করা যায়। সময় সময় মনে হয় এরা তার চেয়েও বেশি করেছে। সভার মঞ্চ, মাইকের ব্যবস্থা, শ্রোতাদের বসবার ও দাঁড়াবার জায়গা, শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ভলিন্টিয়ারের আধিক্য, ইত্যাদি সব দিক থেকে প্রাদেশিক সংগঠন কেবল দক্ষই হয়ে ওঠে নি, তা খুব শক্তিশালী দৃঢ় এবং সমস্ত রকম পাল্টা আঘাত প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখে বলে— তাঁর মনে হয়। এতে আরও খুশি হন তিনি, কারণ এখানকার সংগঠন মজবুত হলে তাঁর কৃতিত্ব সম্পর্কে সকলে বিশেষ করে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কোন সংশয় থাকবে না। আর তাহলে ঐ সর্বোচ্চ সংস্থায় তাঁর আসন পেতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। তাই তিনি এখন একটু বেশি প্রগলভ-ই হয়ে পড়েন।

কিন্তু চ ও ছ শহরে বিশেষ করে ২ নং জেলার ছ-শহরের প্রকাশ্য জনসভায় গিয়ে টের পান— জমায়েতের এক-অংশ তেমন উৎসাহ-ব্যঞ্জক সাড়া দিচ্ছে না; তিনি বার বার তাদের উৎসাহিত করার জন্য; বক্তৃতায় সক্রিয়ভাবে সাড়া ও অংশ নেবার জন্য আপ্রাণ

চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাতে কোন ফলই হয় না। অবাক হন মনে মনে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কাকেই বা জিজ্ঞেস করবেন। জিজ্ঞেস করার মানে নিজের অক্ষমতার কথা প্রকাশ করা। তাই তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এ-অঞ্চলের হাল-চাল, সংগঠন ইত্যাদির কথা বিশদভাবে জানতে থাকেন। কিন্তু তার থেকে কিছুতেই ঐ নগণ্য অংশের উপেক্ষা করার কারণটি বের করে আনতে পারেন না। বরং কর্মীরা তাঁকে একথা বার-বার বোঝায় যে— তাঁর বক্তৃতায় আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে খুশি এবং এরকম বক্তৃতা এখানে আর কোনদিনই কেউ দেয় নি এবং আজ পর্যন্ত কেউ শোনেও নি।

রামকিংকর হাসেন, কিন্তু এই প্রথম এত প্রশংসা শুনেও হাসি ঠিক জমে না, তিনি ভাবতে চাইলেন— আসল ব্যাপার তা নয়, অন্য কিছু, এবং তিনি মিছিমিছি ভাবছেন। সব শ্রোতার প্রতিক্রিয়া একরকম হয় না..., তবু মন মানতে চায় না, ভেতরে ভেতরে তিনি শঙ্কাকুল হয়ে উঠছেন।

অবশ্য কর্মী ও নেতাদের উষ্ণ সম্ভাষণ আদর যত্ন অচিরে তাঁর দ্বিধা সংশয় দূর করে দেয়; তিনি নিয়মভঙ্গ করে নির্ধারিত ঘরোয়া বৈঠকের বাইরে আরও একটা বৈঠকের আয়োজন করতে বলেন, যাতে দলের বাইরের লোকজন উপস্থিত থাকার উপর জোর দেন। তিনি তাদের সঙ্গে কথা বলে দুশ্চিন্তা মুক্ত হতে চান। কিন্তু এদের সঙ্গে কথা বলেও এক অংশের উপেক্ষার কারণ বের করতে পারেন না।

২ নং জেলা সফর শেষ করে রামকিংকর আবার রাজধানী ফিরে আসেন। দলের সদস্য ও কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। এবং তখন পর্যন্ত নির্বাচনের কাজ যা যা হয়েছে তার বিস্তারিত রিপোর্ট নেন, এবং নিজের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন। বাদ থাকে কেবল সামান্য এক অংশের সাড়া না-দেবার ব্যাপারটি। সমস্ত বলা ও শোনার পর সকলে একমত হন যে, এবার দলের অবস্থা খুব ভালো, এবং কোনও দারুণ দুর্ঘটনা বা বিপর্যয় না ঘটলে দলের ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল...

ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনায় রামকিংকর প্রচণ্ড উদ্বুদ্ধ বোধ করতে থাকেন। তিনি মানসচক্ষে দলের ক্ষমতাসীন হওয়া, সমস্ত বৈষম্যের দূরীকরণ, আইনশৃঙ্খলার সুদৃঢ় প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি দেখে ফেলেন ও সেই স্বপ্নে বিভোর হয়ে নির্বাচনী সফরের শেষ পর্যায় ৩ নং জেলার বিভিন্ন এলাকায় বক্তৃতা দেবার উদ্দেশ্যে বের হন।

অবস্থা পর্যালোচনা করে প্রাদেশিক কমিটি যে বিবৃতি প্রচার করে— তাতে দলের কর্মী, সমর্থক— সকলের মনে এক অভূতপূর্ব উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, কর্মীরা দিন-রাত প্রাণ ঢেলে নির্বাচনী কাজে নেমে পড়েন, যেন এতটুকু শৈথিল্যে সব ভরাডুবি হয়ে যাবে।

রামকিংকর খুবই পুলকিত দলের সকলস্তরে এমন সাড়া জাগায়, তিনি নব উদ্যমে শেষ পর্যায়ের সফর শুরু করছেন। আরও আবেগ ও প্রাণ ঢেলে বক্তৃতা করতে হবে— তার জল্পনা কল্পনা করতে থাকেন জীপে যেতে যেতে। ৩ নং জেলার প-শহরে মিটিং বেশ জাঁকিয়েই হয়, যেমন লোকসমাগম, তেমনি সুবন্দোবস্ত।

রামকিংকর বক্তৃতা দিতে দিতে ভাবেন— এমন কয়েকটা মিটিং করতে পারলে ভারতের চেহারা পাল্টে দিয়ে যেতো, তিনি উপস্থিত সাধারণের সক্রিয় প্রতিক্রিয়ায কেবল উৎসাহিতই হন না দারুণ অভিভূত হয়ে বলেই ফেলেন— আমরা ক্ষমতায় এলে আপনাদের প-শহরকে আদর্শ শহর হিসেবে গড়ে তুলবো।

এই ঘোষণার পর সে কি আনন্দ উত্তেজনা। হাততালি, পটকাবাজি, আতসবাজি পোড়ানো... কত ধুম। রামকিংকরের এতদিনের স্বপ্ন সার্থক ও সফল হতে চলেছে— এ বিষয়ে নিশ্চিত হলেন।

সুখের সেই রেশ নিয়ে আসেন ফ-শহরে। আয়োজন ব্যবস্থার ত্রুটি নেই। সাজ-সজ্জা অতি মনোরম। ঘনঘন শ্লোগান উঠছে, মাইকে লাউডস্পীকারে ছড়িয়ে পড়ছে দিক দিগন্তে, রামকিংকর হৃষ্টমনে এসে দাঁড়ালেন মাইকের সামনে, তাঁর নামে জয়ধ্বনি হল, তিনি মাইকটি পরীক্ষা করে নিলেন।

আমাদের এমন সমাজ গড়ে তুলতে হবে... মাইকের গলা বেশ স্পষ্ট আসছে। তিনি পুবদিকে চাইলেন— শ্রোতারা উদ্‌গ্রীব। পশ্চিম দিকেও তাই। কিন্তু ঈশান কোণে যে জনতা— তাদের চোখমুখের ভাষা পড়তে পারছেন না, তারা নত মুখ এবং যেন চিন্তিত।

তাঁর বুক ছ্যাঁৎ করে ওঠে, তবে কি ২ নং জেলার সেই শহরের ব্যাপাব ঘটতে চলেছে। কিন্তু সেখানে ছিল জমায়েত মানুষের তুলনায় অতি নগণ্য এক অংশ। এখানে তাদের সংখ্যা, তিনি দেখতে চেষ্টা করেন, এবং ঐ সংখ্যা অধিক মনে হওয়ায় বুক কাঁপতে থাকে। তবু তিনি ওদের মন জয় করতে চেষ্টা করেন— স্বর উচ্চগ্রামে তুলেই নামিয়ে নেন, চুটকি গল্প ছেড়ে হাসাতে চেষ্টা করেন, কিন্তু নাহ্— সব চেষ্টা ব্যর্থ হতে চলেছে, অথচ চারপাশে সকলে তাঁকে দারুণভাবে নিচ্ছে, কিন্তু এরা!

মুখের হাসি অম্লান বাখতে সচেষ্ট হন, তবু কোথা থেকে একটা ছোট্ট কালো মেঘ যেন উঠে আসতে চায়। বক্তৃতার শেষে তাই জন-সংযোগী প্রশ্নোত্তর তেমন জমে না।

তিনি ঠিক মত খেতে পারেন না। সকলে ব্যস্ত হয়ে উঠবে। তারা নানাভাবে তাদেব প্রিয় নেতা ও বক্তাকে খুশি করতে চায়, কিন্তু নাহ্! আশঙ্কাটা বড় হয়ে উঠছে।

একবার ভাবলেন— ঙ-এর শেষ নির্বাচনী সভা বাতিল করে দেবেন অসুস্থতাব অজুহাতে। একটু থমকান অবশ্য, যখন আবার ভাবেন— যে-কোনও অজুহাতে সভা বাতিল করে দেয়া তাঁর পক্ষে কঠিন কাজ নয়, কেবল মুখ থেকে কথা খসলেই হয, কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নিলে অনেকগুলো অসুবিধে দেখা দেবে নিঃসন্দেহে। প্রথম কথা— ঙ-এব মানুব বহুদিন প্রতীক্ষা করে আছে, দ্বিতীয় কথা— ঐ আসনটিতে দলের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি দাঁড়িয়েছেন, তাঁর জয়কে অনিবার্য করা দরকাব। কেননা তিনি তাঁব কথায় ওঠেন বসেন, তৃতীয় কথা— নিজেকে তিনি কি বলে প্রবোধ দেবেন, এ যে হার মানারও অধম কাণ্ড।

তিনি দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে দিতে চেষ্টা করবেন, কিন্তু বার-বাব বুকে এসে বিঁধতে থাকে ওদের ঐ উপেক্ষা-দৃষ্টি, তিনি কাকে জিজ্ঞেস করবেন, সকলেই তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে গেছে— ঙ-য় যাওয়ার জন্য প্রণোদিত করেছে; সেখানে যেতেই হবে কারণ সেখানে হচ্ছে মর্যাদার লড়াই; আর তাঁর মত বক্তার-ই সেখানে সব চেয়ে বেশি দরকাব, কেননা তিনি কঠিন ও জটিল সমস্যাকে অতি সহজ সরলভাবে বুঝিয়ে দেন।

বামকিংকর এতে শ্লাঘা বোধ করবেন, তবু দ্বিধা কাটে না, শেষে তার সব ভালো যার শেষ ভালো ভেবে নিয়ে এ যাত্রার শেষ নির্বাচনী সভায় যাবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন।

ঙ-৩নং জেলার বেশ ভেতরে অবস্থিত একটি মাঝারি ধরনের ব্যবসাকেন্দ্র। রাজধানী থেকে যে জাতীয় সড়ক ৩নং র-শহর পর্যন্ত বিস্তৃত, সেই সড়কের বিরাশি কিলোমিটারের বাঁকে একটি কাঁচা-পাকা রাস্তা নেমে গেছে ডান দিকে। এই রাস্তা চওড়া মোটেই নয়, একটা জীপ কোনমতে যেতে পারে, আর সাংঘাতিক ঝাঁকুনি সহ্য করে ছোট ছোট টিলার গা ঘেঁষে কখনো বা পাঁচ-ছ শ' ফুট খাদের পাশ দিয়ে। দু-তিনটে ছড়ার বুকের উপর দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে প্রায় ঘণ্টা আড়াই চলার পর তবে পৌঁছে যাওয়া যায় ঙ—য়, তখন বেশ আরাম লাগে।

আর এখানে মিটিং-এর জায়গাটি অতি মনোরম, তিনদিকে উঁচু টিলা, মধ্যের জায়গাটি সমতল এবং তা এসে মিশে গেছে একটা বড় ছড়ার বুকের সঙ্গে, স্থানীয় বাসিন্দারা ছড়াটিকে আদর ভরে নাম দিয়েছে কুতুই (মিষ্টি) ছড়া। ছড়াটিকে (ছড়া = ঝর্না, ছোট পাহাড়ী নদী) পেছনে রেখে বেশ উঁচু মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে, শ্রোতাদের বসার দাঁড়াবার জায়গায় মধ্যে মধ্যে আড়াআড়ি বাঁশের মাথায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে লাউড-স্পীকার, আর এক বাঁশ থেকে অন্য বাঁশে সুতলিতে গেঁথে টাঙানো হয়েছে পতাকা প্রার্থীর নাম ইত্যাদি।

আস্তে আস্তে লোক আসতে শুরু হয়, রামকিংকর ব্যস্ত হতে থাকেন। কারণ ঘোষিত সময়ের প্রায় দু-ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে গেছে, বার বার তাড়া লাগাচ্ছেন, যদিও এখন তিনি কর্মী সদস্য ইত্যাদি পরিবৃত হয়ে আছেন।

আরও কিছুক্ষণ কাটার পর তাঁকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়। রামকিংকর সভার জায়গায় এসে খুব মুগ্ধ হলেন— প্রথমত স্থানটির প্রাকৃতিক পরিবেশে। দ্বিতীয়ত সমাগত মানুষজনের সুশৃঙ্খলতায়। ভলিন্টিয়াররা বেশ তৎপর। মাইকে ঘোষণা চলছে। তিনি আসতে গোটা দশবারো ছেলে এসে মাইকে দাঁড়িয়ে ধ্বনি দিতে থাকে, সভা প্রাঙ্গণ গম গম করছে শব্দে, লোকজনের নীরব আনাগোনায় রামকিংকব একবার ভালো করে চারদিক দেখতে চেষ্টা করেন, তাঁর বুক হঠাৎ কেন যে ঢিপ ঢিপ করে ওঠে বুঝতে পারেন না, তবে কি ঐ টিলার উপর বনের মধ্য থেকে ঝিঁঝির ডাক মধ্যে মধ্যে সব ছাপিয়ে উঠে আসছে বলে?

ভয় করছে কেন, তা ঠিক ধরতে পারছেন না। চারদিকেই তো দলেরই লোকজন আছে, যারা শুনতে এসেছে তাদের প্রায় সকলেই দলের সমর্থক কিংবা কাছের লোক, তাহলে...

তিনি গলা খাঁকরে সহজ হতে চাইছেন, ততক্ষণে প্রাদেশিক নেতা প্রার্থীকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন কাঁসার মত খন-খনে গলায়, প্রার্থী নবীন বরের মত লজ্জায় লাল হয়ে চারদিকে নমস্কাব কবতে থাকে। ভলিন্টিযার-রা জোর শ্লোগান দেয।

বামকিংকর মনে মনে অস্থির হয়ে ওঠেন— ঐ ঘটনা কি আবার ঘটবে! তিনি দেখলেন— শ্রোতাদেব স্থান পূর্ণ হয়ে গেছে, ব্যাজ পরা যুবক এপাশে ওপাশে এবং মধ্যিখানে, তাদের চোখ মুখ খুশিতে জ্বলজ্বল।

বামকিংকব মাইকের সামনে দাঁড়াতে প্রচণ্ড হাততালি হয়, এবং যুবকরা মাইক থেকে শ্লোগান দিতে থাকে। তিনি কেশে গলা সাফ্ করতে বুঝলেন মাইকে গলা ভালো আসবে, কয়েক মুহূর্ত দেখে নিয়েই শুরু করে দেন— আমাদের দেশকে সুজলা সুফলা করতে হলে—

এক ঝোঁকে কিছু বলার পর তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রতিক্রিয়া বুঝতে চাইলেন। এতদিন বক্তৃতা দিতে দিতে শ্রোতাদের দিকে একবার চোখ বোলালেই বুঝতে পারেন— শ্রোতাবা তাঁকে নিচ্ছে কিনা, এবং তা বুঝে নিয়ে বক্তব্যের কোন অংশ বাড়াতে হবে, কোন অংশ কেবল উল্লেখ করলেই হয়, কোনখানে গলা চড়াতে হবে, কোথায় খাদে নামাতে হবে— এসব পবপর স্বাভাবিকভাবে চলে আসে। তারজন্য এখন আর ছক কেটে নিতে হয় না।

কিন্তু এই মুহূর্তে বক্তৃতা দিতে দিতে যখন বাঁ দিকে তাকান, তারপর সামনের দিকে, তখন তিনি কিছুই ধবতে পাবেন না। গলা আপন অজান্তে কেঁপে ওঠে— তবে কি মাইক কাজ করছে না, ঐ চোঙগুলোর মধ্যে শব্দ সব জট পাকিয়ে যাচ্ছে, তিনি আরও জোরে বলে ওঠেন—

আমাদের বুদ্ধি খাটিয়ে শক্তভাবে.... যাত্রার ঢঙে কথা সব ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে থাকেন, তারপর এদিক সেদিক দেখেন, নাহ! কোনও সাড়া জাগে নি, তাঁব গলা শুকিয়ে আসছে, জল কি খাবেন এক ঢোঁক?

রামকিংকর আরও দৃপ্ত ভঙ্গিতে নিজেদের বর্তমান সম্পর্ক বিশদ করতে চেষ্টা করেন, শ্রোতাদের কয়েকটি দৃষ্টি তাঁর নজরে পড়ে, সে চোখ সব— মৃত, ভাবলেশহীন।

তবে কি, একটা প্রচণ্ড আশঙ্কা বুকের মধ্যে ডমরু বাজাতে শুরু করে। তিনি মরিয়া হয়ে সমস্যা স্বরূপ তীক্ষ্ণ শাণিতভাবে উপস্থিত করতে থাকেন, নাহ্। কোনদিক থেকে কোন সাড়া নেই, কেবল ব্যাজপরা যুবক ও তাদের পাশের কয়েকটি উজ্জ্বল মুখ।

রামকিংকরের গলা চিড়ে যেতে থাকে, বলতে বলতে হঠাৎ বলা থামিয়ে অতিনাটকীয় ভঙ্গিতে বলে ওঠেন— আমরা ক্ষমতায় এলে এখানে গড়ে তুলবো এক আদর্শ রাজ্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, তারপর বসে পড়েন। শ্রোতৃমণ্ডলী কোনও হাততালি দেয় না বা ধ্বনি, কেবল ব্যাজপরা যুবক ও সঙ্গীরা ধ্বনি দিতে থাকে। তিনি ঘামতে শুরু করেন। শ্রোতাদের এ আচরণ কিছুতেই ব্যাখ্যা করতে পারেন না, অথচ আজ সবচেয়ে সহজ সরল বক্তৃতা দিয়েছেন খুবই প্রাঞ্জলভাবে ও সহজ ভাষায়।

ধ্বনি হতে থাকে। তারপর স্থানীয় এক বক্তা উঠে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান, তখন মঞ্চে ওঠার ধাপে কিছু চাঞ্চল্য দেখা যায় ও সামান্য হৈ-চৈ শুরু হয়।

রামকিংকর দেখলেন— একজনকে ঘিরেই এই চাঞ্চল্য। আরও কয়েকজন ঐ জটলার দিকে এগিয়ে যায়। জটলার সামান্য ফাঁক দিয়ে রামকিংকর দেখতে পেলেন— কেন্দ্রস্থলে একজন যুবক।

তাঁর বুক কেঁপে ওঠে। তবে কি যুবকটি হত্যা করতে আসছিল? ভীষণ অস্থির হয়ে ওঠেন তিনি। এতদিনে তিনি কাগজে পড়তেন এমন ঘটনা, এবং বেশিরভাগ ঘটনা একেবারে কাগুজে বানানো বলে উড়িয়ে দিতেন, মনে করতেন এক একজনের ইমেজ বাড়ানোর জন্য কাগজ এমন বিবরণ দিয়ে থাকে।

কিন্তু এখন? ভীষণ অস্থির হয়ে ওঠেন তিনি, বারবার তাকাতে থাকেন সেদিকে। সেখানে যথেষ্ট উত্তেজনা ও তর্ক-বিতর্ক। একদল ছেলে যুবকটিকে ঠেলে ফেলে দিতে চাইছে, কিন্তু যুবকটি খুব দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

এদিকে একজন প্রাদেশিক নেতা সেই জটলার দিকে এগিয়ে যান, এবং দু-একটি ছেলের সঙ্গে কি কথা বলেন। তারপর এগিয়ে আসেন রামকিংকরের দিকে। নেতা তাঁকে কিছু বললে যখন রামকিংকর বুঝতে পারেন যুবকটি তাঁদের দলের সদস্য না হলেও এই এলাকাব একজন সক্রিয় সমর্থক, তখন খানিক নিশ্চিন্ত হন। তিনি স্থানীয় নেতার সঙ্গে কথা বলে— যুবকটিকে আসার অনুমতি দেন। রামকিংকর দেখলেন— যুবকটি নিরস্ত্র এবং শান্ত।

যুবকটি ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে, তার চোখে মুখে ঔদ্ধত্যের চিহ্ন নেই। অতি ভদ্র ও বিনয়ী এক যুবক। রামকিংকরের দিকে এগিয়ে এসে দাঁড়ায়। তারপর আস্তে বলে—

আপনারা ভাষা ওরা বুঝতে পারেন নি, আমাকে বলতে দিন নিজেদের ভাষায়।

রামকিংকরের বুক তড়াক করে লাফায় যেন। আর যুবকটি ততক্ষণে এগিয়ে যায় মাইকের দিকে।

এদিক সেদিক থেকে ভলিন্টিয়ার ছুটে আসছে।

যুবকটি মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে দু-তিনবার ফু-ফু কবে, তারপর খুব শান্ত গলায় আস্তে আস্তে বলে ওঠে— তাদের নিজের ভাষায়।

রামকিংকর যুবকটির দিকে তাকান। তার শান্ত ভাঙা ভাঙা কথা কোথায় যেন ছড়িয়ে যাচ্ছে। তিনি ওর ভাষা এক বিন্দুও বুঝতে পারেন না।

কি বলছে ছেলেটা। তা বোঝার ক্ষমতা তাঁর নেই! অথচ তিনি কতদিন এ অঞ্চলে আসছেন থাকছেন। রামকিংকর তখন মঞ্চের কয়েক জনকে দেখে তাদের মনোভাব বুঝতে চাইলেন; কিছু বুঝতে পারলেন না। বামকিংকর তাকান শ্রোতৃমণ্ডলীর দিকে।

তাদের দৃষ্টি এখন নত নয়। তাবা অপলক তাকিয়ে আছে যুবক বক্তার দিকে।

রামকিংকর দেখলেন— শ্রোতাদেব চোখ জ্বলে জ্বলে উঠছে। তিনি এর কাবণ বেব করতে চাইলেন। যুবকটি খুব আস্তে অথচ স্পষ্টভাবে বলে চলেছে, বলাব ভঙ্গিও তেমন সতেজ নয়। স্ববের উত্থান-পতন নেই। বরং খুবই একঘেয়ে, শুনতেও মোটে কর্ণসুখকর নয়। অথচ শ্রোতারা তন্ময় একাত্ম হযে গেছে। তাদের মন প্রাণ বক্তাব ও বক্তৃতায় সমর্পিত. .

হঠাৎ বক্তৃতার একজায়গায শ্রোতৃমণ্ডলী গর্জে উঠল, শত শত হাত উত্তোলিত হয়, শত শত মাথা নড়ে চড়ে ঊর্ধ্বমুখী হতে চায।

যুবকটি বলে চলেছে— তার কথা এখন শ্লোগান। উত্তোলিত হাত ও মাথা ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার চেষ্টায কেমন একটা বিবাট গর্জনে রূপ নিতে থাকে।

বামকিংকর এধাব ওধার সব দিকে তাকালেন।

উত্তোলিত হাত ও সমবেত গর্জন।

তাঁর মনে হল— পুঞ্জীভূত স্তব্ধ আবেগেব আগল হঠাৎ খুলে গেছে, বন্যাব তোড়ে সব ভেসে যাচ্ছে।

হিমপ্রবাহ অতর্কিতে সমুদ্র হযে উঠছে

শ্রোতাদেব প্রচণ্ড হাততালি, ধ্বনি শুনতে শুনতে বামকিংকবও একসময় হাততালি দিযে ওঠেন।

তাবপব খুব শান্ত হয়ে যান।

নীল অপরাজিতা

মিহিব মুখোপাধ্যায়

বিন্দুবুড়ি ডাকল, 'মযনা, ও মযনা।''

বোশেখেব শুনশান দুপুব। বেশ গুমোট। পলিব ঘবেব দাওযায বসেছিল বুড়ি বসে বসে ঝিমুচ্ছিল। কাছেই মাদুব পাতা। ভাত-ঘুমে শবীব টানছে। চোখেব পাতা ভাবী। কিন্তু নিশ্চিন্তে শুযে ঘুমোবাব উপায নেই। গাছেব আম পাহাবা দিতে হচ্ছে। তিনটি আমগাছ বুড়িব। একটি গোলাপখাস, দুটি হিমসাগব। এবাব ফলনও প্রচুব। ঝোপে আম হযেছে। পাড়াব পাজি ছোঁড়াগুলি তক্কে তক্কে থাকে। একটু এদিক ওদিক হলেই আব বক্ষে নেই। ইঁট-পাটকেল ছুঁড়ে ছুঁড়ে কচিকাঁচা কুশিগুলিব দফাবফা কবে ছাড়বে। সেজন্য মা পাখি যেমন বাচ্চা আগলে বাখে, তেমনি কষ্ট হলেও দুপুবে না ঘুমিযে বাচ্চা আমগুলি পাহাবা দেয বিন্দুবুড়ি। মযনাকে দিযে ভবসা নেই। মন উড়ু উড়ু। থাকে থাকে, পালায। দু'দণ্ড ঘবে থাকতে চায না।

অন্য বছবেব মত এবাবও আসবাব আলি পাইকাব গাছ তিনটি জমা নেবাব জন্য ঘোবাঘুবি কবছে। বড় ছেলে বাড়ি এসে ব্যবস্থা কববে

বিন্দুবুড়ি হিসেব বোঝে না গোনা-গুনতি জানে না।

দিদা তোমাব বযস কত? মযনা কখনো জিজ্ঞেস কবলে বোব না মুখে হেসে [illegible] তাবপব ভেবে ভেবে বলে 'যে বছব আশ্বিনেব ঝড়ে বপ্পাসদেব [illegible] গাছটা প[illegible] সে মাসেই তোব মা আমাব কোলে এল এখন বুঝে নাও। [illegible] বযস [illegible] দিদাব বযসেব হিসেব শুনে হাসতে হাসতে দমবন্ধ হবাব অবস্থা।

এখন এই নিঝুম দুপুবে মযনা বাড়ি নেই। কোথায [illegible] দাওযায বসে হাতপাখা নাড়তে নাড়তে ঝিমুনি এসেছিল। ডাক [illegible] ছেলেটিব ডাকে [illegible] ঝিম-ঝিম ভাবটি ছুটে গেল।

ও বুড়ি মা চিঠি আছে। বাগচিতাব বেড়াব ওপাশে দাঁড়িযে ডাকছিল ছেলেটি। তাড়াতাড়ি নেমে এসে হাতে নিল। পোস্ট কার্ডেব চিঠি ছেলেবা কেউ লিখেছে। দুই ছেলে বিন্দুবাসিনীব। বড় মহাদেব থাকে আগবপাড়া। ওখানকাব এক কাবখানায কাজ কবে। ছোট বাসুদেব ববাকব নামে অনেক দূবেব একটা শহবেব কাছে কোন এক কযলাখনি অফিসেব চাপবাসী। ওদেব উপবে একটা মেযে ছিল মযনাব মা। পোস্ট কার্ডখানা হাতে নিযে উলটে-পালটে দেখল বুড়ি। পড়তে পাবে না। তাবপব বাস্তাব দিকে মুখ কবে উঁচু গলায ডাকল, ''মযনা, ও মযনা।'

মযনা তখন পেছনেব ডোবাব পাশ দিযে বাড়ি ঢুকছিল। আঁকশি নিতে এসেছে। দত্তদেব পোড়ো বাগানে নোনাফল পাড়তে যাবে। দিদাব ডাক শুনে চুপি চুপি পেছনে এসে দাঁড়াল। সামনে মাটির রাস্তাব দুপাশে ঘন গাছপালাব ছাযা।

ডাক-পিওন ছেলেটাকে আব দেখা যাচ্ছে না। বাঁক ঘুবে আড়াল হযে গেছে।

কিছুদূরে রাস্তার ওপাশে ভূষণ তাঁতির কারখানা-ঘরে তাঁতের শব্দ হচ্ছিল, খটখট-খটাখট। বিশ্বাসদের বাঁশবাগানের দিক থেকে থেমে থেমে একটা ঘুঘুর ডাক শোনা যাচ্ছিল। চারপাশের নির্জনতার মধ্যে এইসব শব্দগুলি কেমন মিশে গেছে। রাস্তার পাশে একজোড়া শালিক চরছে।

বিন্দুবুড়ি সামনের দিকে তাকিয়ে আন্দাজেই আবার হাঁক দিল, "ময়না, ও ময়না।"

সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক পেছন থেকে চেঁচিয়ে জবাব এল, "এই যে আমি।"

চমকে ঘুরে দাঁড়াল বুড়ি, "দুর হ মুখপুড়ি, এরকম ভাব—"

খিলখিল করে হেসে উঠল ময়না, "ডাকছিলে কেন?"

"এই দ্যাখ তো, কার চিঠি এসেছে, তোর বড়মামা লিখেছে বোধ হয়।" দিদার কথাই ঠিক। পোস্ট-কার্ডখানি হাতে নিয়ে দেখল ময়না। আঁকাবাঁকা অক্ষরে বড়মামার নাম সই, 'প্রণাম জানিবা, ইতি মহাদেব।' কিন্তু 'ইতি' পর্যন্ত অন্য লোকের লেখা। ঠাসবুনুনি লেখায় পোস্ট-কার্ডখানির এমুড়ো-ওমুড়ো ভর্তি। প্রাইমারি স্কুলে কিছুদিন যাতায়াত করেছিল বটে, কিন্তু এই হাতের লেখা পড়ার বিদ্যে নেই ময়নার।

আ-কার, ই-কার, উ-কারের লম্বা লম্বা টানের মধ্যে জড়াজড়ি করে অক্ষরগুলি যেন কাঁটাতারের বেড়ার মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। উল্টে পাল্টে দেখে বললো ময়না, "আমি পড়তে পারছি না।" দিদার হাতে ফেরত দিল। পোস্ট-কার্ডখানি হাতে নিয়ে বুড়ি আবার দাওয়ায় এসে বসল। হাতপাখা নাড়তে নাড়তে বললো, "তা হলে দ্যাখ, বিলু বোধ হয় বাড়ি আছে, ওকে ডেকে নিয়ে আয়।"

বিশ্বাসদের বাড়ির ছেলে বিশ্বনাথ তখন মস্ত ছাতার মত ছড়ানো শিরীষ গাছটার নিচে খাটিয়া পেতে ঘুমুচ্ছিল। ঘরের ভেতর গরম। এখানটায় বেশ ঠাণ্ডা।

সারাদিন শিরীষের ছায়া ছড়িয়ে থাকে। তেমন রোদ নামে না। কাছেই ওদের খিড়কির পুকুর। পুকুরের জল ছুঁয়ে এক-এক সময় ঠাণ্ডা হাওয়া গড়িয়ে আসে। ওপারে মস্ত বাঁশবাগান। ভেতরে কোথাও অনেকক্ষণ ধরে থেমে থেমে একটা ঘুঘু ডাকছিল। এখানে বসে কান পাতলে তাঁতি-বাড়ির দিক থেকে খট-খট শব্দটাও অস্পষ্ট শোনা যায়।

কিন্তু এসব কিছুই শুনছিল না বিশ্বনাথ। অঘোরে ঘুমুচ্ছিল। দড়ির খাটিয়ার উপর শতরঞ্চি পাতা। শিয়রে বালিশের পাশে হাফহাতা বুশ-শার্ট, একটা পুরনো সিগারেটের কৌটোর মধ্যে বিড়ি আর দেশলাই, ছোট একটা হাতপাখা। উনিশ কুড়ির বিশ্বনাথের পরনে পায়জামা, খালি গা, মুখে সরু গোঁফ, মোটা জুলপি, লম্বা চুল।

বাঁশবাগানের পাশ দিয়ে পুকুরপাড় ধরে এল ময়না। খাটিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে প্রথমে আস্তে ডাকল, "বিলুদা, এই বিলুদা।"

কোন সাড়া নেই। শুধু ফুরুৎ-ফুরুৎ নাক ডাকছিল। হাসি পেল ময়নার।

শাড়ির আঁচলটা মুখে তুলে একা একাই খানিকটা হেসে নিল।

তারপর সামান্য সামনে ঝুঁকে বিশ্বর নাকটি ধরে নাড়া দিয়ে ডাকল, "এই কুম্ভকর্ণ, ওঠো, বাপরে বাপ, এই দুপুরবেলা কি নাকের ডাক!"

"এই কে রে, মারবো এক—" বলতে বলতে ধড়মড় করে উঠে বসল বিশ্বনাথ। ময়নাকে দেখে বললো, "ও তুই। দিলি তো এমন জমাটি ঘুমের বারোটা বাজিয়ে, আবার হাসি!"

"হাসবো না, কি নাকের ডাক, বাপরে বাপ!" মুখে আঁচল তুলে হাসি চাপল ময়না।

কয়েক পলক আঁচলটা দেখে বললো বিশ্ব, "এই শাড়িটা তো সুন্দর, বেশ মানিয়েছে তোকে।"

"কেমন দেখাচ্ছে?" সলজ্জভাবে হাসল ময়না।

"বেশ ভাল দেখাচ্ছে, কেমন অন্যরকম লাগছে, কে দিল শাড়িটা?"

"কে আবার দেবে, বড়মামা দিয়েছে।" ময়না নিয়মিত শাড়ি ধরেছে সম্প্রতি।

কিছুদিন আগেও ফ্রক পরে ঘুরে বেড়াত। এখনো বাড়িতে মধ্যে মধ্যে ফ্রক পরে। ফ্রক পরে ছুটোছুটি করার সুবিধে। কিন্তু দিদা বকাবকি করে।

বাড়ন্ত গড়নের ময়নাকে বয়সের তুলনায় বড়ই মনে হয়। শরীর-স্বাস্থ্য আর ফ্রকের শাসন মানছে না। চলাফেরার সময় চোখে লাগে। ময়নার বয়সের হিসেবটা বিন্দুবুড়ির কাছে পরিষ্কার। যে বছর চৈত্র মাসে বাংলাদেশের লড়াই শুরু হল, তার আগের শ্রাবণে ময়নার জন্ম। সে সময় বিশ্বাসবাড়ির বিশ্বনাথের মামারা সব যশোর থেকে পালিয়ে এসে এখানে প্রায় এক বছর ছিল। বিলুর বয়স তখন চার। পরের মাঘ মাসে ময়নার মা মারা গেল। দেহে রক্ত ছিল না, পেটে জল জমেছিল। ভুগেছিল অনেকদিন। এসব খবর দিদার মুখে কিছু কিছু শুনেছিল ময়না। কিন্তু কিছু মনে হয়নি। মায়ের ব্যাপারটাই ময়নার কাছে কেমন ফাঁকা, শূন্য, অর্থহীন। দূর আকাশে একচিলতে মেঘ ভেসে গেলে কিংবা সন্ধেবেলা একা-একা ফাঁকা মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলে কয়েক মুহূর্ত যেমন মনে হয়, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। দিদার কাছে একটা পুরনো তোরঙ্গ আছে। তার মধ্যে দু'তিনখানা পুরনো শাড়ি, চারগাছা ব্রোঞ্জের চুড়ি, একছড়া সরু সোনার হার, একজোড়া কানপাশ, একটা রুপোর সিঁদুরকৌটো, একজোড়া রুপোর বালা, আর একখানি খামের মধ্যে ময়নার এই বয়সের একটি রোগামত মেয়ের ঝাপসা ছবি। উঠোন-ঘেরা রাঙচিতার বেড়ার পাশে খোলা চুলে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে, পরনে ডুরে শাড়ি। ব্যস, মায়েব সঙ্গে ময়নার এইটুকুই জানাশোনা। দিদা যে মা নয়, মায়ের মা, একথা বুঝতে পেরেছে জন্মের প্রায় দশ বছর পরে। এখন জিজ্ঞেস করল বিশ্বনাথ, "কি রে, ঘুমটা ভাঙালি কেন?"

"দিদা ডাকছে তোমাকে।"

"কেন?" হাই তুলল বিশ্বনাথ।

"বড়মামার চিঠি এসেছে, পড়ে দিতে হবে।"

"তুই পড়তে পারলি না?"

"ওরকম জবরজং লেখা আমি পড়তে পারি না।"

ময়নার জবাব শুনে হাসল। হাতপাখা তুলে হাওয়া খেল কয়েকবার। তারপর শার্টটা গায়ে গলিয়ে বললো, "চল।"

ময়নার পেছন পেছন ওদের বাড়ি এল। দাওয়ার পাশে দাঁড়িয়ে চিঠিটা পড়ে শোনাতে হল। জটিল জড়ানো লেখা বেশ কসরত করে পড়তে পারল। এবং চিঠির বয়ান শুনে বিন্দুবাসিনীর মুখ শুকিয়ে গেল।

খবর হল, মহাদেব এখন বাড়ি আসতে পারবে না, কারখানায় গোলমাল চলছে। আসবাফ আলি পাইকারের কাছ থেকে মা যেন কিছু টাকা আগাম নিয়ে রাখে। দরাদরি কিংবা লেনদেনের সময় যেন বিশ্বাসদার (বিশুর জ্যাঠা কালী বিশ্বাস) সাহায্য নেয়। তারপর আসল খবর। ময়নার বাবা অনন্ত সরকার ময়নাকে নিতে আসবে। মেয়ে বড় হচ্ছে। বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠেছে। এখন থেকেই খোঁজ-খবর করতে হবে। আজকাল ঘর-বর মিলিয়ে তেমন ছেলে যোগাড় করাও মুশকিল। এরকম একটি ছেলের খোঁজ পেয়েছে ময়নার বাবা। তারা এখন মেয়ে দেখতে চায়। এই 'পরস্তাবটি' মহাদেবেরও মনে ধরেছে। সত্যিই তো, অকালে মা-মরা ভাগনী বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠেছে। এই পনেরো বছর মামার বাড়িতেই বড় হল। দিদিমা আর দুই মামা তাদের কর্তব্য করে দিয়েছে। এখন যার মেয়ে সে যদি বিয়ে দেবার জন্য নিয়ে যেতে চায়, তাতে আপত্তি করার কিছু নেই। মায়েরও অমত করা

উচিত হবে না। মেয়ে-সন্তান বলে কথা, আজ হোক, কাল হোক, বিয়ে যখন দিতেই হবে ইত্যাদি, ইত্যাদি।

চিঠিখানি শোনার পরে কয়েক পলক থম মেরে রইল বিন্দুবুড়ি।

তারপর ডাকল, "ময়না, ও ময়না, আবার গেলি কোথায়?"

একমুহূর্ত স্থির হয়ে থাকতে পারে না ময়না। দু'মিনিট দাঁড়িয়ে চিঠিখানি শোনারও ধৈর্য নেই। বিলুদাকে ধরে এনে দিদাব সামনে দাঁড় করিয়ে বাড়ির চারপাশে একবার টহল দিতে গেছে। রান্নাঘরের দাওয়ার ফুল পাড়ার জন্য বাঁশের কঞ্চির আঁকশিটা ছিল। সেটিকে সাবধানে বের করে রান্নাঘরের পেছনে লাউমাচার নিচে লুকিয়ে রাখল। দিদা যেন টের না পায়।

মাচার ছায়ায় ময়নার মেনি বেড়ালটা শুয়ে ছিল। ওর মাথায় একবার হাত বুলিয়ে রান্নাঘরের পাশ ঘুরে ভেতরের উঠোনে এল। উঠোনের এপাশে রোদেব দিকটায ডালের বড়ি আর আচারের জন্য কচি আমের টুকরো শুকোচ্ছে, ওপাশে আম-কাঁঠালের ছাযা। তিনটে আমগাছ ছাড়াও একটা কাঁঠাল, দুটি পেয়ারা, একটি কুলগাছ আছে।

এ ছাড়া রান্নাঘরের পেছনে ডোবার চারপাশ ঘিরে পাঁচটি নারকেল, দুটি খেজুর আর কয়েকটি পেঁপেগাছ। কাঁঠালগাছে ছোট-বড় ছাব্বিশটি এঁচোড় ঝুলছে। একটি নিজেরা খেয়েছে। আরেকটি বিশ্বাস-বাড়ি দিয়েছে দিদা। বিলুদার জ্যাঠামশাই কালী বিশ্বাস "অঞ্চল-প্রধান"। তিনি এঁচোড়ের ডালনা খেতে ভালবাসেন। দিদাকে ডাকেন, "খুড়িমা"। বাকিগুলি আরো বড় হবে, পাকবে। কোন কোনটায় একশ'ব কাছাকাছি কোয়া হয়। আর মধুব মত মিষ্টি। তারপর আষাঢ় মাসে অম্বুবাচীর আগেব দিন একটি যাবে কালী বিশ্বাসেব বিধবা মা অর্থাৎ বিল্বর ঠাকুমার জন্য, আবেকটি দিদা ঘরে রাখবে। বাকিগুলি বেচে দেবে। অম্বুবাচীর সময় ভাল দাম পাওযা যায়।

বড়মামা বাড়ি না থাকলে এইসব বেচা কেনার ব্যবস্থা করেন কালী বিশ্বাস।

বিশ্বাসমামার পেটে তেমন বিদ্যে নেই বটে, কিন্তু বিষয়-বুদ্ধিতে ঘুণ।

বাজারের পাশে বাসবাস্তার উপরে পাশাপাশি কয়লার আড়ত, আটা-কল, খড়কাটা মেশিনের দোকান। এ ছাড়া দুই ভাইয়েব (বিল্বর বাবা আর জ্যাঠা) নামে ষাট বিঘে চাষের জমি। পুকুর, বাঁশঝাড়, আমবাগান সমেত বসতবাড়িখানাই বা কত বড়, প্রায় চার বিঘের মত জমির উপর। ওদের ষাট বিঘের সঙ্গে দিদার পাঁচ বিঘেও চাষ হয়। সব তদারক করেন কালী বিশ্বাস। তার উপর অঞ্চল-প্রধানের কাজের অন্ত নাই। শীত-গ্রীষ্ম বারোমাস বর্ষার পাম্প শু আর ধুতির সঙ্গে রুপোর বোতাম লাগানো নীল হাফশার্ট গায়ে সাইকেলে চেপে বিশ্বাসমামা সারা এলাকা টহল দিয়ে বেড়ান। এঁচোড় কটা গুনতে গুনতে দিদার ডাক শুনতে পেল, "ময়না, ও ময়না কোথায় গেলি আবার?"

"যাই।" সাড়া দিয়ে পরমুহূর্তে সামনে এসে দাঁড়াল। ময়না হাঁটে না উড়ে চলে। "কি হল, ডাকছো কেন?"

"ওই শোন, তোর বড়মামা কি লিখেছে।" পোস্ট-কার্ডখানা তখনো বিল্বনাথের হাতে রয়েছে।

দিদার কথায় সেদিকে তাকাল ময়না, "কি লিখেছে?" বিল্ব কিছু বললো না।

জবাব দিল বিন্দুবুড়ি, "তোর বাবা তোকে নিতে আসবে।"

কয়েক মুহূর্ত কেমন হতভম্ব হয়ে গেল ময়না। একবার দিদার দিকে আরেকবার বিলুদার দিকে তাকাল, তারপর বললো, "বাবা! কার বাবা, কাকে নিতে আসবে?

"তোর বাবা, আর কার বাবা, তোকে এখান থেকে নিয়ে যাবে।"

"কোথায় নিয়ে যাবে?" ব্যাপারটা যেন বুঝতে পারছে না ময়না, কোন হদিস পাচ্ছে না।

"কোথায় আবার, তোর বাপ যেখানে থাকে, সেই দমদমের কাছে নাগেরবাজার না কি যেন নাম—"

দিদার কথা শেষ না হতেই ফুঁসে উঠল ময়না, "কেন সেখানে যেতে হবে কেন?" ওর ভেতরের একগুঁয়ে ভাবটি এতক্ষণে বেরিয়ে এল।

এবার জবাব দিল বিশ্বনাথ, "তোর বিয়ের কথা হচ্ছে, ছেলেপক্ষ থেকে দেখতে আসবে।"

যেন চমকে উঠল ময়না। অবাক চোখে একবার দিদার দিকে আরেকবার বিলুদার মুখের দিকে তাকাল। পরক্ষণেই একরাশ লজ্জা। ঘামে ভেজা ফর্সা মুখ গোলাপি। মুখের কাছে আঁচল মুঠো করে জোরে জোরে মাথা নেড়ে বললো, "ধেৎ আমি বিয়ে করবো না, এখান থেকে যাবোই না।" বলতে বলতে একছুটে ঘরের ভেতর চলে গেল।

বিন্দুবুড়ি তখন বকবক শুরু করল (ময়নাকে লক্ষ্য করে), "এর মদ্দি তোর বড়মামারও সাঁট আছে, ভেবেছে বিয়ের যুগ্যি ভাগ্নীর দায় থেকে বাঁচা গেল, বাপের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারলেই হল, তাহলে আর খরচাপাতি কিছু লাগবে না, কেন দুই মামা কি বিয়ে দিতে পারত না, না হয় আমার দু'বিঘে জমি বেচে দোব, কি বলিস বিলু?"

বিশ্ব আর কি বলবে, এসব কথার মধ্যে কিছু বলার কোন মানে হয় না।

"ও ঠাকুমা, আমি যাচ্ছি, এটা রাখুন।" পোস্ট-কার্ডখানা এগিয়ে দিল। কে কার কথা শোনে।

"আরে বোস না, এই দুপুরে তোর এমন কি রাজকাজ, আমার কথাটা শুনে যা, আমি ভাল বলছি না মন্দ বলছি, তুই ই বিচার করে দ্যাখ—" সামান্য দম নিল বুড়ি, পোস্ট-কার্ডখানি হাতে নিয়ে আবার শুরু করল "সেই নচ্ছার বাপটারই বা কি আক্কেল, জম্মে তো মেয়ের খোঁজ নিস্‌নি, বছর না ঘুরতে ফের বিয়ে করেছিস, এপক্ষে শুনিচি দুটো মেয়ে আর একটা ছেলে, ওই কানে শোনা পর্যন্ত, চোখে দেখিনি কখনো, দেখতে চাইও না, কোন খোঁজ নেই, খবর নেই, দেখা শোনা কিছু হল না আমরা কিছু জানলুম না, শুনলুম না, হুট করে এসে বলে কিনা, 'ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে' এরকম বেআক্কেলে কাণ্ড।"

"ও দিদা তুমি চুপ করো দিকি—" ঘরের ভেতর থেকে ময়নার ধমক শোনা গেল।

"তুই থাম ছুঁড়ি, এর পেছনে তোর বড়মামীরও উসকানি আছে।" বুড়ি ভাঙা গলায় খরখর করে উঠল। তারপর বিশ্বর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, "তুই শুনে রাখ বিলু আমার কতা, তারপর বিচের করে বল, আমি 'অনেস্জ' (অন্যায্য) কতাটা কি বলচি, সত্যি বলতে কি আমার মহাদেবের মন অত ছোট নয়, ওই বউটার বুদ্ধিতেই ওর এমনধারা মতিগতি হয়েছে, না হলে এখান থেকে কি লোকে কারখানার 'ডিবটি' (ডিউটি) করে না, তুই ই বল কত লোক কলকেতা যাচ্ছে, গঙ্গা পেরিয়ে চুঁচড়ো যাচ্ছে, বিয়ের আগে তো মহাদেব এখান থেকেই যেত আসত, বিয়ের পর তিন মাস যেতে না যেতে সোহাগী বউ কানে যে কি মন্তর দেল কে জানে, বলে কিনা গাড়ির গণ্ডগোলে 'ডিবটি' কামাই হয়, কারখানার সস্তা 'ক্যান্টি'তে (ক্যান্টিন) খেয়ে পেটের গোলমাল, আজ অম্বল, কাল পেট খারাপ, এইসব হ্যানো ত্যানো নানান ছুতো, শেষতক আগরপাড়া বাসা করে উঠে গেল, আর ছোটটা তো আগেই চাকরি নিয়ে রাজাগঞ্জ না রানীগঞ্জ লাইনে বরাকর না কোথায় চলে গেল, তারপর থেকে এই মেয়েটাকে বুকে করে এই ভিটে আগলে পড়েছিলুম, মিথ্যে বলবো না, তোর বাপ জ্যাঠা দেখাশোনা করে বলেই চলে যাচ্ছে, এখানে টিকে থাকতে পেরেছি, হরি আর কালী ওরা দুই ভাই আমার পেটের ছেলের চেয়েও বেশি, এখন এই মেয়েটা যদি চলে যায়, তাহলে আমি কি করে থাকবো—" বলতে বলতে বিন্দুবুড়ির গলা বন্ধ হয়ে গেল। চোখ মুছল।

বিশ্ব পড়েছে মুশকিলে। বুড়িকে এখন থামানো যাবে না, চলে যাবারও উপায় নেই। বাঁচিয়ে দিল ময়না। দরজার সামনে এসে বললো, "তুমি চলে যাও তো বিলুদা, এসব কথা তোমার শুনতে হবে না।"

আর কি দাঁড়ায় বিশ্বনাথ! পরক্ষণেই "চলি ঠাকুমা" বলে সোজা হাঁটা দিল। পেছন ফিরে আর তাকাল না। পেছনে বুড়ির বকবকানি থামেনি। এত তাড়াতাড়ি থামার কথাও নয়।

আগের জায়গায় ফিরে এল বিশ্ব। খাটিয়ায় বসে কৌটো থেকে বিড়ি আর দেশলাই বার করল। বিড়িটি ধরিয়ে ভাবল, আর কিছু সময় গড়িয়ে নেবে কি না। এখনো দুপুর ফুরোয়নি। বেলা দুটো-আড়াইটে হবে। বিকেলে গিয়ে দোকানে বসতে হবে। হুকুম জারি করে জ্যাঠামশাই বারাসাত গেছেন। কোর্ট-কাছারিতে জমি-জমার কাজ। বাবা আদাহাটা হাইস্কুলে কেরানী। বেলা দশটায় সাইকেল চেপে চলে যান। ফিরতে ফিরতে বিকেল।

জ্যাঠতুতো বড়দা দোকানে বসে, চাষবাস দেখে। ছোড়দা গ্র্যাজুয়েট। কয়েক মাস হল বি-ডি-ও অফিসে কেরানীর চাকরি পেয়েছে। আর হরি বিশ্বাসের বড় ছেলে বিশ্বনাথ কোনরকমে বারো ক্লাসের বেড়া টপকে এখন ফুলটাইম বেকার। টায়টায় নম্বর যা জুটেছিল তাতে কলেজে ভর্তি হওয়া চলে না। সুতরাং আজ দু বছর কোন কাজ নেই বিশ্বর।

আধ মাইল দূরে শেরপুর বাজারে বাসরাস্তার উপর ওদের পাশাপাশি তিনটি দোকান। সম্প্রতি জ্যাঠামশাইয়ের হুকুম হয়েছে, সামনের মাসে টাইপ স্কুলে ভর্তি হতে হবে। 'টাইপ-শর্টহ্যাণ্ড' শিখবে। আর রোজ বিকেল থেকে রাত ন'টা আটাকলের দোকানে বসে হিসেবপত্তর দেখতে হবে।

ভাল লাগে না। এসব কিছু ভাল লাগে না বিশ্বর। কি করলে যে ভাল লাগবে তা-ও বুঝতে পারে না। শেষ টানের পরে ছুঁড়ে দিল বিড়িটা, তারপর হাতপাখা নেড়ে হাওয়া খেতে খেতে দেখতে পেল পুকুরপাড় ঘুরে ময়না আসছে।

শাড়ির আঁচলটা কোমরে জড়ানো, হাতে আঁকশি। কাছাকাছি এসে জিজ্ঞেস করল, "ও বিলুদা, এখন কি করবে?"

"ভাবছি, আরো কিছু সময় গড়াবো, তারপর দোকানে যেতে হবে।"

"আর গড়াতে হবে না, এখন চলো আমার সঙ্গে।"

"কোথায় যাবো?" মুখে হাত চাপা দিয়ে ছোট্ট হাই তুলল বিশ্ব।

"চলো, দত্তবাড়ির বাগান থেকে নোনাফল নিয়ে আসি।"

"ধুর্, নোনাফল কেউ খায় নাকি, আম হলেও কথা ছিল।"

"কি বলছো তুমি! এই এত বড় বড়!" দুই হাতে ধরার মত করে দেখাল ময়না, "সিঁদুরের মত রঙ, এত বড় নোনা তুমি এ গাঁয়ে আর কোথাও পাবে না, পাখিতে ঠুকরে শেষ করে দিচ্ছে।"

ব্যাপারটা জানা আছে বিশ্বর তথাপি জিজ্ঞেস করল, "তুই জানলি কি করে, ও পাড়ার ওই পোড়োবাগানে ঢুকেছিলি না কি।"

"পরশু দিন পুষ্পর সঙ্গে নীল অপরাজিতা খুঁজতে গিয়েছিলুম, ওখানে অপরাজিতার ঝাড় হয়ে আছে।"

"ওখানে খুব সাপের ভয়, জানিস, গেল বছর পলান মণ্ডল ওখানে একটা গোখরো মেরেছিল, চন্দ্রবোড়াও আছে শুনেছি।"

বিশ্বর কথা শুনে ঠোঁট উলটে, চোখে-মুখে তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটিয়ে ময়না বললো, "ফুঃ!" সাপের ভয় ওর নেই। কিংবা ব্যাঙ-আরশোলা-কেঁচো-নেংটি ইঁদুর, যেসব প্রাণী দেখলে মেয়েদের ভয় কিংবা গা-ঘিনঘিন করে সেসবে গ্রাহ্য নেই ময়নার।

বিশ্বর ছোট বোন পুষ্পর সঙ্গেই টো-টো করে। পুষ্প থাকলে বিলুদার খোশামোদ করতে হত না। পুষ্প এখন স্কুলে। প্রাইমারিতে ময়নার সঙ্গে বরাবর এক ক্লাসে পড়েছে। ক্লাস ফোরে উঠেই ময়না স্কুল ছেড়ে দিল। আর যায় না। বড়মামা আগরপাড়া বাসা ভাড়া করে মামীকে নিয়ে চলে গেল। আর ময়নারও পড়াশোনায় ইতি। গেল পরশু ছিল রোববার।

ছুটির দিন দুপুরবেলা পুষ্পর সঙ্গে নীল অপরাজিতার খোঁজে দত্তবাড়ির পোড়ো বাগানে ঢুকে নোনাফলের গাছটা দেখে এসেছিল। এখন বিলুদার হাত টেনে বললো, "চলো, চলো, আর শুতে হবে না।"

অগত্যা উঠতে হল। পেছন পেছন যেতে যেতে বললো বিশ্বনাথ, "তোর বাবা যদি এখান থেকে তোকে নিয়ে যায়, তা হলে এই রকম টো-টো করে ঘুরে বেড়ানো বেরিয়ে যাবে, তখন মজা টের পাবি।"

"আমি যাবোই না, দেখে নিও তুমি।" ঘাড় নাড়লো ময়না, "দিদাই যেতে দেবে না।"

"মহাদেবকাকা চিঠি দিয়েছে, তোর বাবা নিতে আসবে, ঠাকুমা কি আর আটকে রাখতে পারবে?" বিলুদার কথায় ভাবনা হল ময়নার।

এই 'বাবা' মানুষটি কেমন কিছুই আন্দাজ করতে পারছে না সে। ভাল-মন্দ কোনরকম ধারণাই নেই। এই পনেরো বছর ন' মাসের জীবনে বলতে গেলে মা-বাবার সম্পর্কে মনের মধ্যে ছিটেফোঁটা কোন দাগই নেই। ধোয়ামোছা শ্লেটের মত পরিষ্কার।

তবু মায়ের কিছু চিহ্ন চোখে পড়ে। কয়েকখানি পুরনো শাড়ি-ব্লাউজ, মায়ের হাতে সেলাই করা কাঁথা, সিঁদুরকৌটো, একখানি ফ্যাকাসে ফটো, পুরনো তোরঙ্গে যত্ন করে তুলে রেখেছে দিদা। ভাদ্র মাসের শেষে মেঘ কেটে ঝকঝকে রোদ ফুটলে অন্যসব লেপ, তোশক, কাঁথা, বালিশের সঙ্গে এই তোরঙ্গটাও উঠোনে নামানো হয়। দিদার সঙ্গে ধরাধরি করে নামায় ময়না। ডালাটা খুললেই কালোজিরে, শুকনো নিমপাতা আর ন্যাপথলিনের গন্ধের সঙ্গে পুরনো একটা সোঁদা গন্ধ নাকে আসে। এই গন্ধটার সঙ্গে মায়ের কিছু জড়িয়ে আছে। ঠিক স্মৃতি নয়। মায়ের কোন স্মৃতি নেই। 'মা' বলে কেউ একজন ছিল, এইটুকুই শুধু মনে হয়। আর 'বাবা'।

দিদার মুখে, দুই মামার মুখে টুকরো টুকরো যেটুকু শুনেছে, তাতে 'বাবা' মানুষটি সম্পর্কে তেমন কোন ভাল ধারণা হয়নি। দমদমের কাছে নাগেরবাজার নামে একটা জায়গায় নাকি থাকে বাবা। সেখানে নতুন-মা আছে, ছোট ছোট দু-তিনটি ভাইবোন আছে। কিন্তু সেখানে যাবার কিংবা তাদের দেখার কোন ইচ্ছে কোনদিন হয়নি। দমদমের কাছাকাছি আগরপাড়ায় বড়মামার বাসায় দু'তিনবার গেছে ময়না। এমনকি বরাকরের কাছে ছোটমামার কোলিয়ারির কোয়ার্টারেও গেল বছর পুজোর পরে কয়েকদিনের জন্য ঘুরে এসেছিল। কিন্তু নাগেরবাজার যাবার কথা কখনো মনে হয়নি। দিদা কিংবা মামারা কেউ কখনো বলেওনি। এখন যেতে যেতে একটু থেমে সামান্য পেছনে বিশ্বর দিকে ফিরে বললো, 'আমি যাবো না, বাবা নিতে এলেও যাবো না, দেখো তুমি, বড়মামা পাঠাতে চাইলেও যাবো না।" আগে আগে যাচ্ছিল ময়না। একপিঠ কোঁকড়া চুল। হলুদে-সবুজে ফুল-ফুল ছাপা শাড়ির আঁচলটা কোমরে জড়ানো। ডান হাতে আঁকশি।

ময়নার হাঁটার ভঙ্গিটি তো ভারি চমৎকার! যেন নতুন দেখল বিশ্বনাথ। আগে কখনো এমনভাবে চোখে পড়েনি। আগে কোনদিন এমন নির্জন দুপুরে ময়নার পেছন পেছন হাঁটেনি। এরকমভাবে হাঁটার কোন সুযোগই হয়নি।

ছোটবেলা থেকে ছোটবোনের সঙ্গে ছুটোছুটি করতে দেখেছে। বাড়ির উঠোনের পাশে শিউলিতলায় পুষ্পর তৈরি খেলাঘরে ওদের পুতুল খেলতে দেখেছে।

ছোটবেলা থেকে একটু একটু করে যাকে বড় হতে দেখেছে, সেই খুব চেনাশোনা মেয়েটিকে এই মুহূর্তে যেন নতুন করে দেখতে পেল বিশ্বনাথ।

সত্যিই ময়না বেশ বড় হয়ে গেছে। বড় আর সুন্দরী। বাড়ন্ত গড়নের মধ্যে কেমন একটা চটক এসেছে। ইচ্ছে হচ্ছিল কয়েক পা এগিয়ে ময়নার হাত ধরে পাশাপাশি হাঁটে। কাঁধে হাত রেখে হাঁটে। কিংবা যদি ওকে জড়িয়ে ধরে আদর করে? ময়না কি রেগে যাবে, চেঁচামেচি করবে, ছুটে পালাবে। ভাবতে ভাবতে বিশুর কান দুটি গরম হয়ে উঠল। বুকের মধ্যে ছাদ পেটানোর শব্দ। তথাপি, যা হয় হোক ভেবে তাড়াতাড়ি দু'পা এগিয়ে যাবার সময় দেখল উলটো দিক থেকে ওপাড়ার অখিলদা, সাইকেল চালিয়ে আসছেন। টিঙ-টিঙ ঘণ্টি বাজালেন। সরু মাটির রাস্তার বাঁ-দিক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল ময়না। পাশ কাটিয়ে যাবার জায়গা দিল। অগত্যা কয়েক হাত পেছনে বিশ্বনাথকেও দাঁড়াতে হল। ওর বেপরোয়া ইচ্ছেটাকে যেন দমিয়ে দিয়ে গেলেন অখিলদা। নিজেকে সামলে নিতে পারল। ময়নার পেছন পেছন আরো কিছুদূর যাবার পর ওদের পাড়া ছাড়িয়ে প্রায় আধ মাইল হেঁটে দত্তবাবুদের পোড়োবাড়িব পেছনে খিড়কির পুকুরপাড়ে বিশাল আমবাগানের কাছে এল।

দত্তবাবুরা এককালে এ অঞ্চলের জমিদার ছিলেন। জমিদারি চলে যাবার পরে খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো ভায়েরা সব পেটের ধান্দায় নানাদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

কলকাতার দিকে চলে গেছে সব। কলকাতা-দমদম-বরানগরে বাড়ি করেছে কেউ কেউ। চাকরি-ব্যবসা। মোট কথা, এই পুরনো পোড়োবাড়িটায় এখন আর ওদের বংশের কেউ থাকে না। অথচ এককালে এই বাড়িটার কত জাঁকজমক ছিল, পুজো-পার্বণের কত জৌলুস ছিল। দিদাব মুখে নানা গল্প শুনেছে ময়না। দোতলা, চকমিলানো, দুই-মহলা বাড়ি। পেছনের অন্দরমহলেব দিকটা একেবারে ভেঙে পড়েছে। বট-অশ্বত্থের চারাগুলি বেশ বড় হয়ে উঠেছে। ইঁট পাটকেল খসে গেছে, কড়ি-বরগা ঝুলে রয়েছে। পাল্লাহীন জানালার ভাঙা ফোকরগুলি কঙ্কালের চোখের মত খাঁ-খাঁ করছে। কেমন গা-ছমছম করে। শেয়াল, ভাম, সাপ, বাদুড়, ছুঁচোর আড্ডা।

সামনের দিকে বাইরের মহল এখনো একেবারে বসবাসের অযোগ্য হয়নি।

সেদিকে জনমানুষের আনাগোনা আছে। লক্ষ্মী-জনার্দনের মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ।

কাছারি দালানের ঘরগুলি যদিও তালা বন্ধ কিন্তু মন্দিরে নিত্যপুজোব ব্যবস্থা আছে। মন্দিরের পাশে ভোগের দালানের সঙ্গে কয়েকটি কুঠুরি নিয়ে সপরিবারে পুরোহিত বাঁকা ভটচাজ থাকেন। আর দেউড়ির পাশে দারোয়ানদের ঘরে একপাল পুষ্যি আর গরু-ছাগল নিয়ে কার্তিক পাইকের আস্তানা। মন্দিরের বরাদ্দ জমি থেকে ভোগের চাল আসে, আর কলকাতা থেকে বাবুরা পুজোর জন্য ভাগে ভাগে মাসোহারা পাঠান।

অন্দরমহলের পেছনে খিড়কির পুকুর ঘিরে আম-কাঠাল-জাম-জামরুলের পুরনো বাগান। চালতা, কুল, তেঁতুল, পেয়ারা, নোনাফলের গাছ। আর আগাছার জঙ্গল। ভাঁট, আকন্দ, আসশ্যাওড়ার ঝোপ। নানা জাতের মোটা মোটা লতা বড় বড় বুড়ো গাছগুলিকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরেছে। বৈঁচি, শেয়াকুল আর গাঁদাললতার জঙ্গল। বুড়ো আমগাছের ডালে ধুঁদুল-লতায় শুকনো ফল ঝুলছে। সীমানার ভাঙা পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে ঢুকল দু'জনে।

ঝোপ-জঙ্গল এড়িয়ে ঘুরে ঘুরে সাবধানে পা ফেলে ফেলে পুকুরের কাছে এল। ওপারে বাঁধানো ঘাট। সিঁড়ির ফাটলে আগাছা জন্মেছে। কোথাও জনমানুষ নেই। চতুর্দিকে নিবিড় নির্জন ছায়া। বোশেখ মাসের প্রখর রোদও সব জায়গায় সমানভাবে ঢুকতে পারেনি। পুকুরে চারদিকেই গাছ-গাছালি ঝুঁকে পড়ে ছায়া ফেলেছে। শুধু মাঝখানে কচুরিপানার বড়

বড় চকচকে পাতায় শেষ দুপুরের রোদ চমকাচ্ছে। ওপারে দত্তবাড়ির অন্দরমহলের ভাঙা দালান চোখে পড়ল।

সেদিকে তাকিয়ে বললো বিশ্বনাথ, "ওখানে নাকি ভূতের ভয় আছে।"

"ধ্যুৎ, দিনের বেলা কিসের ভয়।" বললো বটে ময়না, কিন্তু তাকিয়ে রইল উপরে দোতলার দিকে। হাত তুলে কোণের দিকটা দেখিয়ে আবার বললো বিশু, "শুনেছি, ওই দিকের একটা ঘরে নাকি ও বাড়ির ছোটকর্তা তারক দত্তর বউ গলায় দড়ি দিয়েছিল।"

"চুপ করো, ওসব কথা মনে করিয়ে দিও না—" ধমক দিল ময়না। কিন্তু বিলুদা কিছু বলার আগেই মনে পড়েছিল। ওই দোতলার দিকে চোখ পড়তেই দিদার মুখে যা শুনেছিল সব মনে এল। প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা। তারক দত্তের বউ ছিল যাকে বলে 'ডাকসাইটে' সুন্দরী। দিদার চেয়ে দু'চার বছরের বড় সেই রূপসী বউটি এক শীতের রাতে গলায় দড়ি দিয়েছিল। সঠিক কারণ কিছু বাইরে প্রকাশ পায়নি। কিন্তু দিদার কথা, "ছোটকত্তার স্বভাব-চরিত্তির ভাল ছেল না, বারমুখো ব্যাটাছেলে।" 'বারমুখো' কাকে বলে বোঝেনি ময়না, তবে খারাপ কিছু আন্দাজ করেছিল। সেই বউটিকে নাকি এখনো মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। শীতের সন্ধ্যেয় কিংবা শেষ রাতের আবছায়া কুয়াশার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে কেউ কেউ।

সেই বয়স, সেই রূপ। সারা গায়ে সোনার গয়না, লাল বেনারসী, কপালে সিঁদুর। মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল ময়না, "আচ্ছা, বিলুদা মানুষ মরে গেলে আর বয়স বাড়ে না, তাই না?" এরকম অদ্ভুত প্রশ্ন কখনো শোনেনি বিশ্বনাথ। এরকম কথা কোনদিন ভেবেও দেখেনি। আমতা-আমতা করে জবাব দিল, "কি জানি, ঠিক বলতে পারবো না, তোর মনে নেই, দশ বছর আগে কলকাতার হাসপাতালে ছেলে হবার সময় মারা গেল বড়দি, তখন তার বয়স ছিল তেইশ-চব্বিশ, আমার চোখে এখনো বড়দির সেই চেহারাটাই ভাসে, এতদিন বেঁচে থাকলে কেমন দেখতে হত কে জানে!"

বিশ্বনাথের বড়দি হল ওর জ্যাঠামশাই কালী বিশ্বাসের বড় মেয়ে শেফালি। ময়নার জন্মের আগেই তার বিয়ে হয়েছিল। ময়নার মায়ের সঙ্গে খুব ভাব ছিল।

ময়নাকে দেখতে এসে মায়ের জন্য নাকি খুব কেঁদেছিল বিশুর সেই বড়দি। এক বছরের ময়নাকে কোলে নিয়ে খুব আদর করেছিল। দিদার মুখে শুনেছে এসব।

সুতরাং সেই শেফালিদি আজ বেঁচে থাকলে কেমন দেখতে হত, সেটা ময়নার পক্ষে আন্দাজ করা সম্ভব নয়। এ নিয়ে সে ভাবলও না। ময়নার মন এক জায়গায় বেশিক্ষণ স্থির থাকে না। পুকুরের জলে ছলাৎ শব্দ হতে সেদিকে মুখ ফেরাল। এ পুকুরটায় মাছ আছে। পরক্ষণেই ডানদিকে হাত তুলে বললো, "ওই যে নোনাগাছটা, দ্যাখো।"

ডান পাশে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল দু'জনে। পুকুরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের কাছাকাছি মস্ত নোনাফলের গাছ। অনেকদিন এ বাগানে ঢোকেনি বিশু। গাছটাকে আগে তেমনভাবে লক্ষও করেনি। এখন যা দেখল, রীতিমত অবাক হয়ে গেল। কাঁচাপাকা ফলে ফলে ভর্তি। এক-একটা বেশ বড়। দু-একটা টসটসে পাকা, পাখিতে ঠুকরে খেয়েছে।

আঁকশি দিয়ে চটপট চার-পাঁচটা আধপাকা পেড়ে ফেলল ময়না। পাখিতে খাওয়া একটা পাকা নোনা মাটিতে পড়ে ফেটে গেল। যারা খাচ্ছিল, সেই একজোড়া বুলবুলি ওদের ডাকাতি দেখে উড়ে পালাল। একটা কাঠবেড়ালী লেজ তুলে পাশের আমগাছের গা বেয়ে সড়সড় করে খানিকটা উঠে গেল। দুটো ডালের সন্ধিতে বসে ঘুরে তাকাল, তারপর চিড়িক-চিড়িক করে কয়েকবার ওদের ধমক দিল। ওর কাণ্ড দেখে হাসল ময়না।

হাসিমুখে বললো, "দেখো পাজীটা আমাদের বকছে।"

"আমরা ওর এলাকায় ঢুকে লুঠপাট আরম্ভ করেছি, বকবে না!" বলতে বলতে একটা মাটির ঢেলা ছুঁড়ে মারল বিশ্ব। সুড়ুৎ করে আরো খানিকটা উপরে উঠে গেল। আবার চিড়িক-চিড়িক। আঁকশির নাগালের মধ্যে যে-কটা পেল, প্রায় সাত-আটটা, পেড়ে ফেলল ময়না।

সবে রঙ ধরেছে, কিন্তু শক্ত, সেগুলি চালের হাঁড়ির মধ্যে গুঁজে রাখতে হবে। দু-এক দিনের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে। কয়েকটা টসটসে পাকা। সেগুলি মাটিতে পড়েই ফেটে ছড়িয়ে গেল। এদিক-ওদিক থেকে সবগুলিকে কুড়িয়ে এক জায়গায় জড়ো করতে করতে বিশ্ব বললো, "এই, অত জোরে টানছিস কেন, ভাল ভাল পাকাগুলি ফেটে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।"

"কি করব, জোরে না টানলে ছেঁড়া যাচ্ছে না।" ময়না নিরুপায়।

"এক কাজ কর।" একটা বুদ্ধি দিল বিশ্বনাথ, "তুই আঁচল পেতে নিচে দাঁড়া, আমি টেনে ঠিক তোর আঁচলে ফেলব, তাহলে আর ফাটবে না।" মতলবটা মেনে নিল ময়না। কোমরে জড়ানো আঁচলের পাক খুলে দু'হাতে সামনে মেলে ধরলো।

এবার আঁকশি নিল বিশ্বনাথ। ঠিকঠাক মত একটা পাকা নোনা ওর আঁচলে পড়তেই ময়না উল্লাসে অস্থির। "ওই যে, বিলুদা, ওই যে আরেকটা তোমার ডানদিকে—"

"আহা, চেঁচাসনি, কেতো পাইক লোকটা ভাল নয়, চেঁচানি শুনলে হয়তো তাড়া দেবে।"

"সাপের ভয়ে এদিকে কেউ আসে না।" হাসল ময়না, "তাছাড়া কেতো পাইকের বয়ে গেছে এই জঙ্গল পাহারা দিতে, না হলে এত বড় বড় পাকা নোনাগুলির এই অবস্থা হয়, পাখিতে ঠোকরাচ্ছে, কাঠবেড়ালি খাচ্ছে, কত মাটিতে পড়ে পচে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কেউ নিতে আসে না।"

"নোনা আবার একটা খাদ্য নাকি, নেহাত তোর জন্য আসতে হল, এবার চল, অনেক হয়েছে।"

"না, ওই যে আরেকটা, বেশ বড।" ময়নার আশ মেটেনি, "ওই দ্যাখো, একটু উঁচুতে পাতার আড়ালে, দেখতে পাচ্ছো না?" দেখতে পেলেও নাগাল পেল না বিশ্বনাথ।

আঁকশির শেষ প্রান্ত ধরে যতটা সম্ভব উঁচুতে তুলে, দুই পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে সাধ্যমত উঁচু হবার চেষ্টা করেও নাগাল পেল না। সামান্য কয়েক ইঞ্চির দূরত্ব রয়েই গেল।

"আমাকে দাও, তুমি পাববে না।"

ময়নার কথায় হাসি পেল বিশ্বর, "তুই বুঝি আমার চেয়ে লম্বা!"

"দাও না আঁকশিটা আমি একবার দেখি।" বলতে বলতে নোনা ক'টা নামিয়ে রেখে আঁচলটা আবার কোমরে জড়াল ময়না। আঁকশিটা তুলে সাধ্যমত উঁচু হবার চেষ্টা করল। দু-তিনবার লাফাল। কিন্তু সুবিধে হল না। আশেপাশের ডালপাতায় খোঁচা লাগল শুধু। আসল জায়গায় পৌঁছল না। ওর কাণ্ড দেখে হাসছিল বিশ্ব।

চটে গেল ময়না, "অমন দাঁত বার করে হেসো না, তুমি গাছে উঠতে পারবে?"

"পাগল নাকি, আগের মত গাছে ওঠার অভ্যেস নেই, এখন আর পারবো না।"

"একবার দ্যাখোই না, 'পারিব না একথাটি বলিও না আর ' বলতে বলতে হেসে ফেলল ময়না।"

"পায়জামা নোংরা হবে, সারা গায়ে গাছের ময়লা লাগবে, তাছাড়া দেখেছিস, লাল পিঁপড়ের ঢিপি, ওখানে পা পড়লে আর রক্ষে আছে!"

"তা হলে এখন কি করবো?"

"আর কিছু করতে হবে না, অনেক হয়েছে, এখন বাড়ি চল।"

"না বিলুদা, চলে গেলে হবে না, অমন ভাল নোনাটা পাখিতে ঠুকরে শেষ করে দেবে, কাঠবেড়ালিটাও কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে আছে।"

"তাহলে কি করবি?"

বিশ্বর কথার জবাবে একচিলতে হাসি ফুটল ময়নার মুখে, "এক কাজ করো, তুমি মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে বসো, আমি তোমার পিঠের উপর দাঁড়িয়ে—" বলতে বলতে খিলখিল করে হেসে উঠল।

"তোর তো সাহস কম নয়।" প্রথমটা হতভম্ব বিশ্বনাথ, "আমার পিঠে দাঁড়িয়ে—" পরক্ষণেই গরগর করে উঠল "থাক তুই এখানে, আমি চললুম—"

"আহা, শোনো, রাগ কোরো না।" ময়না ওর জামা ধরে টানল, তারপর রাস্তা আগলে দাঁড়াল, "তুমি এই জঙ্গলে আমাকে ফেলে রেখে চলে যেতে পারবে?"

"খুব পারবো, এক্ষুনি চলে যাচ্ছি।"

"আমাকে যদি লতায় (সাপে) কাটে?"

"কাটুক।"

"যদি ভূতে ধরে?"

"ধরুক, ধরাই উচিত।"

"ওমা আমার কি হবে!" নাকি সুরে কাচুমাচু মুখে কান্নার ভাব করল ময়না, "আমি এখন কাঁদব।"

"খুব হয়েছে, ন্যাকামি করিস না।" হেসে ফেলল বিশ্ব. "যেতে হয়, চল।"

"আর একটু দাঁড়াও।" আবার সহজ গলা ময়নার, "আরেকবার দেখি।"

"আবার কি দেখবি, অনেকবার তো দেখলি. এভাবে হবে না।"

"এক কাজ করবে, আমাকে একটু তুলে ধরতে পারবে, তাহলে হয়ে যাবে।"

"তোকে তুলে ধরবো কি করে?" বিশ্বর কথায় সন্দেহের ভাব। ময়না আবার ইয়ার্কি করছে কিনা, ঠিক বুঝতে পারল না।

"যেমন করে কোলে নেয়, তেমনি, আর কি, একটু উঁচু করে ধরবে।"

সহজভাবে বললো বটে ময়না. কিন্তু বিশ্বর বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল। এক মুহূর্ত কানের ভেতর ঝিঁঝি পোকার ডাক শুনল। আমতা আমতা করে বললো, "তুই কি কচি খুকি, তোকে কোলে নিলে লোকে কি বলবে?"

"ধ্যেৎ, এখানে আর কে দেখতে আসছে?" ময়নার মুখে সলজ্জ হাসি। চারপাশে তাকাল একবার। চারপাশে সবুজ ছায়ার নির্জনতা। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে শেষ দুপুরের রোদ বাঁকা হয়ে পড়েছে। পাকা নোনার গন্ধ, গাঁদাল লতার গন্ধ, শুকনো ঘাস পাতার সঙ্গে উষ্ণ মাটির ভাপের গন্ধ, সব মিশে কেমন একটা ঝিমঝিম নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে।

আবার বললো ময়না, "তুমি একটু তুলে ধরলেই হয়ে যাবে।" কথা কয়টি যেন অনেক দূর থেকে বিশ্বর কানে এল। কেমন নেশার মত মনে হচ্ছে। নেশার ঝোঁকেই যেন একটা আচ্ছন্নের মধ্যে ময়নার কথা রাখতে হল। সামান্য নিচু হয়ে দুই উরু বেষ্টন করে তুলে ধরল। ঊর্ধ্বমুখ বিশ্বর থুতনি ডুবে আছে ময়নার নাভির নিচে। নরম-গরমের মধ্যে ডুবে গেছে। ময়নার শরীরে, শাড়িতে কেমন সোঁদা গন্ধ। পা কাঁপছে। বুকের মধ্যে হারু কামারের হাপর চলছে। মাথার মধ্যে ঝিমঝিম। বোধ হয় আধ মিনিটও হয়নি। বিশ্বর মনে হচ্ছিল আধ ঘণ্টা। আঁকশিটা চটপট আধাপাকা ফলটার বোঁটায় লাগিয়ে টান দিল ময়না। নোনাটা ছিটকে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে আঁকশিটাও ছেড়ে দিল। পরক্ষণেই বিশ্ব হাত আলগা দিতে মাটিতে পা রাখতে পারল। তখনো দুই হাতের মধ্যে রয়েছে। অল্প অল্প হাঁপাচ্ছিল দু'জনেই। গায়ে গা লেপটে আছে। ময়নার মুখ বিশ্বর মুখের কাছে। ময়নার চোখ বিশ্বর চোখের সামনে। হঠাৎ কি যে হয়ে গেল! সামনে ঝুঁকে ময়নার ঘামে ভেজা লালচে ফর্সা দুই গালে আর পাতলা ঠোঁটে পরপর তিনটি চুমু দিয়ে ফেলল।

"এই, কি হচ্ছে!" ছটফট করে সরে গেল ময়না। আঁচল তুলে মুখ মুছতে মুছতে বললো, "দিলে তো থুথু লাগিয়ে, ইস্, কি বিচ্ছিরি বিড়ির গন্ধ তোমার মুখে।"

অপ্রস্তুতের মত হাসল বিশ্বনাথ। হাসির মুখে তাকিয়ে রইল। কিছু বলতে পারল না। বুকের মধ্যে ধুকপুক। তবে আর কিছু বললো না ময়না। সহজভাবেই নোনাটা কুড়িয়ে নিয়ে দেখল। না, ফাটেনি। রঙ ধরলেও তেমন নরম হয়নি।

সব ক'টা আঁচলে গুছিয়ে নিল। ছোটবড় দশ-বারোটা নোনার ভারে আঁচল ছিঁড়ে যাবার অবস্থা। "ও বিলুদা, তুমি ক'টা নাও তো।"

দুই হাতে গোটা চারেক নিতে পারল বিশ্বনাথ। তারপর অনুগতের মতো ময়নার পেছন পেছন চললো। ভাগ্য ভাল, ময়না রাগ করেনি, চেঁচায়নি।

ভাঙা পাঁচিল পার হয়ে বাগান থেকে বেরিয়ে আসার পরে অনেকটা ধাতস্থ হল।

নরম গলায় ডাকল, "ময়না, এই ময়না!"

"কি বলছো?" সামনে চোখ রেখেই জবাব দিল ময়না।

"তুই কি রাগ করেছিস?"

"কেন, রাগ করবো কেন?"

"কি যে হঠাৎ হয়ে গেল, মানে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, ভাবলুম—"

এবার যেতে যেতে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল ময়না, মুচকি হেসে বললো, "তুমি একটা অসভ্য!"

সন্ধে হয়-হয়। বিন্দুবুড়ি তখন ঘরে ধূপ-ধুনো দেখাচ্ছিল। তুলসীতলায় প্রদীপ দেবে ময়না, শাঁখে ফুঁ দেবে। কোথায় গেল মেয়েটা? ময়না তখন চুপিচুপি বাড়ি ঢুকল।

নোনাফল কয়টা পুষ্পর কাছে রেখে এসেছে। দিদা দেখলে জেরা করত, কোথায় পেলি? কার বাগান থেকে চুরি করেছিস? হ্যানো-ত্যানো হাজার কৈফিয়ত। ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলতে হত। "কোথায় ছিলি এতক্ষণ? সন্ধে দিতে হবে না?" দিদার ধমকের জবাবে নিরীহ মুখে বললো, "ওই তো পুষ্পদের বাড়ি, পুষ্পর সঙ্গে লুডো খেলছিলুম কিনা, তাই দেরি হয়ে গেল, জানো দিদা, আমি তিনবাজি জিতেছি আর পুষ্প কোন রকমে একবাজি।"

চটপট হাতমুখ ধুয়ে শাড়ি পালটে তুলসীতলায় প্রদীপ দিল ময়না। তারপর দিদার পাশে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ দম নিয়ে শাঁখে ফুঁ দিল। টানা তিনটি ফুঁ।

দিন পনেরো পার করে বোশেখ মাসের শেষ রোববার, অক্ষয় তৃতীয়ার আগের দিন বেলা দশটা নাগাদ অনন্ত সরকার এসে উপস্থিত। দশ বছর বাদে জামাইকে দেখে প্রথমটা কেমন থম মেরে গেল বিন্দুবুড়ি। তারপর মেয়ের কথা বলে চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে ফোঁপাতে লাগল। পনেরো বছরের ময়নাকে দেখে অনন্ত সরকারও তেমনি অবাক, কিছুটা অপ্রস্তুত। মহাদেবের মুখে শুনেছিল বটে, মেয়ে বড় হয়েছে।

কিন্তু এরকম বাড়ন্ত গড়নের ফুটফুটে সুন্দরী আশা করেনি। মায়ের রঙ পেয়েছে ময়না। রোদে ঘোরাঘুরির জন্য তেমন জেল্লা নেই বটে, তবে এই মেয়ে যদি শহরে থাকতে পারত, সেজেগুজে থাকত, তাহলে এই রঙের চমকেই চোখ ধাঁধিয়ে যেত। যারা দেখতে আসবে, তারা যে এক কথায় পছন্দ করে নেবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রাঙচিতার বেড়ার বাইরে দাঁড়িয়ে শুকনো হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল অনন্ত সরকার, "এই যে ময়না, আমাকে চিনতে পারছো?" চিনতে পারার কথা নয়। তথাপি আন্দাজে বুঝল ময়না, এই লোকটি তার বাবা। ভেতর থেকে কেউ যেন বলে দিল, এই তোর বাবা,

তোকে নিয়ে যেতে এসেছে, এখান থেকে অনেক দূরে, অন্য কোথাও নিয়ে যাবে। উৎকণ্ঠা, বিস্ময় এবং কিছুটা আতঙ্ক ময়নার চোখে-মুখে। একটু আগে স্নান করে এসেছে। একপিঠ ভেজা-ভেজা কোঁকড়া চুল। ধোয়া শাড়ি, ব্লাউজ। কুলোয় করে সরষে ধুয়ে এনেছে। সামনের উঠোনে শুকুতে দেবে। ভেতরের উঠোনে এখনো তেমন রোদ নামেনি। আসছে কাল অক্ষয় তৃতীয়ার দিন দিদা সরষে কুটবে, কাসুন্দি বানাবে। আম-কাসুন্দি খেতে যা দারুণ। ভাবলেই জিভে জল আসে (কিন্তু এই মুহূর্তে গলা শুকিয়ে গেল) এই সরষে কোটার ব্যাপারে দিদার অনেক আচার-বিচার। নিজেও স্নান সেরে ধোয়া থান আর শেমিজ পরে নিয়েছে।

নাতনীর পেছনে দাওয়া থেকে সবে নেমে আসছিল। জামাইকে দেখে প্রথমটা থতমত খেল, তারপর মেয়ের নাম করে ইনিয়ে-বিনিয়ে কান্নার সুর তুলল।

অনন্ত সরকারের পরনে ধুতির সঙ্গে টেরিলিনের পাঞ্জাবি। কাঁধে একটা কাপড়ের ঝোলা, হাতে রসগোল্লার হাঁড়ি। বাঁশের আগল সরিয়ে এপাশে এল।

বিন্দুবাসিনী তখন সিঁড়িতে পা রেখে দাওয়ার কিনারায় বসে পড়েছে। চোখে আঁচল তুলে ফোঁপাচ্ছে। শাশুড়ির সামনে মিষ্টির হাঁড়ি নামিয়ে রেখে কাপড়ের ব্যাগ থেকে শাড়ির প্যাকেট আর সন্দেশের বাক্স বার করল অনন্ত।

শাশুড়ির জন্য থানধুতি আর ময়নার জন্য কচি কলাপাতা রঙের তাঁতের শাড়ি এনেছে। তারপর শাশুড়ির পা ছুঁয়ে প্রণাম করে পায়ের কাছে প্রণামী বাবদ একখানি দশ টাকার নোট আর একটি কাঁচা টাকা রাখল। "এসো, বাবা এসো।" আঁচলে চোখ মুছে ভাঙা-ভাঙা গলায় বললো বিন্দুবুড়ি, "তুমি আবার এসব আনতে গেলে কেন, আমার কি আর শখ আহ্লেদ বলে কিছু আচে?" তারপর মুখ ফিরিয়ে, "হ্যারে ময়না, হা করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন, বাপকে পেন্নাম কর।"

তাড়াতাড়ি সরষের কুলো উঠোনের রোদে নামিয়ে রেখে বাবা নামের এই অচেনা লোকটার পায়ে হাত দিয়ে দায়সারা গোছের একটা 'পেন্নাম' ঠুকল ময়না। মেয়ের মাথায় আলতোভাবে হাত রেখে কোনরকমে 'থাক থাক হয়েছে' বললো বটে অনন্ত, কিন্তু মনে মনে কুঁকড়ে গেল। যে মেয়ের জন্য বলতে গেলে কিছুই করেনি, এই পনেরো বছরে তেমনভাবে কোন খোঁজখবরও নেয়নি, সেই মেয়ের কাছ থেকে বাপ হিসেবে প্রণাম নেবার অধিকার কি আছে, না থাকা উচিত! 'এই জিনিসগুলি তুলে রাখ।" আবার বললো বিন্দুবুড়ি, "মাদুর পেতে বসতে দে, মুখ ধোয়ার জল এনে দে, পাখা দিয়ে হাওয়া কর, আমি দেখি একটু চায়ের যোগাড়—"

"না, না, আপনি ব্যস্ত হবেন না।" জামাইয়ের আপত্তিতে কান দিলে চলে না। হাজার হোক জামাই বলে কথা। শহুরে জামাই। ঘন্টায় ঘন্টায় চায়ের অভ্যেস। এদিকে বিন্দুবুড়ির ঘরে চায়ের পাট নেই। ছেলেরা কখনো বাড়ি এলে কয়েকটা দিনের জন্য চায়ের ব্যবস্থা করে নেয়। বিশ্বাসদের বাড়িতে অবশ্য দুবেলা চা হয়। হরি, কালী ওরা দুই ভাই-ই খুব চা খায়, বউয়েরা খায়। তাছাড়া বাইরের তেমন কেউ এলে দেয় ওরা। চায়ের খোঁজে সেদিকে গেল বিন্দুবাসিনী।

ময়না ততক্ষণে দাওয়ায় মাদুর পেতে বাবাকে বসতে দিয়েছে। হাতপাখা নেড়ে হাওয়া দিচ্ছে। একটু একটু করে নতুন চেনা বাবার সঙ্গে আলাপ শুরু হল।

থেমে থেমে আস্তে আস্তে কথা বলছে ময়না। এরকমভাবে ভেবেচিন্তে মেপে মেপে কথা বলার অভ্যেস নেই। এমনিতেই দিদা বলে 'বকবকানির গুরুমা'। তার উপর নতুন শাড়িখানা পেয়ে খুব খুশি। সেই খুশি কলকলানি এখন চেপে রাখতে হচ্ছে, পুষ্পর কাছে

গিয়ে উগরে দেবে। যা ভেবেছিল, এই 'বাবা' মানুষটিকে তেমন কিছু খারাপ মনে হচ্ছে না। ভয় কেটে গেছে, সঙ্কোচের ভাবটিও যায়-যায়।

কলকাতা দেখার লোভ আছে, আর নাগেরবাজার জায়াগাটা তো বলতে গেলে কলকাতার মধ্যেই। সেখানে সিনেমা আছে, টি-ভি আছে (আগরপাড়ায় বড়মামার বাড়িওয়ালার ঘরে দেখেছিল)। কিন্তু দিদার কাছে কি আর ফিরে আসতে পারবে? দো-টানার মধ্যে পড়ছে। "আসবে বইকি, যখন খুশি চলে আসবে।" বাবার কথাটা শুনলো বটে ময়না, কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারল না। ভয় কেটে গেলেও ভাবনা গেল না। আগরপাড়া তো বেশি দূর নয়। এখান থেকে বাসে নৈহাটি এক ঘণ্টা। তারপর রেলগাড়িতে চল্লিশ মিনিট। বড়মামাই সেখান থেকে সব মাসে আসতে পারে না। আর সে-ই বরাকর থেকে ছোটমামা আসে বছরে একবার। পুজোর সময়।

দুই মামারই যখন এই অবস্থা, ইচ্ছে থাকলেও আসতে পারে না, তখন নাগেরবাজার থেকে কি আর ইচ্ছেমত চলে আসা যাবে? এখন অনেক রকম ভাল ভাল কথা বলে ভুলিয়ে-ভালিযে নিয়ে যাবে। তারপর একবার ওখানে নিয়ে যেতে পাবলে, আব হয়তো আসতে দেবে না। বরাবরের মতো আটকে রাখবে। এই আটকে বাখার কথা ভাবলেই মেজাজ খাবাপ হয়ে যায় মযনার। কোন রকম বাঁধা-ধরার মধ্যে থাকা ধাতে পোষায় না। আগবপাড়া কযেকবাব গেছে। সেখানেও এই ব্যাপার। বড়মামী শুধু বলে, "কোথাও বেবোবি না, এসব জায়গা ভাল নয, আমাকে না বলে কোথাও যাবি না।"

জাযগার আবার ভাল-মন্দ কি? বড়মামীর যত অদ্ভুত কথা! শুনলে হাসি পায়। চোর-ডাকাত গুণ্ডা বদমাশ কি সবসময় ওত পেতে আছে? বড়মামী খালি আজেবাজে কথা ভাবে আব ভয পায়। রাত্তিরবেলা দরজায ভেতর থেকে তালা দেয়, এমনকি রাস্তার দিকেব জানালা দুটিও বন্ধ করে রাখে। মামীর পাল্লায় পড়ে বড়মামাও আজকাল কেমন ভীতু স্বভাবের হয়ে গেছে। ময়নার অত ভয়-ডর নেই। নতুন জাযগা দেখার, নতুন মানুষজন চেনাব, নতুন জায়গায বেড়াবার একটা আলাদা মজা আছে। নতুন মাকে দেখার জন্য, নতুন ভাইবোনদের চেনাব জন্য, দমদমের কাছে নাগেরবাজার জায়গাটা ঘুরেফিরে দেখে আসাব জন্য একটি গোপন ইচ্ছে মনে মনে নাড়া দিচ্ছিল।

আর দমদম নামটাই বা কেমন মজাব! এরকম নাম ভূ-ভারতে আব কোথাও আছে বলে শোনেনি মযনা। দমদম! দমদম! আলুর দম কিংবা দমাদ্দম পিটুনির কথা মনে পড়ে আর হাসি পায়। এই সময় একটা সিগারেট ধরাল অনন্ত। লম্বাটে দামী প্যাকেট। যদিও কারখানার হেড-মিস্ত্রি, কাজের সময় হরদম বিড়ি টানে। আজ শ্বশুবাড়ি আসার আগে এই কিং-সাইজের প্যাকেট কিনেছে।

হাল্কা নীল ধোঁয়ার গন্ধটাও কি চমৎকার! মুগ্ধ ময়না।

আহা, বেচারা বিলুদা, খালি বিচ্ছিরি বিড়ি টেনে মরে। এরকম একটা সিগারেট হাতে পেলে নিশ্চয়ই চমকে যাবে। খুশিতে টগবগিয়ে উঠবে। শাশুড়িকে আসতে দেখে দামী সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়েই ছুঁড়ে দিল অনন্ত। জামাইয়েব সামনে কাঁসার বাটিতে চিঁড়েভাজা, কাঁসার রেকাবিতে দুটি ছানার সন্দেশ আব দুটি নারকোলের নাড়ু নামিয়ে রাখল বিন্দুবুড়ি। তাড়াতাড়ি ঝকঝকে কাঁসার গেলাসে জল গড়িয়ে আনল ময়না।

"এত সবের কি দরকার ছিল, আপনি আবার—" কিন্তু-কিন্তু মুখ করে একটি সন্দেশ তুলে বললো অনন্ত, "তুমি একটা নাও।"

"না, না, আপনি খান।" লজ্জার সঙ্গে মাথা নাড়ল ময়না।

"নে না, বাবা দিচ্ছে হাতে করে।" দিদার কথায় নিতে হল। সন্দেশটা হাতে নিয়ে ভেতর গেল ময়না। সামনে বসে খেতে কেমন লজ্জা করছিল।

মিষ্টির পর চিঁড়েভাজা শুরু হতে-না-হতে চায়ের কেটলি আর দুটি কাপ নিয়ে এল পুষ্প। সঙ্গে ওর জেঠামশাই। জামাইয়ের সঙ্গে আলাপ করার জন্য কালী বিশ্বাসকে ডেকে এসেছিল বিন্দুবুড়ি। ভাগ্যিস ওকে এই সময় বাড়ি পাওয়া গেল। বিশ্বাসমশাইকে দেখে তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে নমস্কার দিল অনন্ত সরকার।

"বোসো বাবাজী, বোসো, বহুকাল পরে দেখা, তারপর কেমন আছ?"

মুখোমুখি বসলেন কালী বিশ্বাস। পুষ্প দু'কাপ চা ঢেলে দিল।

দু'জনে আলাপ শুরু হল। কালী বিশ্বাস পাকা লোক। তার উপরে বিন্দুবুড়ির অগাধ আস্থা। ময়নাকে যেতে দেবার আগে ভালভাবে খোঁজখবর নেওয়া দরকার। ময়নার মা মাধবীর গয়নাসমেত তোরঙ্গটি এখন চাইলেও দেবে না।

নাতনীর বিয়ের জন্য কিছু টাকা জমিয়েছে বিন্দুবুড়ি। সেসব এখন হাতছাড়া করবে না। আগে বিয়ের কথা পাকা হোক, দিনক্ষণ ঠিক হোক। তারপর মহাদেব নিজে গিয়ে সব বুঝিয়ে দিয়ে আসবে। তার আগে জামাইয়ের ভাবগতিক বোঝা দরকার। কোন কথা নেই, বার্তা নেই। দশ বছর বাদে হুট করে এসে মেয়েটাকে 'নিয়ে যাব', বললেই হল! কোথায় বিয়ের কথা হচ্ছে, কি 'বেত্তান্ত', আসল মতলবটা কি, ভালভাবে হদিস নিতে হবে। তবে কালী বিশ্বাসের কাছে জারিজুরি খাটবে না। পেটের কথা টেনে বার করতে জানে। এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে রান্নাঘরে গেল বিন্দুবুড়ি। জামাইয়ের জন্য দু'চার পদ ভালমন্দ কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। ময়না সাহায্য করবে। দরকার হলে পুষ্পও হাত লাগাবে। বিন্দুবাসিনীর হেঁশেলে আমিষের বালাই নেই। ছেলের বউয়েরা বাড়ি এলে রান্নাঘরের দাওয়ায় আলাদা উনুনে আমিষ রান্না করে। আজ কালী বিশ্বাসের বউ রুইমাছ রান্না করে পাঠিয়ে দেবে বলেছে। দই-মিষ্টির জন্য বিশ্বকে বাজারের দিকে পাঠানো হয়েছে।

প্রায় ঘণ্টা-দুই ধরে জামাইয়ের সঙ্গে নানা বিষয় আলাপ করলেন কালী বিশ্বাস। তারপর পুষ্পকে ডেকে স্নানের জন্য অনন্তকে তাদের পুকুরে নিয়ে যেতে বললেন। তেল-সাবান গামছা আর মহাদেবের একটা পুরনো ধোয়া ধুতি পুষ্প নিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। সেই ফাঁকে রান্নাঘরের সামনে এসে চুপি চুপি বললেন কালী বিশ্বাস, "খুড়িমা, কথাবার্তা শুনে তো খারাপ কিছু মনে হল না, মেয়ে যখন বড় হচ্ছে, একদিন তো বিয়ে দিতেই হবে, সম্বন্ধটি যা শুনলাম, খারাপ নয়, হাজার হোক বাপ বলে কথা, নিতে যখন এসেছে, তখন ভাল মনে দিয়ে দিন, কয়েকটা দিন বাদে মহাদেবকে পাঠাবো, দেখেশুনে আসবে ভালভাবে খোঁজখবর না নিয়ে তো বিয়ে দেওয়া যায় না, এদানীং চাদ্দিকে যা সব হচ্ছে, রোজ খবরের কাগজে একটা দুটো বউ খুনের কেচ্ছা বেরোয়, এরকম অবস্থায় ভালভাবে দেখাশোনা না করে আমরা তো মেয়ের বিয়েতে মত দিতে পারি না, জামাইকেও সে কথা বলে দিয়েছি।'

"তা তুমি যদি বলো বাবা, তা হলে ভরসা করে পাঠাই।"

"দিন পাঠিয়ে, কিচ্ছু ভাববেন না, আমরা তো পাঁচজন আছি।"

রান্নাঘরের এক কোণে বসে চাল বাছতে বাছতে কথাগুলি শুনল ময়না। স্বস্তি পেল না। যাবে কি যাবে না, সাব্যস্ত করতে পারল না। দু'চার দিনের জন্য ঘুরে আসা যেতে পারে। কিন্তু বরাবরের মত দিদাকে ছেড়ে, এই বাড়ি, এই গ্রাম ছেড়ে কোথাও গিয়ে থাকা অসম্ভব।

দুপুরে (বেলা প্রায় দেড়টা) ঝকঝকে কাঁসার থালায় জামাইকে খেতে দিল বিন্দুবুড়ি। কলমা চালের ভাত, বেগুন ও করলা ভাজা। তিনটি কাঁসার বাটিতে মুগডাল, আলুপটল, রুইমাছ (কালিয়ার কাছাকাছি একটি পদ)। পাথরের বাটিতে কচি আমের চাটনি আর স্টিলের রেকাবিতে দই-সন্দেশ। খাওয়াটা বেশ জম্পেশ হয়ে গেল।

বহু বছর এমন চমৎকার স্বাদের টাটকা পাকা রুইমাছ কপালে জোটেনি (বেশ বড় বড় দু'টি টুকরো নয়, 'খণ্ড' বলা চলে)। গেল মাঘ মাসে এক বিয়েবাড়িতে (বরযাত্রী বলেই মাছ-মাংস দুই-ই জুটেছিল, না হলে হয় মাংস, নয় মাছ) তিন-চার টুকরো রুইমাছ পেয়েছিল। কড়ে আঙুল সাইজের টুকরো. এরকম স্বাদের ধারে-কাছে নেই। আজকাল ভোজের বাড়িতে রুই-কাতলের সঙ্গে 'সিলভার কাপ' মেশানো হচ্ছে। সেই বিলিতি মাছের টুকরো পাতে পড়েছিল কিনা কে জানে। বাইরের দাওয়ায় মাদুর পেতে দিয়েছিল ময়না. সঙ্গে বালিশ। সেখানে বসে সিগারেট ধরাল অনন্ত সরকার। ময়না পান এনে দিল। তারপর হাতপাখা নেড়ে হাওয়া দিতে বসল।

"আমাকে হাওয়া দিতে হবে না, অনেক বেলা হল, তুমি এবার খেয়ে নাও মা, আর দেরি কোরো না. বিকেলে যেতে হবে।" নতুন চেনা বাবার মুখে 'মা' ডাকটি ভাল লাগল ময়নার। কিন্তু 'বিকেলে যেতে হবে' কথাটি শুনে বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল। যেতে হবে, যেতে হবে, এখান থেকে চলে যেতে হবে।

দিদার পাশে বসে শুধু ভাত নাড়াচাড়া করছিল ময়না।

"কি রে, খাচ্ছিস না যে?"

দিদার কথা শুনে জিজ্ঞেস করল, "আমাকে কি আজ বিকেলেই চলে যেতে হবে?"

"সে রকম কথাই তো—" বিন্দুবুড়ির গলায় ভাতের দলা আটকে গেল। এক ঢোক জল খেতে হল।

"আমি যাব না দিদা, তুমি বারণ করে দাও।"

"তা কি করে হয়, কালীনাথ বলে গেল, তুই তো নিজের কানে শুনলি, তোর বাবা নিতে এসেছে আমি আর কি করে— " বলতে বলতে চোখে জল এল বিন্দুবুড়ির।

বাঁ হাতে আঁচল তুলে চোখ মুছল। মুখ নিচু করে নিজেকে সামলে নিল ময়না। অদ্ভুত একটা অভিমান হল। কোথায় দিদা জোর করে আটকে রাখবে তা নয়, বিশ্বাসমামার কথায় গলে গেল। আসলে তাকে কেউ চায় না।

বড়মামা নয়, মামী নয়, এমনকি দিদাও না। মেয়ে পার করতে পারলেই বেঁচে যায় সবাই। ঠিক আছে, চলেই যাবে সে। তারপর যা হয় হবে।

কোনরকমে খাওয়া শেষ করে বাইরের দাওয়ায় এসে দেখল, বাবা ঘুমিয়ে পড়েছে। ওপাশে কাত হয়ে ঘুমুচ্ছে। শিয়রের কাছে সেই দামী সিগারেটের প্যাকেট। এদিক-ওদিক তাকাল ময়না। কাছেপিঠে কেউ নেই। দিদা রান্নাঘরে।

আলতো পায়ে এগিয়ে এসে প্যাকেট খুলে একটা সিগারেট বার করে নিল। আরো চার-পাঁচটা রয়েছে। প্যাকেট বন্ধ করে আগের জায়গায় রাখল। তারপর সাবধানে সরে এল। বিল্লুদাকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে. জানা আছে।

শিরীষ গাছের নিচে খাটিয়া পেতে শুয়ে ছিল বিল্বনাথ। ঘুম আসছে না। বেশ গরম। পরশু বিকেলে আচমকা ঝড় বৃষ্টি হয়েছিল। অথচ গরম কমেনি।

ময়নাকে আসতে দেখে উঠে বসল। লম্বা কিং-সাইজ সিগারেট হাতে পেয়ে অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, "কোথায় পেলি?"

"বাবার প্যাকেট থেকে নিয়েছি।"

"চুরি করেছিস বল।"

"তোমার জন্য করতে হল।" বলতে বলতে ঝপ করে পাশে বসল ময়না।

সিগারেট ধরিয়ে লম্বা দুটি টান দিল বিল্বনাথ। তারপর জিজ্ঞেস করল, "তোর বাবা কি তোকে নিয়ে যেতে এসেছে?"

"সেরকম কথাই তো হয়েছে।"

"কবে নিয়ে যাবে?"

"আজই বিকেলে যেতে হবে।"

"সে কি! আজই?"

কয়েক সেকেণ্ড থম মেরে রইল বিল্ব। আবার জিজ্ঞেস করল, "তোর যাবার ইচ্ছে আছে?"

"আমার ইচ্ছেয় কি হবে, ভেবেছিলুম দিদা যেতে দেবে না, এখন দেখছি, তোমার জেঠামশাইয়ের কথা শুনে দিদাও বাজী হয়েছে।" বলতে বলতে মুখ নিচু করল ময়না।

"এ কি রে, কাঁদছিস নাকি?" ময়নার চিবুকে আঙুল ছুঁইয়ে মুখখানি তুলে ধরল বিল্ব।

"কাঁদবো কেন, অত সহজে কাঁদি না আমি।" মুখ সরিয়ে নিল ময়না। আবার বললো, "এখানে আমাকে কেউ চায় না, বড়মামা না, মামী না, এমন কি দিদাও না, আমি সকলের বোঝা।" গলা ভারী হয়ে এল।

বিল্বর এক হাতে সিগারেট, আরেক হাতে ময়নার কাঁধ জড়িয়ে ধরে বললো, "কেন রে, আমি তো তোকে চাই, আমরা কাছাকাছি থাকবো।"

"ফাজলামি কোরো না।" বিল্বর হাতখানি সরিয়ে দিয়ে সামান্য সরে বসল ময়না। ম্লান হাসিমুখে বললো, "তুমি কে? তোমার কথায় কি হবে?"

ঘন ঘন সিগারেট টেনে গম্ভীর মুখে কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবল বিল্বনাথ। তারপব বললো, "একটা কথা বলছি, কাউকে বলিস না, আমি তোদের সঙ্গে যাব, চুপি চুপি যাব, কেউ টের পাবে না।"

"সে কি! কেন?" ময়না অবাক।

"নাগেরবাজারে তোর বাবা কোথায় থাকে দেখে আসবো।"

"তাতে লাভ কি?"

"তোর খবর নিতে পারবো, দরকাব হলে দেখা করতে পারবো, তোর দিদাকে খবব দিতে পারবো।"

"কিন্তু লুকিয়ে যাবে কি কবে, বাবা যদি দেখে ফেলে!"

"দেখলেও চিনতে পারবে না, আমি তো আজ সামনে যাইনি, ছোটবেলায় আমাকে হয়তো দু'একবাব দেখে থাকতে পাবে, আমার মনে নেই, তোর বাবাবও মনে থাকাব কথা নয়।"

কথাটা ঠিক। খানিকটা ভেবে নিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল ময়না, "যদি রাত হয়ে যায়, অতদূর থেকে তুমি একা-একা ফিবে আসতে পারবে?"

"কি যে বলিস?" হাসল বিল্বনাথ। সিগারেটের ধোঁযা ছেড়ে বললো, "ওসব জায়গায় আমাব অনেক ঘোরা আছে, তুই তো জানিস দমদমের কাছে প্যাটেল কলোনিতে আমার মেজমাসীমার বাড়ি, নাগেরবাবাজার থেকে তেমন দূর নয়, ওখানে যাব বলেই বাড়ি থেকে বেবোব।"

বিলুদা চুপি চুপি সবাইকে লুকিয়ে সঙ্গে যাবে। বেশ মজা হবে। পুরো ব্যাপাবটা নতুন ধরনেব এক লুকোচুরি খেলা মনে হল। ভেতরের গুমোট ভাবটা কমে গেল। অনেকটা হালকা মনে উঠে দাঁড়াল ময়না, "যাই পুষ্পর সঙ্গে দেখা করে আসি।"

"ওকে কিছু বলিস না কিন্তু।" সাবধান করল বিল্বনাথ, "তোর পেটে তো আবার কথা থাকে না।" সিগারেটে শেষ টান দিয়ে ফেলে দিল।

আগে আগে যাচ্ছিল অনন্ত সরকার, পেছনে ময়না। বাবার দেওয়া কচি-কলাপাতা রঙের নতুন শাড়ি। হালকা গোলাপি ব্লাউজ। আঁটো খোঁপা। আলতা পরা পায়ে স্যাণ্ডেল।

গেল পুজোর সময় কেনা এই স্যাণ্ডেল জোড়ার সঙ্গে ময়নার পায়ের খুব একটা সম্পর্ক নেই। সারাদিন পাড়ার মধ্যে এখানে-ওখানে, এবাড়ি-ওবাড়ি, বনে-বাগানে, পুকুরঘাটে খালি পায়েই ঘুরে বেড়াত, ছুটোছুটি করত। বরং এখনই স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়ে তেমন তড়বড়িয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারছে না। শান্ত মেয়ের মতন বাপের পেছন পেছন ধীর পায়ে যাচ্ছে। হাতে প্লাস্টিকের একটা বালতি-ব্যাগ। ব্যাগের মধ্যে ওর শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ, গামছা, সস্তার স্নো-পাউডার, চিরুনি। একটি ছোট টিনের বাক্সে সেলাইয়ের টুকিটাকি।

রাঙচিতার বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন চোখ মুছছিল বিন্দুবুড়ি।

ময়না একবার পেছন ফিরে দেখল দিদা দাঁড়িয়ে আছে, আর অনেক পেছনে বিলুদা আসছে। নীল প্যান্ট, চকরাবকরা বুশ শার্ট আর হাওয়াই চপ্পল। বিন্দুবুড়িও বিল্বকে যেতে দেখল, কিছু মনে করল না। রোজই তো এসময় বাজারের দিকে ওদের দোকানে যায়। তবে সাইকেলে যায় আজ হেঁটে যাচ্ছে।

হয়তো কাছাকাছি কোন বন্ধুর বাড়ি যাবে। আর বিল্ব দেখল, বেশ সহজভাবেই যাচ্ছে ময়না। ইনিয়ে-বিনিয়ে কান্নাকাটি কিংবা হা-হুতাশ করা ওর ধাতে নেই। ওদিকে আকাশে মেঘ জমেছে, বাতাস থমকে আছে। দু'দিন আগে, সন্ধের মুখে আচমকা ঝড়-বৃষ্টি হয়েছিল, আজও সেরকম হতে পারে।

মেঘ-ছেঁড়া একঝলক বিকেলের রোদ এসে পড়েছে গাছপালার গায়ে, ময়নার রাস্তায়, নতুন শাড়িতে। দারুণ দেখাচ্ছে।

প্রায় মিনিট পনেরোর হাঁটা পথ। শেরপুর বাজারের গায়ে বাস-স্টপ। তিয়াত্তর নম্বর বাস-রুট। এদিকে হাবড়া বাজার, ওদিকে নৈহাটি স্টেশন। দেড় ঘণ্টার দৌড়। এখান থেকে নৈহাটি এক ঘণ্টার কাছাকাছি।

খগেন সাধুখাঁর চায়ের দোকানের সামনে দু'খানি বেঞ্চি পাতা থাকে। তার একটিতে চুপচাপ বসে আছে ময়না। পাশে বালতি-ব্যাগ। উলটো দিকে শ্যামের পানেব দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে দড়ির আগুনে সিগারেট ধরাচ্ছে অনন্ত সরকার। সামান্য তফাতে মহালক্ষ্মী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারেব ভেতর থেকে লক্ষ রাখছে বিল্বনাথ, সত্যি বলতে কি, বেশ কিছুটা অবাক। ময়নাকে এরকম ঠাণ্ডা চুপচাপ কখনো দেখেছে বলে মনে কবতে পাবল না। চোখের সামনে ময়না আছে, অথচ ছটফটানি নেই, বকবকানি বন্ধ। ভাবা যায় না।

দুপুরবেলা কিছুক্ষণ এই বাজার এলাকাটা ঝিমিয়ে থাকে। এখন বিকেলেব শুরুতে দোকানপাট খুলছে, লোকজনের আনাগোনা বাড়ছে। সন্ধেবেলা জমজমাট হবে।

খানিকটা সময় পার করে বাস এল (মোটামুটি পঁচিশ মিনিট অন্তর সার্ভিস)। তেমন কিছু উপচেপড়া না হলেও, বেশ ভিড়। বাবাব সঙ্গে উঠল ময়না। বসার জায়গা নেই। তবে বাঁ-দিকে মেয়েদের জায়গায় সামান্য চাপাচাপি করে বসতে পারল। উলটো দিকে মুখ করে মাথার উপর লোহার রড ধবে দাঁড়িয়ে বইল অনন্ত।

বাসের ঘণ্টি বাজতেই একছুটে এসে সামনের দরজা দিয়ে উঠে পড়ল বিল্বনাথ। ময়নার পেছনে জানালা, সেজন্য ওঠার সময় দেখতে পায়নি কয়েক মিনিট বাদে বাঁ দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখতে পেল, সামনের দরজার কাছে জটলার মধ্যে সামান্য ঝুঁকে বিলুদা ওকে লক্ষ করছে। চোখাচোখি হতে হাসল। ময়নাও হাসিমুখে চোখ ফিরিয়ে নিল। এদিকে বাবা টিকিট কাটছিল। এইসময় একটি লোক উঠে আসতে বসার জায়গা পেয়ে গেল। বুড়োমত মানুষটি ঠেলেঠুলে দরজার দিকে এগিয়ে এল। রাজাপুর। বোধ হয় আধ মিনিটও থামল না। আবার ছুটল। রাস্তা ভাল নয়। ঝাঁকুনি দিতে দিতে টিক টিক করে তিয়াত্তর নম্বর চলেছে। এরপর ঈশ্বরীগাছার বাজার। ডান পাশের বউটি উঠে যেতেই সরে এসে দরজা

ঘেঁষে বসতে পেল ময়না। বাজারে নামল কয়েকজন, উঠল অনেক। এখন বেশ ভিড়। সামনে মানুষের আড়াল। ফাঁকফোকর দিয়ে দেখতে পেল ময়না। উলটো দিকে লম্বা বসার জায়গায় সামনের প্রান্তে কাটা-সিটের ঠিক পেছনে বসতে পেরেছে বাবা। আর আশ্চর্য। বসে বসে ঝিমুচ্ছে। দুপুরে জমাট ঘুমের রেশ এখনো যায়নি। ওদিকে আকাশ কালো হয়ে এসেছে। বাজার এলাকা ছাড়াবার পরেই দু'পাশে খোলা মাঠ। যতদূর দেখা যায়, মাঠের আকাশে মেঘ থই-থই করছে। দূরের গ্রাম, গাছপালা অন্ধকার। রাস্তার পাশে ধুলোর ঘূর্ণি। কালবোশেখী ছুটে আসছে। এখুনি হয়তো ঝড় শুরু হবে। এরকম বাসে যেতে যেতে কখনো ঝড় দেখেনি ময়না। উৎসুক চোখে বাইরে তাকিয়ে ছিল। মনে মনে উত্তেজিত, উৎফুল্ল। পুষ্প এখন কি করছে? এই ঝড়ে কি আম কুড়োতে যাবে? নাকি ময়না নেই বলে ওর মা একা-একা যেতে দেবে না। হঠাৎ মনে পড়ল, উঠোনে রোদে দেওয়া সরষে আর ডালের বড়িগুলি তোলা হয়নি। চলে আসার সময় খেয়াল ছিল না। দিদা নিশ্চয়ই এতক্ষণে তুলে রেখেছে।

সামনে দরিয়াপুর, তারপর আওয়ালসিদ্ধি। তারপর আদাহাটা। বিলুদার বাবা এখানকার স্কুলে চাকরি করে। কয়েকবার আগরপাড়া আসা-যাওয়ার পথে এই নামগুলি মোটামুটি চেনা। লোকজনের ওঠা-নামা। ঘণ্টির টিঙটিঙ। বাবা ঝিমুচ্ছে। মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে বুকের ওপর। বিলুদা এখনো বসার জায়গা পায়নি।

বাস ছুটেছে সোজা পশ্চিমে। ওদিকে নৈহাটি। তারপর গঙ্গা। গঙ্গার ওপার থেকে মেঘ উঠে সারা আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। দূরে গাছপালার মাথায় বিদ্যুতের চকমকি। একটানা বাসের গোঙানির সঙ্গে মেঘের গুরুগুরু। কানের পাশে হুহু হাওয়া। দেখতে দেখতে সাহেব কলোনি। সামনে চওড়া নতুন রাস্তা। দক্ষিণ উত্তর বরাবর এই রাস্তাটা বারাকপুর থেকে কল্যাণী গেছে। সেখান থেকে নাকি গঙ্গা পার হয়ে কোথায় বোম্বে রোডের সঙ্গে মিশবে, শুনেছে ময়না। বাসটা থামতে না থামতেই উঠে দাঁড়াল। পায়ের কাছে রাখা বাস্কেট ব্যাগটা তুলে নিয়ে টুক করে নেমে এল, বাবা ঘুমোচ্ছে ঘুমোক। নৈহাটি গিয়ে ঘুমের মজা টের পাবে।

ওদিকে হতভম্ব বিল্বনাথ। একি কাণ্ড! ময়না হঠাৎ এরকম অচেনা জায়গায় নেমে গেল কেন? টিংটিং শব্দের সঙ্গে গাড়িটা চলতে শুরু করতেই খেয়াল হল।

তাড়াহুড়ি দু তিনজনকে ঠেলেঠুলে হুড়মুড় করে নেমে পড়ল। (পেছনে কয়েকটি কটু মন্তব্য।) বাস ততক্ষণে নতুন রাস্তা পার হয়ে গেছে। মোড়ে দাঁড়িয়ে হাসছে ময়না।

ঝোড়ো হাওয়ায় ওর আঁচল উড়ছে। কাছাকাছি এসে বললো বিল্বনাথ, "কি কাণ্ড করলি, বল তো!"

"বাবাকে কেমন ফাঁকি দিলুম, নৈহাটি নেমে খুঁজে মরবে।" হি-হি করে হাসল ময়না।

"এরকম করার মানে কি?"

বিল্বের জিজ্ঞাসার জবাবে বললো, 'মানে আবার কি, আমার তো যাবার ইচ্ছেই ছিল না, ঝড় আসছে দেখে আম কুড়োবার কথা মনে হল, বাবাকে ঘুমোতে দেখে সোজা নেমে এলুম।" ময়নার হাসি আর থামে না।

বিল্বর মুখেও সেই হাসির ছোঁয়া লাগল। আবার জিজ্ঞেস করল, "এখন কি করবি?"

"কি আর করবো, সোজা উলটোদিকের বাসে চেপে বাড়ি চলে যাব।" বলতে বলতে বৃষ্টি ছুটে এল। কালো রাস্তার উপর বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা। একছুটে রাস্তার পাশে একটা জারুল গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়াল দু'জনে। কিছুদূরে রাস্তার ওপাশে একটা চালাঘরে চায়ের দোকান। উলটোদিকের বাস বোধ হয় ওখানেই থামে। দুই বড় রাস্তার কাটাকুটির কাছাকাছি কোন দোকানপাট এখনও গড়ে ওঠেনি। কাছেপিঠে কোনও বাড়িঘরও নেই।

চারদিকে অনেক দূর পর্যন্ত ফাঁকা। চওড়া নতুন রাস্তায় উপর দিয়ে অনেকটা দূর থেকে বৃষ্টিব ছুটে আসা চমৎকার দেখা যাচ্ছে। তুমুল বৃষ্টি। উথাল-পাতাল হওয়া। জারুল গাছের নিচে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বৃষ্টির ছাটে ভিজে যাচ্ছে দু'জনেই। গাছেব পাতা থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরতে শুরু করেছে। একটু পরেই অঝোরে ঝরবে। এখানে আর দাঁড়ানো যাবে না। ছুটে গিয়ে ওই চায়ের দোকানে ঢুকবে কিনা ভাবছিল বিশ্ব। ময়নার ভ্রূক্ষেপ নেই। বিলুদার সঙ্গে এরকম একটা নতুন জায়গায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে অদ্ভুত মজা। খুব খুশির গলায় বললো, "যেখানে আমাকে নিয়ে যাচ্ছিল, সেখানে কি এরকম বৃষ্টি দেখা যায়, আম কুড়োনো যায়, সেখানে পুষ্পকে পাচ্ছি কোথায়, দিদাকে পাচ্ছি কোথায়, আর—"

ফিক করে হেসে বললো, "সেখানে তোমাকেই বা পাবো কোথায়?"

আকাশে আকাশে সন্ধ্যার ম্লান আলো। ঝড়-বৃষ্টি উড়ে গেছে। বোশেখের বৃষ্টি, হুড়মুড় করে এসেছিল, হুস করে চলে গেল। উঠোনময় আমপাতা, খড়কুটো। কতগুলি কচি আমও পড়েছে এদিক-ওদিক। অন্ধকারে ঠাহর হচ্ছে না। ময়না বাড়ি নেই। কে আর ছুটোছুটি করে আম কুড়োবে?

তুলসীতলায় প্রদীপ দিল বিন্দুবুড়ি। শাঁখটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। আগের মত দম নেই। বাজাতে পারবে না। ওবাড়ি থেকে পুষ্পকে ডেকে আনবে কিনা ভাবছিল। এমন সময় ঠিক ঝড়েব মতই হইহই করে এল ময়না। "ও দিদা, আমি এসে গেছি।"

"ওমা! তুই?"

"ঝড-বৃষ্টির জন্য ফিরে এলাম।"

"তোর বাবা কোথায়?"

"চলে গেছে, দাঁড়াও আমি শাঁখ বাজাব, শাড়ি বদলে আসছি।"

তাড়াতাড়ি শাড়ি বদলে, হাতমুখ ধুয়ে তুলসীমঞ্চের কাছে রোজের মত নিজের জায়গাটিতে এসে দাঁড়াল ময়না। দীর্ঘ দম নিয়ে শাঁখে ফুঁ দিল। টানা তিনবার ফুঁ।

ছাত

আলাউদ্দিন আল আজাদ

শহরতলীর রাস্তাটা যেখানে একটু চওড়া হবার চেষ্টা শুরু করেছে, তার একপাশে সরু গলিটা, সহজে চোখে পড়ে না। যাত্রীবোঝাই বিপুলতর বাসগুলো যখন গোঙাতে গোঙাতে হেলেদুলে এগুতে থাকে, নাকে রুমাল চেপে পথচারীকে ঘুবে দাঁড়াতে হয়, আর তখনই তা নজরে পড়ার সম্ভাবনা। ডান পাশে বড় বাড়ির প্রাচীরে হাত ঠেকিয়ে সামনেব দিকে চলতে থাকলে, আবছা অন্ধকার দৃষ্টিকে ব্যাহত করবে, তাবপর মনে হবে, কোন পাহাড়ের সুড়ঙের ভিতরে প্রবেশ করা হচ্ছে স্বেচ্ছায়। নীচে নর্দমা। যাদের রুমাল থাকবে না, বাঁ হাতে নাকটা চেপে ধরতে হবে সজোরে। এভাবে আরো কিছুদূর এগুলে দেখা যাবে, একটু ফাঁকা, নীল আসমানের এক টুকরো, প্রৌঢ় পেয়ারা গাছটা মরিয়া হয়ে ডালপালা বাড়িয়ে রেখেছে, আব তার নীচেই দু'চালা করগেটের ঘরখানা। বারান্দাটা বড় হলেও নানা রকম জিনিসপত্রে ঠাসা— ভাঙা চেয়ার, পাঠশলা-লাকড়ি, খড়-বিচালীর স্তূপ। দুয়ারের কাছাকাছি বাঁশেব খুটি ঘেঁষে একটা বেতের সোফা, ভেঙে লেপটে যাওয়ার অপেক্ষায দিন গুণছে।

বারো তেরো বছর আগে নতুন বৌকে প্রাচুর্যের ইংগিতে হকচকিয়ে দেবাব অবচেতন ইচ্ছায় কেনা এই সোফাটায় বসে সকাল-বিকেল দু'বার নিবিষ্টমনে ধূমপান করেন আমিনুদ্দিন, সরকারী দপ্তরখানায় একশো পঁচিশের মালিক। বড় ছেলেটা জ্যামিতির সূত্র মুখস্থ করে মাদুরে বসে, ছোট ছেলেমেয়েগুলো সুর করে চেঁচায় প্রথম পাঠ দ্বিতীয়পাঠ। সামনের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে চলে তাঁর নাক কানের পাশ দিয়ে, নানা দার্শনিক তত্ত্বে তাঁর মগজটা খোপে খোপে ভরে উঠতে থাকে।

রোকেয়াবানুর মেজাজ ভাল নয়, এমন কথা তাঁর বড় শত্রুও বলতে পারবে না। তবে এ জিনিসটা তাঁর দু'চোখের বিষ— এই গোমড়া হয়ে বসে থাকা, মিছিমিছি ভাবনা-চিন্তায় মন খারাপ করা। আমিনুদ্দিন সব শোনেন, কিছু বলেন না; সস্তা চশমায় ঢাকা তাঁর ক্লান্ত চোখের তারায় এমন একটা ভাব খেলে, যাকে পত্নী-প্রেম মুগ্ধতার নিদর্শন ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

কিন্তু প্রকৃত তথ্য বিবৃত করতে গেলে, বলতে হয়, এতদিনকার একটানা দাম্পত্য জীবনের পরেও স্ত্রীকে তিনি পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেননি। এতে বেশ কিছুটা নতুনত্ব আছে সন্দেহ নেই; কারণ তাঁর ধারণা ছিল, প্রথম প্রথম উভয়পক্ষ থেকেই আগ্রহের আতিশয্য থাকে, দৈনন্দিন টুকিটাকি ব্যবহারে, কথাবার্তায়; বৌ মায়ের বাড়ি গেলে, বিরহের কবিতা লিখতে না বসলেও, অন্তত অকারণে দুপুররোদে হেঁটে বেড়াতে, কিংবা বাপ-মায়ের ওপরে কথায় কথায় মেজাজ ফলাতে অনেককেই দেখা গেছে; আর অতি আগ্রহে মায়ের বাড়ি গেলেও, হাতে মেহেদির ছোপ লাগানো, বিয়ের শাড়িপরা অপর প্রাণীটির ঘুমও যে গভীর রাত্রিতে মাঝে মাঝে ভেঙে যায়—এও সবারই জানা কথা। কিন্তু সাত আটটা নতুন মানুষকে দুনিয়ার আলো দেখাবার পরও দীর্ঘশ্বাস-কাতরতা একটু কমে আসাই স্বাভাবিক।

অথচ এখানে দেখা যাচ্ছে ঠিক তার উলটো।

এ যেন একটা রুটিন হয়ে গেছে। সন্ধ্যা হতেই ছেলেমেয়েদের খাইয়ে গিন্নী একেবারে সাফসোফা। নিজেদের ভাগটুকু আলাদা করে রাখার অভ্যাস তার। একটা মাদুর পেতে ভাত বেড়ে দেন স্বামীকে, ঝাঁপের কোণায় নিজেও থালা নিয়ে বসেন একই সংগে। আমিনুদ্দিন আপত্তি করেন না, কিছু মনেও করেন না; মেয়েরা আজকাল বাজারে বেরুতে শিখেছে, আর স্বামীর নাম নেওয়া, এক সংগে বসে খাওয়া— এত নেহাৎ তুচ্ছ ব্যাপার। যুগের সাথে স্ত্রীর অগ্রগতি দেখে বরং তার আনন্দই লাগে। খাওয়া-দাওয়া সেরে হারিকেনটা সিথেনে রাখেন বিছানায়, তামাক সেজে হুকোর নলটা এগিয়ে দেন রোকেয়াবানু। তারপর পানের ডিবাটা এনে উপুড় হয়ে বালিশে ভর দিয়ে গভীর যত্নে খিলি তৈরী করেন গণ্ডাদুয়েক। দু'জনের মাঝখানে রাখেন পানের ডিবাটা। কিছুক্ষণ এভাবে কেটে যাওয়ার পর সলতেটা কমিয়ে দেন হাত বাড়িয়ে। চৌকির নীচের দিকে মেঝেয় ছেলেপুলেবা শোয়, এমনকি কনিষ্ঠতম জাতকটাও তক্তপোষে শোওয়ার নাগরিক অধিকার পায় না।

এভাবে অনেকক্ষণ কেটে যায়। তামাকের ধোঁয়া আর পানের গন্ধ বাতাস ভারী করে তুলতে থাকে।

কিছুদূরে রাস্তায় শেষ যানবাহন চলাচলের শব্দ শোনা যায়। এ-ছাড়া ঘরময় আদিম নীরবতা বিরাজ করে। মাঝে মাঝে স্বপ্নের ঘোরে কঁকিয়ে ওঠে মাঝারি মেয়েটা, বারান্দায় মুর্গির টঙে কদাচিৎ কক্‌কক্‌, পাখার নড়াচড়া। পানেব ডিবাটা সিথেনে রেখে রোকেয়াবানু বলেন, 'ওগো শুনছো।'

'হু।'

নাকে কিংবা মুখে ঠিক বুঝা যায় না, একটা অদ্ভুত শব্দ।

'আমাদের সেই মুর্গিটা দুটি ডিম দিয়েছে।'

'হু!'

'তুমি তো বলছিলে, জবে' করে ফেল। তোমাব খালি বাজে গোঁ। জবে' করলে একদিনেই সব খতম হয়ে যেত।'

'হুঁ।'

'মুর্গিটার জাত ভাল। আমি তো দেখেই বুঝেছিলাম, দেখো কেমন বাচ্চা দেয়। তা আর বলব কি, দেখলেই তো তোমার জিভ টস্‌টস্‌ কববে। বলবে এটা জবে' কর, ওটা কর। মুর্গির বাচ্চার কত দাম বাজারে। তোমার কি চোখ আছে? আমাদের গাঁয়ের বেন্দার মা মুর্গি বেচেই টিনের ঘর তুলেছে।'

আমিনুদ্দিন নিশ্চুপ। তাঁর শ্বাস-টানা ক্রমে ভারী হয়ে উঠতে থাকে। রোকেয়াবানু ধাক্কা দিয়ে বলেন, 'কি, ঘুমিয়ে গেলে নাকি?'

'হুঁ'।'

নারীকণ্ঠ হঠাৎ ঝাঁকিয়ে ওঠে, 'হুঁ হুঁ, খালি হুঁ। মুখে যেন কাঁথা পুরে রেখেছেন, কথা জানেন না।'

আবার স্তব্ধতা। আবার সেই বস্তির কুকুরের আচমকা ঘেউ ঘেউ, বাড়ির পিছনকার পচা জলায় নানারকম পোকার ঝিন্‌ঝিন্‌ টিপটিপ ডাক। ঘরের চালের ওপর পেয়ারা গাছের ডালায় একটা নিশাচর পাখি এসে বসে, ঝুপ করে।

সকালে কাক ডাকার আগেই উঠে পড়েন রোকেয়াবানু। গোসল সেরে এসে ফজরের নামাজ পড়েন সাদা শাড়িটা পরে। এরপর রান্নাঘরে চলে যান।

এভাবে শরৎ কাটে, হেমন্ত কাটে। শীতের পর বসন্ত আসে। গ্রীষ্ম যায়, আসমানের একটানা কান্না নিয়ে দেখা দেয় বর্ষা।

আষাঢ় শেষ হতে চলল, তবু বর্ষণের অন্ত নেই। রান্নাঘরের পাশ দিয়েই নর্দমা চলেছে, পাশের দালানের কার্নিশের ধারা ঝুপঝুপ পড়তে থাকে ঘরের চালে, আর একসংগে সব মিশে জোর একটানা শব্দে নালায় পড়ে। হেঁসেলের ছাউনী ফুটো হয়ে গেছে এমন নয়, তবু ফাঁকে-ফোকরে কিছু কিছু পানি ছিটকে পড়েই। সময় এগিয়ে চলে, সংগে সংগে মেঝেটা ভিজে চপচপ করতে থাকে। কেমন ঘিনঘিনে। সব সময় পয়-পরিষ্কার থাকবার চেষ্টা, এসব সহ্য হয় না রোকেয়াবানুর। কাছে-ভিতে কাউকে না পেয়ে, অপরাধী করতে না পেরে বকবক করতে থাকেন আপন মনেই, 'হায়রে, চোখকানা খোদা, একটু ছ্যাক দিলে কি তোর আরশ ভেঙে পড়ত।'

মাঝারি মেয়েটা বারান্দা থেকে চিঁ চিঁ করে বলে, 'মা! আব্বা বললেন, অফিসের সময় হয়ে এল।'

'অফিসের সময় হয়ে এল!' মেয়ের কথাটা চিবিয়ে চিবিয়ে মা জবাব দিলেন, 'সোফায় বসে বসে তার বলতে কি! সকাল থেকে বাইরে একটু নাক গলিয়ে দেখেছে, কেয়ামত হচ্ছে না শাদিমোবারক? খালি মাতব্বরি, অফিসের সময় হয়েছে, আমি যেন জানি না।'

আমিনুদ্দিন পাজামা পরতে পরতে শুনলেন কথাগুলো। তাঁর ঠোঁট দুটো বেঁকে গেল, এই সংগে এমন একটা ভংগী হল, যাকে হাসিও বলা যেতে পারে।

বড় ছেলে নান্নু, তারও স্কুলের সময় হয়েছে। পারদ ওঠা আয়নাটা সামনে নিয়ে সে মাথা আঁচড়াচ্ছে, ঠোঁট বেঁকিয়ে, চোখ বড় করে চেহারাটা দেখছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। বাপ আড়চোখে ছেলেটাকে লক্ষ্য করে হাসলেন আবার। যুগটা পাল্টাচ্ছে বটে। তাদের আমলে গোঁফ না উঠলে চুল রাখাই ছিল অশোভন, বখাটে হয়ে যাওয়ার লক্ষণ, আর আজকালকার ছোঁড়াদের হয়েছে কি।

অবশেষে ভাত এল।

ছেলেকেও বসতে দেখে রোকেয়াবানু চেঁচিয়ে ওঠেন, 'তুই আবার বসলি কেন? ওঠ, পেটে যেন দোজখের আগুন, একটু তর সয় না!'

'ইস্কুলে যাব না?' নান্নু গাল ফুলিয়ে বলে।

'ইস্কুলে?' মায়ের চোখজোড়া কপালে উঠল, 'এই বৃষ্টিতে ইস্কুলে যাবি? তোর মাষ্টারদের খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই বুঝি।'

ছোট হলেও নান্নু বুদ্ধিমান, মিছিমিছি বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন বোধ করে না। নির্বিকারচিত্তে একটা বাসন টেনে নিয়ে বসে গেল।

ঘাড় গুঁজে গোগ্রাসে সে খেতে লাগল। রোকেয়াবানু একবার মার মার করে উঠছিলেন, স্বামী থামিয়ে দিলেন, 'আহা হা, খেতে দাও না! ইস্কুলে না-হয় না যাবে। হয়তো খিদে পেয়েছে।'

'খিদে পেয়েছে! পেলেই হল আর কি! ঢ্যাঙা ষাঁড় কোথাকার! ওদিকে ওরা যে খায়নি, তাদের খিদে পায় না?' ছোটদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন রোকেয়াবানু।

বর্ষণ একটু কমলেও, বাইরে বেরুনোর মত অবস্থা এখনো হয়নি। উঠোনে একহাঁটু পানি জমেছে, মাথা খারাপ ছাড়া কেউ জুতো পায়ে বেরুতে চাইবে না। একান্ত প্রয়োজন হলে হাতে নিয়ে নামতে হবে। পাজামা কুঁকড়িয়ে তুলতে হবে হাঁটুর ওপর। কাঁধে বগলতল ঠেকিয়ে ছাতাটা এক হাতে, আর নীচের কাপড় অন্য হাতে ধরে রাস্তার দিকে এগুতে হবে সন্তর্পণে। আমিনুদ্দিনকে প্রায়ই এরকম করতে হয় বলে, বৃষ্টি না থামা সত্ত্বেও, তাঁর যেন কোন ভাবনা নেই। তিনি খাচ্ছেন ধীরেসুস্থে।

নাকেমুখে কিছু গুঁজে উঠে যায় নান্নু। মুখে এমন ভাব দেখায়, যেন সারা দুনিয়া গয়রত হয়ে গেলেও, বারান্দায় পা দেয়ারও ইচ্ছে তার নেই। কিন্তু মায়ের শ্যেনদৃষ্টির আড়ালে গিয়ে তার চলনে চাঞ্চল্য দেখা দেয়; টেবিলের কাছে গিয়ে চটপট বইপত্তর সার্টের নীচে, প্যান্টের বন্ধনীতে গুঁজে ফেলে। কালো কাপড়ওলা বস্তুটা টাঙান ছিল বেড়ায়, চেয়ে না চেয়ে কোন রকমে টেনে নিয়ে খরগোসটির মত বেরিয়ে যায়।

উঠোনের পানিতে শব্দ।

'নান্নু!' ডাক নয়, যেন পৃষ্ঠদেশ লক্ষ্য করে একটা মোক্ষম বর্শা ছুড়ে মারা।

আটকে যায়। এগুতে পারে না, আর একটা পাও ফেলতে পারে না সে। সামনের দিকে মুখ করেই দাঁড়িয়ে থাকে। হয়তো কাঁপতেও থাকে, ঠিক দেখা যায় না।

'আয়! ইদিকে আয়!' চাঁছা-ছোলা স্পষ্ট নির্দেশ।

নান্নু নয়, তার পা দুটো তাকে ধরে নিয়ে আসে। বারান্দার নীচেই দাঁড়িয়ে থাকে মাথা নীচু করে, উঠে আসার সাহস নেই। এমন অপরাধের শাস্তি কি, সে জানে, এতটুকু জীবনে এ ধরনের অভিজ্ঞতার সংগে পরিচয় ঘটেছে অনেকবার। সে জানে, আত্মসমর্পণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। একটানে ছাতাটা হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে, বেড়ায় ঠেসান দিয়ে রেখে, ছেলের চুলের মুঠি ধরে বারান্দায় টেনে তুললেন রোকেয়াবানু। ডান হাতে ঠাশঠাশ দু'তিনটে চড় মেরে বসিয়ে দিলেন একেবারে।

'দস্যি দস্যি! দশমাস দশদিন পেটে আমি দস্যি ধরেছি!' ছেলেকে ছেড়ে দিয়ে হাঁপাতে থাকেন, আরে বাপরে বাপ কী কল্‌জে দেখ না, দিনেদুপুরে ডাকাতি। ছাতিটা নিয়ে চলেছে।'

ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করেন আমিনুদ্দিন।

একটু এগিয়ে এসে সহধর্মিণীর কণ্ঠে সুর মিলিয়ে বলেন, 'ছেড়ে দিলে কেন? দেও, দেও আরো দেও। এত বয়েস হয়েছে, এখনো একটু কমনসেন্স হল না। হবে আর কবে।'

'আরে বাপরে বাপ!' ছেলেকে টেনে তুলে গালে একটা ঠোনা মেরে রোকেয়াবানু বলেন, 'ছাতিটা যে নিয়ে চলছিলি বড়, চোরের মতন? কথা বলছিস্ না কেন, হে? আমার নবাবপুত্তুর, থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেব চড়িয়ে!'

নান্নু কাঁদতে সাহস করে না। ঢোক গিলে সে তার আকাশচুম্বী অভিমানকে দমিয়ে রাখে। কিন্তু কাঁহাতক আর মুখ বুঁজে থাকা যায়? চোখ কচলাতে কচলাতে সে বলে, 'ইস্ মারলেই হল। আমার ইস্কুল নেই যেন।'

সে ভ্যাক্‌ভ্যাক্ করে চোখের পানি ছেড়ে দেয়। ছোট মেয়েটা মেঝেয় গড়াগড়ি দিতে দিতে আঙুল চোষে সেদিকে চেয়ে।

মাথা নীচু করে কী ভাবেন আমিনুদ্দিন। কাচাপাকা খোঁচা খোঁচা দাড়িভরা চোয়ালদুটো বড় বিষণ্ণ দেখায়, চশমার আড়ালে ভাবলেশহীন ধূসর ছায়া নামে চোখে। পিরহানের পকেটে হাত ঢুকিয়ে এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন, যেন কিছু লোকজন থাকলে এখনি একটা জোরাল বক্তৃতা শুরু করে দিতেন। এ ভাবটা পত্নীর দৃষ্টি এড়ায় না। ছাতাটা হাতে দিয়ে বলে ওঠেন, 'কি, এখনো ভালমানুষের মতন দাঁড়িয়ে রয়েছ যে। তখন যে খুব হৈ চৈ শুরু করেছিলে। আপিসের সময় হয়ে এল। ভাত হল না।'

'ও, হ্যাঁ এই যাচ্ছি!'

নিমেষে কর্মতৎপর হয়ে ওঠেন আমিনুদ্দিন। বারান্দায় গিয়ে ছেলেটাকে বলেন, 'চ, আমার সংগে চ'। তোদের ইস্কুলের পথ দিয়েই তো আমার যেতে হবে, দিয়ে যাব তোকে।'

নান্নু অবাক বিস্ময়ে পিতার মুখের দিকে তাকায়। ইস্কুলের পথ আর আপিসের পথ—দুটো দু'রাজ্য দিয়ে চলে গেছে। অথচ উনি বলছেন কি! ভাবটা বেশীক্ষণ থাকে না তার,

পিতার অর্থপূর্ণ ইশারা পেয়ে উঠোনে ছাতার নীচে নেমে যায়। দু'জনে একসংগে চলতে থাকে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক খিলি পান মুখে ঠেসে, রোকেয়াবানু এমন একটা ভংগী করেন, একমাত্র বাঁদরের ভেংচি কাটার সংগে যার তুলনা চলে।

বৃষ্টি কিছু পাতলা হলেও কাপড় বাঁচাবার মত নয়। পিতাপুত্র যেখানে এসে থামে, তার দুদিকে দুটো রাস্তা চলে গেছে। এখন আর একসংগে যাবার উপায় নেই, আব গেলেও একজনের ক্ষতি হবেই। চট করে একটা বুদ্ধি খেলে যায় পিতার মস্তিষ্কে, ছাতাটা ছেলেব হাতে দিয়ে বলেন, 'এই নে। তুই যা। ইস্কুলের ঘণ্টা হয়তো পড়ে গেল।'

'আপনি।' নান্নু উচ্চারণ করে।

আমিনুদ্দিন হাসেন। বলেন, 'আমার জন্যে ভাবিসনে! ঐ বাস এসে গেছে। চট করে উঠে পড়ব, তারপর নেমে সোজা চলে যাব আপিসে। এই নে, তুই যা।'

ওর কানেব কাছে ফিসফিস করে আরো কী বলেন, কুচক্রীর আদল ফোটে চেহারায়।

নান্নু ঘাড় নাড়ে, 'আচ্ছা।'

যেন বৃষ্টিকে তুড়ি দিয়ে এড়িয়ে চলেছেন এমনিভাবে মাথাটা নীচু করে বাস ষ্ট্যাণ্ডের দিকে দৌড়ে যান আমিনুদ্দিন। ছেলেটা নিজের পথ ধরে, খানিকক্ষণ দাঁডিযে থাকে।

টেবিলের তিন পাশেই ফাইল, ফাইলের স্তূপ। পিঠটা একটু কুঁজো করে সামনেব দিকে ঝুঁকে বসাই তাঁর অভ্যাস, চশমা নেওয়া সত্ত্বেও জৈবিক চোখদুটো কুলিয়ে উঠতে পারে না। কাজ করার সময় বোতাম খুলে দেন পিরহানের, গায়ে ল্যাপটানো গেঞ্জিটা ঘিনঘিন কবে ঘামে, হাতাদুটো কনুই ইস্তক কুচকিয়ে খচখচ কবে কলম চালিয়ে যান, অটোমেটিক যন্ত্রের মত, একটু চিন্তা করে দেখা, নিম্নতম বুদ্ধিবৃত্তির চর্চারও কোন প্রয়োজন পড়ে না, মগজ আর মনকে এড়িযে কেবল হাতদুটো যেন স্বেচ্ছায় কাজ করে চলে। পাশের টেবিলেব সহকর্মী, আতাউল হক খান, একটু বেশী বাক্যবাগীশ, যখন তখন এটাসেটা নিযে বসাল গল্প জমিয়ে তোলার ওস্তাদ। অবশ্য এতে কাবো কাজের ব্যাঘাত এতটুকু হয় না। হাত কবে হাতের কাজ, মুখ করে মুখের।

জোহরের নামাজের জন্য ছুটি পাওযা যায ঘণ্টাখানেকের। আতাউল হক খান আকর্ণ বিস্তৃত একটা হাসি দিযে টেবিলের সামনে দাঁডায। একটা মোহিনী বিডি হাত বাডিয়ে দেয, 'নেন খান।'

বিড়িটা হাত বাড়িয়ে নেন আমিনুদ্দিন।

খান বলে, 'ভাবছেন কি অত? ভেবে আর কি হবে বলুন, যা হবাব তা হবেই, আপনি আমি ঠেকাতে পারব না। হ্যাঁ, ব্যক্তিগতভাবে আমি ওমর খৈয়ামের ভক্ত। লোকটাব প্রতিভা ছিল বটে। কয়েক শতক আগেও কি বিপ্লবী কথা শুনিয়ে গেছেন, খাও-দাও, নাচো, গাও—কারণ কালই তোমাকে মরতে হবে।'

'হুঁ।' আমিনুদ্দিন শব্দ করেন।

'আরে! আপনার পিরহানটা যে দেখছি ভিজা? ছাতা নেই বুঝি।'

'ছিল একটা। আনতে ভুলে গেছি।'

খান সহজভাবে বলেন, 'হ্যাঁ ঠিকই। বৃষ্টির দিনে ছাতা আনতে ভুলে যাওযাই স্বাভাবিক। যাই বলুন, আমরা বড্ড আপনভোলা। নিজের সুখ-সুবিধার দিকেও সব সময় নজর রাখতে পারি না।'

খান যদিও কথাটা আঘাত দেবার জন্য বলেনি, তবু হঠাৎ মনে বড় লাগে। চুপ মেরে থাকেন আমিনুদ্দিন। ভাবেন, ও ভদ্রলোকেরই বা দোষ কি। সত্যিই তো জামাটা বেশ ভিজে গেছে, লেপ্টে আছে পিঠে। এ জন্যেই বোধহয় ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা লাগছিল এতক্ষণ।

আপিস ছাড়ে, কিন্তু বৃষ্টি ছাড়ে না। দুপুরবেলাটায়, যখন কোন প্রয়োজন ছিল না, একটু বিরতি ঘটেছিল, আকাশ পরিষ্কার হতে দেখে আশাও জেগেছিল অনেকের মনে, কিন্তু বেলা গড়িয়ে যেতেই আবার মেঘ জমেছে, কালো কালো। সংগে সংগে নাকিকান্নাও। বৃষ্টি একটু পাতলা হবে আশায় আমিনুদ্দিন দাঁড়িয়ে থাকেন আপিসের বারান্দায়। কিন্তু পাতলা হবে দূরের কথা. ক্রমে ক্রমে আরো বেড়েই চলে।

আপিসেরই একজন কর্মচারী। ছাতা মাথায় বেরুচ্ছে।

'আপনি বাসষ্ট্যাণ্ডের কাছে যাবেন কি?' বলে অনুমতির অপেক্ষা না করেই ছাতার নীচে মাথাটা ঢুকিয়ে দেন আমিনুদ্দিন। ভদ্রলোক নাক সিটকায়, কিছু বলতে পারে না।

একটা দোকানের বারান্দা ঘেঁষে ছাতা-হাতে দাঁড়িয়ে আছে নান্নু, পিতার অপেক্ষায়। এখানেই দাঁড়িয়ে থাকার কথা ছিল।

'চ' শীগগির। রাত হয়ে গেল।' ছাতাটা নিজের হাতে নিয়ে বলেন আমিনুদ্দিন।

সত্যি অন্ধকার হয়ে আসছে। এমন মেঘলাদিনে সূর্যের মুখদর্শন অসম্ভব, তবু প্রাকৃতিক আবছায়া আর সন্ধ্যাকে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। যে-কোন কারণেই হোক, আপিস থেকে ফিরতে রাত হয়ে গেলে, বাংলা ভাষায় নতুন নতুন বাগ্বিধির সৃষ্টি হয়ে চলবে, কেবল দু'টো ঠোঁটের শক্তিতেই। এ বিষয়ে রোকেয়াবানুকে একদম নির্দয় বলা ছাড়া উপায় নেই, ছেলেপুলে, স্বামী যেই হোক, সন্ধ্যার আগে বাড়ি না ফেরার ব্যাপারটা। ছাতার নীচে জড়াজড়ি করে পিতাপুত্র বাড়িতে ঢোকবার গলিটার মুখে এসে দাঁড়ায়।

পিতা বলেন, 'আমি ছাতা-হাতে বাড়িতে ঢুকি। তুই একটু পরে আসিস। বুঝলি? যাতে সন্দেহ করতে না পারে!'

নান্নু সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে।

পিরহানটা আলনায় রাখতে গিয়ে রোকেয়াবানু সওয়াল করেন, 'জামাটা ভিজল কিভাবে, শুনি।'

'এই ভিজে গেছে!' আমিনুদ্দিন প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে চাইলেন।

'ভিজে গেছে মানে?'

'বাইরে গিয়ে দেখ না, কেমন বাতাস। আরে বাপস্ বৃষ্টিকে একেবারে তেরছা করে এনে গায়ে ছুঁড়ে দেয়। ছাতার সাধ্যি কি আটকায়।' বলে হাত-পা ধুতে বেরিয়ে যান আমিনুদ্দিন। ভাবেন, হায়রে স্ত্রীজাতি! তোদের হাত থেকে বাঁচবার কোন পথই বিধাতা সৃষ্টি করেননি।

'নান্নু!'

'জি আম্মা!'

রোকেয়াবানু অভিযোগ করলেন, 'ইস্কুল থেকে কিভাবে এলি? তোব জামা-কাপড় ভিজল না যে।'

'আমাব এক ক্লাস-ফ্রেণ্ড তার ছাতায় করে দিয়ে গেছে।'

তিনি গিয়ে যান স্বামীর দিকে, 'নান্নু তো ছাতায় করে এসেছে। কই, সে তো ভিজেনি!'

আমিনুদ্দিন জবাব দেন, 'ও ছেলেমানুষ, আবার ভিজবে কি! প্যাণ্ট পরে, হাফসার্ট পরে, ওদের কথা আলাদা!'

প্রশ্নকর্ত্রী এরকম জবাবে সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে মনে হয় না। শুকোবার জন্যে ছাতাটা ঘবের এক কোণায় মেলে দিয়ে চলে যান নিজের কাজে।

ক্রমে রাত হয়। খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পর, রোকেয়াবানু একটা পিতলের চামচেয় কিছু সরষের তেল নিয়ে তা গরম করেন চেরাগের শিখায়। দু'তিনটে রশুন ছেঁচে দেন মিশিয়ে। এরপর চৌকিতে উঠে মালিশ করতে বসেন স্বামীর গা। বড় ভাল লাগে

আমিনুদ্দিনের। শরীরে মাংস বিশেষ নেই, তবু পায়ের পাতায়, আঙুলের ফাঁকে, হাঁটুর নীচে, উরুর কাছে, বুকের দিকে আর পিঠের ওপর ঈষৎ গরম তেল মাখানো চটচটে হাতটা যখন যত্নের সংগে চাপ দিয়ে দিয়ে চলে, তখন বাতির শিখার দিকে চেয়ে হঠাৎ তার মনে হয়, দুনিয়াতে স্ত্রী যাদের নেই তাদের মত হতভাগাদের গলায় কলসী বেঁধে মরে যাওয়াই ভাল। তাঁর চোখের তারায় গভীর তৃপ্তির ছায়া পড়ে। স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন একদৃষ্টে, এই মুহূর্তে অনেক বেশী সুন্দরী মনে হয় তাকে।

এক সময় খুকখুক করে কেশে ওঠেন তিনি।

রোকেয়াবানু বলেন, 'আবার কাশিও হয়েছে দেখছি।'

তৎক্ষণাৎ ছাতাটার কথা তার মনে পড়ে যায়। তার পেছনে একটা কারণ অবশ্য রয়েছে। অনেকদিনের পুরনো একটা ছাতা, গত গ্রীষ্মে দেখা গেল, তার দেহের পরিচ্ছদটা একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, ধরে ধরে অসংখ্য মোটা সুঁচ ফোটানোর মত, কালো রং উঠে ফ্যাকাশে সাদা রূপ ধারণ করল, শিকগুলোও এমন দুর্বল হয়ে পড়ল, ছাতাটাকে কোন রকমেই নিজস্ব আকৃতিতে রাখতে পারল না। তবু চলছিল। কিন্তু কালক্রমে দেখা গেল, আপনা-আপনিই কাপড় ছিঁড়ে ছিঁড়ে ঝুলে পড়েছে। এই তো হাল। কি করা যায় এখন? আমিনুদ্দিন এসব নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামাননি, কোন না কোন উপায়ে দিন চলবেই, অনড় বিশ্বাস তার। কিন্তু সবার দৃষ্টিভঙ্গী তো এক নয়? ছেঁড়া গেঞ্জি পিরহানের নীচে পরে বাইরে বেরুনো যায়, কিন্তু ছেঁড়া ছাতায় অসম্ভব। এ যে একেবারে খোলসা, সূর্যের নীচে, সূর্যেরই আক্রমণ প্রতিহত করতে উদ্যত। পথে ঘাটে, হাটে বাজারে ছাতা সবারই নজরে পড়ে। নিতান্ত খোলাখুলি।

কিন্তু রোকেয়াবানুর কাছে শুচিবায়ুগ্রস্ততার প্রশ্রয় নেই। তার যুক্তি সম্পূর্ণ অন্য রকম। কাজে-কর্মে বসতে-শুতে তার কেবলি মনে হয়, সংসার-ধর্মে স্বামী একটা ছাতা বিশেষ, যে সুদিনে দুর্দিনে ছেলেপুলে বৌকে ছায়া প্রদান করে, ঝড়-বৃষ্টি-রৌদ্রের হাত থেকে বাঁচায়। কোন কারণে এ অকেজো হয়ে পড়লে সামনে কেবল ধূ ধূ মরুভূমি, হাশরের ময়দান। গরমের দিন শেষ না হতেই বনেদী ছাতাটার হাল দেখে তার ভাবনার অন্ত রইল না, স্বামীকে বললেন, খেয়ে না খেয়ে দাঁতে কামড় দিয়ে একটা কিনে নিতে। কিন্তু পীড়াপীড়ি করলেই তো হল না? রক্তমাংসের একটা মানুষ কত আর কুলোতে পারে? জিনিসপত্রের আক্রা দর। এত কাচ্চা-বাচ্চা। অবস্থাটা ধীরেসুস্থে চিন্তা করে দেখলেন রোকেয়াবানু, বাংলাদেশের আর যে গুণই থাকুক, বর্ষাটা এমনি বিশ্রী, মানুষকে নাকানি-চোবানি খাইয়ে ছাড়ে, বৃষ্টির জন্যে আপিস কামাই করতে হলে, হাঁড়ি চড়বে না। অতএব তিনি সিদ্ধান্ত করে ফেললেন, নিজে নিজেই। সব সময়ই আনিটা দু'আনিটা সঞ্চয় করা তার অভ্যাস, তাছাড়া প্রতিবেশী অফিসারের বৌয়ের কাছে চুপিচুপি হাঁস-মুর্গি বিক্রি করে জমিয়েছিলেন কিছু। ইচ্ছা ছিল নামাজ পড়ার জন্য একটা ভাল সুতীর শাড়ি কেনা। কিন্তু তিনি স্বার্থত্যাগ করলেন, এদিকে স্বামী জানতেও পারলেন না। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সাড়ে এগারোটা টাকা গুণে দিয়ে বললেন, দোকান থেকে ছাতা কিনে বাড়ি ফিরতে। না হলে, রোকেয়াবানু এমন একটা ইংগিত করলেন, যারপর স্বামীর তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না।

ছাতা আনা হলে, একটি দিনের পরিশ্রমে নাম লিখলেন, বাড়ির নম্বর, ঠিকানা লিখলেন সুই-সুতো দিয়ে, যাতে হারান গেলেও পাওয়া যায়।

স্বামীর গায়ে তেল মালিশ করতে করতে তার স্বার্থত্যাগের কথা মস্তিষ্কে খেলা করে, শাড়ির জন্যে অনুশোচনা জাগে দুর্বল মুহূর্তে। এভাবে রাতের চাকা গড়িয়ে চলে অসমাপ্ত স্তব্ধতার দিকে, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে তার।

সকাল হয। যতই দিন যাচ্ছে, আকাশ যেন কোমব বেঁধে লেগেছে, মানুষের চলাচলকে বন্ধ করে দিতে। কিছুক্ষণ হয়ত নিঝঝুম, চুপচাপ, কিন্তু তা সহ্য হবে কেন? একটু পরেই ওঠে গুড়গুড়, গুমগুম গর্জন— একটানা, একঘেয়ে ঝমঝমানি শুরু হয়ে যায। রান্নাঘরে বেড়াব ফাঁকে ছিটকে পড়ে বৃষ্টিব ছিটে। মেঝেটা কাদা কাদা, চ্যাপচেপে। আসমানের মালিককে লক্ষ্য করে রোকেয়াবানুর সুমধুর বাক্যবর্ষণ চলে বাইরের বর্ষণেব সংগে তাল বেখে।

কিন্তু তা বলে হাত পা গুটিয়ে ঘবে বসে থাকলে তো চলে না। পুরনো টেবিল ঘড়িটাতে দশটা বাজলে হাতে তুলে নেন ছাতাটা। নান্নু তাব সংগে যায, মায়ের সামনে ভেজা বেড়ালটি হযে।

বাসস্ট্যাণ্ডেব কাছাকাছি এসেই পিতা বলেন, 'এই নে, তুই যা। ইস্কুলেব ঘণ্টা বোধ হয পড়ে গেল।'

নান্নু উপেক্ষা করতে পাবে না পিতাব নির্দেশ। ছাতাটা হাতে নিয়ে সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, নিজের অজান্তেই যেন। দেখে, বাবা ভিজতে ভিজতে ছুটেছেন, রবারের পাম্প সু থেকে কাদার ছিটে পড়ছে পাজামাব পেছন দিকে, পিটপিট বৃষ্টি পড়ছে মাথায়, পিরহানেব ওপব। তার কিশোব চোখের তাবা দুটো কেমন একটা অনুকম্পাব আববণে ম্লান হয়ে যায়। বাসটা চলা শুরু করলে সে পা বাড়ায।

বিকেলে ইস্কুল ছুটি হলে, আবাব সে এসে দাঁড়িয়ে থাকে নির্দিষ্ট স্থানটিতে। কিছুক্ষণ পব পিতা আসেন। দুজনে মিলে চলে বাড়ির উদ্দেশ্যে। গলিটাব মুখে এসে আবাব সে দাড়ায়। পিতা ভিতবে চলে যান ছাতাহাতে। এবপর সে ঢোকে।

এমনিভাবে সপ্তাহখানেক কেটে গেল। কাশিটা বেড়েছে আমিনুদ্দিনের। একবার উঠলে শাঁগগির থামতে চায না, বুকে বড্ড টান লাগে। ব্যথা বাজে। কপালেব দু'পাশের রগদুটো টনটন করে, মাথা ঘোবায। একটু জ্বব জ্বর ভাব। বাইবে আগের মতই কাজকর্ম করলেও, ভিতর থেকে যেন শরীরটা ভেঙে পড়েছে। বড্ড ক্লান্তি বোধ করেন আজকাল।

সেদিন বোধহয় শনিবাব। কিছু ফাইল জমে আছে। ওপরওলা অফিসাবেব তাড়ায কলম চালিয়ে যাচ্ছিলেন বেপবোয়া, হঠাৎ একসময টেবিলেব উপব এলিয়ে পড়ল মাথাটা। পাশেব টেবিলে আতাউল হক খান হকচকিয়ে উঠল 'কি হল আপনার?'

কোন জবাব নেই।

কাছে এসে, শরীর স্পর্শ করে, শিউরে ওঠে খান, 'ইস্ এ যে ভীষণ জ্বব! হাত পুড়ে যাচ্ছে! এমন শরীর নিয়ে কেউ আপিস করতে আসে নাকি! চুলোয় যাক চাকরি! নিজে বাঁচলে তো বাপের নাম।'

হেড-ক্লার্কের কাছে একটা দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়ে, রিকসা করে তাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল খান। তখন আড়াইটে বেজেছে।

শরীর খুব ভাল যাচ্ছে না জানলেও, হঠাৎ এভাবে জ্বর আসবে, ভাবতে পারেননি রোকেয়াবানু। অপ্রস্তুত হয়ে যান, কেমন যেন। এত ঝড়-ঝাপটায় তৈরী-হয়ে ওঠা তাব মনোবল ভেঙে পড়তে চায়, টুকবো টুকরো হয়ে। অজানা আশংকা তাব সমস্ত মনকে ছেয়ে ফেলে। অসুখ-বিসুখে তার বড় ভয়, কি জানি কি থেকে কিসে গড়ায বলা তো যায় না। ডাক্তার ডাকারও সংগতি নেই। মাথায় পানি ঢালা, তেল গবম করে হাত-পা মালিশ করা-- ইত্যাকার যত প্রক্রিয়া তার জানা আছে, সবই বেপরোয়ভাবে প্রয়োগ করতে থাকেন রোগীর ওপর।

মালিশ করতে করতে হঠাৎ তার চক্ষু স্থির হয়ে যায়।

'ছাতাটা কই?' জিজ্ঞেস করেন ভযার্ত স্বরে।

উসখুস করেন আমিনুদ্দিন। পরে বলেন, 'ও হ্যাঁ। ভুলেই গিয়েছিলাম, আপিসে বোধ হয় ফেলে এসেছি।'

রোকেয়াবানু বিচলিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'পাওয়া যাবে তো?'

'ও, তার জন্যে ভেব না। নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। সরকারী আপিসে কোন জিনিস হারান যায় না।'

উনি মনে মনে ঠিক করে রাখেন, নান্নু ইস্কুল ফেরামাত্র তাকে পাঠিয়ে দেবেন ছাতাটার খোঁজে। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে এল, ও ফিরছে না দেখে অবাক হয়ে যান। এত দেরী হবার কথা তো নয়। শত ঝড়বৃষ্টি হলেও সে সময় মত আসবেই বাড়িতে। বিপদ যখন আসে, সব দিক থেকেই আসে। তার মেজাজ বিগড়ে যায়।

ছাতাটা একপাশে লুকিয়ে ঘরের ভিতরে প্রায় ঢুকে পড়ছিল নান্নু, মায়ের নজরে পড়ে গেল। লম্বা পা ফেলে তিনি এগিয়ে এলেন, 'কিরে ছাতি পেলি কোত্থেকে?'

নান্নু মাথা হেঁট করে থাকে।

'কি! জবাব দিচ্ছিস্ না কেন?' মা ধমক দিয়ে উঠলেন।

ও মুখ নীচু করে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'আমার কি দোষ। বাইরে গিয়ে আব্বাই তো দিয়ে যান। বলেন, আমার লাগবে না তুই যা।'

নিমেষে আগাগোড়া ব্যাপারটা যেন দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গেল রোকেয়াবানুর কাছে। তার ভুরু যায় কুঁচকে। পান খাওয়া পুরু ঠোঁট দুটো কাঁপতে থাকে রাগে, তাহলে এই ব্যাপার।

থপ্থপ্ পা ফেলে স্বামীর বিছানার কাছে হাজির হলেন রণমূর্তিতে। তার শরীরটা ভেতর থেকে ঝাঁকানি দিতে থাকে। কোন কথা আসছে না মুখে, কণ্ঠরোধ হয়ে এসেছে তার। কিন্তু এ ভাবটা বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না, ক্রমে তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে উঠল—কপালে চোখে মুখে ঠোঁটে বুকে কেমন একটা বিবর্ণ স্তব্ধতা।

'তোমার মনে বুঝি এই ছিল!' কথাটা ঠিকমত উচ্চারিত হল না, গলা কাঁপছে। কেমন একটা জ্বালা, অপরিমেয় ঝাঁঝ। এরপর রোকেয়াবানু ফুঁপিয়ে উঠে বসে পড়লেন দু হাতে মুখ চেপে, 'ও মাগো, আমি কি করব গো। আমারে মেরে ফেলার ফিকির করছে। কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে পথে বসাতে চায়। ভিক্ষা করাতে চায়। নিজে মরে, আমাদের সবাইকে মারতে চায়। ও মাগো, আমি কই যাব গো।'

ছোট খুকীর মত তিনি কাঁদতে থাকেন মাটি লেপটিয়ে।

আমিনুদ্দিন কিছুই ঠাহর করে উঠতে পারেন না, সব এলোমেলো হয়ে গেছে যেন। আলোর দিকে মুখ করে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন শুধু। তার চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে। কোন অনুভূতি কিংবা ভাবের প্রকাশ সেখানে নেই। কিছুক্ষণ পর ব্যাপারটা আগাগোড়া হৃদয়ংগম করে হঠাৎ তিনি রেগে ওঠেন। কটমট করে তাকিয়ে বলেন, 'কেবল বাজে প্যানপ্যানানি। দুনিয়াটা কোন্ তালে ঘুরছে বুঝতে পারছ না।'

কান্না থামিয়ে কথাগুলো শোনবার পর আবার ঝরঝর করে চোখের পানি ছেড়ে দেন রোকেয়াবানু। কেননা, তিনি কিছু বুঝতে পারেন না, এ অপবাদ জীবনে এই প্রথম!

বিসর্জন

নিমাই ভট্টাচার্য

আদিকালে রাজা-মহারাজা, বাদশা-শাহেনশার দরবারে সভাকবির দল থাকতেন। তাঁরা রাজার কথা লিখতেন, ছোটরাণী, বড়রাণীর কথা লিখতেন। লিখতেন আরো কিছু। লিখতেন, রাজ্যের কথা, রাজ্যশাসনের কথা, রাজ্যের খ্যাতিমান পুরুষদের কথা। আর লিখতেন রাজার মহানুভবতার, রাণীমার ঔদার্যের কাহিনী। মাঝে মাঝে রাজকুমারের মৃগয়ার কথা বা অষ্টাদশী পূর্ণযুবতী রাজকুমারীর রূপ-যৌবনের কাহিনী নিয়েও সভাকবির দল লিখতেন। সময়ে-অসময়ে আরো অনেক কিছু লিখতে হত। শত্রুপক্ষের নিন্দা করে কাব্যরচনা করতে হত সভাকবিদের। কখনো কখনো সুরাপানের প্রয়োজনীয়তা বা উপকারিতা নিয়েও লিখতেন তাঁরা। রাজার মনোরঞ্জনের জন্য দেহপসারিণী নাচিয়ে গাইয়েদের নিয়েও চমৎকার কাব্যরচনা করে গেছেন অতীত যুগের ঐ সব সভাকবির দল।

অতীতকালের ইতিহাসের টুকরো টুকরো ছেঁড়া-পাতাগুলো খুঁজলে সভাকবিদের বিস্ময়কর প্রতিভার আরো অনেক পরিচয় পাওয়া যাবে। এই সভাকবিদের টুকরো টুকরো কাব্যকে অবলম্বন করে পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকরা ইতিহাস লিখেছেন। সে ইতিহাস আমরা মুখস্থ করে পরীক্ষায় পাশ করছি, কিন্তু ভুলে গেছি সভাকবিদের। শুধু যে তাঁদের আমরা ভুলে গেছি, তা নয়। সভাকবিদের জীবন-কাহিনী সম্পর্কে আমাদের অবজ্ঞা আমাকে বড়ো পীড়া দেয়, সভাকবিদের রচনা নিয়ে আমরা হৈ-চৈ করি, কিন্তু তাঁদের জীবনে কোনদিন সুখ-দুঃখ, ভালবাসা-ব্যর্থতা নিয়ে আলো-আঁধারের খেলা হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে আমাদের কোন আগ্রহ নেই। সভাকবিরা সব কিছু লিখেছেন, লেখেননি শুধু নিজেদের কথা। হয়তো নিজেদের সুখ-দুঃখ, প্রেম-ভালবাসার জ্বালায় তাঁরা জ্বলে পুড়ে মরেছেন, কিন্তু সে কাহিনী লেখার সুযোগ কোনদিন তাঁদেব জীবনে আসেনি।

আমরা খবরের কাগজের রিপোর্টাররাও হচ্ছি এ যুগের সভাকবির দল। আমরাও রাজার কথা লিখি, মন্ত্রীর কথা লিখি, রাজার মহানুভবতা রাণীমার ঔদার্যের কথা, রাজ্যের কথা, রাজার বন্ধুদের কথা লিখি। অতীতের সভাকবিদের কাব্যের মত আজকের দিনের খবরের কাগজের রিপোর্টারদের টুকরো রিপোর্টকে কেন্দ্র করে আগামী দিনের ঐতিহাসিকরা নিশ্চয়ই আজকের ইতিহাস লিখবেন। আগামী দিনের মানুষ সে ইতিহাস হয়তো মুগ্ধ হয়ে পড়বেন, কিন্তু মুহূর্তের জন্যও কেউ স্মরণ করবেন না রিপোর্টারদের।

. সভাকবিদের টুকরো টুকরো কাব্যের মধ্যে দিয়ে যেমন অতীতের বহুমানুষের জীবন-কাহিনীর একটা পরিষ্কার ছবি পাওয়া যায়। আজকের দিনের রিপোর্টারদের টুকরো টুকরো রিপোর্টের মধ্য দিয়েও তেমনি বহু মানুষের জীবন কাহিনীর একটা পূর্ণাঙ্গ ছবি ফুটে উঠবে। রিপো[illegible]দের কলমে বা টাইপ-রাইটারে আজ যিনি ছাত্র নেতা বা ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম ক[illegible]। [illegible]মী দিনে তিনিই হয়তো মন্ত্রী। মাঝখানে তাঁর কারাবরণের কথা ও মুক্তিলাভের খবর[illegible] ঐ একই টাইপ-রাইটারে লেখা হয়। শুধু কি তাই? ঐ একই রিপোর্টার হয়তো মন্ত্রীর

পদত্যাগ, মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি, তার তদন্ত, তদন্তের খবর ফাঁস, সরকার কর্তৃক তদন্তের রিপোর্ট নাকচ, মন্ত্রীর দলত্যাগ, আবার পুরোনো দলে ফিরে আসা, মন্ত্রীর বিদেশ ভ্রমণ, তাঁর প্রতিদিনের কাজকর্ম, এমন কি তাঁর প্রেম, বিয়ে বা নার্সিংহোমে পুত্রসন্তান জন্মের খবরও ঐ রিপোর্টারের কলমেই লেখা হয়। অদৃষ্টের পরিহাস ঐ মন্ত্রীর মৃত্যুর সংবাদও হয়তো একই রিপোর্টারের টাইপ-রাইটারে লেখা হবে। দীর্ঘদিনের বিস্তীর্ণ পরিবেশে লেখা এইসব টুকরো টুকরো খবর জুড়লে নিশ্চয়ই একটা জীবন-কাহিনীর পূর্ণ রূপ দেখা যাবে। রিপোর্টারের দল সবার অলক্ষে হয়তো নিজেদেরও অজ্ঞাতসারে অসংখ্য মানুষের জীবন-কাহিনী লিখে যান। অতীতের সভাকবিদের মত আজকের দিনের খবরের কাগজের রিপোর্টাররাও লেখেন না শুধু নিজেদের কথা, নিজেদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-ভালবাসা, আনন্দ-বেদনার ইতিহাস।

তাইতো নির্মলদার ইতিহাস হয়তো কেউ জানবেন না, কেউ একফোঁটা চোখের জল ফেলবেন না, কেউ তাঁর জীবনের আনন্দ বেদনার উষ্ণতা অনুভব করবেন না নিজেদের অন্তরে। নির্মলদার জীবন নাট্যে আমি অভিনয় করিনি, উইং স্ক্রীনের পাশ থেকে প্রম্পটারের কাজ করিনি, গ্রীনরুমেও যাইনি। তবে অদৃষ্টের পরিহাসে দুটি প্রাণীর জীবন নাট্যের চরম কয়েকটি দৃশ্যের একমাত্র দর্শকরূপে আমি তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলাম।

নির্মলদা ও নির্মলাবৌদি দীর্ঘ ও বিচিত্র জীবনপথ পাড়ি দিয়েছিলেন। এক পান্থশালা থেকে আরেক পান্থশালায় গিয়েছেন ওঁরা দুজনে। আমি তাঁদের সহযাত্রী হবার গৌরব অর্জন করিনি, কিন্তু ওঁদের জীবনপথের পান্থ-সীমার এক পান্থশালায় মাত্র কয়েকটি স্মরণীয় রাত্রির জন্য আমি সঙ্গী হয়েছিলাম। ধন্য হয়েছিলাম ঐ দুটি মহাপ্রাণের কাছে এসে। ওদের দুজনের ভালবাসার আত্মতৃপ্তিতে আমি আমার অন্তর ভরিয়েছিলাম। অতর্কিত আক্রমণ করে ঐ দুটি প্রাণীর স্নেহ ভালবাসা দশ হাতে লুটপাট করে নিয়েছি, কিন্তু তার বিনিময়ে শুধু ক'ফোঁটা চোখের জল ছাড়া আর কিছু দিতে পারিনি আমি। নির্মলাবৌদি তার হৃদয় ঔদার্যে আমার হৃদয়-কার্পণ্য ক্ষমা করলেও আমি নিজের বুকের মধ্যে প্রতিনিয়ত একটা অসহ্য জ্বালা অনুভব করি। কাজকর্মের অবসরে নিজের অজ্ঞাতে আজও দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে আমার বুকটাকে ভারী করে তোলে, মনটাকে পীড়িত করে। মানুষকে আমি ভালবাসি। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় অসংখ্য মানুষের সংস্পর্শে এসে আমি ধন্য হয়েছি, কিন্তু কেন জানিনা মানুষের যত কাছে এসেছি, ততই তাঁদের সুখ-দুঃখের ঝঙ্কার এমন তীব্রভাবে আমার অন্তরে বেজেছে যে, বেদনা অনুভব করেছি।

গত বছরের মত এবারেও লণ্ডন এয়ারপোর্টে শুধু একটি প্রাণীই আমাকে রিসিভ করতে এসেছিলেন। বন্ধু-বান্ধব বা বান্ধবীদের আমার যাবার কথা জানাই কিন্তু ঠিক করে কোন্ ফ্লাইটে কটার সময় কোথা থেকে লণ্ডনে পৌঁছাচ্ছি, সে কথা জানাই না। লণ্ডনের মাটিতে পা দিয়ে প্রথমে আমি শুধু একটি প্রাণীকেই দেখতে চাই, তাঁকে প্রণাম করতে চাই, তাঁর বুকে আত্মসমর্পণ করতে চাই। লণ্ডনে পৌঁছে প্রথম কয়েকটি আনন্দ বেদনাতুর মুহূর্তে আমাদের দুজনের মাঝখানে হাইফেনের মত অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে আমি কল্পনা করতে পারি না। তাইতো এবারে সবাইকে জানিয়েছিলাম কমনওয়েলথ প্রাইম মিনিস্টার্স কনফারেন্স কভার করতে লণ্ডন আসছি। কিন্তু দাস ফার, নো ফারদার। শুধু নির্মলাবৌদিকে লিখেছিলাম—

'বৌদি'।

আমি আসছি। ১১ই জুন সুইস এয়ার ফ্লাইটে জুরিখ থেকে বিকেল চারটে কুড়িতে লণ্ডন পৌঁছব। ক'দিন আবার দুজনে কাঁদব, গাইব, বেড়াব। কেমন? প্রণাম নিও।

তোমার ঠাকুরপো'

চিঠি পাবার পরই নির্মলাবৌদি আমার জন্য ঘরদোর ঠিক করতে লেগে পড়েছিলেন। আমি ঠিক যা যা চাই, যা কিছু ভালবাসি, তার আয়োজন সম্পূর্ণ করেছিলেন আমি আসার ক'দিন আগেই। এগারোই জুন বারোটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া সেরে তিনটে বাজতে না বাজতেই নির্মলাবৌদি এয়ারপোর্টে হাজির হয়েছিলেন। আমি কাস্টমস এনক্লোজারে ঢুকতেই দেখলাম বেরুবার রাস্তায় দেওয়ালে মাথাটা ভর দিয়ে একটু কাত হয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আমার নির্মলাবৌদি। আমি হাত তুলে ইশারা করলে উনি একটু হেসে হাত তুলে প্রত্যুত্তর দিলেন আমাকে। তারপর কয়েক মিনিট পরে কাস্টমস্ চেক্ শেষ করে বেরিয়ে আসতেই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলাম নির্মলাবৌদিকে। বৌদিও দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন আমাকে। দু এক মিনিট পরে ক'ফোঁটা চোখের জল আমার গালে গড়িয়ে পড়তে খেয়াল হল বৌদি নিশ্চয়ই কাঁদছেন। হাত দুটোকে ছাড়িয়ে নিয়ে বৌদির চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বললাম, 'ছিঃ বৌদি, তুমি কাঁদছ? এত দূর থেকে এলাম তোমার কাছে সে কি তোমার চোখের জল দেখবার জন্য?'

ঠোঁটের কোণে একটু হাসির রেখা ফোটাবার চেষ্টা করে বৌদি বললেন, 'না না, ঠাকুরপো কাঁদছি কোথায়?'

'শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা কোরো না বৌদি।'

চোখের জল বন্ধ হল, কিন্তু চোখের মণিদুটো স্থির করে এমন উদাস দৃষ্টিতে বৌদি চাইলেন যে, আমার বুকের মধ্যে জ্বালা করে উঠল। নীচের ঠোঁটটা কামড়াতে কামড়াতে খুব ধীর স্থির আস্তে বৌদি বললেন, 'ঠাকুরপো, তুমিও যেমন আমাকে পেয়ে আনন্দ পাও, আমিও তেমনি তোমাকে কাছে পেয়ে অনেক শান্তি পাই। আজ তুমি ছাড়া আমার ঘর আলো করার আর কে আছে বলতে পার?'

'ঠিক বলেছ বৌদি। তোমার ঘরে, তোমার মনে, তোমার জীবনে আর কোনদিন সূর্যের আলো পড়বে না বলে তুমি আমার মত একটা মাটির প্রদীপকে ধন্যবাদ জানাচ্ছ?'

'তুমি মাটির প্রদীপ হলেও আমার এই জমাট বাঁধা অন্ধকার জীবনে তার অনেক প্রয়োজন, অনেক দাম। তাই না ঠাকুরপো?'

আর বেশি কথা না বলে এয়ারপোর্ট থেকে বৌদির বাসায় গিয়েছিলাম। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে ডানদিকের ঘরে ঢুকতেই টেবিলের ওপর নির্মলদার কলম, পেন্সিল, টাইপ রাইটার, নোটবই হাতঘড়ি আর একটা ছবি দেখতে পেলাম। বছর পাঁচেক আগে যেদিন সন্ধ্যায় এই বাড়িতে প্রথম পদার্পণ করি, সেদিনও ঠিক এমনি করেই সাজানো ছিল। ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্রও ঠিক এমনিই ছিল। আজকের সঙ্গে সেদিনের বিশেষ কোন পার্থক্যই ছিল না। তবে হ্যাঁ, সেদিন এই ঘরের মালিক নির্মলদা ছিলেন, আজ তিনি নেই। আর শুধু একটা পরিবর্তন নজরে পড়ল। সেদিন নির্মলদার ফটোটায় ফুল চন্দন ছিল না, আজ ছিল। পাঁচ বছর আগে নির্মলা-বৌদি নির্মলদাকে পুজো করতেন, আজ পুজো করেন তাঁর ঐ ফটোটাকে। নির্মলদার টাইপ-রাইটার একটু খুললাম। ফটোটাকে হাতে তুলে নিলাম। মিনিট খানেকের মধ্যেই চোখের দৃষ্টিটা ঝাপসা হয়ে উঠল, তারপর ধীরে ধীরে অজস্র ধারায় নেমে এল চোখের জল। আমাকে সান্ত্বনা জানাবার শক্তি বৌদির ছিল না। তিনিও আমারই মতন অতীত স্মৃতির ঝড়ে পথ হারিয়েছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ বাদে বৌদি বললেন, 'ঠাকুরপো।'

'কি বৌদি।'

'প্রথম যেদিন এ বাড়িতে তুমি এসেছিলে সেদিনের কথা মনে পড়ে?'

নির্মলদার স্মৃতিতে আমার মানসিক অবস্থা ঠিক স্বাভাবিক ছিল না। মুখে কোন উত্তর দিতে পারিনি, শুধু মাথা নেড়ে জানিয়েছিলাম, হ্যাঁ মনে পড়ে। বৌদির পাশে দাঁড়িয়ে

নির্মলদার ফটোটার মুখোমুখি হয়ে শুধু পাঁচ বছর আগের কথাই নয়, আরো অনেক কথা, অনেক স্মৃতি আমার মনে সেদিন ভীড় করে এসেছিল।

আমি ঠিক নির্মলদার সহকর্মী না হলেও আমাদের মধ্যে বেশ একটা হৃদ্যতা, ভ্রাতৃত্বের ভাব ছিল। বহু ট্যুরে আমরা দুজনে একসঙ্গে থেকেছি, বহু ঐতিহাসিক খবর দুজনে একসঙ্গে কভারও করেছি। দুজনের মধ্যে বেশ খানিকটা বয়সের পার্থক্য থাকায় খুব গভীরভাবে নির্মলদাকে কাছে টানতে পারিনি। আমি কলকাতা ছাড়ার পর শুনলাম নির্মলদা হঠাৎ অন্য একটা কাগজের ফরেন করেসপনডেন্ট হয়ে কায়রো গেছেন। বছর দুই পরে বেইরুটে এক বন্ধু-গৃহে নির্মলদার সঙ্গে আমার দেখা। তারপর দুজনের দেখা হয় যুগোশ্লোভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে। দুজনেই নন্ অ্যালাইনমেণ্ট কনফারেন্স কভার করতে গিয়েছিলাম। একই হোটেলে প্রায় পাশাপাশি ঘরে ছিলাম।

নির্মলদাকে নানাভাবে নানা জায়গায় দেখেছি। দেখেছি কাছ থেকে, দেখেছি দূর থেকে। বেশ লাগত নির্মলদাকে। ওর হাসি খুশী ভরা মুখখানা আমাকে অনেক সময়ে অনুপ্রেরণা দিত। বহু বিষয়ে নির্মলদার আগ্রহ ছিল, কিন্তু কোনদিন কোন অবস্থাতেই মেয়েদের বিষয় তাঁর কোন আগ্রহ দেখতে পাইনি। তাছাড়া নির্মলদার আর একটা বৈশিষ্ট্য আমার কাছে একবার নয়, দুবার নয়, বহুবার ধরা পড়েছিল। মাঝে মাঝেই উনি যেন কোথায় তলিয়ে যেতেন, অনেক চেষ্টা করেও ওঁকে খুঁজে পেতাম না। সন্দেহ হত হয়তো কোন রহস্য আছে, কিন্তু চেষ্টা করেও বুঝতে পারিনি।

খবরের কাগজের রিপোর্টাররা বিভিন্ন কাগজে কাজ করলেও নিজেদের মধ্যে পারিবারিক হৃদ্যতার মত মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সুখে দুঃখে পাশাপাশি না চললে আমাদের বেঁচে থাকাই মুশকিল। এইত বিজয়দার বোন উমার বিয়েতে ওদের ব্যারাকপুরের বাড়িতে তমাল বা পূর্ণেন্দু যা করল, তা দেখে কেউ ভাবতে পারল ওরা ঐ পরিবারের কেউ নয়? কেউ কি জানতে পারল ওদের কাগজের মধ্যে দারুণ লড়াই? রিপোর্টারদের লেখার সঙ্গে তাদের ব্যক্তিগত জীবনের কোন সম্পর্ক নেই। এইত মান্নার বাবা মারা গেলে বলাইদা যা করলেন বা অধীরদার মেয়ের বিয়ের জন্য ছেলে দেখা থেকে শুরু করে সবকিছুই তো রমেশদা করলেন কিন্তু কেউ বুঝতে পারবে না, কেউ জানতে পারবে না ওরা সহকর্মী পর্যন্ত নন। রিপোর্টারদের মধ্যে এমন একটা অচ্ছেদ্য বন্ধন থাকা সত্ত্বেও কোন প্রবীণ রিপোর্টারকেও নির্মলদার বিয়ের জন্য অনুরোধ করতে দেখিনি। আমার বেশ একটু আশ্চর্য লাগত। নিজের মনে মনেই প্রশ্ন করতাম, কিন্তু কোন উত্তর খুঁজে পেতাম না। দীর্ঘদিন পরে স্বয়ং নির্মলদার কাছ থেকেই প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিলাম।

বেলগ্রেডে যখন নির্মলদার সঙ্গে দেখা হল, তখন উনি লণ্ডনে পোস্টেড। তাই লণ্ডন যাবার পথে আমি নির্মলদার সহযাত্রী হলাম। পথে ক'দিনের জন্য দুজনেই বার্লিন গেলাম। কেম্পিনিস্কি হোটেলে দুজনে একই ঘরে ছিলাম। দীর্ঘদিনের পরিচয়ের পরিপ্রেক্ষিতে দুজনের একত্রে বার্লিন বাস এক বিচিত্র গাঁটছড়া বেঁধে দিল আমাদের মধ্যে। দুটি মানুষের মধ্যে পরমাত্মীয়ের সম্পর্ক গড়বার জন্য সতেরো দিন মোটেই দীর্ঘ সময় নয়, কিন্তু অত্যন্ত নিবিড় করে মেশবার জন্য আমার আর নির্মলদার মধ্যে এক প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল। তাই তো বার্লিন ত্যাগের আগের দিন নির্মলদা হঠাৎ আমাকে বললেন, 'বাচ্চু তুই তোর লণ্ডনের হোটেল রিজার্ভেশন ক্যানসেল করে একটা টেলিগ্রাম করে দে।'

একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন নির্মলদা?'

'কেন আবার? তুই আমার কাছেই থাকবি।'

হোটেলের রিসেপশন কাউন্টারে টেলিগ্রামটা দেবার সময় নির্মলদাও একটা টেলিগ্রাম পাঠালেন। কাকে, কোথায়, কিজন্য পাঠালেন, তা বুঝতে পারলাম না। ফ্রাঙ্কফুর্ট হয়ে লণ্ডন পৌঁছবার পর জেনেছিলাম ঐ টেলিগ্রামটা নির্মলা-বৌদিকে পাঠিয়েছিলেন।

লণ্ডন এয়ারপোর্ট কাস্টমস থেকে বেরিয়ে আসতেই একজন সুদর্শনা মহিলা ধীর পদক্ষেপে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে নির্মলদার হাত থেকে টাইপ-রাইটার আর কেবিনব্যাগটা নিয়ে নিলেন। তারপর কপালে চিন্তার রেখা ফুটিয়ে টানা চোখ দুটোকে একটু কুঁচকে নির্মলদার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, তুমি কি কোনদিন আমাকে শান্তি দেবে না?'

সামনের দিকে এগোতে এগোতে একটু হেসে, একটু অবাক হয়ে নির্মলদা পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'কেন বল তো?'

'আবার জিজ্ঞাসা করছ কেন? আজকে তোমার ফেরার কথা?'

'কেন, টেলিগ্রাম পাওনি?'

'নিশ্চয়ই একশোবার পেয়েছি, কিন্তু তোমার না সোমবার আসার কথা?'

একগাল হাসি হেসে নির্মলদা বললেন, 'ওঃ, এই কথা।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, এই কথা।'

আমি বেশ বুঝতে পারলাম সোমবার নির্মলদার লণ্ডনে ফেরার কথা ছিল এবং কদিন যে দেরী করে আসছেন, সে খবরও জানাননি। স্বাভাবিক ভাবেই বৌদির সেজন্য চিন্তা হয়েছে। ট্যাক্সির কাছে এসে নির্মলদার খেয়াল হল আমার সঙ্গে বৌদির পরিচয় করিয়ে দেননি। বৌদির ডান হাতটা টেনে ধরে বললেন, 'রাধা তোমার সঙ্গে বাচ্চুর পরিচয় করিয়ে দিইনি।'

নির্মলদাব দিকে ফিরে বৌদি বললেন, 'সেসব কাণ্ডজ্ঞান কি তোমার আছে?' এবার আমার দিকে ফিরে বললেন, 'এস ভাই ট্যাক্সিতে ওঠ।'

তিনজনে ট্যাক্সিতে উঠে পড়লাম। ট্যাক্সির মধ্যে আমাদের অনেক কথা হয়েছিল, সে সব আজ আর মনে নেই। তবে মনে আছে বৌদি একবার বাঁকা চোখে নির্মলদার দিকে তাকিযে পরে আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'বিয়ে করেছ?'

'না বৌদি।'

'বিয়ে কোর না।'

'কেন বলুন তো?'

'কেন আবার? বিয়ে করলে তো আমারই মত তাঁকেও যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে।'

উত্তর-পশ্চিম লণ্ডনের হেণ্ডন সেন্ট্রালে নির্মলদার ফ্ল্যাটে আমার দিনগুলো বেশ কাটছিল। এত ভাল আমি কাটাতে চাইনি, কিন্তু অদৃষ্টের যোগাযোগে এড়াতে পারি নি। হিসাব-নিকাশে ভগবানের ভুল নেই। সেদিনের সব আনন্দের জের সুদে-আসলে তিনি আজ আদায় করছেন। কিন্তু আমি অসহায়।

নির্মলদা ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে যেতেন। আমি তিনবাব বেড-টি খেয়েও উঠতে চাইতাম না। বৌদি, কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে এক-একবাব হাঁক মাবতেন, 'ঠাকুরপো, উঠুন ভাই। অনেক বেলা হয়ে গেল।' আমি কোন জবাব না দিয়ে বালিশটাকে আরো একটু আদর করে জড়িয়ে পাশ ফিরে শুতাম। শেষকালে অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর আমি পাশ ফিরে জিজ্ঞাসা করতাম, 'কিছু বলছেন?'

চোখের কোণে হাসি ফুটিয়ে মুখের চারপাশে গাম্ভীর্যের ভাব এনে বৌদি বলতেন, 'বাপরে বাপ, তোমরা এত ঘুমোতেও পার।'

'সকালবেলায় উঠতে না উঠতেই বহুবচন দিয়ে গালাগালি দিতে শুরু কবলেন।' তারপর বৌদির মুখটা কাছে টেনে নিয়ে কানে কানে ফিসফিস করে বলতাম, 'কেন, নির্মলদারও বুঝি খুব বেশি ঘুম?'

চট করে বৌদি মুখটা টান দিয়ে বলতেন, 'বাচ্চু! কানটি মলে দেব।'

'উইথ প্লেজার। কিন্তু প্রশ্নের উত্তর দেবেন।'

বৌদি আমার কথায় কান না দিয়ে উঠে যেতে গেলেই আমি তাঁর শাড়ির আঁচল ধরে টান দিয়ে কাছে টেনে নিতাম।

'জানেন তো বৌদি, প্রাইম মিনিস্টারকেও রিপোর্টারের প্রশ্নের জবাব দিতে হয়।'

বৌদি বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা দেখিয়ে বলতেন, 'বেখে দাও তোমাদের রিপোর্টাবী চালিয়াতি। মাঝে দু'বছর ছাড়া আজ আঠারো বছর ধরে রিপোর্টার দেখছি। ওসব ভয় আমাকে দেখিও না।'

শেষপর্যন্ত দুজনেই মিটমিট করে নিতাম। বৌদি একটা গান শোনালেই আমি উঠে পড়তাম।

কাজকর্ম সেরে আমার ফিবতে রাত হত। কিন্তু নির্মলদা সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে ফিবে আসতেন। খুব জরুরী কাজ না থাকলে সন্ধ্যার পর কোনদিন তিনি বেরোতেন না।

আমি ফিরলে তিনজনে একসঙ্গে ডিনার খেতে বসতাম। খেতে বসে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডেব আলোচনা শেষ করে উঠতে অনেক রাত হত। কিন্তু তখনও আমাদের আসব ভাঙত না। ফায়ার প্লেসের ধারে আমরা দুজনে সিগারেট টানতাম, আর বৌদি শোনাতেন গান। একটা দুটো নয়, ডজন ডজন গান শোনাতেন বৌদি। এত গান শোনার পরও হয়তো নির্মলদা বলতেন, 'রাধা, সেই গানটা শোনাবে?'

'কোন গান?'

'সেই যে— নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে। হৃদয় তোমাবে পায় না জানিতে, হৃদয়ে রয়েছ গোপনে।'

বৌদি কোন উত্তর দিতেন না; শুধু-ভাব-ভবা চোখে একবার চাইতেন নির্মলদার দিকে। তারপর গাইতেন গান।

কবে, কখন ও কেন বৌদিকে 'তুমি' বলে ডাকতে আরম্ভ করেছিলাম, তা আজ মনে নেই। মনে আছে শুধু সেই কটা দিনের স্নেহভরা মধুর স্মৃতি। নির্মলদার ঔদার্য ও বৌদির স্নেহে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ওদের দুটি জীবনের মাঝে আমিও আমার একটা ঠাঁই খুঁজে পেলাম।

ক'দিন থাকার পরই জানতে পারলাম বৌদির নাম কৃষ্ণা। একদিন রাত্রিরে কথায় কথায় হঠাৎ নির্মলদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি বৌদিকে রাধা বলে ডাকেন কেন?'

'কেন আবার? পরস্ত্রীকে তো এর চাইতে ভাল নামে ডাকা যায় না।'

মুহূর্তের মধ্যে বৌদির মুখটা লাল হয়ে উঠল, দুজনের দৃষ্টি বিনিময়ও হল। আমি এ-সব নজর করেছিলাম, কিন্তু গুরুত্ব দিইনি। বৌদির সিঁথিতে সিঁদুর দেখিনি। তবে আশ্চর্য্য হইনি কারণ লণ্ডন প্রবাসী কোন মেয়েই সিঁদুর পরে না বললেই চলে।

বছর দেড়েক পর রাষ্ট্রপতির ব্রিটেন সফর কভার করার জন্য আমি লণ্ডন গেলাম। রাষ্ট্রপতির সফর শেষে ক'দিন নিরিবিলি লণ্ডনবাস করার জন্য আমি আবার হেণ্ডন সেণ্ট্রালে নির্মলদার ফ্ল্যাটে বৌদির সংসারে আশ্রয় নিলাম। সেবার একটু ভাল করে দেখলাম। ড্রইং রুমে রাত্তিরের গানের আসর ভাঙার পর দুজনকে দুটি ঘরে চলে যেতে দেখলাম। গভীব রাতে চুরি করেও দেখেছি, দেখেছি দুজনকে দু'ঘরে গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকতে। মনে একটু খটকা লেগেছিল। কিন্তু সেটা নিতান্তই খটকা, তার বেশী নয়। ইতিমধ্যে বৌদি নির্মলদার

স্ত্রী বলে আমি তাঁর নাম দিলাম নির্মলা। ডিনার-টেবিলে। এই নামকরণ উৎসবের সময় দুজনেই একটু মুচকি হেসেছিলেন। বোধকরি এই নামকরণ উৎসবের পরই নির্মলদা ও নির্মলা-বৌদি স্থির করেছিলেন, আর দেরি করা ঠিক নয়। তাই তো রাত্তিরে ফায়ার-প্লেসের ধারে বসে নির্মলদা ওঁদের দুজনের অতীত জীবন-কাহিনী শুনিয়েছিলেন।

হাওড়া মধুসূদন পালচৌধুরী লেনের নির্মলদা ও নির্মলা-বৌদিদের বাড়ি প্রায় পাশাপাশি। দুটি পরিবারের মধ্যে গভীর হৃদ্যতাও ছিল। শৈশবে নির্মলদার মা মারা গেলে কিছুকাল বড়পিসির তদারকেই ছিলেন। বড়পিসির বিয়ে হবার পর নির্মলদার জন্য তাঁর বাবা বড়ই চিন্তায় পড়লেন। তখন নির্মলা-বৌদির ঠাকুমা বললেন, 'আরে, এরজন্য আবার চিন্তা কি? ও আমার কাছেই থাকবে।'

তখন নির্মলদার বয়স বছর আট কি নয় হবে। পরে নির্মলদাদের সংসারে তাঁর কাকিমা এসেছিলেন, কিন্তু এই মাতৃহীন শিশুটি সম্পর্কে তিনি বিশেষ আগ্রহ দেখালেন না। নির্মলদা ঐ ঠাকুমার স্নেহছায়ায় থেকে গেলেন। স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকলে নির্মলদা নিজেদের বাড়িতে থাকলেও আত্মার যোগাযোগটা কমল না। দুনিয়ার সবাই শুধু এইটুকুই জানত, কিন্তু কেউ জানত না ঐ অতগুলো মানুষের ভীড়ের মধ্যেও দুটি আত্মা সবার কল-কোলাহল থেকে বহুদূরে নিজেদের একটা ছোট্ট দুনিয়া রচনা করেছে। বিপন কলেজ থেকে ইকনমিক্সে অনার্স নিয়ে পাশ করার পর নির্মলদা ইকনমিক্সে এম্-এ. পড়বার জন্য ইউনিভার্সিটিতে ঢুকলেন। মাস ছয়েক পরে হাওড়া ব্রীজের কোণায় এক দুর্ঘটনায় বাবা মারা গেলেন। ঠাকুমার স্নেহের স্পর্শে ও শুভাকাঙ্ক্ষীদেব ভালবাসায় সে-দুঃখও নির্মলদা ভুলেছিলেন। কিন্তু রেজাল্ট খুব ভাল হল না, সেকেণ্ড ক্লাস পেলেন।

এদিকে রেজাল্ট বেরোবার আগে থেকেই নির্মলদা পাড়াব দত্তদার সূত্রে ডেইলি টাইমস পত্রিকায় যাতায়াত শুরু করেছিলেন। রেজাল্ট বেবোবার পর পাকাপাকি ভাবে রিপোর্টারেব কাজে লেগে পড়লেন।

তিন বছর পরে নির্মলাবৌদিও বি. এ. পাস করলেন, কিন্তু বাড়ির কেউ এম. এ. পড়াতে চাইলেন না। সবাই বললেন, আরো পড়ালে ভাল পাত্র পাওয়া মুসকিল হবে। পাত্র-নির্বাচন-পর্ব প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে এলে নির্মলদা আর দেরি করলেন না। একদিন একটু আড়ালে ঠাকুমাকে বললেন, 'আম্মা, এ বিয়ে দিও না। কিনু সুখী হবে না।'

ঠাকুমা একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, 'কেন রে?' ঠাকুমার বিশেষ আপত্তি ছিল না, কিন্তু নির্মলাবৌদির মা কিছুতেই রাজী হলেন না। স্ত্রীর চাপে পড়ে নির্মলাবৌদির বাবাও আপত্তি করলেন। নির্মলাবৌদি অনেক কান্নাকাটি করেছিলেন কিন্তু কিছু ফল হয়নি। বন্ধু-বান্ধব নির্মলদাকে পরামর্শ দিয়েছিল নির্মলাবৌদিকে নিয়ে বোম্বে বা দিল্লী মেলে চেপে পড়তে, কিন্তু নির্মলদা রাজী হন না। শুধু বলেছিলেন, 'তা হয় না রে'। যাঁদের দয়ায় আজ আমি এতদূর এসে পৌঁছেছি, তাঁদের এ সর্ব্বনাশ করা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না।'

পরবর্তী সাতাশে শ্রাবণ মাঝরাতের এক লগ্নে এঞ্জিনিয়ার সুকুমারবাবুর সঙ্গে নির্মলাবৌদির বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ে বাড়ীর রোশনাই আলোর চেকনাইতে কেউ জানল না দুটি আত্মা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

নির্মলাবৌদি সুকুমারবাবুর হাত ধরে হাজারিবাগে রওনা হবার কয়েকদিনের মধ্যেই নির্মলদা ছুটি নিয়ে বম্বে রওনা হয়ে গেলেন। বম্বের ডেইলি এক্সপ্রেসের এডিটর মিঃ রঙ্গ-স্বামীর সঙ্গে একবার একটা প্লেনের উদ্বোধনী যাত্রায় একত্রে জাপান গিয়েছিলেন।

নির্মলদাকে তাঁর বেশ ভাল লেগেছিল এবং ভাল অফারও দিয়েছিলেন। তখন সে অফার নেওয়া নির্মলদার পক্ষে সম্ভব হয়নি কিন্তু অতীতের ঐ সূত্র ধরেই আজ উনি বোম্বে

গেলেন। সপ্তাহখানেক বসে থাকার পর মিঃ রঙ্গস্বামী জানালেন, দিল্লী বা বম্বেতে কোন ওপেনিং নেই, তবে কায়রোতে স্পেশাল করেসপনডেণ্টের পোস্টটা খালি আছে। নির্মলদা হাসিমুখে সে অফার গ্রহণ করে দিন পনেরোর জন্য কলকাতা ফিরে এলেন।

পনেরো দিন বাদে আম্মাকে প্রণাম করে নির্মলদা বি. ও. এ. সির প্লেনে কায়রো রওনা হলেন। তিন বছর বাদে মস্কো বদলি হওয়ার সময় একমাসের জন্য হোম লিভ পেয়েছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণাবিহীন হাওড়ার কোন টান না থাকায় দেশে আসেন নি। আবার তিন বছর মস্কোয় কাটালেন নির্মলদা। তারপর বদলি হলেন লণ্ডনে।

'...জানিস বাচ্চু, তখন সবে লণ্ডন এসেছি। একদিন ইণ্ডিয়া হাউসের এক রিসেপশন থেকে ফেরার সময় অকস্মাৎ চ্যারিংক্রশ টিউব স্টেশনে রাধার সঙ্গে দেখা। ওব বিয়ের আট বছর পরে ওকে লণ্ডনে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। তোর বৌদি সে রাত্তিরে আর নিজের ফ্ল্যাটে ফিরল না, আমার সঙ্গে এল। আট বছরের জমাট বাঁধা ইতিহাস দুজনে দুজনের কাছে তুলে ধরলাম। হাওড়ার সঙ্গে কোন যোগাযোগ না থাকায় আমি কিছুই জানতাম না। জানতাম না বিয়ের দেড় বছর বাদে জীপ দুর্ঘটনায় সুকুমারবাবু মারা গেছেন। বিধবা হবার পর তোর বৌদির কোন ইচ্ছার কোন প্রতিবন্ধক এল না। বাবা, মা, আম্মা সবাই মত দিলেন। থাক্, বিলেতে গিয়েই পড়াশোনা করুক। তারপর একদিন ও লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স থেকে পাস করে বেরুল। তারপর দিনের পর দিন, রাতের পর রাত দুজনে মিলে অনেক ভেবেছি, অনেক আলোচনা করেছি, শুধু কি তাই? দুজনে মিলে অনেক চোখের জল ফেলেছি। রিজেণ্ট পার্কের বেঞ্চগুলো হয়তো আজও সে চোখের জলে ভিজে আছে। ভাবতে ভাবতে কোন কূল-কিনারা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত দুজনে ঘর বেঁধেছি, আর এই তিনটি বছর স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় করে চলেছি দুজনে।

নির্মলদা একটা পাঁজর কাঁপানো দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেন। ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে বৌদিও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। হয়তো আমারও একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়েছিল কিন্তু ঠিক মনে নেই।

...'যাকে সারা জীবন ধরে নিজের জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে দেবার স্বপ্ন দেখেছি, যার রক্তের সঙ্গে নিজের রক্ত মিশিয়ে সন্তানের হাসিমুখ দেখার ছবি এঁকেছি মনে মনে, তাকে নিয়ে এই অভিনয় করা সে কি অসহ্য, সে কথা তুই বুঝবি না বাচ্চু।'

উত্তেজনায় আমার হাতটা চেপে ধরলেন নির্মলদা। বললেন, বিশ্বাস করে বাচ্চু, আজ আর তোর কাছে মিথ্যা কথা বলব না। মাঝে মাঝে সমস্ত ন্যায়-অন্যায়ের কথা ভুলে গিয়ে রাতের অন্ধকারে তোর বৌদির ঘরে ঢুকে পড়েছি। দু-একদিন হয়তো হিংস্র পশুর মত ঝাঁপিয়ে পড়েছি, কিন্তু তারপর কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এসেছি নিজের ঘরে। কখনও কখনও আমি ঘুমিয়ে পড়ার পর তোর বৌদি চুরি করে আমার পাশে শুয়ে থেকেছে, আমাকে আদর করেছে, আমার মুখে মুখ রেখে কেঁদেছে, কিন্তু তবুও আজ পর্যন্ত তার বেশী এগুতে পারিনি।

নির্মলদা হাঁপিয়ে পড়েছিলেন, আর কিছু বলতে পারলেন না, থেমে গেলেন। চোখের জলটা মুছতে মুছতে বৌদি বললেন, 'ঠাকুরপো একটা কথা বলত?'

আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করলাম কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল না। মাথা নেড়ে বললাম, 'বলুন।'

'তোমার দাদাকে আর আমাকে-খুব খারাপ মনে হচ্ছে তাই না?'

'তুমি কি ভেবেছ বৌদি, আমি ভাটপাড়ার পণ্ডিত, না কি পাষাণ?' একটু থেমে মুখে একটু হাসির রেখা ফুটিয়ে বললাম, 'আমাকে আরো একটু দুঃখ না দিলে তুমি বুঝি তৃপ্তি পাচ্ছ না বৌদি?'

বৌদি নির্মলদার ওপাশ থেকে এসে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিলেন। বললেন, 'লক্ষ্মীটি ঠাকুরপো, দুঃখ করো না। তুমি যে আমাদের জন্য চোখের জল ফেলেছ, তাতেই আমাদের অনেক দুঃখ কমে গেছে। আর তাছাড়া তুমি ভিন্ন আর কেউ তো আমাকে এমন করে বৌদি ডাকেনি, এমন মর্যাদা তো আর কেউ দেয়নি। আমি তো আর কাউকে এমনভাবে ঠাকুরপো ডাকবার অধিকার পাব না।'

পরের দিন নির্মলদা আর কাজে বেরোলেন না, আমিও আমার অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো বাতিল করে দিলাম। লাঞ্চের পর তিনজনে অক্সফোর্ড স্ট্রীটে মার্কেটিং করে কাটালাম সারা বিকেল, সারা সন্ধ্যা। রাত্রে পিকাডেলির ধারে একটা রেস্টুরেন্টে ডিনার খেয়ে হাইড পার্ক কর্ণারে খানিকটা আড্ডা দিয়ে অনেক রাতে বাড়ি ফিরলাম।

রাত্রে ফিরে এসে নির্মলদা দেখলেন বিকেলের ডাকে একটা প্লেন কোম্পানির লণ্ডন-মণ্ট্রিলের উদ্বোধনী যাত্রায় অতিথি হবার আমন্ত্রণ এসেছে। নির্মলদা বলেন, 'বাচ্চু, তুই কটা দিন থেকে যা, আমি ঘুরে এলে দিল্লী যাস।'

পরের দিন আমি আমার এডিটরকে একটা টেলিগ্রাম করে জানালাম, লণ্ডন ডিপারচার ডিলেড স্টপ রিচিং ডেলহি নেক্সট উইক।

তিনদিন পর রাত দশটার সময় আমি আর নির্মলাবৌদি নির্মলদাকে লণ্ডন এয়ারপোর্টে বিদায় জানিয়ে এলাম। বাসায় ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। দুজনেই বেশ ক্লান্ত ছিলাম। টেলিভিশনের সামনে বসে গল্প না করে দুজনেই শুয়ে পড়লাম। লেট নাইট নিউজটাও শুনলাম না।

পরের দিন সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে খবরের কাগজটা খুলে ধরার সঙ্গে বৌদি একটা বিকট চীৎকার করে চেয়ার থেকে পড়ে গেলেন। আমি মুহূর্তের জন্য হতভম্ব হয়ে গেলাম। বৌদির মাথা কোলে তুলে নিয়ে দেখি জ্ঞান নেই। তাড়াতাড়ি ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা জল এনে চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে খবরের কাগজের ওপর নজর পড়তেই দেখলাম, যে প্লেনে নির্মলদা রওনা হয়েছিলেন, সে প্লেন লণ্ডন থেকে টেকঅফ্ করার পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে অতলান্তিকের গভীর গর্তে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। প্লেনের কয়েকটা টুকরো পাওয়া গেছে, কিন্তু যাত্রীদের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

অনেক ঔষধ-পত্র ডাক্তার নার্স করার পরও বৌদি ষোল ঘণ্টা অজ্ঞান ছিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য জ্ঞান হবার পর এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেননি বৌদি। শোকে-দুঃখে বৌদি পাথর হয়ে গিয়েছিলেন। তিন দিন তিন রাত্রি একবিন্দু জল পর্যন্ত স্পর্শ করলেন না। সপ্তাহখানেক পর বৌদি বললেন, 'ঠাকুরপো, তোমার বুকিংটা এবার করে নাও। আর কতদিন তোমাকে আটকাবো।'

আমি আপত্তি করেছিলাম, কিন্তু বৌদি কিছুতেই রাজী হলেন না। বললেন, 'না ভাই তুমি আর আমার সংস্পর্শে থেকো না। হয়তো আমার সংস্পর্শে থেকে তোমারও কোন সর্ব্বনাশ হবে।'

দুদিন পর আমি দিল্লী রওনা হলাম। অনেক আপত্তি করা সত্ত্বেও বৌদি এয়ারপোর্টে এসে আমাকে বিদায় জানিয়ে গেলেন। প্রণাম করে বৌদির কাছে থেকে বিদায় নিলাম। বৌদি আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে চোখের জলের বন্যা বইয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি তোমার দাদার স্মৃতি নিয়ে এই লণ্ডনেই থাকব। আর কোথাও গিয়ে শান্তি পাব না। তুমি তাই আমাকে ভুলো না। মনে রেখো এই ঝড়ের রাতে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই যে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারে।'

আমি কোন উত্তর দিতে পারলাম না। যন্ত্রচালিতের মত প্লেনে উঠে পড়লাম। বোয়িং ৭০৭ এর তীব্র গর্জন আমার কানে এল না, বার বার শুধু মনে পড়ল বিকট চীৎকার করে ব্রেকফাস্ট দিতে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

পালামের মাটিতে পা দিয়েই বৌদিকে আমার পৌঁছানো সংবাদ দিলাম। ক'দিন পর বৌদির একটা উত্তর পেলাম।

'ভাই ঠাকুরপো,

তোমাকে প্লেনে চড়িয়ে দেবার পর জীবনের সব চাইতে প্রথম অনুভব করলাম, আমি নিঃসঙ্গ, আমি একা, আমি বন্ধুহীন, প্রিয়হীন। অনুভব করলাম আমার অন্তরের শূন্যতা। আজ মনে হচ্ছে স্বার্থপরের মত তোমাকে ধরে রাখলেই ভাল হত, মনে হচ্ছে তোমার নির্মল্দার জন্য যদি আর একজনকে চোখের জল সঙ্গী পেতাম, তবে অনেক শান্তি পেতাম।

আজ বেশ বুঝতে পারছি কে যেন অলক্ষ্যে বসে আমাব জীবনটাকে নিয়ে খুশীমত খেলা করছে। বেশ বুঝতে পারছি তাঁরই ইচ্ছা আমার মনের রং বদলায়। কখনো মেঘে মেঘে ছেয়ে যায়, কখনো সোনালী রোদে ঝলমল করে ওঠে। আবার কখনো গোধূলির বিষণ্ন রাঙা আলোয় ভরে যায়। আমি আর কিছুই ঠেকাবার চেষ্টা করি না, কিছুরই বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ নেই। আমার জন্য তুমি একটুও চিন্তা করো না। জীবন দেবতা যখন যেদিকে নিয়ে যাবেন, আমি নিঃশব্দে সেদিকেই যাব। তবে আমার সংস্পর্শে দুটি নিরপরাধ মানুষের সর্ব্বনাশ হওয়ায়, আজ তোমার জন্য বড় ভয় হয়।

বাচ্চু, একদিন তাবকার দীপ্তি আমারও ছিল, কিন্তু তবুও বিশাল আকাশের কোলে কেন ঠাঁই হলো না বলতে পার? বলতে পার কেন কক্ষচ্যুত তারকার মত উল্কার জ্বালা বুকে নিয়ে ছুটে বেড়ালুম পৃথিবীময়? বলতে পার কোন প্রায়শ্চিত্ত করলে এ জন্মে না হোক, অন্ততঃ আগামী জন্মে তোমার নির্মলদাকে পেতে পারি? ভালবাসা নিও।

তোমার অভাগা বৌদি'।

এখানে সকলে একপ্রকার কুশলে আছি

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

দুপুরবেলা। 'স্বাভিমান' দেখতে দেখতে বেঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিল পঙ্কজ। টিভি বন্ধ না করেই। ঘুম ভাঙল প্রবল চিৎকারে। না, ভয়ের কিছু না। সে তখুনি বুঝতে পারল, স্টেডিয়ামে উঠে দাঁড়িয়েছে অসংখ্য লোক। মাঠে একা ছুটছে কৃশানু দে। ভাবখানা, যেন ঢাকা মুক্তিযোদ্ধা নয়, ব্রাজিল কি কলম্বিয়ার পেটেই একখানা গোল ঢুকিয়ে দিয়েছে। ঐ যে, হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে, উর্দ্ধাঙ্গ ঝাঁকিয়ে, গ্যালারির উদ্দেশ্যে, একটা অ্যাপিলও জানাচ্ছে।

তারপরেই..... একটানা বেল বেজে যাওয়ার শব্দ পেল সে। বেল এ-ভাবে তো বাজে না! শর্ট সার্কিট হল নাকি? তাড়াতাড়ি দরজা খুলতে গিয়ে দেখল, চৌকাঠের ফাটল দিয়ে ফুবফুর করে ধোঁয়া ঢুকছে ঘরে। তখনও তার মাথা ছিঁড়ে-যাওয়া ঘুমে ভারি হয়ে আছে।

বিপদ একটা হয়েছে। যার কেন্দ্রে সে দাঁড়িয়ে। এবং সেটা কী, তা জানা দরকার। এবং এই মুহূর্তে। এখন থেকে প্রতিটি মুহূর্ত তাকে হয় জীবন, না হয়ত মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, সে টের পেল।

মুখোমুখি দুটি ফ্ল্যাট চারতলায়। ১৬ আর ১৭ নং। তারপর ছাদ। ছাদের দরজায় তালা দেওয়া থাকে। কিন্তু রাস্তার ওপর মেন গেট থাকে সারারাত খোলা। সরকারি ফ্ল্যাট, দারোয়ান নেই। ওপরে ছাদের সিঁড়িতে তাই প্রেমসে আড্ডা দিত মস্তানরা। বিশেষত দুপুরে আর সন্ধ্যার পর থেকে। বোতল আর খুরি আগেই পাওয়া গিয়েছিল। তারপর পাওয়া গেল এফ-এল। অ্যাসোসিয়েশনের মিটিঙে ১৬ আর ১৭ নং তখন প্রস্তাব রাখে, সমাজবিরোধী রুখতে তাদের ফ্ল্যাটের সামনে আর একটি গেট বসানো দরকার। ছাদে যাবার প্রয়োজনে সকলেই দুটি করে ডুপ্লিকেট চাবি পাবার শর্তে বাকি ফ্ল্যাট-মালিকরা রাজি হয়ে গেল। চারতলার সেই নতুন গেটের বাইরে এখন বেল বাজছে। বেল বেজেই চলেছে।

দু'হাট করে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে দিতেই রাশি রাশি ধোঁয়া সমুদ্রের ঢেউ-এর মত উথলে উঠে ঢুকে পড়ে তাদের ১৬ নম্বরে। পঙ্কজ দেখল, বাইরে স্ট্যান্ডিং ধোঁয়ায় অন্ধকার।

'পঙ্কজদা গেট খুলুন! গেট খুলুন!'

ধোঁয়ার ওপরে থেকে চায়ের দোকানের বাদলের গলা সে শুনতে পেল। গৌর, ভুটে, নন্তু, বাসু এরাও চেঁচাচ্ছে। চেঁচাচ্ছে ১৭ নং-এর কাজের মেয়ে বাসন্তীও। এইসময় টুকাইকে স্কুল বাস থেকে আনতে বৌদির সঙ্গে সেও রাস্তায় দাঁড়ায়। বঙ্কু নিশ্চয়ই অফিসে। সে ভিড়ের মধ্যে স্বাতীকে দেখতে পেল না।

গেটের চাবি হাতে নিয়েই দরজা খুলেছে পঙ্কজ। সে দেখল, গেট পর্যন্ত সটান দাঁড়িয়ে যাওয়া যাবে না। নিচের দিকে ধোঁয়া বরং অপেক্ষাকৃত পাতলা। হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হতে হতে চাবিটা সে গেটের দিকে ছুঁড়ে দিল। নিশ্চয়ই তাকে উদ্ধার করতেই ছুটে এসেছে ওরা। সে নিজেই বেরিয়ে পড়তে যাচ্ছিল। কিন্তু, সে বেশ অবাক হল, তাকে ধোঁয়ার ভেতর ঠেলে দিয়ে বাদলকে ১৭ নং-এর দরজার দিকে ছুটে গিয়ে দরজায় দমাদ্দম লাথি মারতে দেখে।

দরজা ভেঙে পড়ল। ভক করে চামড়া পোড়া আর কেরোসিনের গন্ধ নাকে এল তার। সে দেখল, আরও অনেক বেশি নিরেট ধোঁয়ার মধ্যে আগুন-লাগা কিছু একটা, কেউ, গড়াগড়ি খাচ্ছে ওদের ডাইনিং স্পেসে।

'জ্বলে গেল।। পুড়ে গেল!' বিভূতিবাবুর গলা সে স্পষ্ট শুনতে পেল। একটু আঁচ-লাগা এবং ঘড়ঘড়ে। তবে তাঁর স্বরযন্ত্রে এখনও আগুন লাগেনি।

সে চোখ ফিরিয়ে নিল।

যখন কমন গেট হয়, দুই ফ্ল্যাটের মধ্যে সম্পর্ক খুব ভাল ছিল। ফ্ল্যাটের মালিক পঙ্কজের দিদি, তখন দিদি ছিল। তাঁর স্ত্রী-বিয়োগ পর্যন্ত অপেক্ষা করে, শেষপর্যন্ত অফিস-কলিগ সেই সোমনাথবাবুকেই বিয়ে করে দিদি সুলতা বড়িশায় নতুন ফ্ল্যাটে চলে গেল। তারপর থেকে পঙ্কজ একা। অধিক বয়সে, বিবাহজনিত লজ্জায় দিদি আর এদিক মাড়ায়নি।

দুই ফ্ল্যাটের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হল এ-বাড়ির মনীষার আসা-যাওয়া নিয়ে। প্রথমা স্ত্রী বেঁচে থাকতেই সোমনাথবাবু আসতেন। তখন আপত্তি ছিল না। অবশ্য সোমনাথবাবুর চুলে পাক, চেহারাও বেশ রাশভারি। দিদিরও গোটা পঁয়ত্রিশ। এবং মনীষার মত যখন-তখন বা অত ঘনঘন আসতেন না দিদির লাভার। সে-সব প্রয়োজনে ওরা যেত ডায়মন্ডহারবারে। বা, চেনা হোটেলে। পঙ্কজ জানত, এবং দিদির সুদীর্ঘ এক যুগ ধরে এ প্রণয় সম্পর্ককে সে মেনেও নিয়েছিল। যদিও এর পরিণতি নিয়ে সংশয় ছিল তার মনে। কিন্তু দিদির মনে কোনও দ্বিধা ছিল না। আর লুকিয়ে করছে না কিছু, অন্তত তার কাছে। বিনিময়ে মনীষার ব্যাপারেও কোনও প্রশ্ন তোলেনি দিদি। টাকা নেয়, দিদি জানে। তাছাড়া, তখনও দুই ফ্ল্যাটের বাইরে তালা-বন্ধ কমন গেটেরও প্রচলন হয়নি।

মনীষা হয়ত এসে গেল দুপুরে। আর, আসবে জেনে পঙ্কজও অফিস যায়নি। আব, ভুল করে ১৭ নম্বরের বেল টিপেছে মনীষা। গেট খুলেছে বিভূতিবাবুর পুত্রবধূ স্বাতী। এমন অনেকদিনই হয়েছে। তাছাড়া ১৬-র বেল টিপলেই বা কি। ১৭-র কি পিপ-হোল নেই? স্ত্রীর আপত্তি। পত্নীব্রত স্বামী বন্ধু বিষয়টা নিয়ে গেল নাগরিক কমিটি পর্যন্ত। সে পার্টি করে। এসব হচ্ছেটা কী, অ্যাঁ, এ কি মধুচক্র? এবছরেই তারা বিয়ে করছে, মনীষার নার্সিং ট্রেনিংটা শেষ হলেই এতে কোনও কাজ হল না। মনীষার আসা বন্ধ হল। সেই থেকে বন্ধু আর স্বাতীর সঙ্গে বাক্যালাপ প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। সিঁড়িতে দেখা হলে যে-কোনও পক্ষের 'ভালহ্ তো?' শেষ হবার আগেই অপর পক্ষের ঘাড় কাৎ করে দেওয়ায় পর্যবসিত হল। স্বাতী তো মুখ ঘুরিয়েই রাখে। কিন্তু, বিভূতিবাবুর সঙ্গে একটা পাড়াতুতো সম্পর্ক তার শুধু থেকে গেল নয়, দিনে দিনে গভীর থেকে গভীরতরই হতে থেকেছে।

অফিস থেকে সোজা চলে এলে এবং আর কোথাও যাবার না থাকলে কাজের মাসির তৈরি করে রেখে যাওয়া পরোটার সঙ্গে এক কাপ কফি বানিয়ে খেয়ে, সময় কাটাতে, পঙ্কজ প্রায়ই পাড়ার পার্কে যায়। মৃত ফোয়ারাব ধারে একটা-না-একটা বেঞ্চিতে রোজই বসে থাকতে দেখত বিভূতিবাবুকে। ওঁর বেঞ্চে বসাটা ছিল সত্যিই একটা দেখার জিনিস। প্রথমে বেশ কিছুক্ষণ রুমাল আছড়ে ধুলো ঝাড়বেন। তারপর পাঞ্জাবির পকেট থেকে বেরুবে ভাঁজ-করা ছোট্ট প্লাস্টিকের শিটটা। ভাঁজের পর ভাঁজ খুলে ফটাস ফটাস শব্দে হাওয়ায় ঝেড়ে সেটা বেঞ্চির ওপর পেতে হাত দিয়ে ভাঁজগুলো মসৃণ করবেন। তারপর ধীরে,' খুব ধীরে, যেন ইতিহাসে, আসন গ্রহণ করবেন। কোলের কাছে মলাক্কা বেতের লাঠিটা পড়ে থাকবে। পঙ্কজ এসে পড়লে, পাশ থেকে রুমালটা তুলে নিয়ে বলবেন, 'বোসো ভায়া'। কালক্ষয় করাই উদ্দেশ্য এই বিলম্বিত লয়ের— পঙ্কজ বুঝত। জিওলজিকালের

অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি, দু'পাটি ডেনচারের বয়সই হয়ে গেল ১২ বছর। প'রে প'রে মাড়িতে ঘা হয়ে গেছে। অথচ, সামনে এখনও অনিশ্চয়। শেষ কোথায় এখনও জানা নেই।

'মরবার বয়স? সেটা ঠিক কখন থেকে শুরু হয় তুমি বলতে পার পঙ্কজ?'

শেষ যেদিন পার্কে কথা হয় জানতে চেয়েছিলেন বিভূতিবাবু, 'এই যেমন ধরো কেদারযাত্রায়। হৃষিকেশ থেকে গৌরীকুণ্ড। বাসে গেলে। তারপর সেখান থেকে ১১ কিলোমিটার হাঁটাপথ। সবাই জানে আগে থেকে। এ'রকম কোনো ডিমার্কেশন আছে কি?'

ওঁর কথায় কথায় ভ্রমণের গল্প এসে যেত ঠিকই, যে কোনও ছুঁতোয়। কারণ, উনি হচ্ছেন সেইসব রিটায়ার্ড মানুষদের একজন, যাঁরা কর্মসূত্রে তো বটেই, নিজস্ব উদ্যোগেও ভারতবর্ষের এমন কোনও দিক নেই যেদিকে যেতে বাকি রেখেছে। মায় সস্ত্রীক অমরনাথ। সব, সব শেষ। আর কোথাও যাবার নেই। সাল তারিখ? সব মুখস্থ। এমনভাবে বলতেন যেন সেটাই তার জীবন। কিন্তু সে-সব গল্পে, আজকের মত, মৃত্যু-রঙ এর আগে কখনও লাগতে দেননি তো কোনোদিন!

''বুঝলে ভায়া'' নিজেই বলতে শুরু করলেন, ''আজ সকালে নেপালের মা শুনলাম বৌমাকে বলছে, 'ছাইটাই আব পাওয়া যাচ্ছে না বৌদি। আপনি হাঁড়ি-টাঁড়ি আর পোড়াবেন না।' বৌমা জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন, তোমাদের বস্তিতে আর উনুন জ্বলে না?' নেপালেব মা হেসে বলল, 'উনুন কোথা বৌদি। আমরা তো এখন রেশনের কেরোসিন জ্বালাই। কয়লার যা দাম। আগুন!' শুনে বৌমা তো মহা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শুনলাম বলছেন, 'তাহলে ছাই কি আর পাওয়া যাবে না?' আমি তখন সবে চায়ের কাপে চুমুক দিয়েছি। শুনে এমন হাসি পেল আমার, বুঝলে ভায়া? হাসিব তোড়ে মুখ থেকে চা চলকে পড়ল। খাবার আগে দাঁতের পাটি দুটো পরি। এমনিতেই লুজ, হাসির চোটে খটাস করে মাটিতে পড়ে গেল। বুঝলে? তখন বৌমা বললেন, 'এতে হাসিব কী হল?' আমি জানি, আর তুমিও হয়ত লক্ষ্য করেছ, হাসলে আমার এই নাদুসনুদুস গোটা চেহারাটাও সেইসঙ্গে হাসতে থাকে। মায ভুঁড়িটুড়িও। ভাল দেখায় না। তাই না হাসতে আমি খুব চেষ্টা কবি। আর যে কথাটা মনে পড়ায় হাসি পেয়েছিল, আমি খুব চেষ্টা করেছিলাম সেটা না-বলতে। হাতের নাড়ায় চা প্রায় সবটাই পড়ে গেছে। বৌমার তো আর এক কাপ কবে দেবার কথা। কিন্তু, জানো তো, হাসিব মত, নতুন আইডিয়াগুলোও পাখির মত। আর যারা আকাশে ওড়ে, মাধ্যাকর্ষণ তো তাদের জন্যে তেমন কাজ কবে না। তাই আমিও বলে ফেললাম, 'না, পোলের ওপারেই তো ক্যাওড়াতলা। আর ওদেব বস্তি তো ওদিকেই। ছাই কি সেখানেও পাওয়া যাবে না? শুনে বৌমা একদম গুম মেরে গেলেন?'

'তারপর?'

'শুনে বৌমা এমন রেগে গেলেন, কী বলব তোমায়। মুখটুক লাল হয়ে উঠল। এদিকে ঐ কথাটা বলে ফেলে আমিও হাসি থামাতে পারছি না। মুখের হাসি থামে তো কাঁধ দুটো হাসির তোড়ে লাফায়— কাঁধ থামে তো ভুঁড়ি—ভুঁড়ি থামে তো.... জোকার-জোকার লাগে আমাকে— আমি জানি।'

'না। তা আপনার বৌমা কী বললেন।'

''বৌমা বললেন,'' বলতে চাননি, কিন্তু এক্ষেত্রেও বোধহয় দুর্বল মাধ্যাকর্ষণ পাখি-ওড়া আটকাতে পারল না। বিভূতিবাবু একটা গোটা দীর্ঘশ্বাস না পেলে, বরং তাতেই বুক ফুলিয়ে বললেন, ''বৌমা বললেন, 'এমন কথা এই বাড়িতে আপনি আব কোনোদিন উচ্চারণ করবেন না। আমাদের অকল্যাণ হবে। আপনার মরার বয়স হয়েছে। কিন্তু ওর তো হয়নি'— বলে টুকাইকে দেখালেন।''

৪ বছরের নাতনি টুকাই পার্কের গল্পে রোজ একবার না একবার আসবেই। টুকাই-এর গল্প বলতে গিয়ে একদিন তো হাসির চোটে দম বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়। হয়েছে কি, গড়িয়াহাটে স্বাতী গেছে পুজোর কেনা-কাটা করতে, সঙ্গে টুকাই, আর কোনও লেডিজ ছাতার খোঁচায় টুকাই-এর কপালটা গেছে ছড়ে। বৌমা তো 'চোখের মাথা খেয়েছ' থেকে মেয়েটিকে আর বলতে কিছু বাকি রাখেনি। ছোটগিন্নি কিন্তু তাতে যথেষ্ট সন্তুষ্ট নন। রাতে আমার ঘরে এসে ঠোঁট ফুলিয়ে নালিশ জানাচ্ছেন, 'দাদু জানো, তোমার নাতনিকে, তো-মা-র নাতনিকে এইখানে খিঁচে দিয়েছে।'

'বিশেষ করে খিঁচে শব্দটা ওর মুখে এমন মজার লাগল'— বাকিটা না বলে জলদগম্ভীর 'হেঃ হেঃ' শব্দযোগে বেদম হাসতে শুরু করলেন বিভূতিবাবু। আর থামাতে পারেন না কিছুতেই। মুখের হাসি থামে তো কাঁধ দুটো লাফায়, কাঁধ থামে তো ভুঁড়ি— সত্যিই জোকার-জোকার লাগছিল।

শেষ যেদিন দেখা হয়, 'মৃত্যুর বয়সে'র কথাটা তোলার পর বহুক্ষণ চুপ কবেছিলেন বিভূতিবাবু। পকেট থেকে একটা তোবড়ানো সিগারেট বের করে (আরও একটা আছে, আমি জানি) ধরাবার জন্যে পরপর তিনটে কাঠি জ্বালালেন। তিনবারই জ্বলে দপ্ করে নিবে গেল। কয়েকবার নাড়িয়ে উনি দেশলাই বাক্সটা ফেলে দিলেন। পঙ্কজ দেশলাই আনতে যায়।

ওঁব বোধহয় সিদ্ধান্ত নিতে এতটাই সময দরকার ছিল। 'আমি আব বঙ্কুব ওখানে থাকব না। তুমি আমাকে একটা ঘর দেখে দাও। বি-পি কমন হলেও চলবে। ভাড়া ৫০০ টাকা। পেনসন ফিক্সের সুদ— আমাব চলে যাবে।' আমার হাতদুটো ধরে ঝবঝব কবে কেঁদে ফেললেন বিভূতিবাবু, 'আমি থাকলে টুকাই-এর অকল্যাণ। ও:-হো হো।'

সামনেই কর্পোরেশন ইলেকশন। ঢেলে সাজান হচ্ছে পার্কটি। শোনা যাচ্ছে, ফোয়ারাতেও নাকি জল আসবে। সবুজ রঙ-করা রেলিং-এর ধারে ধারে একের পর এক এপ্রিলের কৃষ্ণচূড়া। কয়েকটি শিমুল-পলাশ। ঝরে-পড়া লাল-হলুদ ফুল ঝাঁট দিয়ে ডাঁই করা এখানে-ওখানে। ও-দিকে ভলিবল। তিনটি যূথবদ্ধ পাম গাছের বাঁধানো বেড় ঘিবে মায়েবা। তাদের সামনে শিশুদের ছোটাছুটি।

একসপ্তাহ পরের কথা। রবিবারের বিকেল। মৃত ফোয়ারার ধারে পার্কের বেঞ্চিটাতে পঙ্কজ সাতদিনের মধ্যে এই প্রথম এসে বসেছে।

অপঘাতে মৃত্যু, তাই তিনদিনের মাথায় স্থানীয় বৈষ্ণব মঠে শ্রাদ্ধ হয়ে গেছে বিভূতিবাবুর। বঙ্কু নাগরিক কমিটিব মেম্বার। পুলিশ হ্যাঙ্গাম হয়নি। চুনকামের জায়গায় তাদের ফ্ল্যাটে প্লাসটিক পেন্টিং করা হয়ে গেছে। নইলে নাকি আগুনের হল্কায় দাগগুলো পুরোটা যেত না। একটি পাখা পুড়েছিল, নতুন পাখা ফিট হয়েছে। টিভি'র ক্ষতি হয়নি। ডাইনিং স্পেসের বিদ্যুতের ওয়ারিং পুরোটা বদলাতে হয়েছে। এসব বঙ্কুই বলেছে তাকে। পুলিশকে বঙ্কু বলেছে, আত্মহত্যা নয়, এটা দুর্ঘটনা। ৭২ বছব বয়সে কেউ আত্মহত্যা করে না। আর ক'টা বছর কাটিয়ে দেয়। আসলে উনি তো একা-একা চা করতে গিয়েছিলেন জনতা স্টোভে। ফ্ল্যাটে কেউ ছিল না। তাতেই আগুন লেগে যায়। স্টোভ উল্টে গিয়েছিল, তাই অত কেরোসিন গন্ধ। এই তো ইনিই তো দেখেন প্রথম। জিজ্ঞাসা করুন না'— পঙ্কজকে দেখিয়ে বঙ্কু বলেছে। দুর্ঘটনার প্রথম দর্শক হিসেবে পঙ্কজ থানায় গিয়ে সবই সমর্থন করেছে। বিপদ আবার কাছাকাছি এনে দিয়েছে তাদের। স্বাতী নিজে এসে দ্বাদশ ব্রাহ্মণের একজন হিসেবে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করে গেছে পঙ্কজকে। এবং সে গিয়েওছিল।

টুকাই না? ছুটন্ত শিশুর দলে একটা বাচ্চা হুমড়ি খেয়ে পড়ল। এখন কাঁদো-কাঁদো মুখে উঠে দাঁড়াচ্ছে। হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঐ তো টুকাই। তাকে উঠতে সাহায্য করছে, তার চেয়ে একটু

বড়—এক রাশভারি ছেলে। কার সঙ্গে এসেছে খুঁজতে গিয়ে, অত্যন্ত কাছে, একেবারে রেলিং-এব ধারে সে ওদের বাড়ির নতুন কাজের মেয়ে বাসন্তীকে দেখতে পেল। এখন তাব গায়ে শাদা কালো ছিট ম্যাক্সি— যদিও আজ সকালেই ফ্রক পরে দই-ইলিশ দিতে এসেছিল।

একদম দেখতে পায়নি তাকে। বাসন্তী রেলিং-এ সেঁটে। সামনে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে। রাতে মাস্তান, দিনে চা-বিক্রেতা।

'বিশ্বেস যাও বাওলদা, দকদার সঙ্গে আমাব দাদা-ছোটবোনের সম্পোককো।'

'সিনেমায় যাস?'

'মাইবি বলছি, মা কালী, কুনোদিন না।'

'গুরুকে বলে দিস, এ-পাড়া যেন আর কোনোদিন না মাড়ায়। ওকে দেখলেই ক্ষুব মাবব। এই যে' বলে সে ক্ষুর বের করতে গিযে প্রথমে একটা দাঁড়া-ভাঙ্গা সবুজ চিরুনি বেব কবে ফেলে। তারপর ক্ষুর দেখায়।

এইসময় টুকাই আবার পড়ে গিয়ে জোরে কেঁদে উঠল। দৌড়ে গিয়ে তাকে কোলে নিয়ে বাসন্তী ফের বাদলেব কাছে ফিবে আসে।

বিকেল শেষ হয়ে আসছে। এবার অন্ধকার হবে। বাসন্তী বলল, 'আমি আসছি। কোথায় লেগেছে টুকাই?'

'আমাল এখেনে খিঁছে গেছে' বলে ঠোঁট ফুলিয়ে হাঁটু দেখাতে গিয়ে টুকাই কপালে হাত রাখে, 'দাদু কোতায।'

'তোমাব দাদু সগ্‌গে গেছেন টুকাই।'

'এই শোন', হাত চেপে ধবে বোধহয় তো একটু মুচড়েই দিল বাদল, বাসন্তী বলে উঠল, 'উঃ।'

বাদল বলল, 'ঠিক বাত একটার সময় যাব। ওপরে গেটেব তালা খুলে রাখবি। ঘড়ি দেখবি। জেগে থাকবি। একদম ছাদের সিঁড়িতে চলে আসবি।'

বাসন্তী মাথা নিচু করে হাসল, 'বলল, মাল খেয়ে এসো নি যেন।'

বাদল শুধু বলল, 'গেট যেন খোলা পাই।'

বাদল আব টুকাই দু'দিকে চলে গেল।

হঠাৎ চোখ পড়ল পঙ্কজেব। বিভূতিবাবুর ছুঁড়ে ফেলে-দেওয়া সেই সেদিনেব সবুজ প্রজাপতি মার্কা খালি দেশলাই-বাক্সটা আজও শিমূলতলায পড়ে আছে। সেদিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে বইল সে। তারপর কোথা যে কী, হঠাৎ মনে হল তাব। মনীষাকে আবার আসাযাওয়া শুরু করতে বলা যেতে পাবে। যেদিন মনীষা আসবে, সেও স্বাতীকে বলবে গেটে তালা না দিতে। 'দুর্ঘটনার প্রথম প্রত্যক্ষদর্শীর' জন্যে স্বাতী এ-টুকু কবতে নিশ্চযই রাজি হবে। আব, যদি তালা দেওয়া থাকে, মনীষাকে বলে দেবে ইচ্ছে করে ১৭ নম্বরের বেল টিপতে। স্বাতী যেন অভ্যর্থনা করে তাকে। দুপুবেলা যেন আসে মনীষা। যখন স্বাতী থাকে। এবং নিজে গেট খোলে।

রাখাল কড়াই

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

চকবেড়ের মোড় থেকে বাস চন্দনেশ্বরের বাজারের দিকে ঘুরে গেল। ভাঙ্গড় যাবে। চারদিকে ধানক্ষেত। তার ভেতর রোগা পিচরাস্তা বেয়ে চার চাকার রাজহাঁস ছুটে যাচ্ছে। ক্ষীরোদ পাকড়াশি বাস রাস্তা থেকে নেমে খাল পাড়ে উঠে হন হন করে হাঁটা ধরল। হাতে পাকানো বাসের টিকিট। এখন বিদ্যেধরীর বাদা মাড়িয়ে গরাণবেড়ে পৌঁছে দুপুরের আগেই লোকজন ডাকতে হবে।

খবর যতদূর, জিনিস নাকি সরেস— ঘরে রেখে রস মেরে নিলে পিড়ি চাই পিড়ি, জানলা দরজা কপাট সব হবে। বাদার গাছ, চার মানুষেও বেড় পায না— হোক না তেঁতুল। শাল সেগুনের কারবারে কে দাঁড়াবে? বৌবাজার, শেয়ালদার ক'খানা বাছাই ঘর বাদে সব দোকানই জাম-জামরুল-তেঁতুলে ছেয়ে গেছে। ভাল পালিশের চেকনাইয়ে কত মিটসেফ, আলনা, আলমারি, ইজিচেয়ার দিব্যি বাজারে চলে যাচ্ছে। এই ডামাডোলে ক্ষীরোদ এমন সরেস তেঁতুল কাঠের খোঁজ পেয়ে লোভ সামলাতে পারেনি। লোকজনের ভরসা না করে নিজেই বেরিয়ে পড়েছে। শ্রীমানি মার্কেটের ধারে ধারে ক'ঘর কবিরাজের দোকান। নানান্ জায়গার লোক শেকড়বাকড়, লতা-পাতা বেচতে আসে। হরনাথ তর্কভূষণ বৃহৎ গুগ্‌গুল ও চ্যবনপ্রাশের বয়ম রাখবে বলে গত শ্রাবণে জাব্দা মত পাঁচ তাকের এক আলমারি নিয়েছিল। পরশু সেই টাকার তাগাদায় গিয়ে এই গাছের সন্ধান।

কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের ওপর বাপকেলে দোকান। তর্কভূষণ ইলেকট্রিকের ধার ধারে না। হেরিকেনের সামনে বাঁদুরে টুপি কম্ফটার বালাপোষ চাপিয়ে দশাসই লাস একেবারে সাক্ষাৎ যম সেজে বসে। চার কিস্তিতে আলমারির দাম শোধ হওয়ার কথা— দশ বারেও অর্ধেক উঠিয়ে আনতে পারেনি ক্ষীরোদ। শিষ উঠে হেরিকেন কেবল কালি ওগলাচ্ছে। কম্ফটারের আলগা গেরোর ভেতর দিয়ে এক খাবলা পাকা দাড়ির সাদা ছোপ। আধ ঘণ্টা বসেও টাকার কথাটা পাড়তে পারেনি। পা নামাতেই মেঝের ড্যাম্প কোমর অবধি উঠে এসেছিল পরশু। ভাল জ্বালা! এই ড্যাম্পের হাত থেকে ভাল ভাল বটিকা, পাঁচন বাঁচানোর জন্যেই হরনাথ হাত ধরে আলমারি চেয়েছিল একটা। এখন টাকার কথা তুললেই বলে, শীতটা ভাল করে পাকুক— শ্লেষ্মা ধাতের সব রুগী এই তর্কভূষণের দোরে এসে লাইন দেবে। তখন নাকি আলমারির দাম শুধে আগাম সুদ্ধ চার পেয়ার চেয়ারের অর্ডার দেবে হরনাথ।

আগের অবস্থা থাকলে ক্ষীরোদ দু'খানা চেয়ার অমনি করে দিত কবিরাজকে। বুড়ো আর বেশীদিন নেই। ঠিক তখনই ফুটপাত থেকে মুসকো মত একটা লোক সোজা হেরিকেনের সামনে উঠে এসেছিল। গায়ে জড়ানো কাপড়ের খুট টেবিলে আলগা করে দিল লোকটা। দেড়পো আধসের ট্যাংরার চেয়েও লম্বা লম্বা তেঁতুল, 'এনেছি—এ কটার বেশি হল না-'

হাত পাঁচেক লম্বা, মাথার চুল অনেকটাই শাদা, কুঁজো হয়ে দাঁড়ানোয় পেটের খোঁদলে দিব্যি একটা ধামা বসিয়ে দেওয়া যায়।

তর্কভূষণ টুপির ভেতর থেকেই বলল, 'এর চেয়ে বড় পেলে না?'

'থাকবে না কেন? পাবার যো আছে—গাছতলায় পড়তেই বেদেদের শোর এসে চেঁচে পুঁছে খেয়ে যাবে—'

একটা তেঁতুল হেরিকেনের সামনে তুলে ধরে কবিরাজ গন্ধ নিল নাকে, 'বাড়ন কমে গেছে বোধহয়—'

'তোমার বাপের আমল থেকে দে যাচ্ছি— কতকেলে গাছ, এবারে ছোট হয়ে আসছে।'

ক্ষীরোদ আর থাকতে পারেনি, 'কত কালের গাছ?'

'তা ধরুন আমাদের সাত পুরুষ ওর ডালে পুড়েছে— এখন জুড়ে দেখুন।'

মনে মনে হিসেব করতে যাচ্ছিল ক্ষীবোদ। লোকটা সব গুলিয়ে দিল, 'এ তেঁতুল তো খেতি পারিনে আমরা— বিষ। একবার খেলিই জ্বর— তারপর ভুল বকে কালঘুম— একদম ঢলে পর্ড়াতি হবেনে।'

হরনাথ একটা তেঁতুল ভেঙ্গে তখনও গন্ধ শুকছে।

ক্ষীরোদের মুখ দেখে কী দয়া হল লোকটার। বলল, 'এ আপনাব জঙ্গুলে তেঁতুল। ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার বাপ জঙ্গল হাসিল করে গরাণবেড়ের মুলুক বসায়— সেই ইস্তক গাছটা আছে। কী শোভা ছিল আগে— ছোটবেলায় গা ভরে এমন ঝুলে থাকত—'

'না গায়েন, রস কষে গেছে— এ তেঁতুলে আমার হবে না। ও তুমি নিয়ে যাও—'

লোকটা হেরিকেন বরাবর সিধে দাঁড়িয়ে গেল, 'তা হবে না কবিরাজ। কত আজে বাজে লতা পাতা কিনছ দিনভর— আর গাছের এমন আদত্ ফল নে ফিরে যেতি হবে?'

'দরকাব না থাকলে যেতে হবে।'

'এতটা পথ ভেঙ্গে এলুম—'

'সে তুমি ফি বারই বল। দরকার না থাকলে কাহাতক কিনি বলতো গায়েন? এমন নয় যে, ঘরে রেখে টক রেঁধে খাব!'

'পোকায় এবাব ধান পাট সব শুকিয়ে পুড়িয়ে জেরবার কবেছ। নযত আসতুম না— নাও বেখে দাও, খরাব দিন কাজে দেবে—'

লোকটা নিজে নিজেই সামনে আলমারির খোলা তাকে একটা করে তেঁতুল তুলে সাজিযে রাখছিল।

'নোংরা করো না। ঝামেলা ভাল লাগে না গায়েন—' হরনাথ উঠে দাঁড়িয়েছিল, আবার চেয়ারে বসল। গায়েন কাপড়ের খুঁটে তেঁতুল তুলে নিয়ে ফুটপাথে নেমে গেল।

ভীষণ শীত পড়েছে, মুলোর দর এখনও নামছে না— এইসব ধানাই পানাই বলে টাকার কথা না পেড়েই কোন গতিকে ক্ষীবোদ রাস্তায় নেমে পড়ল। তেঁতুল নিয়ে দু'দুটো হুমদো বুড়ো যা করছিল, চোখে দেখা যায় না। ফুটপাথের তেলেভাজা দোকানীর তোলা উনুনের ধোঁয়া ফুঁড়ে শাদা রঙের লম্বাই চওড়াই গায়েন হুস হাস এগোচ্ছে। পরনের কাপড়ের খানিকটা গায়ে। ক্ষীরোদ একরকম দৌড়েই ধরে ফেলল, 'কতদূর যাওয়া হবে?'

রাস টেনে দাঁড়াল লোকটা, 'কোথায় দেখিচি বলুন তো?'

'কবিরাজের দোকানে— এই মাত্তর।'

দুই থাবা দিয়ে ক্ষীরোদের হাত ধরল। জানলার রডের পারা আঙ্গুলগুলো আর একটু লম্বা হলে তার কনুই ধরে ফেলত।

'বুড়োর বাপ থাকতে তেঁতুল, অর্জুন ছাল কত কি দে আসতুম— একটু থেমে বলল, 'আগে কত রুগী বসে থাকত— হরনাথই বা করবে কি!'

ক্ষীরোদের হাত ছেড়ে দিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। ক্ষীরোদ দৌড়ুতে লাগল। 'ন'টা আটান্ন না ধরলে বাস পাব নি। এত আঁধার—এখন আর দু'কোশ একা হাঁটতি ভাল লাগে না।'

ক্ষীরোদ আর ভূমিকা করার সময় পেলে না, 'অনেক দিনের গাছ—'

দমকে বেরিয়ে যাবার আগে গায়েন আবার থামল, 'কোন গাছ?'

ফুটপাতে কথা বলা যায় না। লোকজন বন্ধ নেই কোন সময়, 'তাই তো বলছিলেন গায়েন মশায়— সাতপুরুষের—'

একদম থেমে গেল গায়েন, 'ওঃ! আমাগে গড়াণবেড়ের— সে মশায় বড় অগড়ের গাছ— তাব অগড়ের কথা কত বলব—'

'যদি বলেন তো একবার দেখে আসি—'

'যাবেন? গড়াণবেড়ে যাবেন?'

'খুব! সকাল সকাল গিয়ে ঘুরে আসব। কালই সকালে—'

'কাল নয়— আট গাড়ি খড নে খালিশপুব যেতি হবে— পবশু আসন— ভোরের ট্রেনে চড়ে বাসুলিডেঙ্গা নাববেন, চকবেড়ের মোড়ে আমায় পাবেন— না দেখলি হাঁক পাড়বেন নীলাম্বর গায়েন বলে—'

পরশু আর কথা বলতে পারেনি গায়েন। না ছুটলে ন'টা আটান্নো মিস্ হয়ে যেতো।

সে রাতেই গোলায় ফিরে ক্ষীরোদ তিনখানা বড় করাত ভাড়া নিয়েছে। গবাণবেড়েব লোকজন লাগিয়ে তিনদিনে কুড়োলে কুড়োলে পুরো গাছটা খানকয়েক গরুর গাড়িতে চাপিয়ে নিতে হবে। বাসুলিডাঙ্গা থেকে রেলে বুক করে দিলে পরদিনই চিৎপুব ইয়ার্ডে মাল ডেলিভারি। তারপর কয়েক ক্ষেপে লরিতে পুরো গাছটা গোলায়। তখন ভাডাব কবাতে চেরাই, প্লেন, পালিশ। অতকেলে গাছ— মোদ্দা কত হাজার সি এফটিতে দাঁড়াবে। মনে মনে হিসেব কষতে গিয়ে সব অঙ্ক গুলিয়ে গেছে। এসব কাগজ কলম ছাড়া জুৎ হয না। হাঁক দিতে হল না— বরং কানেব কাছে গিয়ে আস্তে ডাক দিল ক্ষীবোদ, '—গায়েন মশাই, ও নীলাম্বর গায়েন —'

একটু নড়ে চড়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা। খালপাড় থেকেই দেখতে পেয়েছে ক্ষীবোদ। পুকুরপাড়ে তুলে দেওয়া শুকনো কচুরিপানার ডাই জুড়ে মা সুদ্ধ পাঁচ ছ'টা কুকুবছানা বোদ পোহাচ্ছে। তাদেরই দু'টোকে কোলে নিয়ে গায়েন ঝিম মেরে বসে।

'এসে গেছেন। ভাবলুম বেলাবেলি বেইরি আসতে দেরি হবে আপনার, তাই অঘোবের ঘরে বসতিই এই কাণ্ড—।' ভগ্ ভগ্ করে গন্ধ আসছে। সারা মুখে জোর গোটা আটেক দাঁত। তার ভেতর দিয়েই হেসে বলল গায়েন, 'অঘোর বেটে মুকুজ্যেদেব চর-হাসিল দশ বিঘে খালি জমি কিনল। ওদের হয়ে অনেক খুনখারাবি করেছি— মুকুজ্যেরা তাই আমাকে দেখেই তিন হাজারের ভেতর সবটা জায়গা অঘোরকে লিখে দিলে। বেটে অঘোর সকালবেলাই তাই এসব ছাইপাশ গিলিয়ে দিলে—'

আল ধরে ধরে গায়েন এগোচ্ছে— ক্ষীরোদ খানিক দৌড়ে তাকে ধরল। দুই ছেলে নিয়ে এক চাষী পান্তা পেড়ে বসেছে। একটা উঁচু ঢিবিতে পাল্লা খাটিয়ে মাঠের ধান মাঠেই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। সেকথা বলতে গায়েন তিরিক্ষি হয়ে উঠল, 'লিভির ভয়ে পিঁচ রাস্তায় ধান নে যাবার পথ নেই— চৌকি বসেছে—'

খানিক জায়গা জুড়ে ধানগাছ সব খাক্। এ সব জায়গায় বর্ষার মুখে মুখে বিষ-পোকাব ঝাঁক উড়ে গেছে— ধান দূরে থাক, ভাল খড়ও পাওয়া যাবে না।

পথ ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে গায়েন নিচু হয়ে ঘাসের চেয়েও সবুজ খুদে খুদে বরবটি তুলে ক্ষীরোদের হাতে দিল. 'ভেঙ্গে মুখে দিন— রাখাল কড়াই, বয়েসকালে গরু চরাতে এসে ক্ষিধের চোটে এসব কত খেয়েছি— শুকিয়ে নিলি ভাল ডাল হয়—'

'গরু ছিল বুঝি—'

'হেলে গরুই বেশি— একাই বিঘেটাক দিন ভরে চষে ফেলেছি। সন্ধ্যেবেলা চবানির মাঠ ঢেকে রেখে দিতুম— রাত থাকতি জোচ্ছনায় সেখানে ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতুম, ভোর হলিই হালে জুতে—'

'সাপটাপ—'

'কোথায়? আজকাল আর দেখিনে—'

ক্ষীরোদ কিন্তু সাবধানে পা ফেলে এগোতে লাগল। এমন দশ বিশ হাজাব বিঘের মাঠে যে কোন জায়গা থেকেই সাপ উঠে আসতে পারে।

'আছে দু'একটা— খুব রাত না হলি বেরোয না। ভয়ানক বিষধর। তবে, আগে অনেক ছেল। সত্তর আশিটে কেউটে আমিই সাবাড় করিছি—'

'লাঠি দিয়ে—'

'লাঠি কোথায়! এই হাত দে—' গায়েন দাঁড়িয়ে গেল।

আর কত দূর গরাণবেড়ে। অনেকক্ষণ বসতবাড়ির পরিষ্কার ঢিবি জায়গায় দাঁড়ানো হয়নি। নিশ্চয় সেখানে সাপ থাকে না।

'এখন যেখানে দাঁড়িয়ে— তার মাথায় অন্তত ষাট হাত জল ছেল— বিদোধরীর জল, নৌকো এ জাযগায় এলি পয়সা ছুঁড়ে দিতুম—'

'এখানে? নদী?'

'এ জায়গা তো মধ্যিখান— তিন মাইল চওড়া বুক ছেল, আমিই চাল বোঝাই দে ধোসারহাট ঘুরে চেতলার আড়িদের গোলায কালীগঙ্গা ধরে নৌকো পৌঁছে দিতুম। ওই যে বাবলার ঝাড়— রশি দশেক হবে. ওসব গাছ ত বছর সাতের— নদী ফুরে আসার মুখি পাখিদের কাণ্ড।'

ক্ষীরোদের আর কিছু বলতে হল না অনেকক্ষণ। নীলাম্বর আগে আগে হাঁটছে। পেছনে ক্ষীবোদ, সামনে কেউ নেই। সেই ফাঁকার দিকে তাকিয়ে নীলাম্বর কথা বলছে। উলটো দিক থেকে বাতাস এসে তার কিছু শব্দ তালগোল পাকিয়ে দিচ্ছে। ক্ষীরোদ খানিকটা শুনতে পেল— তাকেও পথ দেখে পা চালাতে হচ্ছে।

'বিদ্যেধরীর বুক জেগে উঠতি দু'পাশে লাঠালাঠি শুরু হয়ে গেল। যার জমির লাগোয়া চর ওঠে সেই রাজা— দুশো-পাঁচশো বিঘে হামেশাই অনেকের ক্ষেতের গা দিয়ে জেগে গেল। কিন্তু দখলে রাখা চাই। আর লাঠালাঠি! এখানটায় থেমে গায়েন দু'হাতে তালি দিয়ে হেসে উঠল।

ক্ষীরোদ মানে না বুঝেও সঙ্গে সঙ্গে হাসল। গাছটা নীলাম্বরদেব।

'আমি তখন বড় গুণ্ডো। বুকে বুকে খাড়াই গুতো মেরে মাল খেলি— যার লাগে তার চড়চড করে আওয়াজ হয়— আমি দাঁড়াইনে, ফেড়ে বেইরে যাই। মুকুন্দদেব বড় তরফ ডেকে নে বললে, নারাণপুরেব কাছে পাঁচ হাজার বিঘের চবটা দখল কবে দিলি একশো বিঘে জায়গা লিখে দেবে—'

'তা দেছেলে— হোসেনপুরের মোড়লদের বড় ছেলেটাকে কেটে ফেললাম! জোয়ান বয়েস, রক্তের রঙ কী— জমি দখলে এমন কত হত—' গায়েন থেমে থেকে মাঠের মাঝখানে এক জায়গায় আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ওই যে রূপশাল ধান দেখিছেন ওখানটায়-- ঠিক ওই খাক্ মত জায়গাটায় খুনটো করি—'

ধান আছে— ভেতরের দুধ পোকার বিষে শুকিয়ে খাক্। এতক্ষণ দু'জনে গরুর গাড়ির লিক্ ধরে এগোচ্ছিল। এবারে গায়েনের সঙ্গে মাঠে নামল ক্ষীরোদ।

'খুনটা হয়ে যাওয়ার পর মন মুষড়ে গেল— কিন্তু তখন ছেলেরা ছোট, আমার ফাঁসি হলে ওদের দেখতো কে? মাঠের মধ্যি বসেই মোড়লদের, ছেলেটাকে ল্যাজা দে এতটুকুন টুকরো টুকরো করে চৌদিক ছড়িয়ে দেলাম—আর কী শকুন! তিন দিনের ভেতর—সব সাফ!'

তারপর একশো বিঘে নে কি করব? আর কি মাটি! ধান ছড়িয়ে দি তো ধান বেরোয়— এই তার গোছ— কিন্তু মুশকিল দেখা দেল সাপ নে। যেখানে কোপাও নরম মাটি পেয়ে সাতদিনের ভেতর গোখরো তার ছানা পোনা নে হাজির। গোটা কয়েক মারার পর আমাকে দেখলি ওরা গর্তে গিয়ে লুকোতো। আমি লেজ ধরে টানতুম— উল্টো টানে গায়ের মাংস খাবলা খাবলা উঠি যেত। সে অবস্থায় মাথার ওপর পাক দে ছুঁড়ে দিতুম— তারপর বাচ্চারাই পিটে মারত।'

'গরাণবেড়ে আর কতদূর?'

'এসে গিছি।'

নদীর বুকের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আগেকার পাড়ে এসে উঠতে আরও আধ ঘন্টা লাগল। সেখানেই মার খাওয়া নদীটাকে পাওয়া গেল। খানা কেটে দেওয়া ড্রেনের চেয়েও সরু— জলের ছিটে ফোঁটাও নেই দু'ধারে কিছু বুনো ফুল ফোটে।

'এই নদী গিয়েই আমাদের সব্বনাশের শুরু। নদীও গেল—মাছ গেল, ব্যবসা গেল—'

এত গাছ, আড়াল আবডাল নেই— শুধু মাঠ, হামেশাই দশ বিশ বিঘের দিঘি— তাতে পলক পড়ে না এমন শালুকের পুরু চাদর, বাতাস একটু থামতেই শুকনো বকুলের ভারি গন্ধ। ক্ষীরোদ একটিপ নস্যি নিয়ে ফেলল।

'দেখতি পাচ্ছেন?'

দক্ষিণে তাকিয়ে ক্ষীরোদ থমকে দাঁড়াল। আকাশের সবখানি জুড়ে সবুজ একটা মাথা উঠে গেছে। পাতার চেহারা অন্য তেঁতুলের চেয়ে কিছু আলাদা। এক একখানা ডালে শেয়ালদার আধখানা প্ল্যাটফর্ম জুড়ে যাবে। এ কেটে নিয়ে গরুর গাড়িতে চাপাতে কম করেও মাস খানেক চলে যাবে।

'পিঁপড়ে হয়নি গাছে? পোকা?'

'নালসের ডিম আছে ঝুড়ি ঝুড়ি। পোকামাকড় নেই একদম। একটুও ঘুণ ধরেনি—' গাছের দিকে তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ক্ষীরোদ নীলাম্বরের সঙ্গে এক উঠোন লোকের মধ্যে এসে পড়ল। জনা ষোল ধান ঝাড়ছে। ইঁটের চেয়েও কঠিন মাটির দাওয়ায় এক তে-মাথা বুড়োর পাশে খেজুর পাতার চ্যাটাইতে বসতে হল। পরামাণিক বুড়োর গালে ফটকিরি বুলিয়ে ক্ষীরোদের থুতনী ধরে ফেলল।

'কামিয়ে নিন্--- আপনারা শহরগঞ্জের মানুষ---' নীলাম্বর নিজেই পরামাণিকের বাক্স এগিয়ে দিল।

গাল বাড়িয়ে দিয়ে ক্ষীরোদ সামনেই আবার তেঁতুলগাছটা দেখতে পেল। গোড়ায় একটা ভাঙ্গা টিউবওয়েল।

'জল ওঠে না?'

'অনেক টাকা দে বসাই। দু'বছর না ঘুরতেই বালি ঢুকে বন্ধ হয়ে গেল—'

'কত ফুট?'

'সাতশো সাড়ে সাতশো— জল এখানে অনেক নীচে—' সেই বুড়ো এক লাফে মাটিতে নেমে বলল, 'সোঁদরবনের মাটি তো—'

'তাই বুঝি।'

'লোলাম্বর তখন ছোট। ওর বাপ আর আমি দেখিছি— আমাদের খুড়ো মশাই লাঙ্গল টানতে পারতেন না। লাঙ্গলের ফলা মাটিতে ঢোকেই না। ঢুকলিও গুচ্ছের শেকড়বাকড় আটকে যায়—'

'কী রকম?'

'তল্লাট ভরে তো শুধু গাছই ছেল। খুড়োমশায়ের বাপ কত গাছ সাবাড় করে লোকজন বসায়। ওই লাউ মাচার নীচি রোজ সন্ধ্যেবেলা বাঘ এসে বসি থাকত। পুকুর দেখিছেন— ওর ভিতর থিকি ওই ঘরের সামনে গাছের গুঁড়ি বেইরেছে— আঁধারের চেয়েও কালো।'

'বাঘ লোক খেত না?'

'খেত। তবে আমাদের কাউকে খায়নি। খুড়োমশায়ের বাপের জন্যি—'

এক গাল কামানো হয়ে গেছে ক্ষীরোদের। এমন সময় গাঁয়ের চৌকিদার এল। খালি গায়ে লুঙ্গির ওপর পেতলের তকমা বেলট্ ঝুলছে। চেঁচিয়ে বলে গেল, দশদিনের ভেতর 'ক' 'খ' 'গ' 'ঘ' শ্রেণীর রেশন কার্ডের জন্য নাম লেখাতে হবে।

নীলাম্বর বুড়োকে দেখিয়ে বলল, 'খুড়ো মশায়ের বিয়ের পর রেল লাইন বসিছে ইদিকে। ওনাদের খুড়োর বাপ বড় তেজি ছেলেন। বাঘ টাঘ তারি সমঝে চলত—'

ক্ষীরোদ পরামাণিকের হাত থেকে মুখখানা বাইরে এনে নীলাম্বরের খুড়োর দিকে তাকাল। বুড়ো খুড়ো এবারে সব ভেঙ্গে বলল, 'আমাদের খুড়ো মশায়ের বাপের লেজ ছেল—'

নীলাম্বব বলল, 'হ্যাঁ, সত্যি ছেল। তিনি এ গাছ থিকি ও গাছে লাফাতি পারতেন — নিজেরই শোরের খোয়াড় ছেল। পাকাবাড়ির মেঝেয় চড় মেরে দাওয়া ফাটিয়ে দেতেন। শেষ বয়সে দাঁত পড়ে যাওয়ায় কড়া চাপানোই থাকত। আধপোড়া শোরের মাংস গিলি গিলি খেতেন।

— লাউ মাচার নীচে, একবার এক বাঘ এসি ওনার হাতে প্রাণটা দেলে। এক মুগুরের ঘাযে বাঘের মাথা ফাঁক —'

'কতদিন বেঁচে ছিলেন—'

'লোকে বলে দু'শো বছর— তবে অত নয়'— একটু থেমে নীলাম্বর বলল, 'তিনি কবে মরলেন কেউ তো দেখেনি।'

'মানে?'

'শেষ বয়সে নাকি একা একাই করাত্তি নদী পার হয়ে সোঁদরবনের দিকে হেঁটে চলে গেছেন— আর ফেরেননি।'

নীলাম্বরের খুড়ো বলল, 'আমরা তখন ছোট। লোলাম্বরের বাপ ওই তেঁতুল গাছের একখানা বড় ডাল কেটে গুছিয়ে রেখিছে। খুড়ো মশায়ের বাপের শরীরটা হেলে গেছে কিছুকাল। মরলিই লাশ চিতেয় দিতে হবে। ছেলে পেলে মাগ কবে কাবাব হয়ে গেছে। মুয়ে আগুন দেবার জন্যি আমরা নাতিরা টিঁকে আছি— একদিন সকালে উঠি দেখি আর নেই। দুপুরের দিকি দূর গাঁয়ের রাখালরা খবরটা দেলে, পোড়ো গায়েনকে তারা ডোঙ্গায় চাপি সোঁদরবনের খাল ধরি এগুতে দেখিছে— সেই শেষ খবর।'

একটা ডাব কেটে নীলাম্বর ক্ষীরোদের হাতে তুলে দিল, 'এই আমাগে অগড়ের তেঁতুলগাছ। খুড়ে মশায়দের খুড়োর বাপ ছাড়া সবাই ও গাছের ডালে পুড়িছে। আমার মেজদি পুড়িছে, শৈলাদি পুড়িছে— আজকাল পাখিরা আর বসে না, আগে ঝাঁক ধরে ওই তেঁতুল ঠুকরে তলায় ঢলে পড়ি থাকত।'

যাকে নিয়ে এত কথা, ক্ষীরোদ দেখল, এমন বাতাসে মগডালে তার কিছু পাতা শুধু কাঁপছে। ঘন সবুজের মাঝে মাঝে পুরনো কালো গা থম্ মেরে দাঁড়িয়ে। ধানকাটা মাঠে নীলাম্বরের বড় ছেলে লাঙ্গল দিচ্ছে। কড়াই বুনবে। দূর রাস্তা দিয়ে বাস যাচ্ছে, গাছপালা বলে দেখা গেল না, ক্ষীরোদ শব্দ শুনতে পেয়ে উঠে দাঁড়াল, 'এমন অমঙ্গুলে গাছ রেখে কি করবে গায়েন— যদি দিতে, নিয়ে যেতাম'— কথাটা গোড়াতেই এর চেয়ে আর খোলসা করে বলা যায় না।

'এত বড় গাছ কি প্রকারে নেবেন'— কিছু অবাক হয়েছে নীলাম্বর খুড়ো, 'আমার এই বয়সে কত ঝড় দেখলাম ওকে নিতে এল— নড়াতিই পারলো না।'

'লোকজন এসে নিয়ে যাবে। দশটা কুড়োল লাগালেই ভাগে ভাগে মাটিতে শুয়ে পড়বে। নায্য দব যা তাই দেব।'

'আপনি কেটে নে যাবেন?' খুড়োর মাঝখান থেকেই নীলাম্বর জানতে চাইল, 'দর কী রকম—'

'বাজার যা তাই— একটা পয়সাও ঠকাবো না। তবে গাছও কতকালের দেখতে হবে— ওতে কি আর কিছু আছে!' এ কথাটা একেবারে মিথ্যে— কেননা, অমন কাঠে কিছু না থাকলে কোথায় আছে— তাই ক্ষীরোদের গলা একটু কেঁপে গেল।

'আপনার কী কাজে লাগবে?'

'বিশেষ কোন কাজে নয়— তবে, আপত্তি না থাকলে চেরাই করে নিমতলার গোলায় পাঠিয়ে দিতাম'— ক্ষীরোদের চোখের সামনে এখন দশ হাজার ইজিচেয়ার, পঞ্চাশ হাজার পিলসজ, এক লক্ষ পিঁড়ি নাচছে।

নীলাম্বর গাছটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। পরামাণিক উঠোন পেবিয়ে গেল। বুড়ো খুড়ো বলল, 'লোলাম্বব হয়নি। বিদ্যেধরীর বুক বেয়ে আমাদের খুড়ো মশায়ের বাপ কোণাকুণি পাড়ি দেতেন রেতের বেলা— তখন জোচ্ছনায এ গাছের পেল্লয় ভরি আঁধারের দিকে চেয়ে পাড়ে ফিরি আসতেন।'

হাতের একখানা পাকানো কাগজ কথা বলতে বলতে সোজা করে ধরল, 'এই যে চৌকো ঘর দেখিছেন— এগুলো বাড়ি, এই যে রেখার মাথায় চিকে দেওয়া ছবি— এ হল বৃক্ষ— এই আমাদের তেঁতুলগাছ—'

'সেটেলমেন্ট ম্যাপ?'

'উনত্রিশ সনের— তখনকার সেটেলমেন্ট সাহেবের সই দেখিছেন নীচি', বলতে বলতে খুড়ো ধান কাটা মাঠে শুকনো বাবলার ঝাড়টা আঙ্গুল দিযে দেখাল, সোত্ কম বলে ওইখেনটায় সাহেবের বোট বাঁধা থাকতো— তিনিই আমাগের খুড়ো মশায়ের বাপের ছবি তোলেন। কত টাকা দিতি চাইল সাহেব— পোড়ো গায়েন তবু তার লেজ দেখায়নি—'

'এমনিতে পোড়ো গায়েন রাতবিরেতে রাস্তা পার হত হেসে খেলে— দিনি দিনি কিন্তু রোদ বাড়লিই কানা, ছায়া বেছে নে বসি পড়ত ওই তেঁতুল তলায় পিঁপড়ে কামড়ালি ধরতি পারত না। ঝাঁক ধরি কামড়ালি তবে উঠে গে তেঁতুল গাছে গা ঘষত— তখন শুকনো ছালবাকল খসি পড়ত। বৃক্ষের আদুল জায়গায় কী মোলায়েম করে হাত বুলে দেত পোড়ো গায়েন তখন।'

ম্যাপখানা মেলে ধরল ক্ষীরোদের চোখের সামনে, 'কেমন চওড়া নদী ছেল দেখিছেন', বুড়ো ম্যাপের ওপরে একটা চ্যাটালো ড্রেনের গা দিয়ে আঙ্গুল টেনে আনল। ক্ষীরোদ ধানকাটা মাঠে তাকিয়ে ফেলেছে। ঢলা রোদেব আলো কাৎ হয়ে পড়ে। ন্যাড়া মাঠের

এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে গরুর ছোট ছোট ছায়া। তার ভেতর দিয়ে নীলাম্বর হেঁটে আসছে। পেছনে জনা পাঁচেক লোক। তাদের দু'জনের কাঁধে দু'টো কুড়োল।

বুড়ো বলছিল, 'এই পেল্লয় নদী সাঁতরে পোড়ো গায়েন পান্তার সঙ্গে ওই তেঁতুল জল খেয়ি ঘুম লাগাতো। বেলাবেলি উঠতি চরের মাটিতে গর্ত করে ধান গুঁজে দেত, তখন ত আর লাঙ্গল চলতো না। দু'হাত শেকড়বাকড়- -'

লোকজন সুদ্ধ নীলাম্বরকে ঢুকতে দেখে বুড়োর কথা কেঁপে গেল—

'ও তুমি দর ঠিক করে ফেল ক্ষীরোদবাবু— এ গাছ আমরা রাখব না—'

নীলাম্বরকে থামিয়ে দিল বুড়ো, 'বেচে দিবি? আমায় পোড়াবি কি দিয়ে—'

'সে আরও গাছ আছে। বাবলাগুলো কি হবে?'

'তা' বলে পোড়ো গায়েনের তেঁতুলতলা থাকবে না— অমন ছাযা বোদ এসে হাট করে দেবে?'

'তা দিক খুড়ো। এবার তো ধানের হালচাল দেখি মাথা ঘোবে। শ্রাবণ ভাদ্রে টান ধরলি এতগুলো পেট তো আর তেঁতুল গিলে চলবে না—' এবার দাঁড়ানো লোকগুলোকে ধমকালো নীলাম্বর, 'নে নে তোরা হাত লাগা— কোথায় কোপাবে দেখে দাও।'

'দর ঠিক হোক্।'

'বেশি কথা কয়ে কাজ কি? না হোক্ তিনশো বছরের গাছ হবে—তিনশোটা টাকা দিয়ো—'

এতক্ষণে খুড়োর মুখে কথা এল, 'আমার ভাগ আমি বেচবো না—'

'বাগড়া দিয়ো না খুড়ো— আটকুড়ো লোক তুমি, আমবাই তোমাকে দেখব— এতকাল দেখিনি?'

নীলাম্বরের কথায় কান দিল না, 'আমার স' পাঁচ অংশ— ও আমি বেচব না।'

নীলাম্বর গোঁজ খেয়ে দাঁড়ালো। পেটের খোঁদল বাতাসে ভরে গেছে। মাঠময় গরু ফিবছে – শুকনো ধুলোয় মাটির ওপরের আধ হাত ধোঁয়া হযে গেছে। নীলাম্বরের বড় ছেলেব বৌ হবে, একগলা ঘোমটা দিযে ক্ষীবোদেব জন্যে ভাতেব থালা নিয়ে দাঁড়ানো।

'তোমার অংশেব গুষ্টি মারি। এ সোঁদববনের গাছ— যে নেয তার। নে নে তোরা হাত লাগা এইবেলা—।' এবাব কিন্তু পাঁচজন নয়— লোকগুলোর মোটে একজন কুড়োল কাঁধে উঠে দাঁড়ালো।'

'পোড়ো গাযেন ফিবে এলি কি দেখাবি নীলাম্বব?' গলা ঘড়ঘড় হয়ে উঠতে একদলা কাশি ফেলে দিল খুড়ো।

'তিনখানা একশো টাকার নোট? তোমার পোড়ো গায়েন আর ফিরবে নি!' কী খেয়াল হতে নীলাম্বর হেসে উঠল, 'কোন পথ দে আসবে শুনি? আড়াইশো তিনশো বছরের বুড়ো তো হেঁটে আসতে পারবে নি। নৌকোয় আসবে কবাতি, বিদ্যেধরীর বুক শুকিয়ে কাঠ!'

এ সব কথার ভেতর দিয়ে বুড়ো শুধু বলল, 'ঠিক ফিরে আসবে রে। সে বেলা দুষিসনে।'

কথাটায় কী ছিল। তেঁতুল গাছটার সামনেই জুৎসই একখানা হাওয়া চৌদিকের অনেকটা ধুলো হুস্ করে শূন্যে তুলে দিয়েই ফেলে দিল। সংগে সংগে কয়েকটা বড় তেঁতুল শব্দ করে তলায় পড়ল। দাঁড়ানো লোকটা কাঁধ থেকে কুড়োল নামিয়ে ফেলেছে। সবার সঙ্গে ক্ষীরোদও গাছতলায় তাকালো। পরিষ্কার জায়গাটুকুর ওপর খানিক চলা-রোদ চৌকো হয়ে পড়ে। তার বাইরেরটা পাতলা অন্ধকার। সেখানে গাছটা দাঁড়ানো। এতগুলো লোকের সামনে গুঁড়ি থেকে একটা কালো জিনিস নেমে এল— রোদে পড়তেই সবার আগে নীলাম্বর হেসে উঠল, 'খড়িচোচ্!'

বেশ লম্বা। সাপটা তেঁতুলগুলোর ওপর দিয়ে— রোদের বাইরে নেমে এল। অবেলায় আর ভাত খেতে পারল না ক্ষীরোদ। থালা ঘেঁটে ঠেসে জল খেয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। আঁচানোর জন্যেই পুকুরে যাচ্ছিল। এমন সময় নীলাম্বর বলল, 'মেয়েরা মাছ ধুতে পুকুরে নামলিই দু'টো এসে জ্বালাত রোজ। একটাকে কোঁচে গেঁথি ফেলিছি।— এইটে তাহলে গাছে উঠে বসেছেল।'

উঠোনের কোণে দাঁড়িয়ে মুখ ধুয়ে নিল ক্ষীরোদ। খুড়ো-ভাইপোর এখন যা অবস্থা তাতে গাছের দর নিয়ে একটু চাপ দিলেই নীলাম্বর আড়াইশো কী স'দুশোয় রফা করে নিত। যোগাড়যন্তর করে ডেকে আনা পাঁচ পাঁচটা লোক কুড়োলসুদ্ধ উঠোন ছেড়ে মাঠে নেমেছে। ক্যাচকোচ করতে করতে ধানবোঝাই একটা গো-গাড়ি এসে হাজির হল। সামনের গোয়ালে বৌরা ধোঁয়া দিচ্ছে, মশার ঝাঁক সেখান থেকে বেরিয়ে উঠোনেব মাথায় এক জায়গায় চাক বেঁধে উড়তে আরম্ভ করেছে। আজ আর গাছ কাটার কথা ভাবাই যায় না। ক্ষীরোদ ধুলো ঝেড়ে পাম্পসুতে পা গলালে। সন্ধ্যেব আগের বাতাসে গেয়োবনের নরম ডাল পালা মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে। ধান মাড়ানোর বলদটার পাঁক খাওযা থামেনি— খুঁটি আলগা দেখে নীলাম্বর উঠে গিয়ে এঁটে দিল।

'এখন যাবেন কি? আমরা পোড়ো গায়েনের বাড়ির লোক, জেনেশুনে আপনাকে ছাড়তি পাবিনে—' বলতে বলতে নীলাম্ববের কাকা এগিয়ে এল। কালচে অন্ধকারে বুড়ো উঠোনে— ওপারের দাওয়ায় ক্ষীরোদ। খুড়ো প্রায় লুফে ধরে ফেলল তাকে। জামার নীচের ফতুয়ার ঘড়ি-পকেটে সাড়ে তিনশো টাকা গজ গজ করছে। খুড়োর মুখ দেখে ভাল বোধ হল না ক্ষীরোদের। এই গাছ, পোড়ো গায়েনেব ফেলে যাওয়া বিদ্যেধরীর শুকনো বাদা, চাকা খোলা গরুর গাড়ির ধড়— এখান থেকে বৌবাজার-শেয়ালদার কাঠগোলায় কোনদিন ফেরা যাবে না আর। খানিক আগে তবু কিছুক্ষণ অন্তব অন্তর দূর রাস্তায় বাসের হর্ন, ঘড় ঘড় আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। এইমাত্র পোড়ো গায়েন এক চড়ে সব শব্দ বন্ধ করে দিয়েছে। বাদার মাথায় পোকায় কাটা আধখানা চাঁদ উঠতেই নীলাম্বর তার খুড়োকে বোঝানো ছেড়ে দিল। এতক্ষণ কত রকমে পথে আনার চেষ্টা চলছিল ক্ষীরোদের সামনে। তিনশো টাকার মধ্যে কী বাবদ কত যাবে তার ফিরিস্তিও দিচ্ছিল নীলাম্বর। খুড়ো উল্টো দাওযায ভোম্ মেরে বসে। হ্যাঁ না কিছুই বলে না। ধরা-জ্যোৎস্নায় ক্ষীরোদ শুধু পাঁচ হাত ছাযাটাকে উঠোনময় চক্কর খেতে দেখল। এতক্ষণে বাদার গর্ত থেকে লাল কাঁকড়ার কোটি ছানা বাইরের ঠাণ্ডায় উঠে এসেছে।

'তবে খুড়ো খতেন দেখাও— কার কত অংশ বুঝে নেব।'

খুড়ো দাওয়া ছেড়ে রাগে রাগে উঁচু ঘরটায় ঢুকলো, 'লম্ফ নে এসে দেখে যা— মালিক খতেনে আমার স'পাঁচ আনা অংশ— তোর বোন শৈলর ছেলেপেলেরা ভাগ বসালি ও গাছে তোর দু'আনাই নেই—'

গুলতিতে টান দিলেও এত জোরে গুরুল ছুটে যায় না। নীলাম্বর মাথায় ঠোক্কর খেতে খেতে অন্ধকার ঘরে ঢুকে গেল। তারপর খুড়োর কয়েকটা কথা বাইরের দাওয়া অব্দি পৌছে শুধু একটা চীৎকার হয়ে গেল শেষে। তাও বেশিক্ষণ থাকল না। মেহগনির প্রথম পালিশেও গন্ধ উঠেই এমন উবে যায়। খুব ভারি নিঃশ্বাসে ঘরের অন্ধকার মাড়াই হচ্ছে প্রায়। কয়লা খেগো পুরনো লোকাল ইঞ্জিনটা ভোরের ট্রেন টেনে বাসুলিডাঙ্গা এসে মাড়ি, দাঁত সব টলে ফেলে নীল ধোঁয়াটে নিঃশ্বাস ফেলছিল আজ সকালে।

পাম্পসু ক্ষীরোদের পায়েই ছিল। নদীর ফেলে যাওয়া মাটি। শেষবারের মত জল চুয়ে নিয়ে পাথর হয়ে আছে। জুতো জোড়া বগলে রয়েছে অনেকক্ষণ। পায়ের নীচে কড়া ফেড়ে

যাচ্ছে— তবু না দৌড়ে নিস্তার নেই। রশি দশেক দূরের বাবলার ঝাড়টা পেরোবার সময় এমন একটানা মাঠে এক পোচড়া ভুষোকালির চেয়ে বেশি কিছু লাগল না তার। ওই জায়গাটায় সেটেলমেন্ট সাহেবের বোট বাঁধা থাকত। ফাঁকা দেখে চাঁদ অনেক উঁচুতে উঠে এসেছে। দৌড়োনোর ঝোঁকে একবার নীলাম্বরের গলা হাকড়ানি পেছু-ডাক ছুটে আসছে বুঝতে পেরেছিল। ল্যাজা দিয়ে পুরো একটা মানুষ সাইজে আনে কী করে। এখন দেখে শুনে পথ ঠিক করে নিতে হবে। ওই তো রূপশাল ধানের মাঠ। বোধহয় তাই। সবই একরকম লাগছে। উপরে তাকাতে ক্ষীরোদ চাঁদের কিছু উনিশবিশ বুঝতে পারল না। পোকা এবাব ধানের দফা শেষ করেছে। বর্ষার মুখে মুখে আরও কম টাকা নিয়ে নীলাম্বরের উঠোনে এসে দাঁড়ালে ভাইপো সুদ্ধ বুড়ো খুড়ো আজ এই সন্ধ্যের পরেও টিকে থাকলে কাঁধে কুড়োল নেবে ঠিক। মগডালের রসালো কাঠে-হলদু বঙের পিঁড়ি বানিয়ে ক্ষীরোদ তখন রথেব মেলা ছয়লাপ করে ছাড়বে।

হঠাৎ মাঠ নাবি নিতে থমকে দাঁড়াল। এ যে নেবেই যাচ্ছে। বাদা জুড়ে ঠাণ্ডা হাওয়া উঠল. বিদ্যেধরী শুকোতে শুকোতে করাতি মুছে গেছে। বর্ষার জল দাঁড়ালে বেরোতে চায় না। সেই বাদা ডিঙ্গিযে পোড়ো গায়েনকে নাকি ফিরতে দেখেছে নীলাম্বরের বড় ছেলে। যত্ত তেড়েল গেঁজেল।

উল্টে পড়ল ক্ষীরোদ' পা ঠিক জায়গায় বাখতে পারেনি। পাম্পস্ কুড়িয়ে উঠতে গিযে বসে পড়ল। করাতি-বিদ্যেধরীর শুকনো জল হু হু করে ফিরে আসছে। রূপো রঙের। পড়ি মরি উঠতে গেল। হাঁটুর কল কব্জায় জং ধরে আছে কতদিন। পাম্পস্ পড়ে গেল হাত থেকে। হামা টানার কায়দায় বুক ভবে দম নিয়ে ছিটকে বেরোবার চেষ্টা কবল ক্ষীরোদ। দৌড় ত দূরের কথা— দাঁড়ানোব মত এমন চেনা জিনিসটাই কিছুতে হল না। হচ্ছে না। হাঁটুই খোলে না। যখন এখানে এভাবে থাকতেই হবে–– তখন আর পাম্পস্ খুঁজে লাভ নেই বুঝে যেখানে ছিল ঠিক সেখানেই ক্ষীরোদ একটুও না নড়ে বসে গেল। কোথাও অন্ধকাবের ছিটেফোঁটাও নেই। বাদা ভর্তি জোৎস্না। ডোঙায় চড়ে পোড়ো গায়েন ইচ্ছে করলেই ফিরতে পারে এখন।

পুরোহিত দর্পণ

শংকর

যেন শেয়ালদা স্টেশনের ফুটপাথে কোলে-বাজারের বাসি শুকনো বেগুন। হরকিঙ্কর ভটচায্যির চেহারাটা দেখলে সপ্তাহখানেকের শুকনো বেগুনের কথাই মনে পড়ে। বাইরের চামড়াটা কুঁকড়ে গিয়েছে, সেই সঙ্গে ভেতরের মাংসও যেন রোদে শুকিয়ে ছোবড়া হয়ে রয়েছে। সরু লম্বা নাকটা যেন একটা বিস্ময়সূচক চিহ্ন! রঙটা এককালে বেশ ফর্সা ছিল দেখলেই বোঝা যায়— এখনও খানিকটা আছে। চোখ দুটোও বেশ বড় বড় কিন্তু এখন ঝিমিয়ে পড়েছে— যেন একশো পাওয়ারের লাইট থেকে পঁচিশ পাওয়ারের আলো বেরোচ্ছে।

খালি গায়ে বাড়ির দাওয়ায় বসে হরকিঙ্কর নিজের পৈতেটা দুহাতে ধরে পিট চুলকোচ্ছিলেন। এমন সময় ডাকপিওনকে দেখে বললেন, 'হরকিঙ্কর ভটচায্যির নামে কিছু আছে নাকি?'

পিয়ন বললে, 'কোনো চিঠি নেই।'

'হরকিঙ্কর দেবশর্মাও লেখা থাকতে পারে।'

'চিঠি থাকলে কেন দেব না বলুন?'

'ওইরকম তো তোমরা বল বাপু, অথচ লোকের চিঠি তো হারাচ্ছেও। সেবার আমার যজমানের চিঠি তোমরাই তো দেরি করে দিলে। চিঠি যখন এসে পৌঁছল তখন রমেশ ঘোষালের শ্রাদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এতে যে ব্রাহ্মণের কি ক্ষতি হয়, তা তোমরা বুঝবে কী করে?'

পিওন বিরক্ত হয়ে বললে, 'আমাদের বিশ্বাস না হয়, পি-এম-জিকে কমপ্লেন করুন।'

কথা আরও বাড়তো। কিন্তু দূর থেকে হরকিঙ্করের মেয়ে সুব্রতাকে দেখা গেল। সুব্রতা সকালে সরকারী দুধের দোকানে কাজ করে। সেখান থেকেই ফিরছিল। পিওনকে সে-ই সরিয়ে দিল। তারপর বাবাকে বললে, 'আপনি শুধু শুধু ব্যস্ত হচ্ছেন।'

হরকিঙ্কর গভীর হতাশার সঙ্গে বললেন, 'শুধু শুধু কি আর ব্যস্ত হচ্ছি মা। নাকতলার সুদর্শন রায় কি সত্যিই এবার দুর্গা পুজো করবে না? কিন্তু কী করে তা হয়? সুদর্শনদের পুজো কি আজকের? আমার ঠাকুর্দা ওদের বাড়িতে মায়ের অর্চনা করেছেন, আমার বাবা করেছেন, আমিও করে আসছি এই এত বছর। পাকিস্তান হবার পরও তো ওদের কাজ বন্ধ হয়নি। মাকে ওরা যশোর থেকে সোজা নাকতলায় এনেছে। ঈশ্বরের আশীর্বাদে সর্বস্ব যায়নি ওদের। এখানেও তো ক'বছর পুজো করলাম আমি। এবারই বা পুজো হবে না কেন? নিশ্চয় চিঠি হারিয়েছে।'

সুব্রতা চুপ করে রইল। হরকিঙ্কর বললেন, 'স্বীকার করলাম, প্রথম চিঠিটা না হয় গোলমাল হয়েছে। কিন্তু আমি যে জোড়া পোস্টকার্ড ছাড়লাম, তার উত্তর?'

সুব্রতার মুখটা এবার সত্যিই মলিন হয়ে উঠলো। 'কেন বাবা, সে-উত্তর তো কালই এসে গিয়েছে।'

'কালই এসেছে? আর আমি পিওনের সঙ্গে ঝগড়া করে মরছি।'—হরকিঙ্কর রেগে উঠলেন।

'আপনি তখন গঙ্গায় স্নান করতে গিয়েছিলেন,' সুব্রতা উত্তর দিলে।

চিঠিটা হাতে নিয়ে হরকিঙ্কর গুম হয়ে বসে রইলেন। সুদর্শন রায়রা এবার থেকে পুজো বন্ধ করে দিলেন। ছেলেরা পুজোটাকে বাজে খরচ মনে করছে। হরকিঙ্কর মুখ বিকৃত করে বললেন, 'সনাতন ধর্মের কিছুই আর থাকবে না।'

সুব্রতা বললে, 'বাবা, চা খাবেন তো? জল চাপাই?'

হরকিঙ্কর নিজের মনেই বললেন, 'ভালই হয়েছে— আমাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়েছে। ওদের বড় ছেলেটা কোথাকার এক বদ্যির মেয়ে বিয়ে করেছে। বাউনের ঘরে যত অনাসৃষ্টি। সে-বাড়িতে পুজো করে নিজের অমঙ্গল ডেকে না আনাই ভাল।'

সুব্রতা চা নিয়ে এল। হরকিঙ্কর নিজের মনেই বললেন, 'ওদের কর্তা কিন্তু জানতো কেমন করে দেব দ্বিজের সেবা করতে হয়। ওদের দেওয়া গামছাগুলোর সাইজ দেখেছিস। অন্য লোকেরা আজকাল যে গামছা দেয়, তা দিয়ে রুমালের কাজও হয় না। নামই হয়ে গিয়েছে-- পুজোর গামছা!'

মেয়ে বললে, 'বাবা চা খান।'

বাবা বললেন, 'এ যুগে আর পুরোহিতের কাজ চলবে বলে মনে হয় না। লোকে ভাবে আমরা একটা নুইসেন্স। আমরা কিছু না করেই পয়সা আদায় করি, ভিখিরীর ভদ্র-সংস্করণ।'

মেয়ে বললে, 'বাবা, নবারুণ স্পোরটিং খুব জাঁকিয়ে পুজো করছে এবার। ওদের সেক্রেটারি রোজ সকালে দুধ নিতে আসেন। আজও বলছিলেন আপনার কথা।'

'কী বললি?' হরকিঙ্কর এমনভাবে আর্তনাদ করে উঠলেন যেন কেউ ভারি বুটজুতোসমেত পা তাঁর পায়ের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। 'বারওয়ারি পুজো করতে হবে আমাকে এই বয়সে? কোনদিন হয়তো কেউ বলবে. ' পরের কথাগুলো হরকিঙ্কর মেয়ের সামনে উচ্চারণ করলেন না, কিন্তু মনে মনে বললেন, 'হয়তো কোনদিন আমাকে বেশ্যাবাড়িতে শীতলা পুজো করে আসবার কথাও বলবে।

মেয়ে বললে, 'সেক্রেটারি বলছিলেন, নবারুণ স্পোরটিং-এর পুজো করবার জন্যে পুরুতদের মধ্যে কাড়াকাড়ি।'

'ভাগাড়ের মড়ার জন্যেও কাড়াকাড়ি হয়। বারওয়ারি পুজোর পত্তন করেই সনাতন ধর্ম উচ্ছন্নে যেতে বসেছে। ও সব জায়গায় পুরুত না এলেও কেউ খোঁজ করে না, একটা পুরুতই তিনটে বারোয়ারি পুজো সারে।'

সুব্রতা চুপ করে রইল। হরকিঙ্কর বললেন, 'মা মহামায়ার পুজো বলে কথা। তাঁকে তুষ্ট করে রামচন্দ্র রাবণ বধ করলেন। দেবী দশভুজা মহিষাসুর নিধন করে দেবগণকে স্বর্গে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন। পুজোর ত্রুটি হলে তাঁর রোষ থেকে কে আমাকে রক্ষে করবে?'

মেয়ে আর প্রতিবাদ করবার সাহস পেলে না। হরকিঙ্কর বললেন, 'একবার মোড়ের বাসনের দোকানে যাবো। যদি কয়েকটা দানের সামগ্রী বিক্রি করতে পারি। বেটা দিনদুপুরে চৌরাস্তার মোড়ে বসে গলা কাটে। অমন সুন্দর পিতলের চাদরের ঘড়া, ছাঁকা কাঁসার থালা বলে কিনা আড়াই টাকার বেশী দেবে না। কিছুদিন ধরে রাখলে দাম উঠতো। কিন্তু সে সামর্থ্য কোথায়?'

সুব্রতা বললে, 'দোকানদারের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করবেন না বাবা। জানেনই তো ওরা চোর।'

হরকিঙ্কর ভাবলেন, 'সবই ভাগ্য। মায়ের ইচ্ছা— না হলে সনাতন ধর্মের এমন সর্বনাশ হবে কেন? কেন আমাদের নিজের দেশঘর ছেড়ে এই বিদেশের বস্তিতে এসে উঠতে হবে?'

হরকিঙ্কর বাইরে যাবার জন্যে উঠে পড়েছেন। ঠিক সেই সময়ই বাইরে আওয়াজ শোনা গেল, 'সুব্রতা ভট্টাচার্যের বাড়ি কোনটা?'

সুব্রতা দরজা খুলে দিয়ে অবাক হয়ে গেল। 'আরে শুভ্রাদি! আপনি? এখানে?'

'কেন, আসতে নেই?' শুভ্রাদি হেসে বললেন।

শুভ্রাদিকে বাবার কাছে নিয়ে এসে সুব্রতা পরিচয় করিয়ে দিলে, 'বাবা, মহিলা মহাবিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপিকা শুভ্রা রায়। ইনিই আমাকে কলেজে ফ্রীশিপ পাইয়ে দিয়েছিলেন।'

'ও।' নমস্কার করলেন হরকিঙ্কর। মেয়ে ততক্ষণে অতিথির দিকে একটা আসন এগিয়ে দিয়েছে। শুভ্রাদির বয়স বেশী নয়। খোঁজ করলে ওই বয়সের মেয়ে কলেজেই পাওয়া যাবে। তাছাড়া শুভ্রাদির মুখে এমন একটা লাবণ্য আছে যে, মনে হয় আঠারো উনিশ বছরের মেয়ে। ওঁর মুখের সঙ্গে হরকিঙ্কর নিজের মেয়ের মুখটাও মিলিয়ে নিলেন। অভাবে অযত্নে থাকলেও তাঁব মেয়ের রঙটা অনেক ফর্সা, দৈর্ঘ্যেও কয়েক ইঞ্চি বেশী হবে। এত অনটনের মধ্যেও বাড়ন্ত গড়ন— দেখে কে বলবে এখনও সতেরো পুরো হয়নি।

বেশ বিব্রত হয়েই হরকিঙ্কর সুবেশা শুভ্রাদিকে বললেন, 'কিছু মনে করবে না, একটু বসতে দেবার জায়গাও নেই।'

'কী ব্যাপার, শুভ্রাদি?'

'ব্যাপারটা তোমার বাবার সঙ্গে। আমি তোমাদেব কাছাকাছি থাকি, তাই প্রিন্সিপ্যাল বললেন তুমি নিজেই দেখা করে এস।'

'কেন বলুন তো?' হরকিঙ্কর প্রশ্ন করলেন।

'কলেজে এবার আমরা দুর্গাপুজো করবো ঠিক করেছি।' — শুভ্রাদি জানালেন।

'কলেজে দুর্গাপুজো, তাও কিনা মেযে কলেজে!' হরকিঙ্কব তাব বিস্ময চেপে বাখবাব কোনো চেষ্টা করলেন না।

শুভ্রা রায় স্নিগ্ধ হাসিতে মুখ ভবিয়ে ফেললেন। সুব্রতা লক্ষ্য করছিল, কি সুন্দব ব্যবহার শুভ্রাদির। শুনেছে খুব বড়লোকের মেয়ে, অথচ কেমনভাবে কথা বলেন। শুভ্রাদি বললেন, 'অনেকেই কথাটা শুনে অবাক হচ্ছেন। পরিকল্পনাটা আমাদেব প্রিন্সিপ্যাল সুভদ্রা হালদাবের। ওঁর ধারণা, দেশের যা অবস্থা তাতে মেয়েদের শক্তি পুজোব দবকাব হয়ে পডেছে।'

হবকিঙ্কর বললেন, 'আচ্ছা!'

শুভ্রাদি বললেন, 'আমাদেব মধ্যে যাবা একটু তথাকথিত মডার্ন তাবা খুব আগ্রহ দেখায়নি। কিন্তু প্রিন্সিপ্যালের ইচ্ছে মেয়েরা পুজো-মাইণ্ডেড হোক— তাবা পুজোব কাজকর্ম শিখুক। শেলি বায়রণ কীটস পড়ে দেশের কোনো মঙ্গলই হবে না।'

হরকিঙ্কর জানতে চাইলেন, 'আগে কখনও এমন পুজো হয়েছে?'

শুভ্রাদি জানালেন, 'সুভদ্রা হালদার বলেছেন, আগে কী হযেছে না হযেছে সে নিয়ে মাথাব্যথা করে লাভ নেই। জিনিসটা যখন ভাল, তখন করতে বাধা কোথায়? মহিষমর্দিনী পুরুষমানুষ ছিলেন না। সুতবাং মেয়েরা ইচ্ছে করলেই নতুন আদর্শ স্থাপন করতে পাবে।'

হরকিঙ্কর বললেন, 'পুজোর তোর আর দেরি নেই।'

শুভ্রাদি বললেন, 'ঠিক বলেছেন, মোটেই সময় নেই। অনেকে ভয় পাচ্ছিল, এই অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সব হয়ে উঠবে না। কিন্তু মিসেস হালদার বললেন, চব্বিশ-ঘণ্টার নোটিশে তাঁর নিজেরই বিয়ে হয়েছিল।'

সুব্রতা যা ভয় পাচ্ছিল এবার তাই হলো। হরকিঙ্কর দ্বিধা না করে শুভ্রাদির মুখের উপরই বললেন, 'আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ বটে, কিন্তু বারোযারি পুজোকে মনে প্রাণে ঘৃণা করি। হাজারজন যেখানে মাতব্বর— পুজোর নাম করে যেখানে কেবল নাচগান হাসিঠাট্টা আর বেলেল্লাপনা হয়— না খেয়ে মারা গেলেও আমি সেখানে পুজো করবো না।'

সুব্রতা বাবাকে বুঝিয়ে শান্ত করবে ভেবেছিল। কিন্তু তাঁর চোখগুলোর দিকে তাকিয়ে সাহস করলে না।

শুভ্রাদি কিন্তু মোটেই অসন্তুষ্ট হলেন না। বললন, 'মিসেস হালদার আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। উনিও চান শুদ্ধ পূজা— যেখানে ধর্মীয় ভাবটা বজায় থাকবে। মাইক, আলোকসজ্জা, প্যাণ্ডাল, প্রসেশন এসব আমরা কিছুই করবো না। আমাদের প্রতিমাও হচ্ছে শাস্ত্রসম্মত।'

'ফিল্ম অ্যাকট্রেসের মুখের আদলওয়ালা আলট্রামডার্ন ফিগার চাইছেন না আপনারা?' হরকিঙ্কর প্রশ্ন করলেন।

চিত্রতারকার কথা উঠতেই সুব্রতা কেমন চমকে উঠেছিল। কিন্তু এঁদের দুজনের কেউই তা লক্ষ্য করলেন না।

শুভ্রাদি বললেন, 'আমাদের প্রিন্সিপ্যালের ইচ্ছে, সনাতন আদর্শে পুজো হোক— তবেই তো মেয়েদের মঙ্গল হবে। আমরা সব কিছুর দায়িত্ব নিজেরাই নিয়েছি। মেয়েরাই সব কিছু করছি। আমাদের সকলের অনুরোধ পুজোটা আপনি করুন। মিসেস হালদার আপনার কথা শুনেছেন কোথাও। আপনি যদি ওঁর সঙ্গে একবার সময়মতো দেখা করেন।'

হরকিঙ্কর নিজের মনকে বোঝালেন কলেজের মেয়েদের পুজোকে বারোয়ারি পুজো বলা চলে না। শুভ্রাদিকে বললেন, 'আপনি আমার মেয়েটাকে সাহায্য করছেন অনেক, কী করে ধন্যবাদ দেবো জানি না। তিনপুরুষ ধরে আমরা রায়দের বাড়িতেই পুজো করে এসেছি। আর কোথাও কখনও বোধন করিনি। এবার করে দেখি, মা কি বলেন। আম আজই কলেজে যাবো'খন।'

হরকিঙ্কর শুভ্রাদিকে বসিয়ে এবার উঠে পড়লেন, বাসনওয়ালার সঙ্গে এখনই দেখা করা প্রয়োজন। বেরোবার আগে মেয়েকে বললেন, 'দিদিমণি তোমার বাড়িতে এসেছেন, একটু চা অন্তত: করে দাও।'

শুভ্রাদি এবার হতশ্রী ঘরখানা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। 'ছাদটা ফেটে রয়েছে দেখেছি। জল পড়ে?'

'জলে ভেসে যায়।' সুব্রতা উত্তর দিলে।

'কলেজে যাও না কেন?'

'অনেক দিন যাচ্ছি না। কাউকে যেন বলবেন না শুভ্রাদি। তাহলে সকালে দুধের চাকরিটাও যাবে। স্টুডেন্ট ছাড়া গভর্ণমেন্ট কাউকে রাখে না।'

ঘরের অবস্থা এবং সুব্রতার মুখ চোখ দেখে শুভ্রাদি যেন সব বুঝতে পারছেন।

লজ্জা পেয়েছে সুব্রতা। বললে, 'বাবাব কথায় রাগ করবেন না, শুভ্রাদি। শাস্ত্রীয় ব্যাপারে ওঁকে একগুঁয়ে বলতে পারেন। ওখানে কোনোরকম শৈথিল্য সহ্য করতে পারেন না। তাই কষ্টও পাচ্ছেন।'

'কেন?'

'অনাচার হলে যজমানের মুখের উপর যা-তা বলেন। তাতে যজমান সন্তুষ্ট থাকবে কেন? পাড়ায় কিছু পুরুতের অভাব নেই। তাছাড়া আমরা বাইরের লোক, পাকিস্তানে ভিটেমাটি হারিয়ে ভাসতে ভাসতে এখানে হাজির হয়েছি। স্থানীয় যজমানবা নিজেদের লোক ছেড়ে কেনই বা বাবাকে ডাকবে?'

শুভ্রাদি চুপ করে ওর কথা শুনে যেতে লাগলেন— 'বাবাকে বলি, আপনি তো লেখাপড়া জানতেন, কেন এই বাজে লাইনে এলেন। বাবা বলেন. ওঁদের পরিবারের অন্তত: একটি ছেলেকে এই লাইনে আসতে হবে এই নিয়ম ছিল। তাছাড়া ওঁদের যৌবনকালে পুরোহিতের সম্মানও ছিল।'

'তোমার কে কে আছেন?' শুভ্রাদি প্রশ্ন করলেন।

'এক দাদা, বাইরে চাকরি করেন। মা নেই। এখন আমিই সংসার দেখছি।'

'তুমি কলেজ বন্ধ করলে কেন? বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে বুঝি?'

সুব্রতা কোনো উত্তর দিল না, শুধু হাসলো।

'আচ্ছা, এবার আসি। পুজোর ক'দিন কলেজে যেও', বলে শুভ্রাদি বিদায় নিলেন।

সুব্রতার হাসি থেকে শুভ্রাদি কি বুঝলেন কে জানে। সুব্রতা কিন্তু গুম হয়ে বসে থাকলো! বিয়ে! বিয়েই বটে! ধানবাদে চাকুরে দাদা। তাই বটে। গতমাস থেকে টাকা আসছে না। দাদা নাকি ওখানে কি একটা গণ্ডগোল বাধিয়ে বসেছে বেল কলোনির কোন একটা বেজাতের মেয়ের সঙ্গে, ধন্য পুরুষ জাত। কি দায়িত্ববোধ! একশ তিরিশ টাকা মাইনের রেলবাবুর আবার প্রেম!

বাবা যতই গলা ফাটিয়ে ধর্মের জয়গান করুন, টাকা— টাকাটাই সবচেয়ে বড় কথা। বেঁচে থাকতে গেলে টাকা চাই-ই।

ডাল্টন কোম্পানি এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের ড্রামা সেক্রেটারি মিস্টার চ্যাটার্জি বোজ সকালে দুধ নিতে আসেন। তিনিই সেবারে বলেছিলেন— 'আপনার গলার স্বরটা খুব সুইট।'

বিরক্ত কণ্ঠে সুব্রতা জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন বলুন তো?'

ভদ্রলোক মোটেই বিব্রত না হয়ে বলেছিলেন, 'অভিনযেব লাইনে এলে উন্নতি করতে পারতেন। আজকাল পাড়ায় পাড়ায় অফিসে অফিসে খুব চাহিদা। আমবা হঠাৎ বিপদে পড়ে গিয়েছি। আমাদের পার্ট করছিল কমলিনী। বেচাবার টাইফয়েড হয়েছে অথচ অভিনযের দিন ঠিক হয়ে গিয়েছে, স্টেজের জন্যে বুকিংও কবা রয়েছে। এখন পেছোবার উপায় নেই। আসুন না। টাকা পাবেন। মেডেলও পেতে পারেন। একবার নাম হলে তখন দেখবেন বাড়িতে লোক এসে সাধাসাধি কবছে।'

সুব্রতা রাজী হয়ে গিয়েছে। লুকিয়ে কয়েক দিন রিহার্সাল দিয়ে এসেছে। তারপব অভিনয়ও। মেডেল পায়নি, কিন্তু টাকা পেয়েছে ষাটটা। কাজে লেগে গিয়েছে টাকাগুলো। সুব্রতা প্রশ্ন করেছিল, 'আপনাদের অফিসে একটা চাকবি পাওযা যায না?'

'মেমসাহেব ছাড়া এরা রাখে না। তাছাড়া, কোন দুঃখে আপনি চাকরি করতে যাবেন? এ লাইনে চাকরির দশগুণ রোজগার করবেন। আব যদি একবাব কোনো সিনেমা প্রোডিউসারের নজরে পড়ে যান, তাহলে তো কথাই নেই!'

কথাটা মন্দ বলেননি ভদ্রলোক। একবার নজবে পড়ে গেলে আর রক্ষে নেই। মিস্টাব চ্যাটার্জির এক বন্ধু স্টুডিওর অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যামেরাম্যান। তার সঙ্গে দেখাও করেছে সুব্রতা।

সে বলেছে, 'ফিচার খুব শার্প। ক্যামেরায় খুব ভাল আসবে। নায়িকা হবার সমস্ত গুণই রয়েছে আপনার। এ-লাইনে কোনো চাঁইকে ধরবার চেষ্টা করুন। ওই প্রথমবারই যা একটু ধরা-করা প্রয়োজন। তারপর যদি তেমন লোক ফেবার করে, সেই একই লোক আবার বাড়িতে গিয়ে সুটিং ডেটের জন্যে কান্নাকাটি করবে।'

লোকে হয়তো যা-তা বলতে চাইবে। কিন্তু কিছুই তোয়াক্কা করে না সুব্রতা। নিজেব ভবিষ্যতের জন্যে তার যা খুশি সে করবে। টাকা যখন কেউ দেবে না, তখন কারুর কথাতেই সে কান দেবে না। সত্যি কথা বলতে কি, বাবা নিতান্তই ভাল মানুষ, একমাত্র বাবাকে নিয়েই চিন্তা। এত শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্য নিয়েও অন্নের সমস্যা সমাধান করতে পারছেন না। বাবা না বুঝেই বাধা দেবেন। ওঁকে এখন কিছু না-বলাই ভাল। তবে যখন সুব্রতার অনেক টাকা হবে, সে তখন বাবাকে একটা খুব সুন্দর মন্দির করে দেবে। সেখানে নিজের মনে নিজের ঠাকুরকে পুজো করবেন। যজমানদের দরজায় দরজায় তখন তাঁকে আর ঘুরে বেড়াতে হবে না।

ভেবেছিল, শুভ্রাদিকে সে সব বলবে। কিন্তু বলা হয়নি কিছুই। বোধ হয় ভালই হয়েছে। এখন নয়। যখন সুব্রতা ভট্টাচার্য দেশজোড়া সুনাম পাবে, সবাব মুখে মুখে যখন তার নাম ফিরবে, তখন সব প্রকাশ করবে। কাগজের প্রতিনিধিরা যখন তার জীবনী লিখতে আসবে, সুব্রতা তখন শুভ্রাদির মহৎ হৃদয়ের কথাও বলবে। তাঁর জন্যেই যে বিনা মাইনেতে কলেজে পড়বার সুযোগ পেয়েছিল সে কথা গোপন করবে না।

তাকের ওপর টাইমপীসটার দিকে এবার নজর পড়ে গেল। বসে বসে আর সময় নষ্ট করা চলবে না। এখনই একবার বেরনো প্রয়োজন।

আর তো ভাবা চলবে না। এখনই সুযোগের সন্ধানে বেরোতে হবে।

বালিকা মহাবিদ্যালয়ে পূর্ণোদ্যমে পুজোর আয়োজন চলেছে।

হরকিঙ্কর গায়ের চাদরটা ঠিক করে নিয়ে বললেন, 'শাস্ত্রমতো সব যোগাড় যন্তর না কবলে, শুধু আপনাদের নয় আমাবও অমঙ্গল। দুর্গা পুজো বলে কথা। অনেক জিনিস লাগে— সিঁদুর, পঞ্চগুড়ি, পঞ্চপল্লব, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, ঘট, কুশুহাঁড়ি, দর্পণ, তেকাটা, তীর, পুষ্প, দূর্বা, বিল্বপত্র, তুলসী, ধূপ, দীপ, কলাগাছ, কচুগাছ, হলুদ গাছ, জয়ন্তী গাছ, ডালিম ডাল, অশোক ডাল....'

তালিকা আরও দীর্ঘ হতো, কিন্তু শুভ্রা বললেন, 'আপনি চিন্তা করবেন না, আমরা সব গুছিয়ে যোগাড় করে রাখবো। আপনি শুধু পুরো ফর্দটা আমাকে দিয়ে যান।'

হরকিঙ্কর বললেন, 'তুমি মা বোধহয় কখনও পুজোর যোগাড় করোনি।'

শুভ্রা সলজ্জ ভাবে বললেন, 'শুনেছি এক সময় নাকি আমাদের বাড়িতে পুজো হতো। কিন্তু তখন আমি খুব ছোট। এবার কিন্তু আপনার কাছে সব শিখে নেবো।'

হরকিঙ্কর অনেকদিন এমন মধুর ব্যবহার পাননি। অন্ততঃ পাঁচভূতের রাজত্বে এমন নিষ্ঠাবতীর সন্ধান পাবেন আশাই করেননি। উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'কিচ্ছু চিন্তা নেই মা, এবার আমি সব শিখিয়ে দেবো। আমাদের মায়েদের জন্যেই তো সনাতন ধর্ম আজও কোনোরকমে টিকে আছে। লেখাপড়া জানা মায়েরা যদি আবার আগ্রহ নিয়ে সব শিখতে আরম্ভ করে, তবে আমাদের কিসের ভয়?'

শুভ্রা নম্রভাবে বললেন, 'নিজের দেশের নিজের ধর্মের নিয়মকানুন জানবো না, এটা তো গর্বের কথা নয়। এর মধ্যেই তো আমাদের দেশের সভ্যতার এবং সমাজের যুগ-যুগান্তের ইতিহাস নিহিত রয়েছে।'

'কিন্তু সে কথা কে বোঝে মা? বারোয়ারি পুজো আমি করি না, লোকে বলে গোঁড়া পুরুত, কেউ কেউ পাগলও বলে। কিন্তু মা ওখানে পুজোর প-ও থাকে না। কেউ জিজ্ঞেস করে না পুজোর সব উপকরণ ফর্দ অনুযায়ী এলো কিনা। যদি কোনো কিছু না থাকে, বলবে যা এসেছে তাই দিয়ে সেরে নাও। কিন্তু মা, সেরে নেবার মালিক কি পুরোহিত? তার পিতৃপুরুষেরও জন্মাবার হাজার হাজার বছর আগে এ-সব কাগজে কলমে লেখা হয়ে গিয়েছে।'

শুভ্রা বললেন, 'আমরা আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। আমাদের প্রিন্সিপ্যাল বলেন, যদি পুজো করতে হয়, ভালভাবে করো, না হলে কোরো না।'

হরকিঙ্কর বললেন, 'ফর্দ আমার মুখস্থ। বলে যাচ্ছি, টপাটপ লিখে নিন। প্রথমে নবপত্রিকার দ্রব্যাদি, নিয়ম হচ্ছে প্রতিপদ থেকে দেওয়া। প্রথম দিন— মাথাঘসা ফুলেব তেল, আতর, চিরুণী, গোলাপজল। দ্বিতীয়াতে মাথা বাঁধবার পটি, তৃতীয়াতে দর্পণ, সিঁদুর, আলতা। চতুর্থীতে মধুপর্ক, কাঁসার বাটি, তিল, চন্দন। পঞ্চমীতে অঙ্গরাগ এবং অলঙ্কার।'

হরকিঙ্কব একটু থামলেন। তারপর বললেন, 'বরং পুজোর ফর্দটাই আগে লিখুন।— বোধনের দ্রব্যাদি—'

আমন্ত্রণের জিনিস, অধিবাসের ডালার তালিকা শেষ করে হরকিঙ্কর সপ্তমী পুজোর ফর্দ শুরু করলেন—'নারায়ণবরণ, গুরুবরণ, পুরোহিতবরণ, ব্রহ্মাবরণ, সদস্যবরণ, হোতৃবরণ, আচার্যবরণ, বরণাঙ্গুরীয়, তিল, হরিতকী, পুষ্প, দূর্বা, তুলসী, ধূপ, দীপ, ধুনা—'

ছাত্রীজীবনে শুভ্রা অত্যন্ত দ্রুত লিখতে পারতেন। কিন্তু পুরুতমশায়ের গতির কাছে তাঁকে হার মানতে হলো।

হরকিঙ্কর হেসে ফেললেন। বললেন, 'দরকার নেই; আমিই লিখে দিচ্ছি মা। অনেকে লিস্টিও নেয় না, দশকর্ম ভাণ্ডার থেকে সোজা গিয়ে সাপ ব্যাঙ যা পায় তাই নিয়ে আসে। আগেকার সে-সব দশকর্ম ভাণ্ডারও নেই— বেশীর ভাগই জোচ্চোর। যা-তা জিনিস দিয়ে দেয়।'

শুভ্রা এবার হরকিঙ্করের দিকে কাগজ এগিয়ে দিলেন। ফর্দ লিখতে লিখতে হরকিঙ্কর বললেন, 'যে কোনো ফর্দের প্রথমেই লিখতেই হয়— সিদ্ধি, সিদ্ধিদাতা গণেশ তবেই তো সিদ্ধি দেবেন।'

শুভ্রা পণ্ডিতমশায়ের হাতের লেখার দিকে তাকিয়ে রইলেন। লিখতে লিখতে হরকিঙ্কর বললেন, 'মহাস্নানের জিনিসগুলো একটু সাবধানে যোগাড় করতে বলবেন মা। দোকানে যা দেয় তা প্রায়ই ভেজাল।'

'শুভ্রা, কাজ কেমন এগোচ্ছে?' সুভদ্রা হালদার প্রশ্ন করলেন।

'খুব ভাল। পুরুতমশাইটি চমৎকার— একটু রাগী বটে কিন্তু নিষ্ঠাবান।'

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'নিষ্ঠাবান পুরোহিতের আজকাল খুবই অভাব। অবশ্য দোষ আমাদেরই। আমাদের কাছে আজকাল পুরুতঠাকুরও যা, রাঁধুনীঠাকুরও তাই।'

কলেজের সর্বত্র এখন পুজো পুজো ভাব। বেশ হৈ চৈ চলেছে। কাজের বাড়ির চাপে প্রিন্সিপ্যালও তাঁর চিরাচরিত গাম্ভীর্যের মুখোসটা খুলে রেখেছেন। সেই সুযোগ নিয়েই টিচারস্-রুমে অর্থনীতির অধ্যাপিকা শিপ্রা মিত্র প্রশ্ন করলেন, 'একথা বলছেন কেন মিসেস হালদার?'

'জানি বলেই বলছি। আমাদেরও বলতে গেলে পুরোহিতের বংশ। কিন্তু আয় নেই বলে কেউ আর ও-লাইনে যায়নি। আজকাল যার লেখাপড়া হয় না সে-ই যাজক হচ্ছে— কিন্তু শিক্ষিত না হলে, সে কী করে শাস্ত্র পাঠ করবে?'

প্রিন্সিপ্যালের কথায় অনেক অধ্যাপিকা সায় দিলেন। মিসেস হালদার বললেন 'এ যুগে মুড়ি মিছরির একদর— এইটাই দুঃখ। ছোটবেলায় আমাদের বাড়িতে একখানা সুরেন ভট্চায্যির পুরোহিত দর্পণ ছিল। তাতে দেখেছি তিনি দুঃখ করছেন, সূপকার ষষ্ঠীপুজো করলে যা পাবে, একজন জ্ঞানী পুরুষও সেই পাবে। এই জন্যেই ভাল লোক ব্যবসা ছেড়ে যাচ্ছে।'

'সূপকার মানে কি, দিদিমণি?' স্বেচ্ছাসেবিকাদের লিডার ও ছাত্রী ইউনিয়নের সেক্রেটারি রমলা প্রশ্ন করলো।

সুভদ্রাদি বললেন, 'শুভ্রা, আজকাল তোমরা কি যে বাংলা শেখাচ্ছো। আমাদের সময় বাংলার কোশ্চেনও ইংরিজীতে হতো— তবু আমরা অনেক কথা জানতাম। এখন তোমরা শুধু নাটক নভেল পড়াচ্ছ— তাও আধুনিক। তাই ছাত্রীরা সূপকার মানে জানে না।'

দিদিমণির কথায় রমলা লজ্জা পাচ্ছিল। কিন্তু সুভদ্রা হালদার বললেন, 'লজ্জার কিছু নেই। না-জেনে পণ্ডিত সেজে থাকার চেয়ে, বোকার মতো প্রশ্ন করে জেনে নেওয়া অনেক ভাল। সূপকার মানে রাঁধুনী— আজকাল নভেলে যাদের বাবুর্চি বলে।'

অধ্যাপিকাদের দিকে তাকিয়ে সুভদ্রা হালদার বললেন, 'আপনারা অনেকে হয়তো এইভাবে পুজোর ব্যবস্থা করায় আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন—ভাবছেন আমি সময় এবং অর্থ

অপব্যয় করছি। কিন্তু একটা দুর্গাপুজো হাতে কলমে করলে, আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে মেয়েরা যা জ্ঞান লাভ করবে, তা দেড় ডজন টেক্স্টবুক থেকেও পাবে না।'

একবার ঢোক গিলে তিনি বললেন, 'কত অদ্ভুত সব জিনিস লাগে, আমি পুরুতবাড়ির মেয়ে হয়েও খোঁজ রাখতাম না। যদি চোখ কান খুলে রেখে, ওগুলোর মধ্যে একটু ঢোকা যায়, তাহলে আমাদের দেশ, আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা, আমাদের জীবনযাপন সম্বন্ধে আমরা কত কি জানতে পারি।'

সুভদ্রাদি বললেন, 'এই মহাস্নানের কথাই ধরুন না কেন। সপ্তমীর দিনে দর্পণ স্নান— শুভ্রা তোমার হাতেই তো লিস্ট রয়েছে, পড় না।'

শুভ্রা পড়তে লাগলেন, 'শোধিত পঞ্চগব্য— অর্থাৎ গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত। শিশির, আখের রস, সাগরোদক, গজদন্ত মৃত্তিকা, রাজদ্বারমৃত্তিকা, চতুস্পথমৃত্তিকা—' এবার হঠাৎ শুভ্রা থমকে দাঁড়ালেন।

'কী , থামলে কেন? পড়ে যাও', সুভদ্রাদি বললেন।

কিন্তু শুভ্রা আর পড়তে পারছেন না। তাঁর মুখটা লাল হয়ে উঠলো।

'কী হলো?' বলে শিপ্রা মিত্র এবার একটু সরে এসে তালিকার দিকে তাকালেন। তাঁরও মুখটা যেন কেমন অপ্রস্তুত দেখালো। 'কী আছে, শিপ্রাদি?' দুজন ছাত্রী একসঙ্গে প্রশ্ন করে উঠলো।

'না কিছু নয়, ও-নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামাতে হবে না।' শিপ্রাদি উত্তর দিলেন।

ঠিক বুঝতে না পেরে প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'হাতে অনেক কাজ রয়েছে— এখন এ-ভাবে সময় নষ্ট করলে চলবে না। পড়ে যাও।' শিপ্রা বললেন, 'ওটা বাদ দিয়েই না হয় পড়ে যা।'

বাদ দেবার কথা উঠতেই সবার কৌতূহল যেন বেড়ে গেল। আরও কয়েকজন অধ্যাপিকা এবার শুভ্রার কাছে উঠে এসে ফর্দর দিকে তাকালেন। তাঁদের মুখের অবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে পাল্টাতে শুরু করলো।

একজন বললেন, 'সত্যি নাকি? ও-সব লাগে তা তো কখনও শুনিনি, এতো পুজোয় গিয়েছি?'

আর একজন বললেন, 'লাগে নিশ্চয় না হলে পুরুতমশায় লিখে দেবেন কেন?'

ছাত্রীরা তখনও বুঝে উঠতে পারছে না। তারা বললে, 'কী দিদিমণি? পুজোতে কী লাগে?'

অধ্যাপিকারা এবার সকলেই পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। শুভ্রাদি কোনোরকমে বললেন, 'না কিছু নয়।' তিনি এবার সেই বিশেষ জিনিসটি বাদ দিয়ে পড়া শুরু করবার চেষ্টা করলেন—'মধু, কর্পূর, অগুরুচন্দন, কুঙ্কুম—' কিন্তু বাদ দেওয়া চললো না। সবার দৃষ্টি যেন বাদ দেওয়া জায়গাতেই আটকে গিয়েছে। সুভদ্রা হালদার বললেন, 'কী ব্যাপার?'

শুভ্রা অগত্যা এবার নিজের চেয়ার থেকে প্রিন্সিপ্যালের কাছে উঠে এসে তালিকাটা দেখালো। এবার তাঁর চোখেও বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠলো। ঘরের মধ্যে ক'জন ছাত্রী আছে তিনি দেখে নিলেন। মাত্র দু'জন। তাদের বললেন, 'তোমরা এবার ফলটলের ব্যবস্থাগুলো দেখো। আর তো সময় নেই।'

মেয়েরা বুঝলে কোথাও কোনো গণ্ডগোল হয়েছে। তারা আর কোনো কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। প্রিন্সিপ্যাল এবার বললেন, 'হুঁ— জানতাম না।'

শিপ্রা মিত্র বললেন, ' মোস্ট এমব্যারাসিং। কম বয়সের কুমারী মেয়েরা রয়েছে। পৃথিবীতে এত জিনিস থাকতে পুজোতে কিনা বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকা লাগে।'

'বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকা দিয়ে কী হবে?' আর একজন অধ্যাপিকা প্রশ্ন করলেন।

'হরকিঙ্করবাবুর তালিকা অনুযায়ী ওই দিয়ে সপ্তমীর দিনে মহাস্নান হবে'— শুভ্রা বললেন।

ইতিমধ্যে আর সবাই লজ্জায় এমনই লাল হয়ে উঠেছেন যে, কথা বলতে পারছিলেন না।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'স্বীকার করছি জিনিসটা এমব্যারাসিং— বিশেষ করে আমাদের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে। কিন্তু অনেকদিন আগে থেকে যা হয়ে আসছে তার উপায় কি?'

'ওইটুকু বাদ দিলেই হয়', একজন প্রস্তাব কবলেন।

সুভদ্রাদি বললেন, 'তার উপায় কোথায়? বাদ দিলে সমস্ত পুজোটাই বাদ দিতে হয়।'

সুভদ্রাদি এবার সমাজনীতির অধ্যাপিকা তন্দ্রা রায়ের মুখের দিকে তাকালেন। 'ব্যাপারটা কি বলুন তো? শুভকাজে এই সব নোংরামি কি করে ঢুকতে দেওয়া হলো?'

অধ্যাপিকা রায় সদ্য ডক্টরেটপ্রাপ্তা। বললেন, 'এনসাইক্লোপিডিয়া অফ রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড এথিকসটা খুঁজে দেখলে হয়। কিছু পাওয়া যেতেও পারে। তবে আমার মনে হয় দুটো কারণ হতে পারে।'

'কী কারণ?'

তন্দ্রা রায় বললেন, 'আমাদের দেশের বিশ্বাস পতিতাগৃহে প্রবেশের পূর্বে পুরুষ তাব সমস্ত সদ্‌গুণ দরজার বাইরে ফেলে রেখে যায়। হয়তো সেই জন্যেই এই মৃত্তিকা বিশেষভাবে গুণান্বিত।'

কারুর মুখেই তখন কথা নেই। সবাই, এমন কি শিপ্রা মিত্রও, তন্দ্রা রায়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। তন্দ্রা রায় বললেন, 'আর একটা হতে পারে হিন্দু ঋষিরা দুর্গোৎসবে উচ্চনীচ সবার সহযোগিতা কামনা করতেন। সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে বলতে পাবেন।'

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'ইন্টারেস্টিং। তবে ছাত্রীদের সামনে এ সব আলোচনা না করাই ভাল। আপনারা এখন যে-যার কাজগুলো সেরে ফেলুন।'

হরকিঙ্কর সন্ধ্যাহ্নিকে বসেছেন। মাথার মধ্যে অনেক চিন্তা কিলবিল করছে। ছেলেটা মনের মতো হয়নি। অমানুষ জানোয়ারও বলা চলতে পারে। না হলে নিজের সমস্ত দায়িত্ব ভুলে গিয়ে শূদ্রা রমণীকে অঙ্কশায়িনী করে ধানবাদে সে কী করে পড়ে রয়েছে? কেন এমন হয়? ছেলেটা জন্মাবার আগে তিনি তো কোনো প্রকার শাস্ত্রীয় আচরণের ত্রুটি করেননি। যথাসময়ে গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, সাধভক্ষণ, জাতকর্ম, ষষ্ঠী, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন— শাস্ত্রীয় কোনো পুজোতেই কোনো অনাচার হয়নি। তবুও ছেলেটা শেষ পর্যন্ত কেন এনন হলো স্বয়ং ঈশ্বরই জানেন। এবার মহাশক্তির বোধনেব সময় মার কাছে তিনি সব দুঃখের কথা নিবেদন করবেন।

কারা যেন কড়া নাড়ছে। কারা আবার এই সময় জ্বালাতন আরম্ভ করলে? বাড়িটা সত্যিই যেন ভূতের হাট হয়ে উঠেছে। ওরা কারা কে জানে? মেয়েটা ওদের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে মনে হচ্ছে। বলছে, 'শোভনবাবু, আসুন আসুন। কতদিন খবর পাই না। শেষপর্যন্ত মনে পড়লো তাহলে?'

লোকটা যেন অভিনয় সম্বন্ধে কি আলোচনা করছে। সুব্রতাকে বলছে, 'তুমি চিন্তা করছো কেন, তোমাকে একটা ভালো রোল দেবই।'

'সে তো কতদিন হয়ে গেল শোভনবাবু। এই অ্যামেচার থিয়েটারী অসহ্য হয়ে উঠেছে। থিয়েটারের দিনটা তবু সহ্য করা যায়, কিন্তু এই রিহার্সেলটাই আর পারি না। আগে তবু

দু'তিন দিন রিহার্সেল হলেই চলতো। এখন চোদ্দদিন হলে বাবুরা খুশি হন। তাও ট্যাক্সি ভাড়া দিতে চান না।'

হরকিঙ্করের কানে কথাগুলো ভেসে আসছে। ইচ্ছে হচ্ছে একটা লাঠি নিয়ে তিনি দরজার দিকে তেড়ে যান। কিন্তু যেন পক্ষাঘাতের রোগী তিনি। আসন থেকে উঠে দাঁড়াবার শক্তি নেই তাঁর।

হরকিঙ্কর শুনলেন, মেয়ে চলচ্চিত্রে নামবার জন্যে পাগল। লোকটা বলছে, 'সাইড পার্ট থেকে শুরু করো। তারপর আস্তে আস্তে উঠবে।'

মেয়ে বলছে, 'শোভনবাবু, তা হয় না। আপনি তো এ লাইনে অনেক দিন রয়েছেন। যে হিরোইন হয়, সে প্রথম দিন থেকেই হয়। সাইডগার্ল যে, সে চিরকাল সাইডগার্লই থেকে যায়।'

মেয়ে যেন শোভনবাবুর অন্তরঙ্গ হয়ে উঠবার চেষ্টা করছে। বলছে, 'না শোভনবাবু, আপনার 'একস্ট্রা' যোগাড় করবার কনট্রাক্ট— আপনি যোগাড় করুন, সাপ্লাই করুন। কিন্তু আমাকে ভাল একটা প্রোডিউসার ধরিয়ে দিন। সুযোগ যদি পাই, দেখিয়ে দেবো কোথায় লাগে আপনাদের---'

শোভনবাবুর গলা যেন এবারে নিচু খাদে নেমে এল। ফিসফিস করে কি বলছে মেয়েটাকে। বাড়িটা হলো কি? এতো বড়ো আস্পর্ধা, বাড়ির কর্তা কি মারা গিয়েছে? কিন্তু প্যারালিসিসটা যেন আরও বেড়ে গিয়েছে— আঙুল নাড়াবার শক্তিও নেই হরকিঙ্করের।

হরকিঙ্করের মনে পড়লো বাড়িভাড়া বাকি। মালিক উকিলের চিঠি দিয়েছে, ছাড়তেই হবে বাড়ি। ওরা বলছে, বাড়ি ভেঙে ফেলবে। কিচ্ছু নেই বাড়িটার। অন্য বাড়ি দেখেছেন হরকিঙ্কর। অনেক ভাড়া চায়। তিন মাসের আগাম। এখানেও সাত মাস বাকি। টাকা চাই— অনেক টাকা। তবে যদি বাঁচা সম্ভব হয়। টাকাটাই যেন বিষ হয়ে গলে গলে দেশের রক্তের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে— যেন তারই ক্রিয়ায় স্নায়ুগুলো অবশ হয়ে প্যারালিসিসের সূচনা করেছে।

ওরা ফিসফিস করে কথা বলছে। হরকিঙ্কর চোখ বুজে তখন গায়ত্রী মন্ত্র জপ করছেন— ওঁ ভূর্ভুবস্বঃ। তৎ সবিতুর্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি।—

আবার যেন বল ফিরে পাচ্ছেন হরকিঙ্কর। তিনি এবার আসন থেকে উঠে পড়লেন। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মেয়েটা বলছে, 'আচ্ছা তাই ঠিক রইল। কোনো অসুবিধে হবে না।'

ভুলে যাবার চেষ্টা করছেন হরকিঙ্কর। যেন তাঁর চোখ কান সব বিষে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বিরাট পেট নিয়ে এক সবভুক হরকিঙ্কর যেন শুয়ে বেঁচে রয়েছেন।

মেয়ে এবার বাবার দিকে তাকাল। 'বেরোচ্ছিস নাকি তুই?'

'হ্যাঁ বাবা, একটু কাজ আছে।'

বাবা চুপ করে রইলেন, মেয়ে বললে, 'একটা বাড়ির খবরও সেই সঙ্গে নিয়ে আসবো.

বাবার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুচ্ছে না। মেয়ে বললে, 'বাবা, কী এতো ভাবেন বলুন তো? সব ঠিক হয়ে যাবে।'

হরকিঙ্কর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা দশকর্ম ভাণ্ডারে গিয়েছেন। পুজোর জিনিসগুলো কেনবার দায়িত্ব শুভ্রা শেষ পর্যন্ত ওঁর ঘাড়েই চাপিয়েছেন। পৃথিবীর যত উদ্ভট জিনিস সব দশকর্ম ভাণ্ডারে পাওয়া যায়। ফর্দ মিলিয়ে কিনতে শুরু করেছেন হরকিঙ্কর। 'আপনারা সব আসল জিনিস দেন তো? না পুজোর জিনিসেও ভেজাল ঢুকেছে আজকাল?'

দোকানদার বিরক্ত হয়ে বলেছে, 'কেন বলুন তো?'

হরকিঙ্কর উত্তর দিয়েছেন, 'মায়ের পুজোয় আজকাল তেমন ফল হয় না কেন? হয়তো ভেজালের জন্যেই।'

দোকানদার গুম হয়ে থেকেছে। 'ভরসন্ধ্যেবেলায় এমন কথা শুনিয়ে গেলেন?'

জিনিস মেলাতে মেলাতে হরকিঙ্কর বললেন, 'মৃত্তিকা কই? বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকা কোথায়?'

'নেই।'

'রাখেন না?'

'ভেজাল। এমনি মাটি তুলে পুরিয়া করে বিক্রি করি আমরা', দোকানদার উত্তর দিয়েছে।

'তাহলে চাইনে।' মুটের মাথায় মাল চাপিয়ে হরকিঙ্কর সোজা কলেজে চলে এসেছেন। সেখানে তখন পুরোদস্তুর হৈ-হৈ চলছে। রাত পেরোলেই পুজো। ঢাকি আসবে এখনই। আর ঢাকের বাদ্যি শুরু হলেই তো পুজো আরম্ভ হয়ে গেল।

হরকিঙ্কর মেয়েগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন। এরা মা মহাশক্তির পুজো করবে? করুক না, করতে আপত্তি কি, তিনি নিজের মনেই বললেন।

শুভ্রা জিজ্ঞেস করলেন, 'সব জনিস পেয়েছেন তো হরকিঙ্করবাবু?'

'একটা বাকি আছে, এখনই আনছি', হরকিঙ্কর উত্তর দিলেন।

আবার পথে বেরিয়েছেন হরকিঙ্কর। কি যেন খুঁজছেন তিনি। জায়গাটা কোথায়? নিশ্চয় কাছাকাছি কোথাও পল্লীটা আছে। ছোটবেলায় ওঁদের দেশের পল্লীটা চিনতেন। গ্রামের এককোণে, কয়েকখানা মেটে বাড়ি। আমোদিনী দাসী বলে একটা বুড়ি ও-লাইন ছেড়ে দুধের ব্যবসা আরম্ভ করেছিল। ছোটবেলায় কয়েকবার তার বাড়িতেও গিয়েছিলেন হরকিঙ্কর।

কিন্তু এখানে পাড়াটা কোথায়? খবর রাখেন না কোনো কিছুরই তিনি। রাস্তার মোড়ে পুলিশকে জিজ্ঞেস করাটা বোধ হয় ঠিক হবে না। কিছুদিন আগে কাগজে বেরিয়েছিল বেশ্যাবৃত্তি বেআইনী হয়ে গিয়েছে। সত্যিই যদি কোনো দিন পতিতাবৃত্তি উঠে যায়, তাহলে পুজোর সময় বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকা কোথা থেকে আসবে?

কিন্তু কাগজেই তিনি পড়েছেন, আইন করে কিছুই হয়নি— ব্যবসা পুরোদস্তুর চলেছে। সুতরাং এখন থেকে সুদূর ভবিষ্যতের কথা ভেবে কী লাভ?

পানের দোকানে খোঁজ নেওয়াই বোধ হয় ভাল, ওরা নিশ্চয় খবর রাখে। সোজা গিয়ে দোকানদারকে প্রশ্ন করেছিলেন। ওরা ফিকফিক করে হেসেছে। 'এই বয়সেও! বুড়ো হয়ে মরতে চলেছে এখনও!'

একজন বললে, 'তোর অত গার্জেনগিরিতে দরকার কি? জিজ্ঞেস করছেন রাস্তাটা বলে দে।'

পানে চুন লাগাতে লাগাতে দোকানদার বলেছে, 'জরুর। বহুত আদমীই খবর নেয়। কিন্তু ঠিক এই সময় নয়, আর কিছুক্ষণ পরে।'

তারপর হরকিঙ্করকে আর একবার ভালভাবে দেখে, মুখ-টিপে হাসতে হাসতে বলেছে, 'নতুন শখ হয়েছে বুঝি? বাঁ দিকের রাস্তাটা ধরে সোজা চলে যান। মিনিট পাঁচেক পরে ডান দিকের পাকা রাস্তাটা ধরবেন। ওইখানেই সিনেমা হল। হলের পিছন দিকেই, গোটা কয়েক গলি— ওইখানেই যা চাইছেন, তা পাবেন!'

আর সময় নষ্ট না করে হরকিঙ্কর এগোতে শুরু করেছেন। সিনেমা হলের কাছে আরেকটা দোকানে জিজ্ঞেস করতে হলো। তারাও মুচকি হাসলে। বললে, 'শরাব চাই নাকি বাবু? ভাল জিনিস পাবেন।'

দাঁতে দাঁত চেপে হরকিঙ্কর গলিতে ঢুকে পড়লেন। কয়েকটা দরজার কাছে কারা যেন সেজেগুজে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হরকিঙ্কর একবার থমকে দাঁড়ালেন। গ্যাসপোস্টের আলোয়

মেয়েগুলোও তাঁকে ভাল করে দেখে নিলে। এমন নামাবলী গায়ে সদ্‌ব্রাহ্মণ অতিথি তারা বড় একটা পায় না। তাই আহ্বান জানালে, 'আসবেন নাকি ঠাকুর?'

হরকিঙ্কর ওদের দরজার দিকে তাকালেন। লাল সিঁদুরে কী যেন লেখা— শ্রীশ্রী দুর্গামা সহায়। পাশের দরজাতেও তাই লেখা। ব্যাপার কী?

এগিয়ে গেলেন হরকিঙ্কর। এখানে লেখা— 'ভদ্রলোকের বাড়ি।' হরকিঙ্করের দেহটা যেন ঘুলিয়ে উঠছে। তাড়াতাড়ি মৃত্তিকা সংগ্রহ করে ফিরে যেতে হবে।

এইখানটা একটু অন্ধকার মনে হচ্ছে। দরজাব মাথায় মায়ের নামও বয়েছে। এ-বাড়ির মেয়েরা এখনও বেরিয়ে আসেনি। হয়তো এখনও সাজপোশাক করছে. কিংবা ওদের হয়তো বাইরে এসে দাঁড়াবার প্রয়োজন হয় না। এইখানকার মৃত্তিকাতেই কাজ চলে যাবে। উবু হয়ে বসে মাটি সংগ্রহ করতে বসলেন হরকিঙ্কর। এমন সময় কে যেন নারীকণ্ঠে বললে, 'ও মাগো, লোকটা ওখানে বসে কী করছে?'

হৈ হৈ করে ভেতর থেকে আরও দুটো-তিনটে মেয়ে এসে হরকিঙ্করের হাত চেপে ধরলো। 'এই মিন্‌সে, এখানে কী কবছিস?'

হরকিঙ্কর ঘাবড়ে গিয়েছেন। 'না মা, কিছু করছি না।'

'মুয়ে আগুন মিন্‌সের, ঢঙ দেখলে মরে যাই। উনি ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না!'

'সত্যি বলছি মা', হরকিঙ্কর কাতর আবেদন করলেন।

'ওর হাতে কী রয়েছে, দেখ তো?' একজন বললে, আর একজন জোর করে হরকিঙ্কবের মুঠোটা খুলে ফেললো। 'এক মুঠো ধুলো নিয়ে বুড়ো কী করছিল গা?'

আর একজন মেয়ে প্রসাধন অর্ধসমাপ্ত রেখেই বোধ হয় ছুটে বেরিয়ে এসেছিল। গা দিয়ে তার সস্তা স্নো-এর গন্ধ বেরোচ্ছে! সে এবার ভয়ে শিউরে উঠলো। 'সর্বনাশ করেছে, কাপালিক নিশ্চয়, তুক করছিল।'

'না না, আমি পুরুত মানুষ, তুক করবো কেন?' হরকিঙ্কর একটু ভয় পেয়েই বললেন।

মেয়েদের গলার স্বরে একটা মোটকা লোকও কোথা থেকে হাজির হয়েছে। 'ঘেঁটুবাবু, দেখুন না, লোকটা এখানে বসে মাটি তুলছিল। কি তুক-তাক কবে গেল কে জানে।'

ঘেঁটুবাবু এবার হরকিঙ্কবের গলার চাদরটাকে টেনে ধরলো। অশ্লীল গালি দিয়ে বললে, 'তোমার বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়বো।'

'বিশ্বাস করুন, আমি কেবল এখানকার মৃত্তিকা নিতে এসেছি দুর্গাপুজোর জন্যে।'

ঘেঁটুবাবু হরকিঙ্করের হাতে আচমকা একটা থাপ্পড় দিলে। সমস্ত মাটিটা ঝরে পড়ে গেল। মেয়েরা বললে, 'কী সর্বনাশ গা, এত বাড়ি থাকতে আমাদেব দরজা থেকে মাটি তোলা। মরণ আর কি! গতর বেচে করে খাচ্ছি, তাও সহ্য হচ্ছে না মিন্‌সের।'

ঘেঁটুবাবু বললে, 'যা শ্লা! আর খবরদার মাটি নিতে আসিস না এখানে। তাহলে জান নিয়ে লেবো।'

ঘেমে নেয়ে উঠেছেন হবকিঙ্কর। উত্তেজনায় দেহটা কাঁপছে। সামান্য মৃত্তিকা সংগ্রহ কবতে এসে এ কি বিপত্তি! কেন বাপু, সামান্য একটু মাটি নিলে কী তোমাদেব ক্ষতি হতো?

হরকিঙ্করের দেহটা ঘিনঘিন করছে। যেন কয়েকটা নর্দমার ধেড়ে ইঁদুর তাঁর গায়ের উপর দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে গেল। স্নান করতে হবে তাঁকে। গঙ্গাজলে নিজেকে পবিত্র করতে হবে।

কিন্তু মাকে কী দিয়ে স্নান করাবেন তিনি? মহাস্নানের সময় এই মৃত্তিকা আসবে কোথা থেকে? পাগল নাকি তিনি? এত ভাববার কী আছে? হাজার হাজাব পুজো তো দশকম-ভাণ্ডারের ভেজাল মাটি দিয়েই হচ্ছে। আরেকটা হবে।

একটা রিকশা ডাকবেন নাকি হরকিঙ্কর? কিন্তু এই অবস্থায় রিকশায় চড়লে লোকে মাতাল ভাববে। হাঁটছেন হরকিঙ্কর।

বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছেন হরকিঙ্কর। ক্যাঁচ করে একটা মোটর এসে প্রায় ঘাড়ের কাছে থামল।

গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবিপরা এক ভদ্রলোক নামলেন। পেটটা বেশ মোটা, গলায় হার ঝুলছে। 'সুব্রতা দেবীর বাড়ি কোথায় বলতে পারেন? ক্লাবে ক্লাবে থিয়েটার করে বেড়ায়?'

হরকিঙ্কর বিরক্তভাবে লোকটার মুখের দিকে তাকালেন। 'সুব্রতা দেবীর বাড়িতে এত রাত্রে দেখা হয় না।'

লোকটা এবার নেশার ঘোরে খিলখিল করে হাসতে লাগল।

'মাইরি আর কি? গোঁসাই বাড়ির মেয়ে বুঝি।'

'যা বলছি, তাই শুনুন। সুব্রতা এমন সময় কারুর সঙ্গে দেখা করে না।'

'আহা-হা, চু চু! তাহলে সব বলবো নাকি? কিন্তু কে হে তুমি বাবার ঠাকুর?'

'মুখ সামলে কথা বলুন বলছি।'

'ওরে বাপরে, মানে মানে কেটে পড় বাছাধন, নইলে, স্রেফ ট্রেনে কাটা পড়বে।'

'এটা ভদ্দরলোকের পাড়া, যদি বেশী কিছু করেন।'— হরকিঙ্করের দেহে শক্তি থাকলে লোকটার গালে একটা থাপ্পড় মারতেন।

'ও বাবা! সুব্রতাকে জিজ্ঞেস করতে হবে তো, কবে থেকে উনি ভদ্দরলোকদের পাড়ায় উঠে এসেছেন!'

দু'জনেই এবার বাড়ির দরজার সামনে হাজির হয়েছেন।

আর চুপ করে থাকতে পারলেন না হরকিঙ্কর। হাত বাড়িয়ে ভদ্রলোকের পাঞ্জাবির উপরের দিকটা ধরবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু লোকটার সঙ্গে তিনি পারবেন কী করে। এক ঝটকায় সে হরকিঙ্করকে মাটিতে ফেলে দিলে। 'শালা, আমি ভাবছিলাম আমিই শুধু মাতাল হয়েছি। দেখছি তুমিও মাল টেনেছো।'

লোকটা হয়তো এবার হরকিঙ্করের বুকের উপর চেপে বসতো। হরকিঙ্করও গড়াতে গড়াতে লোকটার পা ধরে ফেলে দেবার চেষ্টা করছিলেন। হয়তো সর্বনাশা কিছু একটা ঘটতো। কিন্তু গোলমাল শুনে সুব্রতা এসে দরজা খুলে থমকে দাঁড়াল।

'এই যে সুব্রতা দেবী। একটু আগে আপনি বাড়িতে আসতে বারণ করে দিলেন। কিন্তু আপনি চলে আসবার পর দেখলাম হাতে কাজ নেই। আপনাকে দেখবার জন্যে মনটাও কেমন হুহু করতে লাগল।'

হরকিঙ্কর মাটি থেকে উঠে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'যা, তুই ভিতরে চলে যা। কোথাকার মাতাল এসে পাড়ায় ঢুকেছে। কোত্থেকে তোর নাম জেনেছে। আমি ওর দেখাচ্ছি মজা।'

কিন্তু এ কি হলো? এখনও মেয়েটা দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন?

লোকটা বললে, 'কোথাকার এই বুড়োটাকে আপনার বাড়ির খোঁজ জিজ্ঞেস করে ফ্যাসাদে পড়েছি। আপনি তৈরি হয়ে নিন। গাড়ি নিয়ে এসেছি।'

সুব্রতা তখনও পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে আস্তে আস্তে বললে, 'আপনি এখন যান। আমি যাবো না।'

'কেন, কী হলো আপনার? এই তো কিছুক্ষণ আগে হোটেল থেকে এলেন। ডার্করুমে টেস্ট দিলেন। এর মধ্যে ক্যারাকটার পাল্টিয়ে গেল? বইতে নাবার ইচ্ছে নেই বুঝি!'

'কী?' হরকিঙ্কর আবার লোকটার দিকে তেড়ে গেলেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, যা-বলছি ঠিক তাই।' লোকটা দাঁত বার করে হাসতে লাগল।

সুব্রতা এবার চিৎকার করে উঠলো, 'যান বলছি। না হলে এখনই লোক ডাকবো। চাই না আপনার বইতে পার্ট নিতে।' সুব্রতা এবাব ঠক ঠক করে কাঁপছে।

লোকটা বুঝলো কোথাও আজ একটা মস্ত গোলমাল হয়ে গিয়েছে। বললে, 'ঠিক হ্যায়, যাচ্ছি।' তারপর হরকিঙ্করকে শুনিয়েই যেন বললে, 'অন্য কারুর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে নিশ্চয়।'

দবজা বন্ধ করে দিলেন হরকিঙ্কব। ঘামে নেয়ে উঠেছে তাঁর দেহটা। সুব্রতা হাঁপাচ্ছে আর কাঁপছে। কাঁপছে আর হাঁপাচ্ছে। মেয়ের মুখেব দিকে তাকালেন হরকিঙ্কর। মেয়ে বললে, 'বাবা!'

বাবা চুপ করে রইলেন।

মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'বাবা. লোকটা সপ্তমীর দিনে আমার সঙ্গে ফিল্মের কন্ট্রাক্ট সই করবে বলেছিল। এই একবারই— ঢোকবাব সময় কেবল ওদের কাছে ছোট হতে হয়। তারপর নাম হয়— সব ঠিক হয়ে যায়।'

বাবা পাথরের মতো চুপ করে রইলেন।

মেয়ে ডাকল, 'বাবা!'

বাবা কোনো উত্তর দিলেন না।

এখন রাত অনেক। ওরা শুয়ে পড়েছে। হঠাৎ সুব্রতার ঘুম ভেঙে গেল। দরজাটা যেন খোলা মনে হচ্ছে। হ্যাঁ তাই তো, খোলাই রয়েছে। বাবার বিছানাটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সুব্রতা। বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো, বিছানায় তো কেউ নেই।.

তড়াং করে সভয়ে উঠে দাঁড়াল সুব্রতা। 'বাবা, বাবা, আপনি কোথায় গেলেন?'

বাবা দবজার বাইরে রয়েছে। 'বাবা, এখনও জেগে রয়েছেন আপনি? কাল ভোরবেলাতেই না পুজো!'

দরজার সামনে উবু হয়ে বসে হবকিঙ্কর কি যেন করছিলেন। হরকিঙ্কর এবার মেয়ের দিকে তাকালেন। তাঁর চোখ দুটো রাত্রের অন্ধকারে কাপালিকের চোখের মতো জ্বলছে।

'ওখান থেকে কী কুড়োচ্ছিলেন বাবা?'

হবকিঙ্কবের চোখ দুটো থেকে এবার যেন সত্যিই আগুন বেরিয়ে আসতে শুরু করলো। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'মাটি।'

সুব্রতা বাবার মূর্তি দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছে। তবু কাছে গিয়ে পরম স্নেহে বাবার হাতটা জড়িয়ে ধরে বললে, 'মাটি কী করবেন বাবা?'

বাবা প্রথমে নির্বাক হয়ে রইলেন। মেয়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তাঁর ঠোঁট দুটো এবার কাঁপতে শুরু করলো। 'পুজোয় লাগবে', এই বলে রাত্রের অন্ধকারে পুরোহিত হরকিঙ্কর হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

নিশিপালন

আনন্দ বাগচী

ঠিকানা এবং তার সঙ্গে আমার বন্ধুর নিজের হাতে আঁকা পথনির্দেশটুকু ছিল। সামান্য কয়েকটা আঁকাবাঁকা রেখা, ড্রিলমাস্টারের নির্দেশের মত। সামনে এগিয়ে, বাঁয়ে ঘুরে, সোজা এগিয়ে, ডান দিকে ফিরে, পেট্রলপাম্প, তিনটি দোকান, ছ'খানা বাড়ি এবং তার পরেই জোড়া শালগাছের তলা দিযে সেই চরম গলি-পথটুকু, যার শেষ প্রান্তে আমার বন্ধুর সদ্য বাঁধা নীড়। যাকে পাখির বাসা বলাই সমীচীন। একজোড়া পাখি অনেক দূরেব কলকাতা শহর থেকে মফস্বলেব এই প্রান্তিক শহরে উড়ে এসেছে। আসার সময় মুখে করে কিছু খড়কুটো এনেছিল, কিছু ছিল। চাকরির ডালটাকে আশ্রয় করে সংসার বাঁধা হয়েছে।

স্টেশনে নেমেই একটা রিক্‌শা নিয়েছিলাম, সাইকেল রিক্‌শা। তবু হাতে ছিল আমার বন্ধুর পাঠানো সেই নক্‌শাটি। তার প্রতিটি রেখায বন্ধুর অন্তরঙ্গ নিমন্ত্রণ রয়েছে। আমাকে দেখে সে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চেঁচামেচি করে কি কাণ্ড যে করবে তা এই সামান্য ক'টি রেখাব মধ্যে লেখা নেই। কিন্তু আমি জানি। তাব ছেলেমানুষি, তাব অতি সহজে উচ্ছ্বসিত হযে ওঠা আমার বাল্যকাল থেকে জানা আছে।

বিশেষ করে বিবাহিত ভবতোষের কাছে এই আমার প্রথম যাওয়া। মাত্র কয়েক মাস আগে তার বিবাহ অনুষ্ঠানে হাজির হতে পারিনি, সেই অনুপস্থিতি সুদে আসলে পূরণ করে দিতে চলেছি আজ। সঙ্গে বৃহদাকারেব একটি সুটকেস এবং তৎসহ এক সপ্তাহেব ঢালাও ছুটি।

কিন্তু ভবতোষের বিয়েতে শারীরিকভাবে উপস্থিত হতে না পারলেও পত্রমারফত সে ত্রুটি সংশোধন করে নিয়েছি। তার বিবাহ অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি খবর নিজস্ব সংবাদদাতাব মতই আমার লেখক বন্ধু ভবতোষ নিজে আমাকে জানিয়েছিল। এক বিন্দু তথ্যও গোপন রাখেনি। কোন্ রঙের জামা কোন্ ঢঙের জুতো পবে সে বরযাত্রা করেছিল, প্রয়োজন না থাকলেও আমি তা জানি। শুভদৃষ্টি থেকে ফুলশয্যা পর্যন্ত নির্ভুল ধারাবিবরণী পাঠাতেও কার্পণ্য করেনি।

এই একপক্ষেই ফুরোয়নি শেষ পর্যন্ত, কন্যাপক্ষের কথা এবার বলি। ভবতোষের স্ত্রী প্রমীলার সঙ্গেও আমার ক্যামেরা আর লেখালেখির মধ্য দিয়ে পরিচয় হয়েছে। গ্লাসগোর কারখানায় বসে তার ফটো আমি দেখেছি। বেশ রোমাণ্টিক চেহারা, রীতিমত সুন্দরী বউ হয়েছে ভবতোষের। সী-বিচে বসে আমি তার সুন্দর চিঠিগুলো পড়েছি। বেশ স্মার্ট মেয়ে প্রমীলা। প্রমীলা না হয়ে নামটা পত্রলেখা হলে যেন আরও মানানসই হত। ফেরার আগে কণ্টিনেণ্টাল ট্যুরে বেরিয়ে প্যারিসে পৌঁছে ওর সবশেষ চিঠিখানা পাই। শ্যাম্পেনে চুমুক দিতে দিতে সেইদিনই 'তুমি' হয়ে গেছে প্রমীলা। এত নিকট দূরত্বে এসে গিয়েছে যে, প্রমীলা একটি বিবাহিত মেয়ের নাম সেটা চিঠি লিখতে বসে মনে পড়েনি অনেক সময়।

ঘনকালির দ্রুত ছাঁদের হরফগুলোর মধ্যে তার বক্ষস্পন্দন শুনতে পেয়েছি। সে সব দিনগুলোর কথা এখনও মনে হয়। মেঘলা আকাশের নীচে রেফ্রিজারেটরে রাখা ভিজে

শহরের পথে পথে ঘুরে আমি তখন বাংলাদেশের আকাশের সঙ্গে সানাই থেমে যাওয়া, বেনারসী তুলে রাখা একটি ঘরের মনস্তত্ত্ব অনুমান করার চেষ্টা করতাম।

বিয়ের অনুষ্ঠানটা মন্ত্রে আর মন্ত্রণায় মিলিয়ে একটা রহস্য। যাকে ঠিক বুদ্ধি দিয়ে চেরাই করা যায় না, সমস্ত অনুভূতি দিয়েও ছোঁয়া যায় না। উতরোল শাঁখ আর সানাই আর হুলুরবের মধ্য দিয়ে, চোখ ধাঁধানো আলোর রোশনাইয়েব ভিতর দিয়ে, চেলি বেনারসীতে আচ্ছন্ন হয়ে বসে থাকা, জড়োসড়ো, দুরু-দুরু বুক, উপবাস-ক্লিষ্ট মুখ, কান্নাভেজা ফোলা ফোলা চোখ একটি মেয়ের করতল-দুটি শেষ পর্যন্ত নিজের হাতের উত্তাপের মধ্যে চলে আসে। সপ্তপদী-সাতপাক, স্ত্রী-আচার, সিঁড়িভাঙা অঙ্কের মত সব স্তরগুলিই ছুঁয়ে ছুঁযে সেই ফরাশ বিছানো রসিকতার চৌহদ্দির মধ্যে বাংলাদেশেব সমস্ত বরেরাই পৌঁছে যায় শেষ পর্যন্ত। ভবতোষ গেছে, হয়ত আমিও একদিন যাবো। কিন্তু তার পরেরটুকু সম্পূর্ণ অন্য রকম। সেখানে বাসী বিয়ের গন্ধটুকুও নেই। ববিবার রাত পুইয়ে সোমবারের মত। রোদ উঠুক না উঠুক, ফুল ফুটুক না ফুটুক, আবার অফিস, আবার দিনগত পাপক্ষয়। আবার জল তোলা, চুলো ধরানো, চুল বাঁধা। একলা ঘর হলে, সাময়িক এবং অনিবার্য নিঃসঙ্গতা। উপন্যাস পড়ে, সেলাই করে, রেডিও শুনে, নিদেনপক্ষে অবেলায় ঘুমিয়ে কোনোমতে সে প্রহরগুলো কাবার করে আনা।

প্রমীলা এবং ভবতোষের জীবনে সেই অধ্যায় শুরু হয়ে গিয়েছিল। চিঠিপত্রে ঘরগৃহস্থালীর নিত্যনতুন পবিচয, পাক-প্রণালীর অনায়ত্ত বিভীষিকার সংবাদ পেতাম। ইউনিভার্সিটিতে পড়া বউ ভবতোষের, পাকশালের ডিগ্রীধারী নয়। সংসার বিদ্যেয় ভবতোষও কানাকড়ি। তাই বাস্তবক্ষেত্রে প্রবেশ করে ওরা যেন বাস্তব হাস্যরসেরই খনি আবিষ্কার করে বসেছিল।

একটা কিছু করতে গিয়ে যখন অন্যকিছু ঘটিয়ে বসত, প্রচলিত পাকপ্রণালী যখন হযবরল জাতীয় হয়ে উঠত, তখন ওদের যৌথ হাসি যেন থামতে চাইত না। অন্তত চিঠিপত্রে আমার তাই মনে হয়েছিল প্রথম দিকে. যেন দুজনের গাযে দুজনে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে।

সদ্য পরিচয়ের মধ্য দিয়ে স্বামী-স্ত্রী এত অল্পকালের মধ্যে এমন বন্ধুস্থানীয় হয়ে উঠেছে পরস্পরের কাছে, এমন দেখা যায় না। প্রাক্ প্রণয় যেখানে পরিণয় ঘটায়নি, সেখানে এমন একজোড়া আন্তরিক মিল সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু আমার বন্ধু ভবতোষের জীবনে তাই ঘটেছিল। ও সে দিক থেকে ভাগ্যবান, গৃহিণী সচিব সখী সকলের ভাগ্যে নয়। আব সত্যি বিচার কবে দেখলে ভবতোষের গর্ব করবার মত আছেই বা কি? বিশ্ববিদ্যালয়ের গড়পড়তা ডিগ্রী, গড়পড়তা চেহারা এবং এমন গড়পড়তা গুণপনা, যাতে দশজন পাঁচজন কিংবা সময়ে সময়ে দুজনের মধ্যে থেকেও আলাদা করে নেওয়া যায় না।

কেবলমাত্র ওর অন্তরটা ছাড়া। সেটা ছিল ছেলেমানুষিতে ভরা, উদ্ভট কল্পনায ঠাসা। ও অনায়েসে আজগুবি লেখক হতে পারতো, অন্তত কবি, চমৎকার মিল দিয়ে দু চারটে প্রেমের কবিতা কি আর না লিখতে পারতো!

তবে ভবতোষের বন্ধুকৃত্য চমৎকাব। বন্ধুকে ভালবাসতে, বিশ্বাস কবতে এবং কাছে টানতে ও জানে। তা না হলে বিদেশ থেকে ফিরে আসতে না আসতেই ছুটে আসতুম না ওর কাছে, ওদেব কাছে। সমুদ্রের নোনা গন্ধ এখনো শরীরে, জামাকাপড়ে জড়িযে রয়েছে। এখনও প্রভূত বিয়ারের স্বচ্ছলতা আমার দুটি গাল ভবাট করে রেখেছে। আমার চোখে এখনও শ্রেষ্ঠ নগর বন্দরের কেরামতি লেগে রয়েছে। বিশ্বকর্মার দেশের মানুষ কিভাবে বাঁচতে শিখেছে, কাকে তাবা জীবন বলে জানে, আমি দেখে এসেছি।

এদেশে চলতে গিয়ে তাই প্রতিপদে হোঁচট খাচ্ছি আমি। প্রতিপদে আমার রুমালের প্রয়োজন হচ্ছে এই নোংরা দেশে চলতে গিয়ে। ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে যে স্বগতোক্তিগুলো করছি, বলাই বাহুল্য সেগুলো ইংরেজীতে।

কেন না হবে! বলতে গেলে, কপাল তৈরি করেই ফিরে এসেছি আমি। যে বিলিতী কোম্পানী আমাকে সেখানে পাঠিয়েছিল, তারা এবার থেকে আমার সঙ্গে যথাযোগ্য ব্যবহার করবে। সুতরাং এখন আমার জীবনের ভোল কেনই বা বদলে না যাবে। একদিন কম কষ্ট তো করিনি ছাত্র বয়সে। সস্তাব মেসে থেকেছি, ছারপোকা পুষ্যি নিয়ে বিনিদ্র রাত কাটিয়েছি। বিকেলে জলখাবার জোটেনি কোনদিন। সে সব দিনের কথা আজ আমার কাছে সুখের নয়, তাই তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভুলতে চাই।

আজ বাঁচতে শিখেছি আমি। মানুষের মত মাথা তুলে, স্বতন্ত্র হয়ে, বিশিষ্ট হয়ে। সুখ এখন আমার করায়ত্ত, আঙুলের একটি ইশারায় কাছে আসবে। আমার কলমের ডগা দিয়ে যে সই বেরোবে তা বত্নগর্ভা। কিন্তু এইটুকুই আমার সব নয়, কমার্সিয়াল ভ্যালুযেশনেই আমি ফুরিয়ে যাইনি, আমার অন্যগুণও আছে। যেগুলো একসঙ্গে থাকলে মানুষকে চৌকস বলে। নিজের কথা বড্ড বেশি হয়ে যাচ্ছে, এবার থামি।

মানচিত্রেব ইঙ্গিতমত বাড়িটা চিনে নিতে কষ্ট হল না। কয়েক মুহূর্তেব জন্য ইতস্তত ভাব এল মনের ভেতর। কল্পনা এবং বাস্তবের শুভদৃষ্টি, কেমন জমবে কে জানে! দীর্ঘকাল পবে দেখলেও একমাত্র বন্ধুকে ভবতোষ ঠিকই চিনবে, চেহারায় যতই চোস্ত হই, অবাক করে দেবার জন্যে আচমকা এসে থাকি, তার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবো না একমুহূর্তও। কিন্তু বন্ধুপত্নী? বা বলা যাক, আমাব সমুদ্র-এপারের বান্ধবী, সে আমাকে চিনবে কি? চিনলেও সাক্ষাতে কেমন ভাবে নেবে তার ঠিক কি? চিঠির নৈকট্য এবং ভাষা আর বজায় থাকবে? সেই স্বচ্ছন্দ পরিহাস, সেই স্বনাম সম্বোধন কি আজ শুনতে পাবো নিজের কানে?

কিন্তু এত কথা ভাবার সময় কোথায তখন? সিংদরোজার চৌকাঠে যখন পা রেখেছি, ভিতরের চৌকাঠও ডিঙোবো বইকি! এক কথায় মন্দ নয়— বাড়িটার মধ্যে ঢুকে পড়লাম শেষ পর্যন্ত! কয়েক প্রস্থ সিঁড়ি ভেঙে একেবারে দোতলায়। বাবান্দাব ওপরই রান্নাঘব ফেবত, আগুনের আঁচে হিমসিম খাইয়ে বন্ধুজায়ার সঙ্গেই চক্ষু বিনিময হল প্রথম। মাথার আঁচলটাকে কোমরে দুবস্ত করে কি কারণে সে তখন এইদিকেই আসছিল, মুখচোখ লালচে। বুঝলাম উনুনের প্রতিক্রিয়া। মনে মনে ফটো এনলার্জ করে দেখলাম, হ্যাঁ, সেই বটে, তবে আরও জীবন্ত, আবও সুন্দর। আলুথালু চুলের বাশ পল্লবের মত জড়িয়ে ধবেছে মুখখানাকে।

ত্রস্তে একটা নাচেব ভঙ্গিতে থমকে গেল প্রমীলা। কোমর থেকে আঁচলটাকে একবার খসাতে চাইল, কিন্তু ঘটনাটা পবিণামে তেমন জমলো না। তার বিব্রত, অর্ধলজ্জিত অবস্থা উপভোগ করতে বেশ ভালোই লাগছিল। কিন্তু আচরণটা শোভন হচ্ছিল না বলে শেষ অবধি বলে ফেললাম, 'প্রমীলা, আমাকে চিনতে পারছেন না?'

চোখের পলকে ভাবান্তর ঘটে গেল প্রমীলার, বলতে গেলে রূপান্তর। হইহই করে আমাকে প্রায় ধরে ফেলল সে, 'আর আমাদের বিলেত ফেরত টাট্‌কা সাহেব যে! কবে ফিরলে দেশে, একটু জানাতে তো হয়?'

'জানাইনি ইচ্ছে করেই', আমি সহাস্যে জানালাম, 'একেবাবে সশরীরে অবাক করে দেব বলে। তা একেবারে ব্যর্থ হইনি কি বলেন?'

প্রমীলা সেকেণ্ডখানেক ভ্রূভঙ্গি ক'রে তাকিয়ে থেকে বলল, 'এটার মানে কি?'

আমি সন্দিগ্ধ গলায় বললাম, 'কোন্‌টার?'

'এই আপনি-আজ্ঞে করা সাধুভাষার।' প্রমীলা হতাশার ভঙ্গি করে বললো, 'আমাদের প্যারিস-চুক্তি বেমালুম ভুলে গেলে? নাকি এখন কথায় ডাকটিকিট লাগছে না তাই!'

'না না তা কেন', আমি সামলে নিলাম অপ্রতিভ ভাবটা, 'প্রথম দর্শনে নারী জাতির সম্মান রক্ষা করছিলাম মাত্র।'

'যাক কথাটা শুনতে ভালোই লাগলো।'

'জানা কথা, মেয়েরা ফ্ল্যাটারি ভালোবাসে। তা হেড অফ দি ফ্যামিলিকে দেখছি না কেন? তোমার ইনভিসিব্‌ল ম্যান কোথায়?'

'গোল্লায়!'

চমকে উঠে বললাম, 'তার মানে?'

'অফিসের গোলকিপারি করছেন এতক্ষণে!'

'বলো কি। আমি যেন বিশ্বাস করতেই পারছি না। এই সাত সকালে যখন মানুষ দ্বিতীয়বার চা খায় তারিয়ে তারিয়ে, তখন সে ব্যাটা অফিসে গিয়ে বসে থাকলো'—

'না, তুমি হাসছো! আমার কিন্তু সত্যিই কান্না পায়'-- সত্যিই কাঁদো কাঁদো মুখ করলো প্রমীলা।

আমি হাল্কা সুরে বললাম, 'এই রাখো তোমার মেয়েলী আই মীন, রেডিমেড্ কান্না। কিংবা, আচ্ছা দাঁড়াও--' হাতের সুটকেসটাকে টক করে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরা খুলে ফেললাম এক নিমেষে। লেটেস্ট মডেল ঝলসে উঠল আমার হাতের মধ্যে। একচোখ বুজে লক্ষ্য স্থির করে বললাম, 'হ্যাঁ এইবার একখানা সীন ক্রিয়েট করতে পারো'—

'করো কি, করো কি!' দু'হাত তুলে বাধা দিল প্রমীলা, যেন আমি পিচকারী উঁচিয়েছি রঙ দেবার জন্যে, 'এই কি ছবি তোলার পোশাক!—'

ক্যামেরার শাটার টিপে দিয়ে নিজের পোশাকের দিকে তাকিয়ে অজ্ঞতার ভান করলাম, 'কেন, এই পোশাক পরেই তো আমি বরাবর ছবি তুলে এসেছি।'

'তোমার পোশাকের কথা, ওরে!' — হঠাৎ আমার রসিকতা ধরতে পেরে কথা থামিয়ে হেসে উঠল প্রমীলা।

'অবিশ্যি মেক-আপে একটু খুঁত থেকে গেল তোমার—'

'মেক-আপে। কেন?' হাসি থামিয়ে সন্দিগ্ধ হল প্রমীলা।

'আঁচলে একটু সেন্ট ঢেলে আসা উচিত ছিল, ক্লোজ আপ শট্ নিলাম কিনা'—

দ্বিতীয় দফা হাসতে হাসতে প্রমীলা দমবন্ধ গলায় বলল, 'উফ, তুমি এমন হাসাতেও পারো।'

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 'শুটিং তো শেষ হল, এইবার?'

'নেগেটিভটা চাই পজিটিভলি, ডকুমেন্টারী হয়ে থাকতে রাজী নই।'

'তথাস্তু! উইমেন আর অলোয়েজ নেগেটিভ! অতঃপর কি করা যায় বলো'—

'ফলো মি, আমার পশ্চাদ্গামী হও'—

'পিছু নেব? ছি ছি কি যে বলো।'

চলতে আরম্ভ করেছিল প্রমীলা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'একটি চড় খাবে।'

সত্যি বলতে কি, ঘাবড়ে গেলাম একটু। কি রহস্যময় রূপান্তর। নীলাক্ষীদেরও চিনতে এরকম কষ্ট হয়নি আমার।

দোতলার ফ্ল্যাটটি সুন্দর। প্রায় ছবির মত করে সাজিয়েছে প্রমীলা। পর্দায়, ফুলদানিতে, মাটির পুতুল, হাতের কাজের প্রতিটি জিনিস এমনভাবে রাখা যেন আঁকা ছবি, যেন হাত দিয়ে ছুঁতে নেই। ব্যবহার্য জিনিসগুলো পর্যন্ত। মেঝে তক তক করছে, শঙ্খসাদা দেওয়াল। পিছন দিকের ব্যালকনিতে এলাম। আহা। প্রকৃতির বুকের মাঝখানে যেন দূরবীন চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। একখানা ছোটখাটো ভূগোল-বৈচিত্র্য যেন। একটি ব'সে পড়া হাতীর মত পাহাড়, দূর দিগন্তের দিকে। নীলবর্ণ। আকাশ আরো নীল। সামনে ক্যাকটাস শিয়ালকাঁটা ছাওয়া প্রান্তরে, একটু এগিয়ে গিয়েই খোয়াই হয়ে গেছে। লাল, ধূমল কাঁকর মাটির ঢেউ, ঢল, ক্যানভাসের সামনে রাখা

গোছা গোছা সরু মোটা তুলির মত তালখেজুরের সারি। সব মিলে সাঁওতাল পবগনার রূপ এবং রেখা। আর ঠিক আমার পাশটিতে দাঁড়িয়ে জনপদবধূ।

বললাম, 'অপূর্ব।'

'কি অপূর্ব?' নিরীহ জিজ্ঞাসা প্রমীলার।

বললাম, 'এই সিনসিনারী যা আমাব সামনে টাঙিয়ে রেখেছো!'

'ও, শুধু সিনসিনারী!'

'না আরো আছে, সাহস পেলে বলি'—

পৌরাণিক নায়িকার মত মৃগনয়নে তাকালো প্রমীলা, 'সাহস দিলাম তবে।'

'স্থানকাল পাত্রী'—

'মরি মরি!' খিল খিল ক'রে হাসল, 'সত্যি বলতে কি', হাসির ফাঁকে ফাঁকে বলল, 'সত্যি বলতে কি, ফ্ল্যাটার্ড হলাম। ইস—!'

'কি হল?'

'উনুনে বুঝি এতক্ষণ, একস্‌কিউজ মি'— উধাও হয়ে গেল প্রমীলা, যেন ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেল কৌশলে। আমি পকেট থেকে সিগারেট বার ক'রে ঠোঁটে চড়ালাম।

প্রমীলা ফিরে এল একটু পরেই, হাতে এক গ্লাস সরবৎ নিয়ে। ঘরের মধ্যে গিয়ে দুজনে বসলাম মুখোমুখি। বলল, 'এটুকু খেয়ে নাও।' ছাইদান এগিয়ে দিল সিগাবেট নামিয়ে রাখার জন্য।

এই প্রথম প্রমীলাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। সত্যি, তার চেহারার মধ্যে ঐশ্বর্য আছে। ঠোঁটের লোভাতুর হাসি, চোখের রহস্যস্পর্শ, চিবুকের কাছে একটা লাস্যময় মীড়। কয়েক মাস আগে কুমারী ছিল, এখন বধূ। তখন বইখাতা নিয়ে কলেজ যেত, বান্ধবীদেব সাথে দলবেঁধে গল্প করতো, আলুকাবলী খেত। আর এখন খাঁচায় ভরা শালিখের মত গৃহিণী।

এটা মেয়েদের জীবনে জয় অথবা পরাজয়, ভাবছিলাম মনে মনে। কিন্তু চোখ সরাতে পারছিলাম না প্রমীলার মুখের ওপর থেকে। অন্য কোনো মেয়ে হ'লে এই প্রায় সদ্য পবিচিত পুরুষের দৃষ্টির সামনে লজ্জিত বোধ করত, অন্তত অস্বস্তি। কিন্তু প্রমীলার সে বালাই নেই। সে আমাকে নিতান্ত সহজ মনেই গ্রহণ করেছে। দেখলাম, মনোযোগ দিয়ে আমার বুকের দিকে তাকিয়ে আছে।

'ওখানে কি দেখছো?'

'ভয় নেই, হার্ট দেখছি না, তোমার টাই দেখছি, ভারি সুন্দর।'

খুশী হয়ে মনে মনে বললাম, 'হ্যাঁ, দামও তেমনি, তোমার একখানা শাড়ি হয়ে যেত।' প্রকাশ্যে বললাম, 'ভবতোষের জন্যেও একটা টাই এনেছি, এর চেয়ে খারাপ না!'

'টাই?' যেন অবাক হল প্রমীলা, 'তোমার ওই চাষাড়ে বন্ধু টাই দিয়ে কি করবে?'

হয়ত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছিল কথাটিব মধ্যে। কিন্তু তা হলেও চাষাড়ে শব্দটা খুব স্নেহবাচক বা হাস্যরসাত্মক ব'লে বোধ হল না। খট্‌ ক'রে কানে লাগলো আমার। কিন্তু কথাটা খেয়াল করিনি এমনি ভাবে বললাম, 'কেন ও তো প্যাণ্ট পরে?'

'তা পরে।' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ঠোঁট ওল্টালো প্রমীলা।

মনের অসহ্য ভাবটা গোপন রেখে বললাম, 'নিজের বন্ধু ব'লে বলছি না, ওর মত ভালোমানুষ আমি খুব কমই দেখেছি।'

'তুমি সাহিত্যিকের বন্ধু, তোমার কথায় অত্যুক্তি থাকবেই', একটু ম্লান হাসলো প্রমীলা, 'কিন্তু অত ভালোমানুষ কে চেয়েছিল?'

বললাম, 'শুধুই ভালোমানুষ? অমন মার্জিত সাহিত্যিক— ভালো কথা, আজকাল ও লেখে টেখে, না ছেড়ে দিয়েছে একেবারে?'

আমার শেষ কথাটুকু কানে তুললো না প্রমীলা, প্রথমটুকু নিয়ে পড়লো, 'হ্যাঁ ওই লেখাটাই পলিশ্‌ড, লেখক নয়। উদারতা নেই'—

'অর্থাৎ? কিভাবে বলছো কথাটা?'

'যার বিশ্বাস নেই সেই অনুদার।'

'বিশ্বাস নেই এ তুমি কি বলছ? ভবতোষ তোমাকে যে-রকম ভালোবেসেছে— আর কেউ সে রকম'—

'দোহাই তুলনা করো না!' অধৈর্য গলায় কথা ক'টি বলে একটু দম নিল, পরে বলল, 'ভালোবাসার সংজ্ঞা আমি জানি না, কিন্তু এমন পাকে পাকে জড়িয়ে ধরা ভালোবাসার চাপে আমার যে দম বন্ধ হয়ে এল।'

গলার সুরে সমস্ত পরিবেশটা বিষণ্ণ আর অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল। প্রমীলার মনের মধ্যে কোথায় একটা কাঁটা ঢুকেছে। ভবতোষকে সে সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারেনি, সবটা মনে ধরেনি, বুঝতে পারছিলাম। ব্যাপারটা আমার কাছে আকস্মিক হলেও তার কাছে হয়ত এতদিনে এটা বাসি সংবাদ। তবু তাদেব দাম্পত্য জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতি গরমিলের কথা আমাকে শোনানো খুবই হঠকারী হয়ে পড়েছে। তবু ঠাট্টা করে সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলাম শেষবারেব মত।

'বুঝতে পারছি ভালোবাসায় শ্বাসকষ্ট না হওয়ার মত অক্সিজেন থাকা প্রয়োজন! তবু কিছু মনে কবো না, তোমার মত সুন্দবী বউ পেলে আমি বোধ হয় একটা আয়রন সেফ্ কিনতাম।'

ভেবেছিলাম আমাব এই বসিকতায় আগের মতই হাসবে প্রমীলা। কিন্তু সে গম্ভীব গলায় বলল, 'পুরুষদের ভালোবাসা এই রকমই, ঠিকই বলেছ। কিন্তু আয়রন সেফেও শেষরক্ষা হয় কি?'

'জানি না। তবে ওই চাবিকাঠিটাই আমার কাছে মিস্টেরিযাসলি বোমাণ্টিক মনে হয। বন্ধন এবং মুক্তি একসঙ্গে।'

'আমার এক দাদা বলতেন' প্রমীলা বলল, 'লাইফ ইজ হার্ডার দ্যান ফিলসফি, অ্যাণ্ড ব্রডার দ্যান দ্যাট! আমাদের পবিবারে কিন্তু মেয়েদের স্বাধীনতা ছিল। বাইরে মেলামেশা করায় বাবার কোনোদিন বাবণ ছিল না।'

বললাম 'শকিং! খুব দুঃখের কথা'—

'কেন?' প্রমীলা ভ্রূ কুঁচকে তাকালো।

'তোমার বাপের বাড়ির কথা বলছি না। ভবতোষ যদি এ রকম করে তবে সেটা খুব দুঃখের। আমি ওর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলব।'

'অমন কর্মও করতে যেও না' একটু ভীত ভঙ্গী করে বলল, 'তাতে আমার জ্বালা বেড়েই যাবে, তুমি ওকে চেন না!'

. কোনো উত্তর যোগালো না আমার মুখে। আমার বন্ধুকে সত্যিই আব আমি চিনি এমন মনে হচ্ছিল না। আমি যাকে জানতাম সে তো এত কনজারভেটিভ এবং সংকীর্ণমনা ছিল না। আমি না জেনে হয়ত সরল মনে ভবতোষের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা কিংবা তর্ক করতে যেতাম। তার ফলে বেচাবী প্রমীলা হয়ত তার স্বামীর দ্বিতীয় দফা সন্দেহের শিকার হত। ভাবছিলাম প্রমীলা আমাকে সাবধান করে দিয়ে ভালোই কবেছে। মানুষের মন বড় বিচিত্র, বাইরে থেকে তার কতটুকু খবর আর পাওয়া যায়।

'আসলে বিয়ে করাটাই মেয়েদের পক্ষে সবচেয়ে বড় ভুল।' প্রমীলা আমার চোখে তার গাঢ় চোখ দুটি রেখে বলল।

কিছু একটা বলা দরকার, কী-ই বা বলি! মনে হল এ ঘরের হাওয়া নষ্ট হয়ে গেছে। আগের মত আর সহজ নিঃশ্বাস ফেলা যাবে না। তবু শেষ পর্যন্ত মুখ খুললাম।

'ম্যারেজ মানেই অ্যাড্জাস্টমেণ্ট। বিবাহ্ মানেই পরস্পরকে বিশেষরূপে বন্ধন। যা চাই সব কি আমরা পাই? যা পেয়েছি তাকেই মানিয়ে গুছিয়ে নিতে হবে, প্রমীলা।'

'তুমি আজ এ কথা বলছ, কাল বলবে না'— অভিমানের মত শোনালো ওর গলা।

'কেন আজ ব্যাচেলার আছি বলে?' হেসে ওঠার চেষ্টা করলাম, 'যা ফ্যাক্ট তাকে চিরকালই স্বীকার করবো'—

'যাক ওসব কথা এখন থাক!' প্রমীলাই পূর্ণচ্ছেদ টেনে আমাকে বাঁচালো।

প্রমীলার ব্যস্ততার বহর দেখে বললাম, 'আমার জন্য কিন্তু বিশেষ কোনো আয়োজন করতে যেয়ো না। তোমাদের যা হয়েছে তার অন্তত বখরা দিয়ো, তা হলেই হবে।'

প্রমীলা জবাবে বললে, 'এই পোড়া দেশে পাওয়াই বা যায় কি যে, তোমাকে করে খাওয়াব। পররুচি খানা এখানে।'

'খানাপিনায় আমি up-রুচির পক্ষপাতী নই, অত উচ্চ স্তরে নাইবা উঠলে।'

'হাফ্-রুচি থাকলেই হল' ভবতোষ পিছন থেকে টিপ্পনী কেটে আমাদের দুজনকে চমকে দিয়ে গান ধরল, 'কত কাল যে বসে ছিলাম পথ চেয়ে আর কাল-গুণে, দেখা পেলাম ফাল্গুনে।' গানের কলি শেষ করে পিঠে কিল বসালো, 'আই শ্যাল কিল ইউ।' বলে নিজের রসিকতায় নিজেই ঘর ফাটিয়ে হাসলো।

আমি বললাম, 'তোমার শট্গান তোমার দিকেই ঘুরিয়ে ছুঁড়তুম, নেহাত গলায় গান আসে না তাই! নইলে, ঘড়ি ঘড়ি পথ চেয়ে বসে আছি তো আসলে আমিই'—

'প্রমীলার কোম্পানি এতটা বোরিং জানতাম না'—

'এটা আমাকে অ্যাটাক করা হল, কিন্তু আমি তা বলিনি। আসলে ও হল লিমিটেড কোম্পানি। কথা কি জানিস, ব্রাহ্মস্পর্শ না হলে কিছুই আনলিমিটেড হয় না। আড্ডা জমে না।'

'আমার কিন্তু দোষ নেই ভাই, টেলিগ্রাম পাওয়ামাত্র এসেছি— এই দ্যাখ' –

ভবতোষ প্রমীলা-লিখিত পত্রপাঠ চলে আসার হুকুমনামা দেখালো। তারপর স্ত্রীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'এ রকম ঝাপসা করে আর 'কল' দিও না সুন্দরী। হৃদযন্ত্র বিকল হবার উপক্রম হয়।'

'যাক হার্ট আছে তোমার তাহলে।' প্রমীলা ব্যঙ্গের সুরে বলল।

'আছে, কিন্তু আস্ত কি আর রেখেছ। জানিস্ অলকেশ, আমি ভাবলাম না জানি কি আবার। এদিকে তুই এসে বসে আছিস ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি— পুরুষের গলা শুনেই পা টিপে টিপে উঠেছি;' কথার মাঝখানেই মুচকি হেসে নিল একটু, 'রীতিমত রাইভালের মত জমিয়ে বসে আছিস, প্রথমটা চিনতেই পারিনি।'

প্রমীলা আমার চোখে চোখে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো। অর্থাৎ কেমন বলেছিলাম কিনা। পরে তেজী গলায় ভবতোষকে হুকুম করল, 'ওই সব চাষাড়ে রসিকতা রেখে একটু বাজারে যাও দিকি! ভবতোষ আমাকে ছাড়তে নারাজ। সে প্রমীলাকে শুনিয়ে শুনিয়ে গান ধরলো,

'ওগো নিঠুর দরদী, একি কথা বলছ অনুক্ষণ'—

'হ্যাঁ আমি যেন দিনরাত ওই কথাই বলি।' প্রমীলা প্রায় ফোঁস করে উঠল।

'আমার গান গাওয়া একদম টলারেট করতে পার না দেখছি! আসলে এত বেলায় আর কেন'—

আমিও ওকে সমর্থন করলাম, 'নিশ্চয়ই। বাক্তার করার স্কোপ্ পরেও পাবি। না তাড়ালে আমি এখান থেকে নড়ছি না ব্রাদার।'

'এই তো চাই। গ্রেটমেন থিংক অ্যালাইক, বাট উইমেন ডু নট্।' চেয়ার টেনে বসতে বসতে ভবতোষ সহাস্যে বলল।

'বসো!' বলে শাসিয়ে কিংবা ভরসা দিয়ে প্রমীলা উঠে গেল ঠিক বোঝা গেল না।

ভবতোষ অফিস থেকে সাইকেল করেই ফিরেছে, পোশাক দেখেই বুঝলাম।

'লেগ্ পুলিংয়ের অভ্যেস কবে থেকে হল?'

হাসি তামাশা ভবতোষ আগের মতই সহজে ধরতে পারে। বলল, 'এই মফস্বলে এসে ব্রাদার, কস্মিন জ্যোৎস্না রাত্রে আর্দালীর ছ্যাকরা যন্ত্রে হাঁটুকনুই ছড়িয়ে টিংচার আয়োডিন সহযোগে শিখেছি।'

'দরকার করে না। সংসার সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে ও একরকম ম্যানেজ হয়ে যায়। বিয়ে তো আর করলি নে। তোরা হচ্ছিস পয়লা নম্বরের এস্কেপিস্ট!'

'বল, বলে নে।'

ভবতোষের পোশাকের দিকে এবার খুঁটিয়ে নজর দিলাম। ক্রীজ নষ্ট ট্রাউজার্স, পায়ের পাতার ওপরে গোড়ালির ঘেরে দুখানা রুমাল বাঁধা। সাইকেলের প্যাডেল করার সুবিধের জন্যে। গায়ে একটা অদ্ভুত ম্যাড়মেড়ে রঙের ফুলশার্ট। হাত দুটো কনুইয়ের কাছে গুটোনো। সবগুলো বোতাম লাগানো হয়নি, ফলে ভেতরের আধময়লা গেঞ্জির খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। মাথায় পর্যাপ্ত বন্য চুল। সব মিলিয়ে চেহারায় একটা গ্রাম্যতা এসেছে, একটা শিথিল, বয়স্ক ভাবসাব।

প্রমীলার সঙ্গে আগে আলোচনা হয়ে থাকার দরুনই হয়ত চোখে বেশী করে লাগলো। বললাম, 'কিরে জামাকাপড়ে এত অনাস্থা কেন?'

ভবতোষ কথাটা বুঝতে না পেরে, নিজের জামাকাপড়ের দিকে চেয়ে শুধোল, 'কেন কি হয়েছে?'

'হাজার হলেও তুই একজন অফিসার মানুষ, তোর এই পোশাক! স্যুট নেই তোর? টাই ছাড়া আজকের দিনে পুরুষমানুষকে যে স্কন্ধ-কাটা মনে হয়।'

প্রাণখোলা হাসি হাসলো ভবতোষ, 'ও, এই কথা! আমাকে টিপটপ্ স্যুটেড-বুটেড দেখতে চাস? আরে হ্যাঃ, আমার মত পেটি অফিসারদের কি ওসব বিলাসিতা মানায়? তুইও যেমন প্রমীলার কথায় কান দিয়েছিস।'

'আমাকে আবার জড়াচ্ছ কেন এর মধ্যে।' চায়ের ট্রে হাতে ঘরে প্রবেশ করতে করতে প্রমীলা প্রতিবাদ করল, 'আমি কাউকে কিছু বলিনি'—

হাতের মুদ্রায় এক জাতীয় অ্যাবস্ট্রাকট্ আর্ট ফুটিয়ে ভবতোষ আমার অভিযোগ একেবারে হাওয়ায় উড়িয়ে দিল।

নিজের টেরিলিন স্যুটের দিকে ইংগিত করে বললাম, 'এটাকে বিলাসিতা বলিস?'

'বলি, পাত্র ভেদে। তোর পক্ষে ওটা নেসেসিটি, আমার পক্ষে নয়।'

'এই ভেদাভেদের কারণ?' আমি ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে জানতে চাই।

আমার অ্যাগ্রোনমিস্ট বন্ধু মৃদু হেসে বলল, 'অন্যভাবে নিস না কথাটা। প্রফেশন্যালী আই অ্যাম এ চাষা। আমাকে কি এসব মানায়? যে দেশের লোক প্রতিদিন থ্রি কোয়ার্টার নেকেড, সেখানে আমার আকণ্ঠ ড্রেসিং চলে কি রে ভাই?'

'তুই সেণ্ট পার্সেণ্ট প্যাট্রিয়েট ভবতোষ! তাই সিক্সটি সিক্স-এ এসেও এ কথা ভাবতে পারিস। আমরা তো ফরটি সেভেনের পর থেকেই ওসব ভুলে গেছি।'

'ওই সব কচকচি রেখে আয় একটু প্রাণ খুলে আড্ডা দিই।'

আমি সোৎসাহে বললাম, 'আরে সেই জন্যেই তো আসা। কতকাল পরে দেখা হল দেখি?'

'সত্যি বিয়েতে তোকে না পেয়ে— সিগ্রেট, প্রমীলা ঘরে সিগ্রেট আছে?'

'বোঝ?' আমার দিকে তাকিয়ে প্রমীলা হাসলো, 'সিগারেটও যেন আমার এক্তিয়ার?'

'নয়ত কি?' ভবতোষ বলল, 'তোমার হোম ডিপার্টমেণ্টে আবগারীও তো পড়ে। বিয়ের পর থেকে যে ভাবে মাদক কণ্ট্রোল করে চলেছ'—

আমি হাসতে হাসতে স্টেট এক্সপ্রেস ভর্তি মূল্যবান সিগারেট-কেসটা ওর সামনে খুলে ধরে বললাম, 'বিয়ের আগেও কি তাহলে তোমাদের ইয়ে ছিল?'

কৃত্রিম কোপের সঙ্গে প্রমীলা বলল, 'তোমরা দুজনেই কিন্তু বড্ড ভালগার হয়ে যাচ্ছ।'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'কথায় বলে টোয়াইস এ ভালগার।'

'জীবনে তো কাউকে ভালোবাসলে না, তুমি লভটভের বুঝবে কি?' প্রমীলাকে ঠাট্টা করে ভবতোষ বলল, 'প্রেম হচ্ছে মহৎ শিল্প, গ্রেট আর্ট! বিয়েটাই সব নয়, স্যার'—

'নিশ্চয়ই। আমি প্রমীলাকে রাগিয়ে দেবার জন্য বললাম, 'ফার্স্ট ক্লাস ইডিয়ট না হলে কেউ দুম করে বিয়ে করে বসে!'

'সত্যি, তোকে দেখলে হিংসে হয় র‍্যা'— কেস থেকে একটা সিগারেট তুলে নিতে নিতে আমাকে চোখ টিপে বলল।

প্রমীলার এবার সত্যিই মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠল, 'তা তোমার ফ্রেণ্ডের মত ওই সব করে বেড়ালেই হত, ইডিয়টের মত বিয়ে করতে যাওয়া হয়েছিল কেন?'

'তোমার কথা ভেবে'—

'আমার কথায!' নিজের বুকে সবিস্ময়ে আঙুল ঠেকিয়ে প্রমীলা টেনে টেনে উচ্চারণ করল, 'বলো কি?'

'লেট মি এক্সপ্লেন'—আমার হাতের লাইটার থেকে সিগারেট ধরিয়ে পবিতৃপ্তির সঙ্গে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে ভবতোষ বলল, 'দিনের পর দিন তোমার বিয়েব বয়স চলে যাচ্ছে দেখে'—

ভবতোষের কথা শেষ হল না। হাতের পশমের গুটি আর কাঁটা দুটো ভবতোষের বুকের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে দুম দুম করে পাশের ঘরে চলে গেল প্রমীলা।

'অরসিকেষু রস নিবেদনং', শ্লোকের গা ঘেঁষে হাসল ভবতোষ।

দাম্পত্য কলহ ব্যাপারটা আজ যুদ্ধের মতই বাইরের লোকের পক্ষে বেশ লোভনীয় ব্যাপার। কিন্তু তলায় তলায় ব্যাপারটা গুরুতর বলেই শঙ্কা হচ্ছিল।

দুপুরে সস্ত্রীক গোটা দুই গড়াগড়ি দিয়েই ভবতোষ উঠে ধরাচুড়ো পরতে লাগল।

বললাম, 'ব্যাপার কি? এই মফস্বলেও এত কাজ? আজকের দিনটা ডুব দিলে হত না?'

মিটিমিটি হাসল ভবতোষ, 'সেই ব্যবস্থাই পাকা করাতে যাচ্ছি। শুধু আজ কেন, কালকের দিনটাও ম্যানেজ করে আসবো। কাল শনিবার, একবেলা আছে'—

বললাম, 'ব্রেভো!'

ভবতোষ বেরিয়ে গেল। আমি শুয়ে শুয়ে একটি ইংরেজী সচিত্র সাপ্তাহিকের পাতা ওল্টাচ্ছিলাম। কিছু যে পড়েছিলাম তা নয়, আসলে মনে মনে কিছু ভাবতে হলে একটু মুভমেণ্ট আনা দরকার।

এমন সময় প্রমীলা আমার ঘরে চলে এল, 'ঘুমোচ্ছ নাকি, অলকেশ?'

'এসো' তাড়াতাড়ি উঠে বসে বললাম, 'কাঠবেড়ালীর মত সেতু বন্ধনের চেষ্টায় ছিলাম, হল না।'

'ওইতো মুশকিল। দিবানিদ্রা যাদের আসে না, একেবারেই আসে না। চলো, বিকেলে কোথাও ঘুরে আসি একটু। এখানে কার বা ভাল লাগে। না আছে কোনো অ্যাসোসিয়েশন না আছে কিছু। তবে দ্যাখো ও আবার রাজী হয় কিনা।'

'ভবতোষকে তুমি বেরসিকের কোঠায় ধরে রেখেছ দেখছি। আমি তো ওর ম্যুড আজকে খুব ভালোই দেখলাম।'

'ছাই দেখেছ। এই তো যাবার আগেও এক রাউণ্ড হয়ে গেল।'

পাছে সকালের আবহাওয়া আবার ফিরে আসে তাই ভয় পেলাম। লঘু ভঙ্গিতে বললাম, 'গুলি না কাঁদুনে গ্যাস?'

'আমাকে ওরকম ছিঁচকাদুনে মনে হয়েছে বুঝি? অত ইমোশনাল আমি নই।'

'তাহলে আর ড্রামা জমলো কি করে?'

'তোমার ফ্রেণ্ডকে জিগ্যেস করো, তাঁর টেকনিক তিনিই ভালো জানেন।'

'ভেরি ইণ্টারেস্টিং! তোমাদের অশ্রাব্য ঝগড়া তাহলে একদিন শুনতে হচ্ছে।'

'অশ্রাব্য মানে! কি বলতে চাও তুমি?'

'মানে ওই হল যা শ্রবণীয় নয় আর কি! সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি দেওয়ালের তফাতে থেকেও যা শোনা যায় না'—

'মরি, মরি! সাধতো কম নয়, তা আড়ি পাতবে নাকি?'

বললাম, 'তোমার সঙ্গে? আনাড়ির এতটা সইবে কি?'

আমার বাহুদেশে সজোরে চপেটাঘাত করল প্রমীলা। বেশ জ্বালা করছিল, তবু মুখে হাসি ফুটিয়ে বললাম, 'এ কিন্তু মশা মারতে কামান দাগা হল।'

'মশা নয়, মশাই তোমাকেই মারা হল এটা। ভালো কথা, আমার জন্যে বিলেত থেকে কি এনেছ শুনি? খুব যে চিঠিতে লিখেছিলে আমাকে অবাক করে দেবে'—

প্রমীলার স্মার্টনেস দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। যদিও সেই মুহূর্তে আমি সত্যি সত্যিই আড়ি পাতার কথা ভাবছিলাম। মশার চিন্তাটা আর উপহারের প্রশ্ন বিদ্যুৎচমকের মতই আমার ষড়যন্ত্রের উপায় বাতলে দিল। আমার সুটকেসের মধ্যে প্রমীলার জন্যে লুকিয়ে আনা টেপরেকর্ডারের মাউথপিসটা ওদের খাটের মশারির সঙ্গে কিভাবে গোপনে ঝোলাবো— বিদ্যুৎচমকের মতই খেলে গেল সেটা। দু-ঘরের মাঝখান দিয়ে একটা সরু জল যাবার গর্ত আছে দেখেছি, সেখান দিয়ে মাইক্রোফোনের তারটা অতি সহজেই আমার ঘরে নিয়ে আসা যাবে।

'বুঝেছি, মুখে কথা নেই কেন? দেশে ফেরার সময় আর বান্ধবীর কথা মনে পড়েনি কেমন?'

'না ঠিক তা নয়। কণ্টিনেণ্টাল ট্যুরে বেরিয়ে হাত খালি হয়ে গেল একদম, সত্যি আমার কি যে খারাপ লাগছে'—

'আমার কিন্তু মোটেই খারাপ লাগছে না, কারণ আমি জানতাম, বন্ধুর চেয়ে বান্ধবী তোমার কাছে বড় হবে না।'

'তুমি রাগ করো না প্রমীলা'—

'যেতে দাও ওসব। আমার রাগে অনুরাগে কার কি এসে যায়। আরে, ওই শোনো!'

'কী?'

'জীপের হর্ন শুনতে পাচ্ছ না?'

'হ্যাঁ, তাতে কি হয়েছে?'

'তোমার ফ্রেণ্ড এসে গেছে অফিসের গাড়ি নিয়ে'—

আমি তৈরি হয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এসেই দেখি অপ্রসন্ন মুখে প্রমীলা বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে! মুখের মেক-আপ নেওয়া হয়ে গিয়েছে, খোঁপা সারা, কেবল শাড়ি বদলানো বাকি। এতটা আশাই করিনি, কারণ পক্ষীপাত পর্ব নিয়ে বিকেলের মুখোমুখি আব এক প্রস্থ দাম্পত্য কলহ হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ মুরগী রাঁধা নিয়ে ব্যাপারটা। তাতে করে বিকেলে যে প্রমীলাকে সঙ্গে নিয়ে বেরোতে পারব, বিশ্বাস ছিল না।

'আর এ কাকে দেখছি।' অকপট বিস্ময় প্রকাশ পেয়েছিল আমার গলায়।

'দেখে যা।' সিগারেটে বেশ মেজাজে একটা টান দিয়ে ভবতোষ বলল, 'নিজেব স্ত্রীকে পর্যন্ত ঘর থেকে ফুসলে বার করে আনতে পারি। যাদু, বুঝেছিস স্রেফ যাদুবলে'—

আমি ধমক দিলাম, 'অ্যাই ভবতোষ!'

'ওহ্ স্যরি।'

একটু পরেই আমাদের জীপ গাড়ি দূরের পাহাড়ের দিকে ছুটে চলল। দু-তিন জায়গায় গাড়ি থামিয়ে আমি ওদের ছবি তুললাম। যেটুকু গুমোট গাড়িতে উঠেও ছিল, তা কেটে যেতে বিলম্ব হল না। বলতে কি প্রমীলা রীতিমত কিশোরীর মত ঝরনাব জলে পা ডুবিয়ে কয়েকখানা মারাত্মক ভঙ্গীতে ছবি তোলালো।

পুরুষের এবং ক্যামেরার একচোখোমিতে মেয়েদের প্রাগৈতিহাসিক দুর্বলতা। পৃথিবীর সভ্য সমাজের কোনো নাবীকে আমি এর ব্যতিক্রম দেখলাম না।

তারপর পাহাড়ে উঠে একটা অদ্ভুত আকারের পাথরের চাঙড়েব ওপর বসে কিছুটা রাত পর্যন্ত গান আর গল্প হল। প্রমীলা গান গায় সুন্দর। তাব গলা এবং ঢঙটি ববীন্দ্রসঙ্গীতের আবহাওয়া গড়ে তুলল।

গান শেষ হলে আমি বললাম, 'অপূর্ব! এমন গলা বাঁধিয়ে রাখবার মত'--

'এবং মালা দিয়ে বেঁধে রাখবার মতও', ভবতোষ আমাব বসিকতায় যোগ দিল, 'যা আমি ইতিপূর্বেই করেছি।'

'আমার গলা ভালো তা তো আর বলিনি', অভিমানী প্রমীলা ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলল, 'আমাকে অত করে গাইতে বললে কেন তবে!'

আমি বললাম, 'মেয়েরা রসিকতা বোঝে না, এটা ব্যজস্তুতি করলাম ধবতে পারলে না।'

ভবতোষ বলল, 'অলকেশ, তুই যদি টেপ রেকর্ডারটা নিয়ে আসতিস তাহলে এ গলা সত্যিই বাঁধিয়ে রাখা যেত রে।'

'আর লজ্জা দিসনে। আনতে পারিনি ঠিকই, তবে আনিয়ে দেব দেখিস।'

এর পর গাড়িতে বসে রাতের আহার সেরে আমরা যখন বাড়িব পথ ধবলাম তখন মহুয়া আর শালের জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে চাঁদ উঁকি দিচ্ছে। সমস্ত পথ রূপকথাব দেশ বলে মনে হচ্ছিল, মউলের গন্ধে বাতাস ভাবী।

কিন্তু দম্পতির মুখ কেমন যেন থমথমে। সংলাপ নিরুচ্ছল, এবং সংক্ষিপ্ত হয়ে এল। মুখে আর হাসি ফুটল না। ভবতোষের মধ্যেও কেমন যেন একটা পরিবর্তন এসেছে। একটা অস্বাচ্ছন্দ্যের ভাব। কোথা থেকে এই মেঘ নেমে এল, ঠিক ধরতে পারলাম না। তবে বুঝলাম, আজ রাতে একটা খণ্ডপর্ব হতে পারে। সুতরাং সেই দুর্লভ দ্বন্দ্ব রেকর্ড করে ফেলতে পারলে, দাম্পত্য কলহের একটা মধুর উপসংহার টানা যাবে ভেবে মনে মনে উল্লসিতই হলাম।

বাড়ি ফিরে চিরকালের অভ্যেসমত ভবতোষ স্নানঘরে ঢুকলো। প্রমীলা চলে গেল রান্নাঘরে দুধ গরম করতে। সুতরাং এই শুভ মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করতে আমি ভুললাম না।

ভোররাতে ঘুম ভেঙে যেতেই মনে পড়লো কথাটা। টেবিলের ওপরে তখনও রেকর্ডার খোলা পড়ে রয়েছে। শুধু প্লাগ কানেকশন খোলা। কৌতূহলে উঠে বসলাম তাড়াতাড়ি। কাল অনেক রাত নিঃশব্দে যা এই বিদেশী যন্ত্রটি মুখস্থ করেছে, তা না জানা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছিলাম না। মনে আছে শুতে যাবার মুহূর্তে দুধ খাবার প্রসঙ্গে দুজনের একচোট হয়ে গিয়েছিল। এবং সেই হয়ে যাওযার মধ্যে কোনো লুকোছাপা ছিল না, আমার সামনেই সেই মুক্তাঙ্গন নাটকের মত কলহপর্বের একাঙ্কিকা হয়ে গেল।

স্ত্রী দুমদুম করে মেঝে কাঁপিয়ে খাটে গিয়ে ধপাস হল। স্বামী মুণ্ড পুরুষের মত একটা সিগারেট ধরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর কিছুক্ষণ দার্শনিকের মত আত্মমগ্ন থেকে মনুর শ্লোক আউড়ে বলল, 'তুই বেশ আছিস অলকেশ, খবরদার ভুলেও বিয়ে করিস না।'

বুঝলাম, ভবতোষ আর প্রমীলা পরস্পরকে এক মুহূর্তও সহ্য করতে পারছে না। এই অসহিষ্ণুতা কেবল ভবতোষ আর প্রমীলার মধ্যেই নয়, ছমাস এক বছরের পুরনো বিবাহিত ব্যক্তির মধ্যেই চোখে পড়েছে। বড্ড বেশী ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকার এই ফল।

টেপটা গুটিয়ে নিয়ে মিডিয়াম ভল্যুম-এ সুইচ দিলাম। ধীরে মন্থর গতিতে রীলটা ঘুরে চলল, কিন্তু কোনো কথা নেই। মনে অবশ্য এরকম একটা আশঙ্কাই ছিল। শুতে যাবার আগের মুহূর্তে বাক-যুদ্ধটি না হয়ে গেলে হয়ত একটা আশা ছিল। হঠাৎ চমকে উঠলাম গলা শুনে।

'কী, এখন কেন? ছাড়ো!'

'মিলু রাগ করো না, লক্ষ্মীটি শোনো, আাই শুনছো?'

'থাক, আর আদর দেখাতে হবে না, বাইরের লোকের সামনে জুতো মেরে এখন'

'যাঃ, যা খুশি বললেই হল? তোমাকে কি আমি.. আরে এদিকে যেবো না, বাইরের লোক পেলে কোথায় তুমি?'

'কেন তোমার ওই প্রাণের বন্ধু'

'ওহো, অলকেশের কথা বলছ, সত্যি ওকে আমার মানুষ বলেই একেবারে মনে হয় না। ওটা একটা পাগল। জানো, মিলু, ও হতভাগার একটা বিয়ে দেওয়া দরকার। তোমার বন্ধুটন্ধুদের মধ্যে কেউ যদি ফ্রি থাকে'--

'রক্ষে করো! আমাকে আর এর মধ্যে টেন না'—

'তোমাকে তো টানছি না, তোমার বন্ধুদের কাউকে যদি টানতে পারো দেখো না।'

'ঠোঁটে কিছু আটকায় না!'

'আটকাতে আর দিলে কই, যেরকম ফিউরিয়াস হয়ে মুখ ফিরিয়ে আছো'—

'অসভ্য! নাও হল তো?'

রিল ঘুরে চলেছে। আর কোনো শব্দ নেই। ঘুমিয়ে পড়ল নাকি দুজনে। সত্যি, অজাযুদ্ধ, ঋষিশ্রাদ্ধ আর দাম্পত্য কলহ সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রকার যথার্থই ফোরকাস্ট করে গেছেন স্বামী-স্ত্রীর মতিগতির কোন ঠিক নেই।

'এই?' চমকে গিয়েছিলাম আর একটু হলে।

'উঃ?'

'এরকম চুপ করে থাকলে ভারি লজ্জা করে কিন্তু।'

'কেন বলো তো?'

'মনে হয় তুমি কি যা-তা ভাবছ!'

'সর্বনাশ। কথায় কাজে এক হয়ে শেষে হাতে হাতে ধরা পড়ি আর কি।'

'সব সময়ে ইয়ে! ইস্'—

'কি হল?'

'বড্ড শরীর খারাপ হয়ে গেছে'—

'তোমার?'

'মুণ্ডু। তোমার।'

'কেন বেশ শ্লিম হয়েছি বুঝি?'

'থামো তো! সব ব্যাপারে ঠাট্টা না। এত রোগা আর হাল্কা হয়ে গিয়েছ ইস্! আমারই দোষ, আমি কেন এতদিন লক্ষ্য করিনি'—

'সব স্বামীদেরই এই এক অবস্থা'—

'কি অবস্থা?'

'বউ-এর কাছে তাদের আর কোনো ওয়েট নেই।'

কিছুক্ষণ নীরবতার পর। 'তুমি রাগ করবে না, বলো?'

'বলেই ফেলো'—

'আমাদের মাঝখানে কোনো লোক আসুক আমি চাই না।'

'ইটস্ ট্যু লেট ডার্লিং. আরো আগে বলা উচিত ছিল। এই ছোটলোক ট্রেসপাসারদের কিছু বিশ্বাস নেই।'

'অসভ্য কোথাকার। জংলি ভূত একটা। আমি সেই কথা বলেছি নাকি। আমি তোমার বন্ধুর কথা বলছিলাম। সত্যি, আমার বড্ড ভয় করছে গো।'

'এই মরেছে! কেন, ভয়ের আবার কি হল এর মধ্যে?'

'তোমাকে চিরকুট পাঠিয়ে আমার যা ভয় করছিল না, তুমি এমন দেরি করছিলে আসতে।'

'পাগলী কোথাকার! আমার ছেলেবেলার বন্ধু ওই অলকেশকে দেখে তোমার ভয়? তুমি সত্যি ডোবালে। সত্যি বলছি, আমি ওকে মানুষ বলেই মনে করি না একেবারে'—

'ঠিকই করো।'

'যাহ্ বাবা? ও কী করলো তোমার?'

'তবে কি আমি মিথ্যে করে লাগাচ্ছি'—

'আহা আমি কি তাই বলছি, এই দ্যাখো'—

'ও কবে যাবে কিছু বলেছে তোমাকে? নড়বার তো কোনো লক্ষণই দেখছি না।'

'আহা যাবে বইকি। এখানে থাকবে বলে তো আর আসেনি, তাছাড়া অফিসপত্র আছে'—

'ছাই আছে। ওর মতলব ভালো মনে হচ্ছে না'—

আমার কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করছিল, মাথা ঘুরছিল, আর শুনতে সাহস হল না। ভবতোষ কিছু বলার আগেই মেশিন বন্ধ করে দিয়ে ঘড়ির দিকে তাকালাম। তারপর এক টুকরো কাগজে 'তোমাদের কথাই রইল' লিখে টেপের বিলটার তলায় চাপা দিয়ে রেখে উঠে পড়লাম।

আমার শূন্যপ্রায় সুটকেস আর ক্যামেরাটা নিয়ে ছুটতে ছুটতে যখন স্টেশনে পৌঁছলাম, তখন সিগন্যাল ডাউন হয়েছে।

নকুড়মামার জামাই আদর

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

পাড়ায় হঠাৎ খুব চোরের উপদ্রব সুরু হয়ে গেল। আজ এর বাড়ি, কাল ওর বাড়ি, পরশু তার বাড়ি এই হতে লাগল। প্রতিদিন কারো না কারো বাড়ি চুরি হতেই থাকল পাড়ায়। তবু চুরিটা বড় অদ্ভুত রকমের। চোর আসে, তালা ভাঙে। ঘরে ঢোকে। প্রথমেই গেরস্থের হেঁসেল মারে। অর্থাৎ রান্নাঘরে ঢুকে ভালো মন্দ খাবার দাবার যা থাকে খেয়ে নেয় পেট পুরে। তারপর পকেট হাতড়ে বা এদিক সেদিক উটকে পাটকে দেখে টাকা পয়সা যা পায় নিয়ে পালায়। বাসন কোসন বা অন্যান্য জিনিসের দিকে খুব একটা নজর নেই চোরের। হুলো হাবলি কেলো কাবলি দোলন কলমার মতো ডানপিটে ছেলেরা অনেক চেষ্টা করেও চোরের নাগাল পেল না।

চোর ঠিক সুযোগ মতো ঝোপ বুঝে কোপ মারে। অর্থাৎ আসে, চুরি করে এবং যথারীতি চোখে ধুলো দিয়ে পালায়।

নকুড়মামা একদিন ছেলে ছোকরাদের ডেকে বললেন— হ্যাঁরে, ব্যাপার কি? এর ভেতরে তোদের কোন কলকাঠি নেই তো?

সবাই একসঙ্গে বলল-- না মামা। ওসবের ভেতরে আমরা নেই। আমরা মাঝে মধ্যে একটু খারাপ কাজ করে ফেলি বটে, তবে ঐরকম নোংরা কাজ করি না।

— তাহলে তো বেশ চিন্তার ব্যাপার হয়ে উঠল।

-- তা তো হলেই। সবচেয়ে মজার ব্যাপার কি জান মামা? এই চোর বাবাজী রীতিমতো সন্ধানী। কে কবে কোথায় যাচ্ছে না যাচ্ছে সবই ওর নখদর্পণে। সেদিন রামবাবু কাশী গেলেন। তা যেদিন গেলেন সেদিনই রাত্রে চোর এসে তালা ভাঙল বাড়িতে। অমুকদিন অমুকরা গেল বিয়েবাড়ি। তা অমনি সেই রাত্রেই তালা ভাঙল চোর এসে। এর রহস্য কি?

নকুড়মামা একটু গম্ভীর হয়ে কি যেন ভেবে বললেন -- এর রহস্য আমি শিগগির ফাঁস করছি। তা এ ব্যাপারে পুলিশ কি বলছে?

— কি আর বলবে? ঐ একই কথা বলছে। আপনারা পালা করে রাত জেগে পাহারা দিন। আমরা নিশ্চিন্তে ঘুমোই। তারপর আমাদের হয়ে চোর ধরে আপনারা আমাদের হাতে তুলে দিন, আমরা কৃতিত্ব দেখিয়ে চাকরি বাঁচাই।

. — মামার বাড়ি নাকি? ওনারা মাসে মোটা টাকা মাইনে নেবেন আর লোকে সারাদিন পরিশ্রমের পর রাতের শোয়া ফেলে রেখে রাত জাগবে? তোরা শিগগির একটা মিটিং ডাক।

সেইমতো এক রবিবার সকালে মিটিং বসল।

সেই মিটিংয়ে থানার ও-সি এলেন। পাড়ার বিশিষ্ট ভদ্রলোকেরা এলেন। ছেলে ছোকরাদের দল এলো। নকুড়মামাও এলেন।

নকুড়মামা তীব্র প্রতিবাদ করে বললেন — পুলিশের এইসব ফাঁকিবাজি আমরা বরদাস্ত করব না। শহরের শান্তি রক্ষার দায়িত্ব পুলিশের। তারাই সারারাত জেগে টহল দেবে

পাড়ায় পাড়ায়। না পারে চাকরিতে তারা ইস্তফা দিক। অথবা তাদেব মাইনের অর্ধেক টাকা আমাদের দিয়ে দিক। সেই টাকার বিনিময়ে আমরা রাত জাগি। চালাকি নাকি?

নকুড়মামার বক্তব্য শুনে ও-সি বেশ কিছুক্ষণ মাথা হেঁট করে চুপচাপ বসে বইলেন। তাবপব এক সময় খুব নরম এবং ভদ্র গলায় বললেন — আপনার বক্তব্যেব সঙ্গে আমিও একমত নকুড়বাবু। তবে কি জানেন, এই সব প্রতিরোধ বাহিনীর ভেতর দিয়ে আমরা অনেক সুফল পেয়েছি। পুলিশের ওপর আপনাব খুব বাগ তা বুঝতে পারছি। শুধু আপনার কেন অনেকেরই এরকম রাগ আছে। তবে জেনে বাখুন আমাদেব ক্ষমতা কিন্তু সত্যিই খুব অল্প। এক একটি থানার আণ্ডারে এক একটি বিস্তীর্ণ এলাকা রয়েছে। সেই এলাকাব মধ্যে যে কতগুলো পাড়া আছে তা গুণে শেষ করা যাবে না। কিন্তু অত পুলিশ কোথায আমাদের বলুন। এই সামান্য পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঐভাবে পাড়ায় পাড়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করা কি সম্ভব।

নকুড়মামা এবাব একটু শান্ত হযে বললেন— বুঝলাম। তাহলে আব এক কাজ করুন, বেকার ভাতার মতো পাড়ায় পাড়ায ছেলেদের বাত জাগার মতো একটা কিছু ভাতাব ব্যবস্থা করিয়ে দিন।

— সে বাবস্থা আমি কেন কবাতে যাবো? আপনাবা আবেদন করুন সবকাবের কাছে।

— বেশ তাই কবব।

ও সি. বললেন -- চুরি যদি বন্ধ কবতে হয় তাহলে শুধু পুলিশেব দোহাই দিযে নয গৃহস্থকেও সজাগ থাকতে হবে, বুঝেছেন? যে-সব জায়গায় প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে উঠেছে সেই সব জাযগায অনেক ক্ষেত্রেই চুরি ডাকাতি বন্ধ হয়ে গেছে। তা সে যে কোন কারণেই হোক। হয় প্রতিরোধ বাহিনীব ভয়ে চোরেবা পাড়ায় ঢোকে না। নয়তো পাড়াব ছেলেদেব ভেতবেই যদি মন্দ বুদ্ধি কেউ থাকে তো সে সাবধান হযে যায়। নকুড়মামা সব শুনলেন। সব বুঝলেন। পাড়ার লোকেরাও সব শুনল।

নকুড়মামা বললেন — পুলিশের কথা তো আপনারা শুনলেন। এখন আমার কথাটা শুনুন। প্রতিরোধ বাহিনী এখানে গড়তেই হবে। তাই বলি কি আপনাবা যারা কাজকর্মেব ঢেঁকি তাবা সবাই আহারনিদ্রা কাজ নিয়ে থাকুন। আর পাড়ার ছেলেবা, মানে বেকার ছেলে যাবা তাবা শুধু শুধু রকের শোভা না বাড়িয়ে দিনে ঘুমিযে বাতে জেগে পাহাবা দিক।

এই শুনে সবাই তো আনন্দে হৈ-হৈ করে উঠল- বাঃ বাঃ। কি বুদ্ধি। এই না হলে নকুড়মামা। আমরা সবাই খাই-দাই ঘুমোই। আব ঐ ভ্যাগাবণ্ডগুলো বাত জাগুক। চমৎকার প্রস্তাব।

পাড়ার ছেলেবা মানে হুলো হাবলি কেলো কাবলিরা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠল একি মগের মুল্লুক নাকি! বাবুরা চাকরি করেন বলে মাথা কিনে নেন। ওনাবা নিশ্চিন্তে ঘুমোবেন আর আমরা রাত জেগে ওনাদের সম্পত্তি পাহারা দেবো? বয়ে গেছে।

নকুড়মামা ধমকে উঠলেন — চুপ কর গাধাগুলো। আমার কথা শেষ হয়নি এখনো। তারপর পাড়ার লোকদের বললেন— তবে একটা কথা। আপনাবা নিশ্চয় জানেন শুধু হাত কখনো মুখে ওঠে না। তাই এই ছেলেদের মুখ চেয়ে কিছু টাকা-পয়সাব ব্যবস্থা আপনাদের করে দিতে হবে। আপনাদের অর্থে প্রতিরোধ বাহিনীও গড়ে উঠবে এবং ঐ সঙ্গে এদের সাময়িক বেকারত্বও ঘুচবে।

একজন বলল--- তা কিরকম কি দিতে হবে শুনি? টাকার অঙ্কটা কত?

নকুড়মামা বললেন— এই ধরুন এরা তো ছ'জন আছে। দিনে দশ টাকা করে ছ'জনেব ষাট টাকা তো প্রতিদিন লাগবে। এই না শুনেই তো আঁতকে উঠল সকলে। অ্যাঁ! প্রতিদিন ষাট টাকা!

— হ্যাঁ মশাই। ষাট টাকা। নাহলে ঘরের খেয়ে কে বনের মোষ তাড়াবে বলুন?

— দরকার নেই মশাই অমন প্রতিরোধ বাহিনীর।

— বাঃ। বেশ মজার লোক তো আপনারা। যেই বললুম আপনারা সারাদিনে খাটা-খাটানির পর রাত্রিবেলা আরাম করে শুয়ে ঘুমোবেন আর পাড়ার ছেলেরা রাত জাগবে অমনি আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন সব। আর সেইসব ছেলেদের হাতে সামান্য কিছু তুলে দেবার প্রস্তাব যেই করলাম অমনি বলছেন দরকার নেই।

— সে কি আর সাধ করে বলছি। টাকার অঙ্কটা বেশি হয়ে গেল যে। নকুড়মামা বললেন— অঙ্কটা তাহলে আমার কাছ থেকেই লিখে নিন। কিছু বেশি হয়নি। আগে হিসেব করে দেখুন এ পাড়ায় কত ঘর বাসিন্দা আছি আমরা।

সবাই হিসেব করে বলল— তা সাড়ে তিনশোর ওপর।

— তবে! সাড়েটা বাদ দিলেও তিনশো ঘর বাসিন্দা। প্রত্যেক দিন আট আনা করে চাঁদা দিলেও প্রতিদিন দেড়শো টাকা চাঁদা ওঠে। এর ভেতর থেকে ষাট টাকা ছেলেদের হাতে তুলে দিলেও নব্বুই টাকা স্টকে থাকে আমাদের।

— কিন্তু দিন আট আনা করে চাঁদা হলে মাসে পনেরো টাকা চাঁদা হয়। প্রতি মাসে পনেরো টাকা করে চাঁদা দেওয়া কি সম্ভব!

নকুড়মামা রেগে বললেন— কেন নয় শুনি? বাড়ির ঝি, চাকর, ছেলেমেয়েদের মাস্টার, এসবের পিছনে খরচ করেন না? তাছাড়া মাত্র পনেরো টাকার বিনিময়ে সারারাত নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারবেন। বাড়ি তালাবন্ধ রেখে যেখানে ইচ্ছে যেতে পারবেন। কত শান্তিতে থাকবেন বলুন তো? এবারে অবশ্য কথাটা মনঃপূত হল সকলের। বলল— তা না হয় মানলাম। কিন্তু বাকি নব্বুই টাকার কি হবে?

— তারও সদ্‌গতি হবে। আপনারা যখন অফিসে থাকবেন তখন দুপুরবেলা আরো জনা-দশেক ছেলে পাড়ায় টহল দেবে যাতে ঐ সময়ের মধ্যে কোন অপ্রীতিকর কিছু না ঘটে। তাদেরকেও দিন পাঁচ টাকা হিসেবে দিলে আরো পঞ্চাশ টাকা খরচ হবে। বাকি থাকবে চল্লিশ টাকা। ও টাকাটা খরচ করা হবে না। ওটা প্রতি মাসে একটি ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে জমা থাকবে। কেউ হয়তো অসুখে ভুগছে, অর্থাভাবে চিকিৎসা করাতে পারছে না। কোন ছেলে বা মেয়ে হয়তো সাংসারিক দুরবস্থার জন্য পরীক্ষার ফি দিতে পারছে না, কোন গরীবের মেয়ের হয়তো অর্থাভাবে বিয়ে হচ্ছে না তখন ঐ অর্থ সর্বসম্মতিক্রমে ঐ সব খাতে ব্যয় করা হবে। এইবার হাসি ফুটল সকলের মুখে। বলল— বাঃ। প্রস্তাবটা মন্দ নয়তো।

ও সি-ও বললেন— হ্যাঁ। যদি টিকিয়ে রাখতে পারে ব্যবস্থাটা তাহলে খুবই ভালো হয়। থেকে থেকে বেশ ভালো মতলবই খাটিয়েছেন নকুড়বাবু।

নকুড়মামা বললেন— এই মাস থেকেই তাহলে চাঁদা ওঠানো যাক। আর মাস পয়লা থেকে সুরু হোক প্রতিরোধ বাহিনীর পাহারা দেওয়া। সবাই বলল— হ্যাঁ। তাই হোক।

পাড়ার ছেলেরা তো আনন্দে নাচতে লাগল। কি দারুন মজা। প্রতি রাতে দশ টাকা করে হলে মাসে তিনশো টাকা বসে থেকে রোজগার। একি ভাবা যায়? যাদের দিনের পালা তাদের মাসে দেড়শো টাকা। এ যেন স্বপ্নেরও অতীত। এ বুদ্ধি নকুড়মামা ছাড়া আর কেই বা দেবে?

নকুড়মামা বললেন— আমার কিন্তু আরো একটি প্রস্তাব আছে। সেটি হ'ল ফালতু ঝঞ্ঝাট যাতে না হয় সে জন্য বাড়ির মেয়েরা গয়না-গাঁটি পরে রাস্তায় বেরোবেন না। বেশি সোনা-দানা বা টাকা-পয়সা বাড়িতে রাখবেন না। এতে নিজের বিপদ ডেকে এনে পাড়ার শান্তি নষ্ট না করাই বাঞ্ছনীয়। কেননা যে বাড়িতেই একটু চুরি-ডাকাতি হয় সেই

বাড়ি থেকেই শোনা যায় দশ-বিশ ভরি সোনার গয়না গেছে। ত্রিশ হাজার টাকা গেছে। ঐসব যেন এই পাড়াতে না হয়।

একজন ভদ্রলোক বললেন— এটা কেমন ধারা কথা হ'ল। ধরুন আমার মেয়ের বিয়ে। আমার মোটা টাকার দরকার। আমি তুলে বাড়িতে আনব না?

নকুড়মামা বললেন— নিশ্চয়ই আনবেন। সেইজন্যেই তো আমাদের বেতনভূক এইসব ছেলেদের দরকার। যার বাড়ি যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানই হোক না কেন তিনি সর্বাগ্রে প্রতিরোধ বাহিনীকে জানাবেন। টাকা তুলতে যাওয়ার সময় থেকে শুভ কাজ না মেটা পর্যন্ত এইসব ছেলেরা দলবদ্ধভাবে তার বাড়ি ঘিরে থাকবে। এতে সুবিধে এই আচমকা কোন গুণ্ডা মস্তান কাজের বাড়িতে হানা দিতে পারবে না। বা এত জনের খাবার অমুকের হাত দিয়ে অমুক জায়গায় পাঠিয়ে দিন এরকম জুলুমও কেউ করতে পারবে না।

ছেলেরা বলল— ঠিক বলেছেন মামা। এই রকম প্রতিরোধ বাহিনীই আমাদের এখানে চাই। তবে মামা টাকা যখন নিচ্ছি তখন বেইমানি করব না। জীবন দিয়ে দেবো পাড়ার শান্তি রক্ষার জন্যে।

নকুড়মামা বললেন— কিচ্ছু করতে হবে না। এইরকম ব্যাপার আরম্ভ হলে যমেও ঢুকতে সাহস করবে না পাড়ায়। ছেলেরা বলল— তাহলে কবে থেকে চাঁদা ওঠাবো আমরা?

— মাসটা কাবার হোক। সবাই মাইনে পাক। তারপর। তবে একটা কথা। বাড়ি বাড়ি চাঁদা কেউ চাইতে যাবে না। চাঁদার টাকা সবাই এসে আমার বাড়িতে দিয়ে যাবে। পয়লা তারিখ রাত্রি থেকে রাত জাগা সুরু হবে। ঐ দিনেব মধ্যে সবাই এসে চাঁদা দিয়ে যাবে আমাব কাছে। যাদের অসুবিধে থাকবে তারা পরের দিন দেবে। এর মধ্যে আমি ভাবছি দু'এক দিনের জন্য একটু দেওঘর থেকে ঘুরে আসব। দোলন বলল— কবে যাবে মামা?

— ভাবছি কালই যাবো।

খুব ভালো কথা। সবাই আনন্দে অস্থির। পাড়ার বেকার ছেলেদের মুখে হাসি ফুটল। গৃহস্থরাও একটু নিশ্চিন্ত। যাক পনেরোটা কবে টাকা। যা দিন কাল পড়েছে। আব বেকার ছেলেগুলোর হাতেও দু'চার পয়সা পড়লে ওরাও বিপথগামী হবে না।

যাই হোক।.প্রতিবোধ বাহিনীর ব্যবস্থা পাকা করে পরদিন সকালে কাঁধে একটি ঝোলা ব্যাগ নিয়ে নকুড়মামা দেওঘর চলে গেলেন।

ছেলেরা বলল— একেবারে বাড়ি খালি রেখে যাচ্ছ মামা. যদি চোর এসে তালা ভাঙে? তার চেয়ে আমরা কেউ শোবো?

— কোন দরকার নেই। দু'চার দিনের জন্যে তো যাচ্ছি। তা ছাড়া আমার বাড়ির তালা কেউ ভাঙবে না। এই বলে নকুড়মামা চলে গেলেন।

নকুড়মামা গেলেন সকালে। রাত্রিবেলা চোর এলো।

রাত তখন বারোটা। সন্ধানী চোর চুপি চুপি এসে হাজির হ'ল নকুড়মামার বাড়ির সামনে। পাকা চোরের হাতে তালা খুলতে খুব একটা দেরী হ'ল না। তালা খুলে দালানে ঢুকে চোর দরজাটা বন্ধ করল আগে। তারপর দরজায় খিল দিয়ে অন্ধকারে টর্চ ফেলে একটু একটু করে এগোতে লাগল ঘরের দিকে।

ঘরে ঢোকার আগে প্রথমেই মেঝেতে একটা খাম কুড়িয়ে পেল চোর। তাইতে একটা চিঠিতে লেখা ছিল। 'মাননীয় চোর মহাশয় এটা নকুড়মামার বাড়ি। বুঝে শুনে এ বাড়ির জিনিসপত্তরে হাত দেবেন।' চোর সেটা পড়ে 'হুঁঃ' বলে ছুঁড়ে ফেলে দিল মাটিতে। তারপর ঘরের দরজায় শিকল খুলে ভেতরে ঢুকল। দেখল টেবিলের ওপর একটা ডিসে চারটে বড় সন্দেশ আর দুটো রাজভোগ ঢাকা দেওয়া আছে। এক গেলাস জলও রাখা আছে পাশে।

সেখানেও একটা চিঠি পড়ে আছে। তাতে লেখা আছে 'আপনি কিন্তু আবার ভুল করলেন। এটা নকুড়মামার বাড়ি। যাক কষ্ট করে যখন এসেছেন তখন একটু মিষ্টিমুখ করে যান। ঘরের জিনিসপত্তরে কিন্তু হাত দেবেন না।' চোর সেটাও পড়ল। পড়ে খ্যাল খ্যাল করে হাসল। তারপর বলল— বাবা নকুড়, তুমি বড্ড চালাক। অন্যের বাড়ি আমি হেঁসেল মেরেছি। টুকটাক পযসাকড়ি সরিয়েছি। তবে তোমার মাথায় আমি ভালো রকম টুপি পরাবো। বলে সর্বাগ্রে খাবারগুলো খেয়ে নিল। তারপর মনের আনন্দে অন্ধকারে একটু নেচে নিল। তাবপর যেই না আলমারীব দিকে এগোতে যাবে অমনি কে যেন পিছন দিক থেকে ধপাং করে ঝাঁপিযে পড়ল তাব ঘাড়ের ওপর। চোর তো কি করবে কিছু ঠিক কবতে না পেরে হাউ মাউ করে চেঁচিয়ে উঠল প্রথমে। আবার ভূত মনে করে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। ভয পাবে নাই বা কেন? যে বাড়ি বাইরে থেকে তালা বন্ধ এবং যে বাড়িব দবজায় ভেতর থেকে সে নিজে হাতে খিল দিযে এসেছে সেই বাড়িতে কে এসে তার ঘাড়ে পড়ে? ঘাড়ে পড়া বলে ঘাড়ে পড়া? ঘাড়ে পড়ে একেবাবে পিছন থেকে জাপটে ধরে আছে তাকে। চোর অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই তাব কাছ থেকে ছাড়াতে পারল না নিজেকে। শেষকালে বলল—যা করেছি খুব ভুল করেছি। আমাকে এবারের মতো ছেড়ে দিন। আর কখনো এই বাড়িতে আমি ঢুকব না।

উত্তব এলো— আমি যাকে ধরি তাকে সহজে ছাড়ি না।

— কিন্তু এইভাবে টিপে ধরলে আমি যে মরে যাব।

— তোমাব মুখাগ্নিটা তাহলে আমিই করব। আপত্তি নেই তো?

চোব বলল— আপনি কে?

— আমি তোমার শ্বশুর। তুমি আমার জামাই। আমার বাড়িতে এসেছ একটু আদর খাও। বলেই এক লাথি।

লাথি খেযেই লাফিয়ে উঠল চোব— তাবপব কেঁউ কেঁউ করে বলল— আপনি নিশ্চয়ই নকুড়মামা। কেন না এই পায়ের লাথি অনেকদিন আগে একবার আমি খেযেছিলাম। ঠিক ঐ জায়গাতেই।

— সে তো এতদিনে হজম হযে যাবার কথা। এখনো মনে আছে তোমাব?

— হ্যাঁ। ও জিনিস ভোলবার নয়। আপনি দেওঘর গেছেন শুনেই আমি ভুল করে এখানে এসেছিলাম। আমাকে এবারের মতো ছেড়ে দিন, আমি আব কক্ষনো এখানে আসব না।

— আমি দেওঘরে যাবার টোপ ফেললাম বলেই তো এত সহজে তোমাকে ধরতে পারলাম বাবা। না হলে কোনদিন নাগাল পেতাম তোমার? তবে দেওঘরের প্যাঁড়া তো তোমাকে খাওয়াতে পারব না, তার বদলে যা খাওয়াবো তা তোমার সারা জীবন মনে থাকবে। বলেই দমাদ্দুম কিল-চড় আব ঘুসি বৃষ্টির ফোঁটার মতো নামিয়ে দিলেন চোরের সর্বাঙ্গে। তারপর দেওয়ালের স্যুইচ টিপে ঘবের আলো জ্বাললেন নকুড়মামা।

এঁড়েদার বেঁড়েদা একটা কালো চোঙা প্যাণ্ট আর একটা বাটিক প্রিণ্টের হাওয়াই শার্ট পরে ঠক ঠক করে কাঁপছিল।

নকুড়মামা ওর কান ধবে গালে একটা থাপ্পড় মেরে বললেন— রাসকেল! তোমাব এত সাহস যে তুমি আমার বাড়ির তালা ভাঙো। সেই যে মাবধোব খেয়ে গেলে তুমি পাড়া থেকে তারপর থেকে আর তোমাব পাত্তা নেই। মাঝে মধ্যে আনাচে কানাচে তোমাকে ঘোরা-ঘুরি করতে দেখা গেছে শুনেছি তবে চাক্ষুস দেখবার সৌভাগ্য হয়নি। আজ তোমার একদিন কি আমার একদিন।

এইসব কথা যখন হচ্ছে তখন বাইরের দরজায় ঘন ঘন কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল।

নকুড়মামা গিয়ে দরজা খুলতেই হুলো হাবলির দল হৈ-হৈ করে ভেতরে ঢুকে দুজনকে দেখেই চমকে উঠল। বলল— কি ব্যাপার মামা। তুমি যে সকালে ঝোলা কাঁধে দেওঘর যাচ্ছি বলে চলে গেলে তা এর মধ্যেই ফিরলে কি করে? ফিরলেই বা কখন? সারাদিন তো দেখলুম বাড়িতে তালা দেওয়া। আমরা খেজুর বাগানে বসে আড্ডা দিতে দিতে তোমার ঘরে আলো জ্বলতে দেখে ছুটে এসেছি।

নকুড়মামা বললেন— মা ভাগাড়ে কালীর ইচ্ছেয় ভাগ্যিস দেওঘব যাইনি। তাহলে কি এই মালকে এত সহজে ধরতে পারতাম।

— তা হয়তো পারতে না। কিন্তু কি ব্যাপাব বলোতো?

— ব্যাপার কিছুই নয়। দেওঘর যাওয়াটা আমার টোপ। কেননা সন্ধানী চোরকে টোপ ফেলেই ধরতে হয়। তাই দেওঘর যাবাব নাম করে বাড়ির ভেতরের সব দরজায শিকল দিয়ে শুধুমাত্র বাইরের দরজায় তালা মেরে চলে যাই। তারপব সারাদিন গা ঢাকা দিয়ে থেকে সন্ধ্যের পব চুপি চুপি পিছন দিক দিয়ে ছাদে উঠে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামি। নিচে নেমে দালানের দরজার মাথায় বাক্সেব ওপব বসে থাকি চুপচাপ, চোর বাবাজীকে ধরব বলে। আমি জানতাম উনি আজই আসবেন। তা ভাগ্যিস ঐ বুদ্ধিটা খাটিয়েছিলাম। তাই তো হাতে নাতে ধবতে পারলাম ব্যাটাকে। যা, বাইবে নিয়ে গিয়ে বেশটি করে উত্তম-মধ্যম ঘা কতক দিয়ে থানায় হ্যাণ্ড ওভার করে দিগে যা। কিছুদিন জেলেব ঘানি টানুক্ তারপব যদি শিক্ষা হয়।

থানাব নাম শুনেই তো সেই আগেব মতোই এঁড়ে বাছুবের মতো ঠ্যাং ছুড়ে লাফানি আর পরিত্রাহি চিৎকার শুরু কবে দিল বেঁড়েদা।

-- ওগো বাবা গো। তোমবা আমাকে ফলিডল খাইয়ে মেবে ফেলো। থানায দিও না।

হুলো হাবলি কেলো কাবলি সবাই তখন ধবে চাঁটাতে শুরু করেছে বেঁড়েদাকে। এমন সময় দোলন আর কমলাও এলো।

দোলন বলল— ব্যাপার কি মামা?

হুলো বলল— ব্যাপার! এই দেখ না ব্যাপাব। মামা কেমন ফাঁদ পেতে ব্যাটাকে ধরেছে।

দোলন বলল— এ ব্যাটা সেই মাল না? এ্যাদ্দিন কোথায ছিল রে? আবার এসে জুটেছে এখানে?

— শুধু জুটেছে নয়। তালা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে চুরি করতে যাচ্ছিল। বলাব সঙ্গে সঙ্গেই দোলন বেঁড়েদার ঘাড়ে মাবল এক রদ্দা। বেঁড়েদা ছিটকে পড়ল নকুড়মামাব পায়ের ওপর। তাবপর পা-দুটোকে জড়িয়ে ধরে বলল— আমি আপনাব পায়ে নাকখৎ দিচ্ছি। আর কখনো এ পাড়ায় আমি ঢুকব না।

নকুড়মামা বললেন— তা না হয় না ঢুকলে, কিন্তু এত সাহস কোত্থেকে হ'ল তোমার লোকের বাড়ি তালা ভাঙো?

বেঁড়েদা বলল— তা হয়তো ভাঙি। কিন্তু আমাব প্রয়োজনের বেশি তো চুরি করি না।

— কিন্তু তুমি খবর পাও কি করে যে এ পাড়ায় কে কবে কোথায যাচ্ছে না যাচ্ছে?

— চোর গোপালের মুখে।

— চোর গোপাল? মানে অষ্টা ঝির ব্যাটা?

— হ্যাঁ। আমাদের ওখানে একটা কারখানায় কাজে লেগেছে। ওর মুখেই এ পাড়ার খবরাখবর পাই।

— অষ্টা ঝি প্রাণকেষ্টবাবুর বাড়িতে কাজ করে না?

— আজ্ঞে হ্যাঁ।

— তা চোর গোপালও কি তোমার দলের নাকি?

— না না। ও এসবের কিছু জানে না।

গুলো বলল— তা না হয় না জানল। কিন্তু চোরাই মালগুলো পাচার করা হয় কোথায়?

বেঁড়েদা লাফিয়ে উঠল— ও বললে হবে না হে। ওসব মাল টালের ঝামেলায় আমি নেই। ওসব পেশাদার চোরের কাজ। আমি খুচখাচ নিই। পকেট হাতড়ে যা দুচার টাকা পাই।

দোলন সঙ্গে সঙ্গে ওর হাতটাকে মুচড়ে ভেঙ্গে দিতে যাচ্ছিল।

নকুড়মামা বাধা দিলেন— থাক থাক। ওর ব্যবস্থা আমিই করছি। আর মারধোরে কাজ নেই। এর মাথায় যে বেশ রীতি মতো ছিট আছে তা বোঝাই যাচ্ছে। যে কোন উপায়েই হোক একে শোধরাতে হবে। আসলে এটা একটা গবেট। তাই এমন জায়গায় এমন কাজ করে যে নিজের ফাঁদে নিজেই পড়ে যায়।

বেঁড়েদা তার ঘোড়া-মুখ হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল।

নকুড়মামা বললেন — দাঁড়িয়ে থাকলে হবে না। কান ধরে একশো বার ওঠ্ বোস করলে তবে ছাড়ব।

বেঁড়েদা তাই করতে লাগল।

এক দুই করে পঞ্চাশবার করার পর নকুড়মামা বললেন— থাক আর করতে হবে না। এবারের মতো ছেড়ে দিলাম। আর কখনো এ কাজ করতে যেন না দেখি।

বেঁড়েদা বলল না আর করব না।

দোলন বলল— এত সহজে ওকে ছেড়ো না মামা, ওর এত সাহস যে ও তোমার দরজার তালা ভাঙে! আমি এখনো বলছি ওকে পুলিশে দাও।

নকুড়মামা বললেন— তাতে লাভ কি! এই তো মাসখানেক হল জেল থেকে বেরিয়েছে ও।

সবাই চমকে উঠল— জেল থেকে! চমকে উঠল বেঁড়েদাও।

নকুড়মামা বললেন— হ্যাঁ! বাসে সাদা পোষাকের এক পুলিশের পকেট মারতে গিয়ে মারও খেয়েছে। জেলও খেটেছে।

বেঁড়েদা লাফিয়ে উঠল— না না। একথা ঠিক নয়। আমি কারো পকেট মারতে যাই নি। কণ্ডাক্টার ভাড়া চাইছিল তাই তাকে পয়সা দেবো বলে নিজের পকেটে হাত ঢোকাতে গিয়ে পুলিশের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ফেলেছি।

দোলন বলল — আবার গুল মারছ! তুমি কবরে বাসের টিকিট! চালাকীর জায়গা পাওনি?

নকুড়মামা বললেন— তা জেল খেটে বেরোবার পরও তো দেখছি শিক্ষা হয়নি তোমার। এদিকে তো পুলিশের নাম শুনলেই তিড়িং বিড়িং করে লাফাও। কিন্তু এই তালা ভাঙা বিদ্যেটা শিখলে কোত্থেকে?

— ঐ চোর গোপালের কাছ থেকেই শিখেছি। ও আমি দুজনেই তো এক সঙ্গে জেলে ছিলুম।

— অ। ঐখানে বসে তালিম পেয়ে এইখানে এসেছ হাত পাকাতে?

বেঁড়েদা বলল— বললুম তো। আজই শেষ।

নকুড়মামা বললেন— তোমার কথা তো। পিসির হাতে অমন ঝাঁটা পেটা খেয়েও যখন তোমার চেতনা হয়নি তখন মারলেও তোমার স্বভাব শোধরাবে না।

বেঁড়েদা বলল— পিসিমা তো মারা গেছে।

— তাই নাকি! কতদিন?

— তা প্রায় মাস ছয়েক হ'ল।

নকুড়মামা আক্ষেপ করে বললেন— ও। সেইজন্যে তুমি এইসব ধান্দাবাজি শুরু করে দিয়েছ! বেশ করেছ। তা বলি বাবা, একটা কথা। তুমি ভূত বিশ্বাস করো?

বেঁড়েদা ঘাড় চুলকে বলল— ধ্যুৎ। ভূত আবার আছে নাকি!

নকুড়মামা বললেন— আছে। আছে। তোমাদের এঁড়েদাতেই আছে।

— এঁড়েদায়!

— হ্যাঁ। যে বাড়িতে তোমার পিসিমা থাকত সেই বাড়িতেই আছে। কেননা আজ সকালে আমি যখন দেওঘর যাবার নাম করে পাড়ার বাইরে গা ঢাকা দিতে যাচ্ছিলাম তখন হঠাৎ প্রাণকেষ্টবাবুর সঙ্গে দেখা। তাঁর মুখেই তোমার গুণাগুণ শুনে তোমার সঙ্গে দেখা করার খুব ইচ্ছে হ'ল আমার। তাই অন্য কোথাও না গিয়ে সোজা চলে গেলাম তোমার পিসিমার বাড়ি। ঠিকানা অবশ্য প্রাণকেষ্টবাবুই দিয়েছিলেন। তা তোমার পিসিমা তো খুব আদর যত্ন করলেন চা খাওয়ালেন। তাঁর মুখেও তোমার জেল খাটার কথা বা জীবনের অন্যান্য উন্নতির কথা, মানে চুরি চামারির মতো মহৎ কাজগুলোর কথা আর কি শুনলাম। তুমি যে আজকাল বাড়িতেও সব দিন যাও না তাও শুনলাম। কিন্তু তখন তো জানতাম না যে তোমার পিসিমা মৃত। তাহলে —।

বেঁড়েদা তখন হঠাৎ ছুটে ঘর থেকে পালাতে গেল।

যেই না পালাতে যাবে হুলো অমনি খপ করে টিপে ধরল ওর জামার কলারটাকে। নকুড়মামা বললেন— পালিয়ে যাবে কোথায় চাঁদু। তোমাকে পুলিশের হাতে তুলে না দিলেও জামাই-আদর করতে কিন্তু ছাড়ছি না। বলেই হুলোদের বললেন— এই তোরা আর দেরি করিস না। এর মাথার চুলগুলো খাবলা করে কেটে এক্ষুনি একে নিয়ে শোভাযাত্রা বার কর।

দোলন বলল— এই এত রাতে! রাত তো এখন একটা।

— হ্যাঁ হ্যাঁ। এই রাত্রেই। নিশিকুটুম্বর আদর রাত্রে হওয়াই ভালো। দোলন তো মনের আনন্দে লাফাতে লাফাতে কোথা থেকে একটা খোল করতাল জোগাড় করে নিয়ে এলো।

এদিকে হুলো আর হাবলি বসল কাঁচি দিয়ে বেড়েদার চুল কাটতে। তারপর ঘুঁটের মালা পরিয়ে গাধার টুপি মাথায় দিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে খোল করতাল বাজিয়ে সেই রাত দুপুরে মশাল জ্বেলে পাড়ার লোকের ঘুম ভাঙ্গিয়ে বেঁড়েদাকে নিয়ে বের হ'ল এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। সে এক দেখবার মতো দৃশ্য।

পাড়ার লোকেরা সব শুনে বলল— হ্যাঁ। এতদিনে একটা কাজের কাজ হয়েছে বটে। প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে ওঠার আগেই নকুড়মামা যে এইভাবে বুদ্ধির জোরে চোরকে হাতেনাতে ধরে ফেলবেন তা কেউ ভাবতেও পারেনি।

সবার মুখেই নকুড়মামার জয় জয়কার পড়ে গেল।

অশ্বমেধের ঘোড়া

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

'শুনছ? সানাই।'

রেখা থমকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। ঠিক সেই মুহূর্তে আলোটা ওর মাথার চুলে ভেঙে পড়ে চিবুক আর গলার পাশে একটা হালকা ছায়া সৃষ্টি করল। কাঞ্চন সানাইয়ের সুর বিস্মৃত হয়ে আশ্চর্য চোখে রেখার সেই ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ রেখাকে অপরিচিতা মনে হল। স্বপ্নের অস্পষ্ট স্মৃতির মতো।

'কি সুর?'

কাঞ্চন চমকে বলল, 'দাঁড়াও'। তারপর ভুরু কুঁচকে অন্যমনস্কের মতো খানিক শুনে উত্তর দিল, 'চন্দ্রকোষ'। হাসল, 'আকাশ ভেঙে বৃষ্টি আসলে কি হয়. আজ শুক্লপক্ষ তো বটে'।

রেখা চোখ নামিয়ে নিয়েছে। আলোটা মাথার চুল ছাপিয়ে সমস্ত মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। কাঞ্চনের একটা আশ্চর্য উপমা মনে এল। ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'নাহ্। বেশ একটু মোগলাই মেজাজ হচ্ছে।'

রেখা চকিতে হাতের ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মোর কম্ফর্টেবল্ জার্নি'?

'ধুৎ!' কাঞ্চন ঠোঁট বেঁকিয়ে উত্তর দিল, 'ও তোমাদের কেরানী ইন্টেলেকচুয়ালদের মানায়। উঠে বসতে না বসতেই পৌঁছে যাওযা। তার ওপর বেবী ট্যাকসিগুলো তো নেহাৎই ভালগার। যেন বালিগঞ্জে বান্ধবীব বিয়েব চায়েব নেমন্তন্ন। বড় ট্যাক্সিতে তা-ও বনেদী বাড়ির পাত পেতে বাসার আভিজাত্য আছে। তোমাদের এই কলকাতা দিন দিন আধুনিক হচ্ছে, বর্বব হচ্ছে. সূক্ষ্মতার নামে দরকচা মেবে যাচ্ছে।'

রেখা ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে বলল, 'এত বাণী দিও না মাস্টারমশাই। লোকে ধবে বেঁধে মন্ত্রী বানিয়ে দেবে।'

কাঞ্চন হা-হা করে হেসে উঠল। আশে-পাশেব লোক চমকে বিরক্ত চোখে তাকাল। লজ্জায় দুজনেই মাথা হেঁট করেছে। একটি প্রৌঢ় পসারী 'ফুল চাই' বলে তখনই সামনে এসে দাঁড়াল। কাঞ্চন কখনও পযসা দিযে ফুল কেনে নি। একবার চকিতে রেখাব সিঁথির দিকে তাকাল। তার বড় ইচ্ছে হতে লাগল এক ছড়া মালা কিনে বিনুনিতে জড়িয়ে দেয়। কিন্তু রাস্তায় ফুল কিনতে যথারীতি লজ্জা করল। বলল, 'না।'

রেখা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগ থেকে পয়সা বের করে দিয়েছে। কাঞ্চন রেখার সাহস দেখে স্তম্ভিত। রেখা কি আজ. রেখা কি, প্রকাশ্যে মালা কিনতে ওর ভয় করল না? ফুলের মালা হাতে একটি মেয়ের সঙ্গে সে এখন বাসে উঠবে!

'চলো, হাঁটি।'

'চলো।'

হাঁটার শেষ নেই। এক পথে পা ফেলা। রাস্তাটা চোখের সামনে পালটাতে দেখি। কলকাতা রোজ পালটায়। আমরা শুধু রাস্তাটুকুর খবর রাখি। হাঁটতে হাঁটতে বড়জোর ময়দান অব্দি যাব। বড়জোর চা খাব এক পেয়ালা। আলো আর অন্ধকারের সমারোহ দেখব। তারপর বাস ধরব। রেখার পাশে খালি জায়গা থাকলেও আমাকে আলাদা বসতে হবে, বা দাঁড়াতে। ভিড় ঠেলে নেমে যাবার সময় রেখা হাতে একটা টিকিট গুঁজে দিয়ে যাবে। সুযোগ পেলে কিছু একটা বলবে। নয়তো অপরিচিতার মতো রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হবে। কণ্ডাক্টর কি কোনো কৌতূহলী যাত্রী অকারণে একবার আমার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাবে। তারপর আমি নামব। তারপর বাড়ি যাব। তারপর রাত্রি। তারপর দিন। আর দিনে দিনে হাঁটতে হাঁটতে দেখব রাস্তাটা পালটাচ্ছে। কলকাতা কত তাড়াতাড়ি পালটায়।

ইস্, দেখেছ?' .

কাঞ্চন যদিও জানত, তবু সেনেট হলের সিঁড়ি আর ছাদের দিকে তাকিয়ে নতুন করে চমকে না উঠে পারল না। কাঞ্চন সত্যিই আত্মীয় বিয়োগের বেদনা অনুভব করল। সিঁড়ি নেই, খিলান নেই, দরজা নেই। অন্ধকারে কতগুলো পায়রা উড়ছে। ছাদ জুড়ে আকাশ। শুধু পেছনের দেয়ালটা এখনও ভাঙে নি। বাঙাদি-কে আত্মহত্যা করতে দেখেছিলুম। সমস্ত শরীরটা পুড়ে গেলেও মাথার খোঁপা ঠিক ছিল।

কাঞ্চন ফুটপাতে পা ঠুকে মন থেকে স্মৃতিটা তাড়াল। তারপর গলা ঝেড়ে বলল, 'জানো, বাংলাদেশে নাইনটিন্থ সেঞ্চুরির মৃত্যু অনেক দিন হয়েছিল। এবার তার কবরটাও ভেঙে গেল।'

রেখা হঠাৎ অদ্ভুত প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, সেই পাগলটা এবার কোথায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করবে?'

কাঞ্চন চমকে রেখার দিকে তাকাল। সত্যি, পাগলটা এখন, সত্যি, সেনেটে, দাঁড়াও পথিকবর, বন্দী আমার প্রাণেশ্বর, মরি হায় হায় রে।

গমগম করে যেন অজস্র গলা একসঙ্গে হাজার কথা বলে উঠল। কাঞ্চন প্রশ্ন করল, 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

রেখা হাসল, 'তোমায় চান্স দিচ্ছি।'

হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'কিসের'?

'মালাটা খোঁপায় বেঁধে দেওয়ার।'

রেখা কি মরিয়া? আজকের দিনটাই কি ওকে, আজকের দিনটা, আহ্ দিনটা। দিন গেল, রাত্রি। রাত্রি যায় না। যায় না। কাঞ্চন স্পষ্ট শুনল সানাই বাজছে। চন্দ্রকোষ। সেই আমরা রেস্তোরাঁয়— সুকুমার দুটো মালা— আর প্রফুল্ল সকলকে হতবাক করে এক প্যাকেট সিঁদুর, দুটো লোহার নোয়া— আর সেই মুহূর্তে প্রথম রেখাকে অপরিচিত মনে হয়েছিল। আশ্চর্য লোভে, ভয়ে সিঁদুরের প্যাকেটের দিকে তাকিয়েছিল। অথচ শপথ উচ্চারণের সময়ও তাকে এতটুকু বিচলিত দেখি নি। সকলের তাড়া খেয়ে আমি রেখার ঠাণ্ডা কপালে— মুখের দিকে তাকাতে সাহস— কোন্ আঙুল দিয়ে সিঁদুর লাগাতে হয়— প্রফুল্ল বকেছিল আর রেখা হঠাৎ খিলখিল করে হেসে ফেলেছিল। রেখাকে আমার সেই মুহূর্তে বউ বউ মনে হচ্ছিল। কিন্তু মালাবদল কিছুতেই করতে পারি নি। রেখাও কিছুতে মাথায় ঘোমটা— আমরা অনেকক্ষণ আড্ডা দিয়েছিলাম। মাসের শেষ হলেও প্রত্যেকে কিছু কিছু টাকা এনেছিল। তারপর সন্ধে হল। সুকুমারের টিউশনি আছে, প্রফুল্ল বা চন্দন পালাতে চায়। রেখা রোমাল দিয়ে ঘষে ঘষে কপালের সিঁদুর মুছে ফেলল। রেখার এই মুখটাই আমার পরিচিত। কিন্তু অবাক হয়ে লক্ষ্য করলুম মাত্র কিছুক্ষণে রেখার কপালের সিঁদুর আমার মনে একটা স্থায়ী স্মৃতি রেখেছে। রেখাকে হঠাৎ বিধবার মতো শূন্য, করুণ মনে হল। দেখলাম বাচাল প্রফুল্লও

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। রেখার কপালের ঠিক মাঝখানে একটা নীল শিরা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

'দ্যাখো, সেই পেয়ারটা।' কাঞ্চন অন্যমনস্কের মতো তাকিয়ে যুগলটিকে দেখল। কিন্তু তার চোখের সামনে স্পষ্ট করে ভেসে উঠল সুকুমার, প্রফুল্ল আর চন্দন। ওরা প্রায় পালিয়ে গেল। মালা দুটো আমার হাতে ছিল। ফুল নিয়ে আমি হাঁটতে পারি না। রেখার কপাল শূন্য। চাইলেও রেখা মালা হাতে বাড়ি ফিরতে পারবে না। আমার পকেটে বিয়ের দলিল। রেখার হাতটা ছুঁতে ইচ্ছে করছে। রেখাকে একবার বউ বলে ডাকতে — আহ্, কি আশ্চর্য ইচ্ছে। আমরা পাশাপাশি হাঁটছি অথচ নীরবতা। বিয়ের পর একান্তে প্রথম কথা কি হবে, কি হতে পারে? আমি অস্ফুটে বলেছিলাম গঙ্গায় বসলে হয়। রেখা অস্ফুটে বলেছিল, হুঁ। তারপর আমরা চৌরঙ্গীর বাস ধরেছিলাম আর উঠেই দেখেছিলাম রেখার বাবা। তারপর আমি দোতলায় গিয়ে বসলাম। রেখা একতলায়। তারপর অন্যমনস্কের মতো কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাসের যাত্রীদের লক্ষ্য করলাম আর বাসের বিজ্ঞাপন। জনৈক বিজ্ঞাপন দেখে যথার্থ মুগ্ধ হয়েছিলাম। সুন্দর করে লেখা ছিল "ডোন্ট স্মোক্ ইন দি বাস, নট ইভন নাম্বার টেন।" তারপর জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে চৌরঙ্গী দেখতে খুব ভালো লেগেছিল। হঠাৎ কুয়াশা, মেঘ ও স্তিমিত আলোকমালা শোভিত তীরভূমি আর অন্ধকার, আর মাস্তুলের কথা মনে পড়ায় আমার খুব হাসি পেয়েছিল! অকস্মাৎ লক্ষ্য করেছিলাম আকাশে পূর্ণিমার চাদ। তারপর রেখা নেমে গেল। একটিবার ব্যাকুল গ্রীবা তুলে হয়তো সে আমাকে খুঁজেছিল। রেখার জন্য সেই মুহূর্তে আমার খুব মমতা হয়েছিল। হয়তো আমি একটু বেশি উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ পৌঁছে গেছি লক্ষ্য করে হুড়মুড় করে নামছিলাম। দরজার কাছে কণ্ডাক্টর বলল, টিকিট? অভ্যাসে বললাম, হয়ে গেছে। কণ্ডাক্টর বলল, দেখি? মুখ লাল করে পয়সা দিয়ে নেমে শুনলাম কণ্ডাক্টর বলছে, হাতে আবার মালা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে! রাস্তায় অসহায় দাঁড়িয়ে আমার কান্না পেয়েছিল। দু-পা হেঁটে মালাজোড়া ছুঁড়ে ফেলে দিয়েই লক্ষ্য করেছিলাম একটা স্থবির বলদ সেটি চিবুচ্ছে। কি এক ভয়ে দ্রুত হাঁটতে লাগলাম। কি একটা ভয় আমাকে তাড়া করল। রেজিস্ট্রারের চেম্বারটা মনে পড়ল — ছোট, ঠাসা। রেস্তোরার কেবিনটা মনে পড়ল— ছোট, ঠাসা। বাসের সিঁড়িটা মনে পড়ল— ছোট, ঠাসা। শোবার ঘরটা মনে পড়ল — ছোট, ঠাসা। আমার দম বন্ধ হয়ে এল। স্পষ্ট দেখলাম রেখার কপালে নীল শিরা। মনে হল আমি চিৎকার করে কেঁদে উঠেছি। চমকে দু-হাতে মুখ চেপে ধরে বুঝলাম, চন্দ্রকোষ। পায়ে পায়ে পানের দোকানটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। পরদিন রেখার সঙ্গে দেখা হতে বলেছিলাম, জানো, আমাদের বিয়েয় স্বয়ং বিসমিল্লা সানাই বাজিয়েছে।

'এই কাঞ্চনবাবু?'

কাঞ্চন চমকে তাকিয়ে দেখল সুবিমল। বেহায়ার মতো একবার রেখার দিকে তাকিয়ে সুবিমল বলল, 'তারপর, কি খবর?'

কাঞ্চন কোনো রকমে হেসে বলল, 'বিকেল পাঁচটার পর থেকে এ পর্যন্ত নতুন কিছু ঘটে নি।'

'না, তাই বলছি। একটা সিগারেট হবে?'

রেখা একটু সরে দাঁড়াল। কাঞ্চন পকেট থেকে চারমিনার বের করে সুবিমলকে দিল, নিজে ধরাল। সুবিমল রেখার দিকে আর একবার তাকিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'আপনার বোন?'

'না।'

'ছাত্রী?'

'না।'

'ও, বুঝেছি।' সুবিমল মুখটা উজ্জ্বল করে বলল, 'দেখেও আনন্দ। আপনাদেব আর কি ভাবনা মশাই। জীবন সামনে পড়ে আছে। এই-আমি কলেজ সেরে, টিউশনি সেরে, এখন বাড়ি ফিরে শুনব মা-র সঙ্গে ঝগড়া করে বৌদি রান্না চাপায় নি, ইত্যাদি। আচ্ছা, চলি। যা বিষ্টি আসছে।' দু-পা এগিয়ে সুবিমল আবার থমকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'খবর শুনেছেন? ইউ, জি. সি.-র টাকাটা নাকি আরও পেছিয়ে গেল। প্রিন্সিপালও হয়েছে তেমনি।'

'লোকটি কে মাস্টারমশাই?'

'আমাদের কলেজের, ম্যাথামেটিক্স্।'

'কি বলল?'

'এই, তুমি আবার কে হও, ইত্যাদি।' শেষ শব্দটা উচ্চারণ করেই কাঞ্চন সচেতন হল যে সুবিমল তার আগাগোড়া মধ্যবিত্ত সংলাপেব মধ্যে এই একটি শব্দ প্রয়োগে আভিজাত্যের পরিচয় দিয়ে গেছে।

'জানো, সেদিন আমাদের নমিতা, নমিতাকে মনে নেই তোমার— সেই যে ইস্‌লামিক হিস্ট্রির...।'

'হুঁ, দেখা হয়েছিল?'

'হ্যাঁ তো। কথায় কথায় তোমার খবর জিজ্ঞেস করল। বলল, কবে বিয়ে করছিস?'

'কি বললে?'

'বললুম, এই ভালো, বিয়ে করলেই তো সব ফুরিয়ে যায়। তার ওপর ছেলেপিলের ঝঞ্ঝাট, শাশুড়ী-ননদের ঝামেলা।'

তারপর দুজনেই স্তব্ধ হয়ে খানিক পথ হাঁটল। রাস্তায় ব্যস্ততা বাড়ছিল, কাবণ বৃষ্টি আসছে। অথচ পরিপার্শ্ব সম্পর্কে ওরা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল।

'রেখা?'

'উ?'

'রেখা?'

'কি?'

'রেখা?'

এবার জবাব না দিয়ে রেখা হাসিমুখে কাঞ্চনেব দিকে তাকাল। কাঞ্চন বলল, 'জানো? ছেলেবেলায় মাকে এমনি অকারণে ডেকে জ্বালাতাম।'

রেখার হাসিমুখ মুহূর্তে শুকিয়ে গেল। মা র নামে ওর বাড়িব কথা মনে পড়েছে। আমারও পড়ে। রেখা সম্পর্কে মা-র একটা চাপা স্নেহ লক্ষ্য করেছি। অনেক আগে বেখাদেব বাড়ি গিয়েছিলাম, মাত্র একবার। রেখার মা ব চেহাবা মনেই পড়ে না। বাবাকেও না। রেখার ভাই বোনেরা এই চার-পাঁচ বছরে নিশ্চযই কত বদলে গেছে।

'আচ্ছা, আমি যদি চিৎকার করে লোক জমিয়ে বলি, এই যে দেখছেন ভদ্রমহিলা— ইনি আমাব ধর্মপত্নী, তাহলে?'

'পাগল বলে ধরে নিয়ে যাবে, এই আব কি।'

'তাহলে তো বেঁচে যাই'। কাঞ্চন হাসতে হাসতে বলল, কিন্তু দীর্ঘশ্বাস চাপতে পারল না। রেখা ঠোঁটে ফুল ফুটিয়ে প্রশ্ন কবল, 'আহা, আত্মাটা আবার মাথাচাড়া দিল?' কাঞ্চন বলল, 'জানো, এই কথার খেলা সত্যি আব ভালো লাগে না।' রেখা স্তব্ধ হয়ে দাড়াল।

ভালো লাগে না। ভালো লাগে না। চুবি করে একটু সময় নেওয়া, দুটো কথা এক পেয়ালা কফি, লম্পট নদীতীরে নির্জনতাব ব্যর্থ অন্বেষণ, তারপব অক্ষম ক্লান্তি ও ক্ষোভে

অপরিচিতের মতো ঘরে ফিরে যাওয়া। একদিন, কোনো এক নিকট অথচ বিস্মৃত অতীতে, একদিন অতীতে, সবই ছিল স্বপ্ন। আর আজ, আর এখন, ঘেন্না করে। একই অভ্যাসবোধ, একই পরিবেশ, একই চায়ের দোকান আর রাস্তা আর গঙ্গার ধারের গাছতলা। এক ধরনের কথা বা কথা খুঁজে না পাওয়া। বদল নেই, হায়। অথচ কলকাতা প্রতি মুহূর্তে বদলায়। পৃথিবী বদলায়। জীবন বদলায়। আমাদের বয়েস বেড়ে যাচ্ছে, মনে মনে আমরা আরও দ্রুত বুড়িয়ে যাচ্ছি। অথচ সেই মৌলিক ছকের ওপর ঘুঁটির মতো এগোচ্ছি, পেছোচ্ছি। এ-যুগের নিয়তিই হল বাল্য এবং প্রৌঢ়তা— মধ্যিখানে বিশাল চড়ায় ইচ্ছা ও অভিজ্ঞতা, ভালোলাগা আর কর্তব্যের বিরোধে আমরা পোকার মতো গর্ত খুঁড়ে নিচে নামছি— অথচ সামনে সমুদ্র ছিল। হায় রে সমুদ্র। নিজেকে ফাঁকি দিচ্ছি কথায়, রেখাকে ফাঁকি দিচ্ছি কথায়। আর পুঁথি থেকে তার সমর্থন খুঁজছি। কি যেন সেই— কি যেন... ফুলগুলি কথা আর পাতাগুলি চারিদিকে পুঞ্জিত নীরবতা। সমুদ্রের মৌন। বক্ষের কাছে পূর্ণিমা লুকানো আছে। দিনে দিনে অর্ঘ মম। দিনে দিনে রূপবতী হবে পৃথিবী। দিনের পব রাত্রি। কিন্তু রাত্রির পব? রাত্রির পর?

'এই, এ ভাবে হাঁটলে পথেই বৃষ্টি নামবে।'

উত্তরে অন্যমনস্কের মতো কাঞ্চন চিৎকার করে উঠল, 'গাড়োযান, বোক্‌কে'। বলেই সে নাকে মালতীফুলেব গন্ধ পেল। কাবণ শ্রীকান্তব গহব-ভাইয়েব কথা মনে পড়েছিল।

বেখা বলল, 'ক্ষেপেছ?'

কাঞ্চন শুনল, নতুন গোঁসাই ওঠো। অথচ সে সচেতন ছিল এস্‌প্ল্যানেডেব সামনে দাঁড়িয়ে, সঙ্গে রেখা।

'খিদিরপুর কেতনা?'

লুঙ্গির খুট দিয়ে গলাটা মুছে গাড়োয়ান বলল, 'সওয়ারী কিধার?'

'দেখতে পাচ্ছ না?' কাঞ্চন বিরক্ত। কারণ গাড়োয়ানের রক্তাভ চোখেব হাসি তার অকারণ ও অশ্লীল মনে হল। অথচ বিদেশী উপন্যাস এবং মধুসূদন দত্তেব কলকাতার ইতিহাস পড়ে ঘোড়ার গাড়ি সম্পর্কে মনে যে স্মৃতির পরিমণ্ডল জন্ম নিয়েছে, তার চেহারা অন্য।

'পোলের ওপারভি যাবেন?'

'না।'

'গঙ্গাব কিনাবা দিয়ে?'

'হ্যাঁ।'

'চাব টাকা লাগবে স্যার।'

চমকে উঠে বিবক্ত কাঞ্চন বলল, 'ঠিক আছে।'

চলে যেতে দেখে গাড়োয়ান গাড়িটা এগিযে নিয়ে প্রশ্ন করল, 'কত দিবেন?'

বেখা হঠাৎ উত্তর দিল, 'দু-টাকা।'

কাঞ্চন গম্ভীব হয়ে রেখার দিকে তাকাল। রেখা দর কষছে? রেখা এই অশ্লীল, ধূর্ত গাড়োয়ানটার সঙ্গে যেচে কথা বলল? বেখা কি আজ প্রতিপদে প্রমাণ কববে আমি কাপুরুষ, আমি জীবন থেকে পালাচ্ছি? রেখা কি আজ, রেখা কি, এইসব ছুটকো স্মার্টনেস্, অথচ বেখার পক্ষে—

'তিনটে টাকা দিন মা।'

রেখা হেসে কেটে কেটে বলল, 'ট্যাক্সিতে দু-টাকাও লাগে না।'

গাড়োয়ানটা আহত ভঙ্গিতে সামনে ঝুঁকে একটা ঘোড়ার রোগা পিঠে চাপড় মেরে নিজের জিভে আক্ষেপ প্রকাশ করে বলল, 'আরে হায়, মিসিন আর জানোয়ার এক হল দিদি? আচ্ছা, আট আনা বখশিস দিয়ে দিবেন। আচ্ছাসে ঘুমিয়ে দিব।'

লাফিয়ে নেমে যখন দরজাটা খুলে ধরল তখন আবার রেখাকে অপরিচিত মনে হল। বিব্রত, ভীত চোখে সে কাঞ্চনের দিকে তাকাল, তারপর গাড়িটার ভিতরে। ক্রুদ্ধ কাঞ্চন কোনো কথা না বলে ত্বরিতে উঠে পড়ল।

আঁচলটা ভালো করে জড়িয়ে রেখা এক কোণে কুঁকড়ে বসেছিল। উল্টোদিকেব গদিতে নিজেকে ছড়িয়ে প্রায় আধশোযার ভঙ্গিতে বসে কাঞ্চন চারমিনাব বের করল। ভেবেছিল রেখা এত তাড়াতাড়ি আবার সিগারেট ধরাতে নিষেধ কববে! কিন্তু রেখা নির্বাক। লাল আলোর সঙ্কেতে গাড়ি তখনও ট্রাম লাইনের ওপারে যেতে পারে নি। কাঞ্চন অদ্ভুত আনন্দ বোধ করল। রেখা এই আলো, এই অবণ্য, এই পরিপার্শ্বকে ভয় পাচ্ছে। ঘোড়াব গাড়িতে আমার সঙ্গে উঠেছে তাই ভয় পাচ্ছে। আমার সঙ্গে উঠে ভয় পাচ্ছে। ফিটনের দু-পাশ খোলা। সত্যিই চারদিকে অমৃতের অজস্র সন্তান। কে না কে দেখছে জানি না। বেখার পরিবার আছে, সমাজ আছে, আমি একটা পুরুষ। ওহো, আমি পুরুষ। বেড়ে।

"আলোর দিকে মুখ রাখুন। হলদের পর সবুজ আলো জ্বললে দুই দাগের মধ্যে দিয়ে সাবধানে রাস্তা পার হন। মনে রাখবেন, জীবন অমূল্য। সামান্য ভুলের মাশুল ভয়ানক। আলোব দিকে মুখ বাখুন।"

কাঞ্চন হা হা করে হেসে উঠল।

'কি?'

'সাবধানে পথ চলুন সপ্তাহ। ফলে আবও ট্রাফিক জাম। বেশ বলেছে, আলোব দিকে মুখ রাখুন। তোমার যাবতীয় জেস্চার আর ঘোষণাটা মিলে পুবো শবৎ চাটুজ্জে টাইপ।'

'কি আর করি বলো? প্রবোধ সান্যালের নায়কের সঙ্গে প্রমোদভ্রমণে বেবিযে ববীন্দ্রনাথেব নায়িকা হলে গুরচণ্ডালীব দোষ সামলাবে কে?'

কাঞ্চন সিগারেটে টান দিল। রেখার স্মার্ট উত্তর তাকে এই মুহূর্তে যথেষ্ট বিবক্ত কবেছে। অথচ আমি জানি না ঠিক কি চাই। কি হলে খুশি হতাম। বেখার অস্বস্তি মিথ্যে নয়, তুচ্ছ নয়। আমি একটা কলেজের শিক্ষক। রেখাকে এনে সংসারে স্ত্রীর মর্যাদা দেবাব সাধ্য আমাবই নেই। বাড়িতে ক্রমাগত বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে, যাবতীয় লুকোচুরির নিষিদ্ধ পথে সে তার ভালোবাসা— বেখাই উদ্যোগ নিয়ে রেজিস্ট্রেশন- তার ভয় শেষ পর্যন্ত বাবা নিষ্ঠুর— শেষ পর্যন্ত বাবা কিছুতেই জাতেব অভিমান-- তখন তাঁকে ঠেকাবে বিয়েব দলিল— কাবণ সে জানে আমাদের হতকুতসিৎ সংসারে হঠাৎ চলে আসা সম্ভব নয়। সে জানে যতদিন না অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ছে ততদিন তার পক্ষেও বাবাকে আঘাত দেওয়া — । আহ্, এইভাবে, ঠিক এইভাবে আমরা স্বার্থপর হতে পারি না। অথচ যাদেব জন্য ত্যাগ, তাদের প্রতিও মনে মনে বিদ্বেষ পোষণ করি। আব দুঃখ পাই। নিজের কাছে ক্রমাগত ছোট হতে থাকি। অথচ জানি না ঠিক কি চাই।

তারপর গাড়ি চলতে শুরু করল। পর পর কতগুলো বাস বাতাসের ঝাপট দিয়ে চলে গেল। জানলার পাশে দু-একজন যাত্রী একটু ঝুঁকে কাঞ্চনদের দেখল। নানা ধরনের শব্দের ভেতর ঘোড়ার ক্ষুরের অলস অথচ একটানা আওয়াজ কাঞ্চনেব মনে কিসের যেন অনুষঙ্গ আনতে চাইছে। গাড়িটা দক্ষিণে ঘুরল। কার্জন পার্কের পাশ দিয়ে স্বল্প আলো আর নির্জনতাব দিকে ধীরে এগোতে লাগল। এস্প্ল্যানেডের মোড়ের সেই আশ্চর্য শব্দপ্রবাহ স্তিমিত হয়ে পেছনে পড়ে রইল, যেন এক চিত্রিত শব। এখন ক্বচিৎ বিকশার গুঞ্জন, দু-একটা গাড়ির

দ্রুত অন্তর্ধান, পথচারীর আকস্মিক কণ্ঠস্বর। কাঞ্চন এতক্ষণে অনুভব করল চৌরাস্তার ভিড়ে ঘোড়ার গাড়িতে বসে থাকতে সে অত্যন্ত কম্‌প্লেক্স বোধ করছিল।

আর বৃষ্টি নামল। রেখা বাইরে হাত পেতে ধরল। ফোঁটা ফোঁটা জলে হাতটা অপরূপ হয়ে উঠল। রেখার আঙুলগুলিতে একটি মুদ্রার ভঙ্গি। ঘোড়ার ক্ষুরের অলস অথচ অবিচ্ছিন্ন শব্দপ্রবাহে কাঞ্চনের মনে হঠাৎ নূপুরের মৃদু, অস্ফুট শব্দতরঙ্গের অনুষঙ্গ এল। সারেঙ্গিতে গাঢ় পুরুষালি ছড়ের টানে চন্দ্রকোষ বেজে উঠল। বাধার চোখে, রাধার আঙুলে মিনতি। সঙ্গী, কেনা বাঁশী বাএ কালীনী নঙ্গ কূলে। কড়ি মধ্যম সমুদ্র স্তম্ভের মতো কোমল ধৈবতে ভেঙে পড়ে কোমল গান্ধার ছুঁয়ে ষড়জে ফিরে এল। আব বৃষ্টি দ্রুত হল। চাকার শব্দ, ক্ষুরের শব্দ, বৃষ্টির শব্দ। মাঝে মাঝে সহিসের চাবুক বাতাসে একটা সূক্ষ্ম মীড় টেনে দিচ্ছে। অজস্র জলবিন্দু ওদের ভিজিয়ে দিল।

'বাবু?

'কেন?'

'পর্দাটা ফেলে দিব?'

কাঞ্চন জানত না এ-জাতীয় ফিটনে পরদা থাকে। অবাক হয়ে বলল, 'দাও'। মুহূর্তে যেটাকে ভেবেছিল গাড়ির ছাউনি, তার ওপর থেকে দুপাশে দুটো চামড়ার পরদা ঝুলে পড়ল। আর হঠাৎ তারা সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

স্তব্ধ দুজনে বসে রইল। কেউ কারোর দিকে তাকাতে পারছে না। এ কি আশ্চর্য ঘটনা। আমরা নির্জনতা খুঁজতাম, যেখানে ঘনিষ্ঠ বসা যায়। কলকাতা শহরে নির্জনতা নেই। আমরা অবসর খুঁজতাম, যেখানে নিবিড় হওয়া যায়। আমাদের জীবনে অবসর পাই না। আমরা একটা পরিমণ্ডল খুঁজতাম, যেখানে আমরাই অধীশ্বর। আমাদের সময় সে পরিমণ্ডল দেয় না। অথচ আজ, অথচ একি, অথচ এভাবে— বন্ধ গাড়ি চলছে, বাইরে বৃষ্টি, আজ আমাদের বিবাহের প্রথম বার্ষিকী। আমার স্ত্রী রেখা— পরমেশ্বরকে সাক্ষী করে— ধর্মপত্নী...

'এই, কি ভাবছ?'

কাঞ্চন দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল, 'কিছু না।' বলেই হেসে ফেলল। কাবণ এর পরেই সে জানে রেখা বলবে— কথা নয়, ভাবনা নয়, তাহলে এখন তোমার মনে 'সিচুয়েশন ভেকেন্ট' নোটিশখানা আবার ঝুলিয়েছ? কিন্তু রেখা কাঞ্চনের মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে শুধু বলল, 'কিছু বলো।'

হাতের তেলোর ওপর মাথা রেখে ঘাড়টা পেছন দিকে ঈষৎ ঝুলিয়ে জানুর ওপর আড়াআড়ি করে পা ফেলে রেখা শিথিল ভঙ্গিতে বসেছিল। একগোছা ভেজাচুল কপালের ওপর টিকলির মতো কুঁকড়ে ঝুলে আছে। গর্বে, আনন্দে রেখা যেন রাজেন্দ্রাণী।

প্রায়ই আজকাল রেখাকে অপরিচিত মনে হয়। হঠাৎ সে কি এক ঔদাসীন্যে অনেক দূরে চলে যায়। আসলে গত একবছরে, বিয়ের পর, আহ্ আমাদের বিয়ে একটা কৌতুক। কিন্তু সত্যিই তো তারপর রেখাকে নতুন করে কিছুই জানি নি। রেখার শরীর না, মন না, অভ্যাস না। আসলে আমরা দুজনেই আমাদের অনেক আকাঙ্ক্ষা পরস্পরেব কাছে গোপন করে যাচ্ছি, নিজের কাছে মহৎ থাকার তাড়নায় পরস্পর ছদ্মবেশ পরেছি।

'কি বলো না গো?'

রেখার মুখে গো শব্দটা কাঞ্চনকে চমকাল। বাস্তবিক. অবস্থায় পরিবেশে শব্দেব ওজন কি আশ্চর্য বদলে যায়। অন্য সময় হলে পরিহাস কবার সুযোগ নিশ্চয়ই ছাড়তাম না। আসলে আমি তো জানি, আমার তাবৎ অস্তিত্ব এমনই কিছু সম্বোধনের জন্য কাঙাল হয়ে থাকে।

'বউ.?'

রেখা উদ্ভাসিত মুখে কাঞ্চনের দিকে তাকাল।

'বউ?'

'উ?'

'আমাকে একবার স্বামীন্ বলে ডাকবে?'

'যাহ্।'

'ডাকো না?'

'যাহ্।'

'প্লীজ্ একবার ডাকো।'

'না গো, ভীষণ লজ্জা করে।'

'আচ্ছা, ফিশফিশ করে বলো। একবারটি শুনতে ভীষণ ইচ্ছে করছে। আসলে বুঝলে—'

রেখা কাঞ্চনের কথার মধ্যে হঠাৎ স্পষ্ট করে বলল, 'স্বামীন্'। বলেই দুহাতে মুখ ঢেকে ঝির ঝির করে হেসে উঠল। হাসিটা হঠাৎ ক্ষুরের শব্দের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেল। কাঞ্চন নাকে ভেজা মাটির গন্ধ পেল।

ছুঁতে ইচ্ছে করছে। খোপাটা খুলে একমুঠো ফুলের মতো চুলগুলো যদি রেখার মুখে-বুকে ছড়িয়ে দি। হাতটা ধরব? কান পেতে রেখার হৃদপিণ্ডের শব্দ যদি শুনতে পেতাম? আমার রক্ত, আমার মন বৃষ্টি হতে চায়। একটা কথা ধ্রুব বুঝেছি। বৈষ্ণব কবিরা যৌবন সম্পর্কে যে উল্লাস প্রকাশ করেছেন, তা মিথ্যে। আসলে যৌবন আমাদের লজ্জা, আমাদের যন্ত্রণা। আমি পারি না। আমি পারি না এখানে রেখাকে অপমান করতে।

আঁচল সরে গিয়েছিল। একটা সেফটিপিন। কাঞ্চনের খুব ইচ্ছে হল বলে, জামায় বোতাম লাগিয়ে নিতে পারো না? বলল, 'কি দেখছ এমন করে?'

রেখা হাসল। বলল, 'জানো, আজ প্রথম লক্ষ্য করলাম তোমার গলায় একটা তিল আছে।'

'এই অন্ধকারে?'

'হুঁ। যখন সিগারেট ধরালে, হঠাৎ তোমার—'

'কি?'

'যাহ্।'

'ভালো লাগছে তোমার?'

'খুউব।'

ভালো লাগছে রেখার। কি অমোঘ এই ভালোলাগা। আমি জানি রেখা কি চায়। আমি জানি আমি কি চাইছি। অশ্বক্ষুরের ধ্বনি চেতনা অবশ করছে। এই আমার শরীর গীর্জার উজ্জ্বল মোমবাতি, বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরে পড়ছে। অশ্বমেধ যজ্ঞের গর্বিত ঘোড়াটি ঘাড় বেঁকিয়ে আগুনের নিঃশ্বাস ফেলে চলে গেল। আর দ্রাবিড়-কন্যা আর্য ঘোড়সওয়ারের পায়ের তলায় হা হা করে কেঁদে উঠল। তারপর চেঙ্গিজ খাঁর অশ্বারোহী দল শেকল বেঁধে দাসদের টেনে নিল। তারপর লরেন্স ফস্টর ধুলো উড়িয়ে দিল্লিতে পতাকা ওড়াল। আর পতাকার রঙ পালটায়। স্বর্গের উচ্চৈঃশ্রবা এখন ধর্মনিরপেক্ষ কলকাতার মাঠে পাটোয়ারী বুদ্ধিতে বাজি দৌড়য়। আর যে যজ্ঞের অশ্বকে ফিরিয়ে আনতে ভগীরথ মর্ত্যে গঙ্গা এনেছিল, মাত্র আড়াই টাকার বিনিময়ে সে আমাদের খিদিরপুর পৌঁছে দেবে। কাঞ্চন চোখ বন্ধ করে ক্ষুর এবং হ্রেষাধ্বনি শুনতে লাগল। সত্য যে, দিগ্বিজয়ী অশ্বের শোণিতে যজ্ঞের আহুতি পূর্ণ হয়।

-'কি গো, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?'

কাঞ্চন চোখ বুজে জবাব দিল, 'হুঁ'। তাকাব না, আমার নিজেকে ভয় করছে। আমার -—নিজেকে বড় দীন, বড় অসহায় মনে হল।

'শোনো?'

'কি?'

হঠাৎ রেখা দু'-হাতে কাঞ্চনের ডান হাতটা ধরে বলল, 'শোনো'?

কাঞ্চন অস্ফুটে বলল, 'কি?'

'এই মালাটা আমায় পরিয়ে দেবে?'

গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ল। গাড়োয়ান ডাকল, 'বাবু!'

'কি?'

'খিদিরপুর।'

রেখা প্রায় আর্তনাদ করে বলে উঠল, 'দাও, পরিয়ে দাও।'

কাঞ্চন বিমূঢ়ের মতো রেখাকে মালা পরিয়ে দিচ্ছিল, সেই সময় পরদাটা উঠেই আবার নেমে গেল। ঘাড় হেঁট করে দু-জনে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল। কাছেই ট্রামস্টপ। চৌরাস্তায় একটা পুলিস। তাছাড়া জায়গাটা নির্জন।

রেখা ব্যাগ খুলে দুটো টাকা দিল। কাঞ্চন পকেট থেকে একটা আধুলি বের করে টাকাটা গাড়োয়ানের হাতে দিতেই সে চটে উঠে বলল, 'সে কি পাঁচ টাকার কম হবে না।'

কাঞ্চন ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, 'কেন? তুমিই তো বলেছিলে।'

গাড়োয়ান বলল, 'ফূর্তি করবেন, হোটেল ভাড়াভি দিবেন না?'

প্রায় ফিসফিস করে কাঞ্চন বলল. 'কি বললে?' জিভে তার কথা জড়িয়ে গেল। আর রেখা চমকে দু-হাতে নিজের কান চেপে ধরতে যাওয়ায় মালাটা হাত থেকে রাস্তায় পড়ে গেল।

তারপর সম্পূর্ণ অপরিচিতের মতো দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে দ্রুত পায়ে তারা খানিকটা হেঁটেছিল। কিন্তু কাঁদে নি। কারণ একান্তে কাঁদবার মতো কোনো আশ্রয় তাদের জানা ছিল না।

অন্ধকারে নিশিকান্ত

পূর্ণেন্দু পত্রী

আকাশ বড় দয়ালু। অন্ধকেও সে রোদ তাপ আলো দেয়। প্রকৃতিও কম দয়ালু নয়। মরা চোখের দৃষ্টিব খামতিটাকে পুষিয়ে দেয় অন্য ইন্দ্রিয়গুলোর অতিরিক্ত তৎপরতা দিয়ে। আকাশে এবং পৃথিবীর এই জাতীয় উদার সাহায্য না পেলে অন্ধের পক্ষে কঠিন হতো বাঁচা।

নিশিকান্ত অন্ধ। গত বৈশাখেই তার মরে যাওয়ার কথা। কিন্তু অন্ধ বলেই বেঁচে গেল সে। নিজেও বাঁচল, একটা সংসারকেও পথে বসার হাত থেকে বাঁচাল। আড়ালে-আবডালে লোক বলাবলি করে, উনি মববার মানুষ নয়। নিশিকান্তর বয়স নিয়ে নানা মত। কেউ বলে, আশি। কেউ ভাবে, পঁচাশি। কেউ তাতেও সন্তুষ্ট নয়। উনি কি আজকের লোক গা? মোর ঠাকুর্দার মুখে ওঁনার কত কিত্তি-কথা শুনেছি। সেই ঠাকুর্দা চিতেয় গিয়ে শুয়েছেন কবে। সে শ্মশানে এখন ইস্‌কুল বাড়ি উঠেছে। তবে?

গত বৈশাখেই নিশিকান্ত মারা যেতে পারতো। আগুন লেগেছিল বাড়িতে। বাড়ির বৌ ছেলে মেয়ের দল সকাল থেকে চৌধুরীদের বাড়ি খাটা-খাটনির কাজে। চৌধুরীদেব বাড়িতে শ্রাদ্ধ। গোটা গ্রাম খাওয়াবে। শুধু বাটনাই বাটা হচ্ছে তিন রাত্রি ধরে। বাড়িতে ছিল মাত্র তিনজন লোক। নিশিকান্তর ছোট ছেলে সহদেবের বৌ কুন্তি। বড় ছেলে কার্তিকের নাতি পাঁচ বছরের ঘনা। ঘনার পেটটা খাবাপ। জন্ম থেকেই পেট-রোগা ছেলে। অসুখে ভুগে ভুগে, দিন রাত শুধু খাই খাই কান্নায় কেঁদে পেটটা তার লাউ-এব মত ফোলা। তাই তাকে নিযে যায়নি তার মা বাবা দাদু দিদিমাবা। মিথ্যে স্তোক বাক্যে ভুলিয়ে রেখে গেছে, ফেবাব সময় তার জন্যে মুড়ি মুড়কি দই মিষ্টি নিয়ে আসবে। কুন্তি যায়নি গরু-বাছুরের দেখা-শোনা আর সংসার সামলানোর অন্যান্য কাজের জন্যে। নিশিকান্ত ছিল তার নিজেব ঘবে, আবছা অন্ধকারে কুণ্ডলী পাকিয়ে যেমন শুয়ে থাকে সে, তেমনি। বেঁচে থাকাব জন্যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটি চলা হাঁটা ছাড়া সে ঘর ছেড়ে বাইরে আসে না। ঐটুকু চলা হাঁটাও করে কখনো লাঠি ধরে। কখনো নাতি নাতনির সাহায্যে।

নিশিকান্ত ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল বিশ্রী এক ধরনের গন্ধে। আর সেই সঙ্গে কানে আসছিল আগুনে বাঁশ-ফাটার ফট্‌-ফাট শব্দ। আগুনে ঘর পুড়লে কেমন গন্ধ হয়, নিশিকান্ত জানে। তার এক জীবনে এ-রকম গন্ধের সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছে বহুবার। অভিজ্ঞতা তার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছিল নিমেষে। লাঠি হাতে নিয়ে পড়ি মরি করে ছুটে এসেছিল উঠোনে। চীৎকার চ্যাচামেচি শুরু করে দিয়েছিল প্রাণপণ শক্তিতে। কুন্তি তখন বাড়ির ধারে কাছে ছিল না। নিশিকান্ত দেখতে পেয়েছিল কেবল ঘনাকে। কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে ঘর পোড়ানো আগুনের নাচ দেখছিল সে। তার হাতে এক গোছা শুকনো পাকাটি। মুখের দিকটা আগুনে পোড়া। রান্নাঘর থেকে পাকাটি জ্বালিয়ে খেলা করতে গিয়ে অগ্নিকাণ্ডটা ঘটিয়েছিল সেই-ই।

—ওরে কে আছিস? ও বৌমা! পাড়ার মানুষরা কে আছ গো! ওরে ও কার্ত্তিক! ঘর দোর সব গেল যে রে আগুনে পুড়ে। হায় ভগবান! একি কাণ্ড করলে গো! ওরে ও সহদেব, ও বুড়ি, ও বৌমারা, ও খেন্তি, ও নন্ত। হায়! হায়! গ্রামের মানুষরা কি অন্ধ হয়ে গেল নাকি? কে আছ গো, ছুটে এস না একবার!

শেষ পর্যন্ত ছুটে এসেছিল গোটা গ্রামের প্রায় অর্ধেকটা। গরুর জন্যে কুঁড়ো-জাউনি সিদ্ধ করতে বসিয়ে কুন্তি এক ফাঁকে ছুটে গিয়েছিল চৌধুরীদের বাড়ি। কার্তিকের বড় ছেলে হরিপদর-বৌ মেনকার গোপন নির্দেশ মত। চৌধুরী বাড়ির বিপুল আয়োজনের মধ্যে থেকে সামান্য হাত সাফাই করে রোজই সে কিছু না কিছু সরিয়ে রাখে। কুন্তির মারফৎ সেগুলো চালান আসে বাড়িতে। পেট-কাপড়ের আড়ালে তিন টুকরো কাঁচা মাছ নিয়ে কুন্তি যখন হন হন করে বাড়ি ফিবছিল, সেই সময়েই দূর থেকে দেখতে পেয়েছিল লাল আগুন আর কালো ধোঁযার তাণ্ডব। তখনো অবশ্য তার মাথায় ঢোকেনি যে, এ আগুনে পুড়েছে তার নিজেরই মাথা বাঁচানোর আশ্রয়। সে ভেবেছিল, অন্য কারো কপাল পুড়েছে। কুন্তি যখন উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছিল, তখন আগুন নেভানো শুরু হয়ে গেছে. বিশ পঁচিশ মানুষের অবিশ্রান্ত এবং গলদঘর্ম চেষ্টায়। পুড়ে ছাই হয়ে গিছল রান্নাঘরটা। ভাগ্যিস রান্নাঘরেব চালের সঙ্গে বসতবাটির চালের ছোঁয়াছুঁয়ি ছিল না, তাই খুব অল্পের উপর দিয়ে কেটে গিয়েছিল ফাঁড়াটা। বসতবাটির বাঁ দিকের চালের খানিকটা পুড়েছে উড়ো আগুনেব হল্‌কা থেকে।

এই বুড়ো মানুষটা না থাকলে আজ তোরা সব্বোসান্তো হয়ে যেতু, বুঝলি কার্তিক।

গ্রাম শুদ্ধ মানুষ নিশিকান্তর প্রশংসায় মুখর। যে-আগুন থেকে সংসারকে বাঁচিয়েছিল নিশিকান্ত, সেই সংসারই একদিন নিশিকান্তকে নির্বাসিত করল তার নিজের ঘর থেকে। আগুনে পুড়বার পর থেকেই দেখা দিয়েছিল সমস্যাটা। বাঁদিকের যে অংশটা পুড়েছে, সেইদিকে ছিল নিশিকান্তর ছোট ছেলে গণেশের ঘর। যতদিন না চাল ছাওয়া হয়, গণেশ তার বৌ ছেলে নিয়ে কোথায় থাকবে সেটাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল বড় ভাই কার্তিকের কাছে বড় সমস্যা। তখন গণেশই দিয়েছিল প্রস্তাবটা।

— বাবাকে একটা কাজ করলে হয় নি? বৈঠকখানাটাকে ছই দিয়ে ঘিরে ওঁনাকে থাকতে দিলে কি হয়?

গণেশেব প্রস্তাবে রাজী হয়নি কার্তিক। বরং মনে মনে বিরক্ত হয়েছিল সে। বুড়ো বাপের উপর এতটুকু মমতা নেই গণেশেব। কিন্তু একদিন কার্তিককে গণেশের প্রস্তাবেই সায় দিতে হল। সেজ ভাই নকুলের বড় ছেলে তাবকের বিয়ের সময়। তারককে তো একটা ঘর দিতেই হবে। অগত্যা নিশিকান্তকে ঘর ছেড়ে আসতে হল। একটা লাঠি. একটা ছেঁড়া মাদুর, তার চেয়ে ছেঁড়া এবং ময়লা একটা কাঁথা, একটা বেগুনে রঙের সুতির চাদর, লাল চামড়ার তালি দেওয়ায় এক জোড়া জীর্ণ কালো চটিজুতো, কফ্ থুতু ফেলার আব রাত্রে আগুনে হাত-পা সেঁকার জন্যে দুটো মাটির মালসা, নিজস্ব হুঁকো, লাঠি এই রকম কিছু আসবাব পত্র নিয়ে তারকের বিয়ের দুদিন আগে নিশিকান্ত বাসা বদল করল মাঘ মাসের এক বিকেল বেলায়। বিয়ের কটা দিন খুব দুঃখ পায়নি। বাড়ি ভর্তি হৈহৈ রৈরৈ-এ ভুলেছিল। বিয়ে বাড়ির উৎসবটা নিভে যাওয়ার পর থেকেই তাব মনের এবং শরীরের কষ্ট ক্রমাগত বেড়ে চলে। দিনটা তবু কোনমতে কাটাতে পারে। সন্ধে থেকে রাত্রি পর্যান্ত ঠাণ্ডা হাওয়ায় সে যেন বাঁশ পাতার মত কাঁপে। আম জাম তাল খেঁজুরের ডালপালা ঝাঁকিয়ে হুহু করে ছুটে আসে ঠাণ্ডা হাওয়া।

নিশিকান্তর চোখ থাকলে বুঝি দেখতে পেত ঠাণ্ডা হাওয়া কেমন করে লোমকূপের ফুটো দিয়ে কাঁথা সেলায়ের ছুঁচের মত ঢুকে পড়ছে তার শরীরে। মেনকা মালসা ভর্তি

আগুন রেখে যায় পায়ের কাছে। যতক্ষণ আগুন, ততক্ষণ তাপ। কিন্তু মালসার আগুন তো সারা রাত থাকে না। তখন আবার হাড়ে মাসে কাঁপুনি। এই জাতীয় শরীরের কষ্টের সঙ্গে আরো একটা নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে নিশিকান্তর। সে সমস্যা আলোর। ভোর হবার পর থেকেই তার চোখের সামনে ফুটে উঠতে থাকে এক রকমের হলুদ আলো। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার রঙটা ক্রমশ লালচে হয়ে ওঠে। আবার বিকেল থেকে লালচে ভাবটা মরতে মরতে কালো। আর সেই আলোয় ছায়া ফেলে, আলোকে ভেঙে চুরে কারা যেন আসে যায় দিনরাত। নিশিকান্ত কৌতূহল চেপে রাখতে পারে না।

— কে যায়?

— আমি।

— আমি বললে, আমি কি আর বুঝবো। কি নামটা বল না হে।

— আমি শশো।

— ও শশো। হ্যাঁরে, কে যেন বলতেছিল, খুব নাকি কুমড়ো ফলিয়েছু ইবার। তা দিয়ে গেলিনিতো একটা খেতে। তোর বাবা কেমন আছে? ভাল? হ্যাঁরে, উপাড়ার গোবিন্দ সাঁতরার ছেলে কানাই এর সঙ্গে তোর দেখা হয়? হলে বলিস তো একবার দেখা করতে। মোকে একটা বই কিনে দিবে বলেছিল, রামায়ণ না মহাভারত, বলিস তো দেখা হলে।

— সে তো এখন কলকাতায়। দেশে আসে ন' মাসে ছ' মাসে একবার।

— কেন, ন' মাসে ছ' মাসে আসে কেন? দেশের ছেলে দেশে আসার সময় পায়নি? বুড়ো মা বাবাকে দেখবার ইচ্ছে করেনি বুঝি? আজকালকার ছেলে ছোকরারা সব কেমন হয়ে যাচ্ছে। বাপ মা, দেশ গেরামের দিকে যেন আর টান নেই। তার বৌ কোথায় থাকে? কলকাতায়? ও, ঐ হয়েছে কাল। আজকাল কি স্বভাব হয়েছে জান তো মানুষের? নিজেরটি হলেই হল। নিজের মাগ ছেলের পেট ভরলো তো জগৎ জয়। হ্যাঁরে শশো, আমাদেব তারকের বৌ দেখেছু? কেমন হয়েছে? শশো...ও শশো।

শশধরের উত্তর আসে না। তার বদলে নিশিকান্তর কানে আসে একদল কচি-কাঁচা ছেলের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর।

এই কদিনে তারা অভ্যস্ত হয়ে'গেছে নিশিকান্তর স্বভাবে। কাউকে দেখলেই সাতকাহন প্রশ্ন। তাদের কাজ থাকে। বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারে না। চলে যায়। বুড়ো ডাকে। আর ছেলে ছোকরারা এ মজার দৃশ্যে দাঁত ঝিকিয়ে হাসে। ক্রমে-ক্রমে ছেলে ছোকরাবাও বিরক্ত হয়ে উঠল তার এই ডাকাডাকি আর প্রশ্ন করার একঘেয়েমিতে। অনেকে কার্তিকদের ঐ বৈঠকখানার সামনে দিয়ে যেতে ভয় পেত। সোজা-সাপটা পথ জেনেও অনেকে যেত ঘুর পথে। আবার কেউ যেত বেড়ালের মত নরম পায়ে। তবু শব্দটা ঠিক কানে এসে যায় নিশিকান্তর।

— কে যায়?

— আমি হনুমান।

কোন কোন পাজি ছেলে বুড়োর সঙ্গে মস্‌করা করে।

— হনুমান। সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তোর বাবার নাম কি বল? বলনারে।

— জাম্বুবান।

— খচ্চর ছেলে কোথাকার। বাবা ঠাকুরদার সঙ্গে কথা বলতে শেখেনি। আমার হাসি হচ্ছে। আয় দিকিন আমার সামনে। তোর মাথাটা থেতো করে দি।

রাগে নিশিকান্তর হাড় জিরজিরে শরীরটা ঝোড়ো হাওয়ার পিদিমের মত কাঁপে। অন্ধ হলেও কোটরের মধ্যে চোখের থলথলে রক্তহীন সাদা অংশটা থরথরিয়ে কাঁপে।

এই ভাবে দিন কাটছিল নিশিকান্তর। একদিন দুপুরে ঘটে গেল একটা কাণ্ড। তারকের বৌ নলিনী দুপুরের খাওয়া সেরে কাদের বাড়িতে যেন গিয়েছিল বেড়াতে। বিকেল বেলায়

ফিরছিল পাড়ার একজন মেয়ের সঙ্গে। নিশিকান্ত দেখতে পেল লাল আলোর মধ্যে আরো একটু বেশী লাল কি যেন এগিয়ে আসছে। খানিক পরে মনে হল ছায়ার সংখ্যা দুটো। আর এগিয়ে আসছে তারই এই বৈঠকখানার দিকে। হ্যাঁ, ছায়াদুটো তার কাছ দিয়েই চলে যাচ্ছে।

নিশিকান্ত পায়ের শব্দে বুঝতে পারে মেয়েমানুষ।

— কে যায়?

নিশিকান্তর চোখ ঘুরতে থাকে তাদের চলার সঙ্গে। ছায়াদুটো হারিয়ে যায় তার চোখের সীমানা থেকে। কিন্তু কোন উত্তর আসেনা। আরো জোরে একবার চেঁচিয়ে ওঠে সে।

— কে যায়? উত্তর দিলে জিভে পোকা পড়বে? তবুও উত্তর আসে না। নিশিকান্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠে। আজকাল কেউই প্রায় উত্তর দেয় না। বিশেষ করে ছেলে ছোকরারা। বয়স্করা তবুও কেউ কেউ দুদণ্ড দাঁড়িয়ে কথা বলে। নিশিকান্ত ডাক ছাড়ে—

— রম্ভা, ও রম্ভা রম্ভা-আ-আ।

রম্ভা, কার্তিকের সেজ ছেলের বৌ। গোটা বাড়ির মধ্যে নিশিকান্তর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তারই নজরটা বেশী। রম্ভা সদ্য ঘুম থেকে উঠে, উঠোনে শুকোতে দেওয়া ধান তুলছিল। নিশিকান্তর ডাকে সাড়া দেবার মুহূর্তে সে দেখতে পায় নেড়ি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে খিল খিল করে হাসছে। নেড়ি অর্থাৎ নলিনীর সঙ্গে আসছিল যে মেয়েটি। বাড়ির কজন বৌ-ঝি তাকে ঘিরে হাসির কারণ জানতে চাইছে। রম্ভাও কৌতূহল প্রকাশ করে—

— কি হয়েছে, আরে ও নেড়ী?

নেড়ীর হাসি থামে না। ওদিকে নিশিকান্তর চীৎকার। নেড়ী শেষ পর্য্যন্ত হাসি থামিয়ে বলে—

— আমরা আসতেছিনু। আমি আর বৌদি। বুড়ো দাদা আমাদের পায়ের সাড়া পেযে যেই না হাঁক দিয়েছে, কে যায়। বৌদি করেছে কি ভয় পেয়ে আমাকে জাপটে ধরেছে কোমরের কাছে। আমাব কি সুড়সুড়ি লাগতেছিল। বৌদিকে বলি ছাড় নাগো কোমবটা। বৌদি তত জড়িয়ে ধরে। বৌদির ভয দেখে হাসতেছি।

নেড়ীর কথায় খুব একটা হাসি না পেলেও খানিকটা হাসতে হাসতে রম্ভা মাথায় ঘোমটা টেনে নিশিকান্তর কাছে এসে দাঁড়ায়।

— কি হয়েছে?

— কে গেল ইখেন দিয়ে?

— ও তো আমাদেব নতুন বৌ, নলি, নলিনী।

— ওঃ, তারকের বৌ? ত, আমি যে জিজ্ঞেস করনু, কে যায়, উত্তর দিলনি তো। ইরকম অভ্যেসটাতো ভালো নয়। কেন, আমি কি একটা মানুষ নয় নাকি?

— উ নতুন বৌ। এই সেদিন বিয়ে হয়েছে, উকি আপনার সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়ি দাঁড়ি কথা বলবে নাকি?

রম্ভার হাসি পায়। তবু হাসে না। নিশিকান্তর কণ্ঠস্বরে বিরক্তি আরও বাড়ে।

— কথা বলতে হবে কেন? শুধু তো উত্তরটি দেবে। রাস্তার ধারে পড়ে আছি বলে কি আমি রাস্তার লোক?

— আপনি রাস্তার লোক হবেন কেন? রাস্তার লোক শুনতে পাবে বলেই লজ্জায় কথা বলে নি।

— তুমি থামো বাপু, মেয়ে মানুষের লজ্জার কথা আর আমাকে বোলো নি। উ আমি অনেক দেখেছি, তোমার দিদিশাউড়ি ছিলেন একজন। লজ্জাবতী মাথায় দশহাত ঘোমটা, ইদিকে যখন কথা বলবেন, যেন শাঁখ বাজতেছে, দশ পাড়া কাঁপিয়ে। তোমরা আমাকে খুব

বোকা পেয়ে গেছ আর কি, বলি নতুন বৌএর এত যদি লজ্জা, তাহলে অমন খিল খিল করে হাসতেছে কেন? আমি ত ইখেন থেকে শুনতে পাচ্ছি হাসির শব্দ। রাস্তার লোক শুনতে পাচ্ছে।

— উ হাসি কি নতুন বৌ-এর নাকি? উতো নেড়ি হাসতেছে। জীবন কাকার মেয়ে নেড়ী।

নিশিকান্ত কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। দম নেয়। রম্ভার কাছে এভাবে হেরে যাওয়াটা তাকে তৃপ্তি দেয়না। সে অন্যভাবে নিজের অভিমান অথবা আক্রমণ সাজায়।

—কথায় বলে, তুমি যাও বঙ্গে, তোমার কোপাল যায় সঙ্গে, মোর হয়েছে তাই। ঘরে নাত বৌ আসবে বলে নিজের ঘর থেকে বেরি এনু। তা সে নাত-বৌ এমন নবাবের ঘরের বিটি যে একদিন এসে এতটুকু সেবা করতে পারে না। ভগবান চোখ কেড়েছেন। মুখটা দেখবো, তাব তো উপায় রাখেন নি। তা একটু হাতের ছোয়া পেলেও তো বুড়ো মানুষের মনটা ভরে, সেও তোমাদের ইচ্ছা নয়। তাকে তোমরা ঘেঁসতে দিবে নি মোর কাছে। আমি এখন বুড়ো হয়ে সকলের চোখে বিষ হয়েছি।

নিশিকান্তর চোখে জল ছিল না। অন্ধদের চোখে জল পড়ে না। কিন্তু গলার স্বরটা ভিজে ভিজে। তাতেই রম্ভার মনটা নরম হয়ে যায়। সন্ধ্যের পর বাড়ির লোকজন সবাই ফিরে আসে। রম্ভার মুখ থেকে কথাটা ছড়িয়ে পড়ে সকলের কানে। কার্তিক বাড়ির কর্তা। সে বলে, নতুন বৌকে একবার পাঠিয়েই দিও না ওঁনার কাছে।

ঘুটের আগুনে ভর্তি মাটির একটা মালসা হাতে নিয়ে নলিনী যায় আগে আগে। পিছনে বাড়ির কয়েকটা ছেলে মেয়ে। তারা যেন একটা মজা খুঁজে পেয়েছে এর মধ্যে। সকলের আগে একদৌড়ে নন্তু ছুটে গিয়ে নিশিকান্তকে বলে,

— ও কত্তা দাদা, কে আসতেছে, দেখো।

— কে রে?

— দেখনা। নতুন লোক।

শীতে কুঁকড়ানো শরীরটাকে সোজা করে উঠে বসে নিশিকান্ত। পায়ে গরম হাতের স্পর্শ পায় একটু পরে। কম বয়সের শরীরের তাপ আব গরম মালসা বয়ে আনার উষ্ণতা, দুয়ে মিলে নলিনীর হাতটা সত্যিই বেশ গবম ছিল। নন্তু পচা আর মেনি এক সঙ্গে বলে।

— কে তোমাকে পেন্নাম করল বলতো?

নিশিকান্ত ওদের মুখের দিকে তাকায়।

— ফ্যাচ ফ্যাচ করিস নি। কে আমি জানিনি ভেবেছু?

— কে বলনা?

— উতো আমাদের নতুন বৌ। নলিনী।

— কি করে দেখলে গা?

নন্তু, পচা আর মেনি অবাক হয়ে যায়।

— তুমি দেখতে পাচ্ছ? কি করে?

— আমি তোদের চেয়ে ঢের বেশি দেখতে পাই, বুঝলি?

নন্তু চুপি চুপি মেনির কানে কানে বলে

— বাজে কথা। কিছু দেখতে পাচ্ছে না, আন্দাজে বলতেছে।

তারপর সে ঘুরে তাকায় নিশিকান্তর দিকে।

— আচ্ছা, কি রঙের শাড়ী পরে আছে বলতো।

— ডুরে শাড়ি?

সত্যিই ভুরে পরেছিল নলিনী। নন্তুদের চোখ টোপাকুলের মত আরো গোল হয়ে যায়। যাঃ বাবা, সত্যিই দেখতে পাচ্ছে নাকি বুড়োটা? নন্তু বলে,

— কই বলতো হাতে কখানা চুড়ি?

মেনী বলে,

— কানে কি গয়না আছে বল দিক্‌নি?

নিশিকান্ত মাছি তাড়ানোর ভঙ্গীতে হাত নেড়ে খেঁচিয়ে ওঠে।

— তোরা যা তো ইখেন থিকে। ইয়ার্কি হচ্ছে মোর সঙ্গে তাই না? দাঁড়া কার্তিককে ডাকতেছি এখুনি। আমি নতুন-বৌ-এর সঙ্গে কথা বলবো, তোরা এখানে ছারপোকার মত কিলবিল করতেছ্‌ কেন? যা পালা।

নন্তুরা দাবড়ানি খেয়ে একটু সরে দাঁড়ায়, পালায় না। পা টিপে আরাম পায়না নলিনী। পা মানে শুধু চামড়া দিয়ে ঢাকা হাড় কখানা। ফাটা চামড়া। সাপের আঁশের মত রঙ। পা টেপার সময় নলিনী তাই অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে রাখে।

— তোমরা ক' ভাই বোন, ও নতুন বৌ?

নলিনী উত্তর দেয় অস্পষ্ট ভাবে, নিশিকান্ত শুনতে পায় না।

– কি বললে?

আবার উত্তর দেয় নলিনী—

— সাত জন।

– বাবা মা সবাই বেঁচে আছেন তো?

— হ্যাঁ।

— জমি জমা ক'বিঘে?

নলিনী অনেকক্ষণ কোন উত্তর দেয় না। নিশিকান্ত বুঝে নেয়।

— জাননি বুঝি? পুকুর টুকুর আছে? কটা গরু?

এই সময় তারক সেখানে আসে। তারকের সাড়া পেয়ে নলিনী বেঁকে বসে আরো। ঝুঁকিয়ে নেয় মাথাটা। আর সেই সঙ্গে নন্তুরা পালায়। কিছুক্ষণ। সে নিজের বৌ-র শরীরের দুলুনি দেখে। তারপর কথা বলে।

--- ওকে একটু বকে দেবেন তো দাদু।

নিশিকান্ত গলা শুনে অনুমান করে নেয় তারক।

— কেন বা, ঐটুকু কচি মেয়েকে বকবো কেন? তোর কি ক্ষেতি করছে যে বক্‌বো?

তারক মনে মনে ভাবে, ক্ষতির কথা তো মুখ ফুটে বলা যাবে না। বিয়ে হয়েছে দেড়মাস। কিছুতেই ভাল করে ছুঁতে দেয় না। কাছে টানলেই জালের মাছের মত ছটফট। আমি যেন ওর ভাসুর। আর বেশী জাপটা জাপটি করতে গেলেই কান্না। ঐটুকু মেয়ে কি কান্নাই কাঁদতে পারে। গত ছ'সাত দিন ধরে বায়না ধরেছে বাপের বাড়িতে যাবে। সেখানে যে কী স্বর্গ সাজানো আছে কে জানে। গত বছর মানকের বিয়ে হল। কি ভাব তার সঙ্গে তার বৌ-এর। কত গল্প করে রাতের মেলামেশা নিয়ে। তার কপালে এমন একজন জুটলো, যার শরীরে ভালবাসার এতটুকু আগুন-তাপ নেই।

— দিনরাত বাপের বাড়ি যাবার জন্যে কাঁদে কেন? সেইটে জিজ্ঞাসা কর না।

নিশিকান্ত অনুমান করে নেয়, তারকের মনোভাব। নতুন বৌকে কাছছাড়া করতে চায় না। তার শুকনো মুখে হাসি ফোটে।

— আহা! ঐটুকু কচি মেয়ে মাঝে মাঝে বাপের বাড়ি যেতে চায় তো দোষের কি ব্যা।

— মাঝে-মাঝে? কদিন বিয়ে হয়েছে, তার মধ্যে ঘুরে এয়েছেন দু-দুবার। এসেই আবার যাব যাব রব কেন?

— আরে পোথম পোথম ও রকম হয়। পোষ মানার আগে পাখি ও রকম ডানার ঝাপটি দেয়। তোর দিদিমা, ক'বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল বল দিকনি? সে-তো এর চেয়েও ছোট। নাক দিয়ে সিকনি ঝরতো। শাড়ী পরবে কি, শাড়ি লুটোচ্ছে ধুলোয়। আর ঐ দিনরাত্তির বাপের বাড়ি যাবার জন্যে কান্না। তারপর যেই বড় সড়টি হল, পেটে বাচ্চা এল, আর কি বাপের বাড়িকে মনে রইল? নতুন ঘর সংসারে মন বসতে একটু সময় লাগবে নি?

ঠাণ্ডা পায়ে নলিনীর নরম এবং গরম হাতের স্পর্শ পেতে পেতে নিশিকান্ত ফিরে গেছে তার নিজের কম বয়সে। সব মনে পড়ে না। কিছু মনে পড়ে। ঠিক এই রকমই ছিল হাতের ছোঁয়া। নরম গরম। অন্য সকলের কাছে হাসিখুশি। স্বামীকে দেখলে মুখ ভার। একদিন আলতা পরাচ্ছিল মা, দাওয়ায় বসে। জবা ফুলের মত পা দুটো দেখে আমার মনটা রাগে গরগরিয়ে উঠেছিল। খুব রাগি মেজাজ ছিল ত আমার। একবার ভাবলুম, ঐ পা দুঠো ধরে আছাড় মারি উঠোনে। এক ফোঁটা মেয়ে, এত কষ্ট দেয় কেন আমাকে? আব না হয়...

নিশিকান্তর ঘোর কাটে তারকের রাগ ভর্তি মন্তব্যে।

— বাপের বাড়ি যদি এত ভাল থাকে সেখানে গিয়েই থাকুক।

তারক উঠে যায়, লাথি মারার ভঙ্গীতে মাটিতে জোরে পা ফেলে। শব্দটা শুনে নিশিকান্ত হাসে, মনে মনে। ছোকরা চটে গেছে। বৌ বশীভূত হয়নি বলে। হবে রে, হবে। অত রাগ-গোসা করলে বরং দেরী হবে।

— তুই এবার যা। কত্তা রেগে গেছে। যা মান ভাঙাতে যা।

নিশিকান্ত পা সরিয়ে নেয়, নলিনী সঙ্গে সঙ্গে ওঠেনা।

ওঠে অনেক ধীরে ধীরে। যেন স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়ার কোন তাড়া নেই তাব শরীরে, মনে।

গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায় নিশিকান্তর। এমনিতেই ঘুম তার খুব পাতলা। সামান্য খুটুস-খাটুসে সজাগ হয়ে ওঠে সে। তাছাড়া রাত্রি বেলায় সামান্য ছোটখাট শব্দও স্পষ্ট ও জোরালো হয়ে ওঠে জগত সংসারের অনা কোলাহল এই সময় ঘুমিয়ে থাকে বলে। মদ্দা আর মাদি কুকুরে ঝগড়া, তালপাতার উপর দিয়ে হেঁটে গেল খ্যাঁক-শিয়াল খড়খড়ীয়ে, ছুঁচো কুটুর কুটুর কি যেন কেটে চলেছে দাঁতে, ইঁদুরের বাচ্চাকে তাড়া করেছে নেউল, উদ্ নেমেছে পুকুরে, তাই পুকুরে ঘাই দিচ্ছে বড় রুইটা, এসব শব্দ নিশিকান্তর চেনা। কিন্তু আজকের শব্দটা ভিন্ন রকম। কে যেন কাঁদছে। ফুঁপিয়ে। থেকে থেকে। আপাদ-মস্তক কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল সে। কাঁথাটাকে আলাগা করে কান পর্য্যন্ত নামিয়ে নেয়। শিশির ভেজা এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস তার কানের ফুটো দিয়ে, সাবা শরীরে ঢুকে পড়ে। তার শুকনো হাড়ে কাঁপুনী জাগে। তবুও সে সজাগ হয়, কান্নার শব্দটার হদিশ পাওয়ার জন্যে। অনেক সময় সদ্য-বিয়োনো বেড়াল বাচ্চারাও মানুষের গোপন কান্নার মত্ শব্দ করে। কিন্তু বৈঠকখানায় বেড়াল আসবে কোথা থেকে। অবশ্য বাড়িতে আছে। কিন্তু সেতো বাচ্চা বিইয়েছে মাস দেড়েক আগে।

আবার কান্নার শব্দ। না, এতো বেড়ালের কান্না নয়। মানুষের এবং মেয়ে মানুষের।

— কে? কে কাঁদছ ইখেনে? উত্তর দেনা। যাঃ, বাবা! আরে কে কাঁদতেছু বল না।

নিশিকান্ত বিছানায় উঠে বসে, কাঁথা মুড়ি দিয়ে। অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে দেয়। কারো স্পর্শ পায় না।

— আরে কে রে? মেনি? না ভুতি? না বিন্তি? কেরে? ভালো জ্বালা হোলো তো। আরে কে কাঁদে বলবি তো।

নিশিকান্ত নিজের বিছানা থেকে সামান্য এগোয়। অন্ধকারে দিকস্থান হারিয়ে গেছে তার। কোনদিকে দেয়াল, কোনদিকে ছই-এর বেড়া, কিছুই মনে করতে পারে না। হাত লেগে কি উল্টে পড়ল ওটা? ওঃ আগুনের মালসা। ভাঙল নাকি? না, ছাইগুলো ছড়িয়ে পড়েছে মাটিতে। ভাগ্যিস, আগুনটা নিভে গেছে। নাহলে তো পুড়ে মরতুম রে বাবা। আগুনের মালসাটা এক হাতে সরিয়ে দিয়ে নিশিকান্ত তার ডান দিকে ঘেঁসে এগোয়। হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গীতে। শরীরটাকে এগোবার আগে আরশোলার শুড়ের মত একটা হাত বাড়িয়ে এদিক ওদিক নাড়া চাড়া করে সামনেটা দেখে নেয়। যাঃ বাবা, আবার একটা মালসা এল কোথা থেকে? কিসের মালসাটা। নিশিকান্ত মালসার ভিতর হাত ঢোকায়। ওঃ, এতো কফ্-থুতুর মালসাটা। নিশিকান্ত মালসার ভিতর থেকে কফ্-থুতু-লাগা চটচটে হাতটা বের করে এনে মাটিতে ঘসে নেয়। আবার এগোয়। একটু এগোতেই হাত লাগে ছই-এর বেড়ায়। যাঃ বাবা কুন দিকে যাচ্ছি? এখুনি তো পড়ে মরতুম। দেয়ালটা কুন দিকে তাহলে? নিশিকান্ত তার শরীরটাকে উল্টোদিকে ঘোরায়।

ছোট বৈঠকখানা এখন যেন তার কাছে এক ব্রহ্মাণ্ড। যেন গোটা ব্রহ্মাণ্ডে সেইই একমাত্র জীবিত মানুষ। আর রয়েছে বহুদূরে এক কান্নার শব্দ। গাঢ় অন্ধকার তার চোখের সামনে তুলে ধরে নানান রকম ভ্রমের ছবি। মনে হয় সামনে বুঝি গাছপালা, ঘন জঙ্গল। হাত দিয়ে ছুঁতে যায়। হাতে কিছু ঠেকে না। হামাগুড়ির ভঙ্গিতে নিশিকান্ত এগোয়।

আবার কি উল্টে পড়ল রে বাবা? কি এটা? জল? ওরে বাবা এই শীতে আবার জল। জল আবার এল কোথা থেকে? হাত ঘোরাতে ঘোরাতে জলের ঘটিটাকে স্পর্শ করে সে। তখন মনে পড়ে রম্ভা রোজ তার মাথার সামনে একঘটি জল রেখে যায় বটে। নিশিকান্ত আবার এগোয়। জল লেগেছে পায়ের যেখানটায়, কনকন করছে। যেন ঐ জায়গায়টায় আর পা নেই, শুধু ব্যথা।

হ্যাঁ, এই তো দেয়াল, যাঃ বাবা, দেয়ালটা এত দূরে? দেয়ালে বাঁ হাত ছুঁইয়ে নিশিকান্ত এগোয়। হঠাৎ লাঠির মত কি একটা তার ঘাড়ে এসে পড়ে, নিশিকান্ত ভয়ে আঁতকে ওঠে। কেউ কি লাঠি-পেটা করতে চাইছে নাকি? মাথায় মারলে তো এখুনি শেষ হয়ে যেতুম। নিশিকান্ত মাটি হাতড়ে লাঠিটাকে ছোঁয়। তখন বুঝতে পারে, লাঠিটা তারই। আবাব এগোতে থাকে সে।

কি এটা? কোমর? হ্যাঁ, কোমরই তো? নিশিকান্তর রোগা গাঁটওয়ালা পাঁচটা আঙুল সেই কোমর থেকে একবার নীচে নামে, আবার উপরে ওঠা নামা করে কিছুক্ষণ। তার হাতের স্পর্শ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরটাও কেন্নীর মত যে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেল, সেটাও বুঝতে পারে নিশিকান্ত। তবুও শরীরটাকে চারপাশ থেকে ছোঁয়ার চেষ্টা করে। বুকের সংগে মুখটাকে এঁটে রেখেছে কুঁকড়ি মেরে। তবুও মাংসের কোমলতার তারতম্য থেকে সে বুঝে নিতে পারে কোনটা স্তন, কোনটা গাল, কোনটা গলা।

— কে তুই? আরে নামটা বলনা। কেন কাঁদতেছু? এই শীতে-জাড়ে গায়ে চাদর নেই, মাটিতে শুয়ে আছু কেন? কে তুই? মেনি? না ভুতি, না বিন্তি, কে রে?

অন্ধকারে একটা নারীর শরীরকে ছুঁয়েও নিশিকান্ত বুঝতে পারে না সে কে। অন্ধকারে সব শরীরই তার কাছে এক। যতক্ষণ না কথা বলবে কেউ, তার পক্ষে বিশেষ একজনকে চিনে ওঠা কঠিন। নিশিকান্ত ক্রমাগত ঠেলা দেয় শরীরটাকে।

— আরে কে তুই, বলনা মুখ ফুটে। একবার নামটা বলতে পারতেছুনি?

হঠাৎ গাঢ় অন্ধকারেও তার চোখে আলো ফুটে ওঠে। হঠাৎ সে অনুমান করে ফেলতে পারে শবীরটা কার? ইতো নলিনী। মেনি অথবা ভুতিদের হাতে চুড়ি, কানে দুল থাকার কথা নয়। নিশ্চয়ই নতুন বৌ।

— ওমা, তুই নতুন বৌ নাকি? আরে নিজের ঘর ছেড়ে, স্বামী ছেড়ে ইখেনে পড়ে আছু কেন? শীত করে নি তোর। গায়ে একটা কাঁথা কানি চাদর মাদর কিছুটি নেই। মরবি নাকি? কি হয়েছে বলনা মোকে। তারক বকেছে নাকি? ঝগড়া হয়েছে? যা, আর কাঁদিস নি। উঠে যা। কাল সকাল বেলায় খুব বকে দুবো ওকে। আর না যদি যাবি তো মোর কাঁথাটা গায়ে দে। আয়, ইদিকে ঘোর। মোর কাছে আয় দিক্‌নি।

নিশিকান্ত নলিনীর কোঁকড়ানো শরীরটাকে নিজের দিকে ঘোরানোর চেষ্টা করে। চুড়ি পবা হাতের ঝনঝনানি দিযে নলিনী তার হাতটাকে সরিয়ে দেয়। নিশিকান্ত তবুও ছাড়ে না। আবার কাছে টানার চেষ্টা করে। ভারী সুন্দর একটা ঘ্রান পায় সে নলিনীর কম বয়সের শরীর থেকে। ভারী মোলায়েম এক রকম স্পর্শের সুখ। নলিনী পা ছুঁড়ে ধাক্কা মারে। টলে পড়ে নিশিকান্তর শরীরটা। আবার সে সিধে হযে নলিনীকে কাছে টানে। নলিনীব শরীবটাকে ছুঁতে ছুঁতে তার শরীর থেকে শীত চলে যায়। অদ্ভুত এক উষ্ণ আরাম উপভোগ কবতে থাকে তার গোটা শরীর। এবং হাতের দশটা আঙুল।

সহসা নলিনী উঠে বসে। নিশিকান্ত সেটা বুঝতে পেরেই জড়িয়ে ধরে নলিনীকে। নলিনী ধাক্কা দেয়। নিশিকান্তও ঝাঁপ দেয় প্রবল যুদ্ধে। নলিনীর কাঁচা শরীরের নরম মাংসপিণ্ডের সঙ্গে নিশিকান্তর শুকনো হাড় মাসের যুদ্ধ। মোলায়েম এই সুখটুকুকে নিশিকান্ত হাবাতে চায না। এই হঠাৎ— সুখ চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছে তাকে। সে দেখতে পাচ্ছে দিগ-দিগন্তর, আকাশ, জ্যোৎস্না, নক্ষত্র, গাঁযের রাস্তা ঘাট, পাল্কী, কার্তিকের মায়ের এক মাথা ঘোমটা, কম-বয়সের নিশিকান্ত, শালখুঁটির মত শক্ত হাত পা, ভাত খায় একসের চালের, কার্তিকের মায়ের পেটে তখনো কার্তিক আসে নি, ঠিক এই রকম একদিন ঝগড়া হযেছিল, সেদিনেব রাগী চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকুনী দিয়েছিল তিনবার, ঠিক এই কান্না, একদিন আলতা পরছে, মা পরিয়ে দিচ্ছে আলতা, পা দুটো জবা ফুলের মত, কি ভালো লাগতো তখন কার্তিকের মাকে....

হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠল নিশিকান্ত। নলিনী দাঁত বসিয়ে দিয়েছে তার ডান হাতের কব্জিতে। হাতের যন্ত্রণায় কাতরে ওঠার মুখেই উঠে পালিযে গেছে নলিনী।

ভোর বেলায় ঘুম ভেঙ্গে যায় সারা বাড়ির কলরবে। রম্ভা এসে জানায়, তারকের বৌ পালিয়ে গেছে। নিশিকান্ত শুনে অবাক হয়। তার পিচুটি ভরা চোখ দুটো সামান্য নড়ে চড়ে ওঠে। কোন কথা বলে না সে।

বেলা বাড়তে থাকে। বেলার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ বাড়তে থাকে ডান হাতের ব্যথা। ব্যথাব সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ মনে পড়তে থাকে রাত্রির ঘটনা। আর নলিনীর বদলে তার চোখে ভেসে ওঠে কার্তিকের মা-এর স্মৃতি।

মরে যাওয়ার কতকাল পরে কার্তিকের মা হঠাৎ আবার এমন জ্যান্ত হয় কি করে, সেই হিসেব কষতে কষতে নিশিকান্তর চোখ ঝাপসা হয়ে আসে অন্ধকারে।

বেহুলার ভেলা

মতি নন্দী

অমিয়া বলল, পয়সা কি কামড়াচ্ছিল। কয়লাওলার কাছে এখনো দু'মণের দাম বাকি। তাছাড়া, ওই কটা আলুতে কি হবে, ঘরে যা আছে তাও দিতে হবে দেখছি। এরপর সে বললে, টাটকা খুব,·চর্বিও কম দিয়েছে। পুতুল বলল, রোববার কোর্মা রেঁধেছিল তৃপ্তির নতুন বৌদি। খুব বেশি ঘি দিয়েছিল, তাই ক্যাটক্যাটানি শুরু করেছিল শাশুড়ী। এই নিয়ে সে কি ঝগড়া মায়েতে ছেলেতে। তারপর সে বলল, আমি কিন্তু রাঁধব বলে দিলুম। বাবুদা বলছিল পাঞ্জাবির হোটেলে নাকি দারুণ রাঁধে, আজ আসুক না একবার, দেখিয়ে দোবো'খন।

চাঁদু বলল, আগে জানলে জোলাপ নিয়ে পেটটাকে রবারের মতো করে রাখতুম। খানিকটা কাল সকালের জন্যে তুলে রেখো, চায়ে বাসি রুটি ভিজিয়ে খেতে খেতে তো জিভে চড়া পড়ে গেল। শেষকালে সে বলল, যেই রাঁধো বাবা, জবাফুলের রঙের মতো রঙ হওয়া চাই কিন্তু।

রাধু এখন বাড়ি নেই। পাঁচ বছরের খোকন শুনে শুনে কথা শেখে, সেও প্রমথর হাঁটু জড়িয়ে বলল, বাবা আমি খাব মাংস।

ওরা যাই বলুক প্রমথ লক্ষ্য করছিল চোখগুলো। ঝিকোচ্ছে বরফকুচির মতো। ওরা খুশি হয়েছে। ব্যস, এইটুকুই তো সে চেয়েছিল, তা না হলে মাসের শেষ শনিবার একদম পকেট খালি করে ফেলার মতো বোকামি সে করতে যাবে কেন।

অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথটা আরো ছোট হয়ে যায় শোভাবাজারের মধ্যে দিয়ে গেলে। বিয়ের পর কয়েকটা বছর বাজারের মধ্যে দিয়েই অফিস থেকে ফিরত, সেও প্রায় বাইশ বছর আগের কথা। তারপর বাবা মারা গেলেন, দাদারা আলাদা হলেন, প্রমথও এখনকার বাড়িটায় উঠে এল। উঠে আসার তারিখটা পাওয়া যাবে ভব শ্রীমানির খাতায়। সেই মাস থেকেই অমিয়া মাসকাবারি সওদা বন্ধ করল, ওতে বেশি বেশি খরচ হয়। তারপর কালেভদ্রে দরকার পড়েছে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার। আজ গরমটা যেন অন্যদিনের থেকে বেশি চড়ে উঠেছে, জুতোর তলায় পিচ আটকে যাচ্ছে, কোনোরকমে বাড়ি ফিরলে বাঁচা যায়।

ডাব বোঝাই একটা ঠেলাগাড়ি পথ জুড়ে মাল খালাস করছে, চারধারে যেন কাটামুণ্ডুর ছড়াছড়ি। তার ওপর বাজারের আস্তাকুঁড়টাও জিনিসপত্রের দামের মতো বেড়ে এসেছে গেট পর্যন্ত। পূব দিকের গেট দিয়েই বেরোনো ঠিক করল প্রমথ। দুটো রকের মাঝখানের পথটায় থৈ-থৈ করছে জল। চাপা-কল থেকে জল এনে ধোয়াধুয়ি শুরু করেছে দুটো লোক। ঝাঁটার জল যেন কাপড়ে না লাগে সেই দিকে নজর ছিল।

আর দু পা গেলেই মাছের বাজারটা শেষ হয়, তখুনি আচমকা জল ছুঁড়ল লোকটা। কাপড়ে লাগে নি, কিন্তু লাগতে তো পারত। বিরক্ত হয়েই সে পিছন ফিরেছিল, আর অবাক হল পিছন ফিরে।

বাজারের শেষ মাথায় দাঁড়িয়েছিল প্রমথ, যতদূর দেখা যায় প্রায় শেষ পর্যন্ত এখন চোখ চলে। ফাঁকা, খাঁ-খাঁ করছে; অদ্ভুত লাগল তার কাছে।

সকালে মাছির মতো বিজবিজ করে, তখন বাজারটা হয়ে যায় কাঁঠালের ভূতি। ঘিন ঘিন করে চলতে ফিরতে। আর এখন, চোখটা শুধু যা টক্কর খেল কচ্ছপের মতো চটমোড়া আনাজের ঢিপিতে। নয় তো সিধে মাছের বাজার থেকে ফলের দোকানগুলো, দোকানে ঝোলানো আপেলগুলো পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আপেল না হয়ে ন্যাসপাতিও হতে পারে কিন্তু লক্ষ্মীপুজোর দিনটায় একবার ওদিক মাড়াতে হয়। ফুল, পাতা ওই দিকটাতেই পাওয়া যায়, আর তখনই চোখে পড়ে ঝোলানো আপেল, সবরি কলার ছড়া, আনারস আর শীতের সময় চুড়োকরা কমলা লেবু। শীতের কথা মনে পড়লেই কপির কথা মনে আসে, আগেকার দিনে সের দরে কপি বিক্রি হত না। নাকের সামনে বাঁধাকপি লোফালুফি করতে করতে সন্নেসীচরণ হাঁক ছাড়ত, খোকাবাবু এই চলল পাঁচ নম্বরী ফুটবল, ছোকা রেঁধে খাও, গোষ্ঠো পালের মতো সট্ হবে। সন্নেসীটা যেন কি করে জেনে ফেলেছিল স্কুল টিমে প্রমথ ব্যাকে খেলে, আর গোষ্ঠ পালকে তো সে পুজো করত মনে মনে। আজকাল অনেকেই নাম করেছে, চাঁদুর মুখে কত নতুন নতুন নাম শোনা যায়। ওই শোনা পর্যন্ত। মাঠে যেতে আর ইচ্ছে করে না। সন্নেসী একদিন ফুটপাথে মরে পড়ে রইল। আজেবাজে জায়গা থেকে রোগ বাধিয়ে শেষকালে বাজারের গেটে বসে ভিক্ষে করত। সন্নেসীর সঙ্গে সঙ্গে কুলদাকে মনে পড়ল প্রমথর, চেহারা কি! যাত্রাদলে বদমাইসের পার্ট করত। বাজারে, শিবরাত্তিরে যাত্রা শুনতে আসার আগে হিসেব করে আসতে হত বাবার কাছ থেকে কতগুলো চড় পাওনা হবে। কুলদার হাতে আড়াইসেরী রুইগুলোকে পুঁটি বলে মনে হত। ওর মতো ছড়া কাটতে এখন আর কেউ পারে না। আজকাল যেন কি হয়েছে, সেদিন আর নেই। গুইরাম মরে গেছে, ওর ছেলে বসে এখন। ছেলেটা বখা। অথচ গুইরামের পানে, পোকা হাজা কিংবা গোছের মধ্যে ছোট পান ঢোকানো থাকত, কেউ বলতে পারত না সে কথা। গুইরামের দোকানের পাশে এখন একটা খোট্টানি বসে পাতি-লেবু নিয়ে। অমিয়ার জন্য রোজ লেবুর দরকার, একদিন ওর কাছ থেকে লেবু কিনেছিল প্রমথ। মাস ছয়েকের একটা বাচ্চা, বয়স দেখে মনে হয় ওইটেই প্রথম, কোলের ওপর হামলা-হামলি করছিল, বুকের কাপড়ের দিকে নজর নেই। ওর কাছে থেকে আব কোনোদিন লেবু কেনেনি সে। দুনিয়াসুদ্ধ মানুষের যেন হজমের গোলমাল শুরু হয়েছে আর লেবুও যেন এতবড়ো বাজারটায় ওই একজায়গাতেই পাওয়া যায়। দিন দিন যেন কি হয়ে উঠেছে। বুড়োধাড়ীদের কথা নয় বাদ দেওয়া গেল, কিন্তু কচিকাঁচারাও তো বাজারে আসে, বাজার পাঁচটা লোকের জায়গা।

প্রমথর বেশ লাগছে এখন বাজারটার দিকে তাকিয়ে থাকতে। ছোটবেলার অনেক কথা টুকটাক মনে পড়ছে। পেচ্ছাপখানার সামনে চুনো মাছ নিয়ে বসে একটা বুড়ী, ওকে দেখলেই আবছা মনে পড়ে মাকে। বোকার মতো হাসে, আর পায়ের আঙুলগুলো বাঁকা। ওখানটায় এখন থৈ-থৈ করছে চাপা-কলের জল। মাকে পুড়িয়ে গঙ্গায় চান করেছিল সে, সেই প্রথম গঙ্গায় চান করা। তখন কত ছোট্টই না ছিল, স্টীমারের ভোঁ শুনে জলে নামতে ভয় করেছিল তার। মাসের শেষে বাজারের ওইদিকটায় আর যাওয়া হয় না। আলু, পান আর দু-একটা আনাজ কিনেই বাজার সারতে হয়। চাঁদুটাই শুধু গাঁইগুঁই করে, কেমন যেন বাঙালে স্বভাব ওর; মাছ না পেলেই পাতে ভাত পড়ে থাকে। খিটিমিটি লাগে তখন অমিয়ার সঙ্গে। চালের সের দশ আনা; পাতে ভাত ফেলা কেই বা সহ্য করতে পারে, পয়সা রোজগার করতে না শিখলে চাঁদুটা আর শোধরাবে না। রাধু একটা টিউশনি পেয়েছে। তবে আই. এ-টা পাস করলে অন্তত গোটাকুড়ি টাকা মাইনে হত। ওর কিংবা পুতুলের খাওয়ার কোনো ঝামেলা নেই, অমিয়ারও না। পাতে যা পড়ে থাকে অমিয়া পুতুলকে তুলে দেয়, বাড়ের সময় মেয়েদের খিদেটাও বাড়ে। শিগগিরই

আর একটা দায় আসবে। পুতুলের বিয়ে। মুখটা মিষ্টি, রঙটা মাজা, খাটতে পারে, দেখেশুনে একটা ভালো ছেলের হাতে দিতে হবে।

হটিয়ে বাবুজী।

এবার এই ধারটা ধোয়া হবে, পিছিয়ে এল প্রমথ। সেই জায়গাটা দেখা যাচ্ছে। একটা বুড়ো বসত ওখানে। পেয়ারা, আমড়া, কদবেল ছোট্ট ঝুড়িতে সাজিয়ে বুড়োটা দুপুরে বসে বসে ঝিমোত। সে কি আজকের কথা। বাবা মারা যাবার অনেক আগে, বড়দার তখন থার্ড ক্লাস, যুদ্ধ তখন পুরোদমে চলছে। সরু চালের দর এগারো টাকা, কাপড়ের জোড়া বোধহয় আট টাকায় উঠেছিল; সে আজ চল্লিশ বছর হয়ে গেল। স্কুলের টিফিনে একটা আধলা নিয়ে তিন-চারজন তারা আসত, পয়সায় আটটা কাঁচা আম। আর এ বছর দশ পয়সা জোড়া দিয়ে একদিন মাত্র সে কাঁচা আম কিনেছে, তাও কুসিকুসি। আহা, সে কি দিন ছিল। প্রমথর ইচ্ছে করে বুড়ো যেখানটায় বসত, সেখানে গিয়ে একবার দাঁড়ায়। ওখানে তখন রক ছিল না, দেয়ালের খানিকটা বালিখসা ছিল। দুটো ইঁটের ফাঁকে গর্তটায় দোক্তা রাখত বুড়োটা। গর্তটা এখনো আছে কিনা দেখতে ইচ্ছে করছে। ইচ্ছেটা খুব ছেলেমানুষের মতো। এত বছর পরেও কি আর গর্তটা থাকতে পারে, ইতিমধ্যে কতই তো ওলট-পালট হয়ে গেছে, ভেঙেছে, বেড়েছে, কমে নি কিছুই। তবু এই দুপুরের বাজারের চেহারাটা একরকমই আছে। ছেলেমানুষ হয়ে যেতে ইচ্ছে করছে, বুকটা টনটন করছে, তবু ঝরঝরে লাগছে গা-হাত-পা।

এই যে আসুন বাবু।

প্রমথ পিছন ফিরল, গোড়ার দোকানটা লক্ষ্য করে সে এগিয়ে এল। সদ্য ছাল ছাড়িয়ে ঝুলিয়েছে। পাতলা সিল্কের শাড়িজড়ানো শরীরের মতো পেশীর ভাঁজগুলোকে রাক্ষুসে চোখে তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে।

কত করে দর যাচ্ছে।

তিন টাকা।

ভাবলে অবাক লাগে। চাঁদুর মতো বয়সে ছ-আনা সের মাংস এই বাজার থেকেই সে কিনেছে। তখন প্রায় সবই ছিল মুসলমান কসাই। ছেচল্লিশ সালের পর কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল।

একসের দিই?

উৎসুক হয়ে উঠেছে লোকটার চোখ আর ছুরি। এর মতো মুন্নাও হাসত, তার একটা দাঁত ছিল সোনার, তবে মুন্নাকে কিছু বলার দরকার হত না, গর্দান থেকে আড়াই সের ওজন করে দিত। সেই মুন্না বুড়ো হল, তার ছেলে দোকানে বসল। তখন সংসার আলাদা হয়ে গেছে। দেড় সের নিত তখন প্রমথ। ঘোলাটে চোখে তাকাত বুড়ো মুন্না, চোখাচোখি হলে হাসত, চোখ ঝিকিয়ে উঠত। রায়টের সময় মুন্নাকে কারা যেন মেরে ফেলল।

একসের দিই বাবু?

না তিন পো, গর্দান থেকে দাও।

ওজন দেখল প্রমথ, যেন সোনা ওজন করছে। পাসানটা একবার দেখে নেওয়া উচিত ছিল। থাকগে ওরা লোক চেনে। তিনটে টাকা পকেটে ছিল। বাকি বারো আনা থেকে আলু, পেঁয়াজ কিনতে হবে। মাইনে হতে এখনো ছ-সাত দিন বাকি। ট্রামভাড়ার পয়সাও রাখতে হবে। মাংসের ঠোঙাটা তুলে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল প্রমথ।

মেটুলি দিলে না যে, তিনটাকা দর নিচ্ছ, আমরা কি মাংস কিনি না ভেবেছ।

লোকটা একটুকরো মেটুলি কেটে দিল। অনেকখানি দিয়েছে, অমিয়া দেখে নিশ্চয় খুশি হবে।

রাস্তায় পড়েই প্রমথব আবার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল। বাবার সঙ্গে ভবর জ্যাঠা হরি শ্রীমানির দোকানে এসেছিল এক সন্ধ্যায়। পাশেই ছিল মাটিব খুরি-গেলাসের দোকান। তখন বিয়ের মরশুম, একহাজার খুরিগেলাস কিনল কাবা যেন। একহাজার লোক খাওয়ানোর কথা তো এখন ভাবাই যায় না। স্বদেশ কনফার্মড হবার পর বিয়ে করল। বরযাত্রী হয়েছিল আত্মীয়-স্বজন, অফিসের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন মিলিয়ে তিরিশ। কন্যাপক্ষ মাংস খাইয়েছিল। কায়দা করে রাঁধলে মাছের থেকে সস্তা হয়। স্বদেশের বিয়েও আজ সাতমাস হয়ে গেল। ছেলেও নাকি হবে। তবু তো সে সাতমাস আগে মাংস খেয়েছে। কিন্তু বাড়ির ওরা, অমিযা, পুতুল। রাধু হন্যে হয়ে চাকরি খুঁজছে, একটা পয়সাও বাজে খবচ করে না। চাঁদু ভালো ফুটবল খেলে, হয়তো বন্ধুরা খাওয়ায়ও! ছেলেটা ভালোমন্দ খেতে ভালোবাসে, আর খেতেও পারে। এইটেই তো খাওয়ার বয়স। অমিযার খুড়তুতো বোনের মেয়ে শিলুর বিয়ের কথা শুনে কি লাফালাফিটাই জুড়েছিল। নেমন্তন্নে অবশ্য যাওয়া হয় নি। অন্তত একটা সিঁদুর-কৌটোও তো দিতে হত। চাঁদুটা আজ খুব খুশি হবে, ওরা সকলেই খুশি হবে।

বড় রাস্তার ঠিক মধ্যিখানেই কালীমন্দির। হাতে মাংসের ঠোঙা। চোখ বন্ধ করে মাথা ঝুঁকিয়ে দূর থেকেই প্রণাম জানিয়ে প্রমথ রাস্তা পার হল। পর্দা-ফেলা রিক্‌শা থেকে গলা বার করে দুটি বৌ প্রমথর পাশ দিয়ে চলে গেল।

সিনেমা হলগুলো আজকাল এয়ারকণ্ডিশন করা হয়েছে। প্রমথ ভাবতে শুরু করল, তা না হলে এই অসহ্য দুপুরে পারে কেউ বন্ধ ঘরে বসে থাকতে। তবু শখ যাদের আছে তারা ঠিক যাবেই, অমিয়ার কোনো কিছুতেই যেন শখ নেই আজকাল। অথচ মেজবৌদি, তার আপন মেজদা যিনি ডাক্তার হয়েই আলাদা হয়ে গেছেন, তার বৌ এখনো নাকি এমন সাজে যে, ছেলের জন্যে পাত্রী দেখতে গেলে, মেয়ে-বাড়ির সকলে গা টেপাটেপি শুরু করেছিল। মেয়েকে ফিরে সাজতে হয়েছিল ওর পাশে মানাবার জন্যে। এ-খবর অমিয়াই তাকে দিয়েছিল। ওর শখ এখন এইসব খবর যোগাড় করাতে এসে ঠেকেছে। অথচ সাজলে এখনো হয়তো পুতুলকে হার মানাতে পারে।

গলিটা এবার দেখা যাচ্ছে, ওখানে ছায়া আছে। এইটুকু পথ জোরে পা চালাল প্রমথ।

ভাবনারও একটা মাথামুণ্ডু আছে। অমিয়া যতই সাজগোজ করুক পুতুলের বয়সটা তো আর পাবে না। সতেরো বছরের একটা আলাদা জেল্লা আছে, দেখতে ভালো লাগে। অমিয়ার বিয়ে হয়েছিল সতেরো বছরে, সেও পুতুলের মতো লাজুক আর ছটফটে ছিল।

হাড়গোড়সার ছেলের হাত-পায়ের মতোই ন্যাতানো গলিটা। হাল্‌কা বাতাস পর্যন্ত স্যাঁতসেতিয়ে যায়। এ গলিতে ঢুকলে গায়ে চিটচিটে ঘাম হয়। কোঁচাটা পকেটে থাকছে না আলু আর পেঁয়াজের জন্যে। পেটের কাপড়ে গুঁজে দিতে একটুক্ষণ দাঁড়াল প্রমথ। ওপর থেকে উকিলবাবুর বিধবা বোন দেখছে। প্রথম ঠোঙার দিকে তাকাল। হ্যাঁ, ওপর থেকেও বোঝা যায় এর মধ্যে মাংস আছে। নন্দীবাড়ির সঙ্গে ওর খুব ভাব। ছোট মেয়ের শ্বশুর বুঝি কোন এক উপমন্ত্রীর বন্ধু। তাই নন্দীগিন্নি ধরাকে সরা দেখে, অমিয়া দুচোখে দেখতে পারে না এই মানুষগুলোকে। উকিলবাবুর বোনের দেখা মানেই পাড়ার সব বাড়ির দেখা। খবরটা শুনলে অমিয়া নিশ্চয় খুশি হবে।

বাড়ি ঢোকার মুখে দোতলার মিহিরবাবুর সঙ্গে দেখা হল প্রমথর। এ বাড়িতে অল্পদিন এসেছে। মুখচোরা, বৌয়ের মতোই মেশে না কারুর সঙ্গে। শুধু কবিতা আর রাজনীতির কথায় মুখে খই ফোটে।

দেখেছেন তো আবার স্ট্রাইক কল করেছে, বেস্পতিবার।

শুনেছি বটে, আপিসে বলছিল সবাই, যা মাগ্‌গিগণ্ডার বাজার, আগের বার এগারো সিকে ছিল, এখন তিনটাকা।

ঠোঙা-ধরা হাতটা দোলালো প্রমথ। কিন্তু মিহিরবাবুর নজর তাতে আটকালো না।

এখন তবু তিনটাকা। এক-একটা ফাইভ ইয়ার যাবে আর দেখবেন দামও পাঁচগুণ চড়বে।

অন্য সময় হলে মিহিরবাবুর সঙ্গে একমত হত প্রমথ। কিন্তু সে যা চাইছিল তার ধার দিয়েও গেল না কথাগুলো। রোববার মিহিরবাবুদের মাংস রান্না হয়েছিল। গরম মসলা গুঁড়োবার জন্যে হামানদিস্তেটা নিয়েছিল। এখনো ফেরত দেয় নি। বোধহয় ভেবেছে, ওদের আর কিসে দরকার লাগবে, যখন হোক ফিরিয়ে দিলেই হবে। মিহিরবাবু লোক ভালো। তবু প্রমথর মেজাজ তেতে উঠল ক্রমশ।

আরে মশাই স্ট্রাইক-ফাইক করে হবেটা কি. তাতে পাঁচটাকার জিনিস একটাকায় বিকুবে?

কিছুটা তো কমবে।

আপনাদেব ঐ এক কথা।

প্রমথ উঠোনের কোণে রান্নাঘরের সামনেব বকে ঠোঙাটা নামিয়ে বাখল। গলার আওয়াজে অমিয়া বেরিয়ে এল। তার পিছনে পুতুল আব চাঁদু। মিহিরবাবু ওপরে উঠে গেলেন। তাবপব ওরা কথা বলল। ওদের চোখগুলো বরফ-কুচির মতো ঝিকিয়ে জুড়িয়ে দিল প্রমথকে।

এইটুকুই সে চেয়েছিল। খুশি-হোক অন্তত আজকের দিনটায়। জিনিসের দাম বাড়ছে, স্ট্রাইক হবে, মিছিল বেরোবে, ঘেরাও হবে, পুলিশ আসবে, রক্তগঙ্গা বইবে, এ তো হামেশাই হচ্ছে। মানুষকে যেন কোন কামার তাতিয়ে তাতিয়ে ক্রমাগত পিটিয়ে চলেছে বিরাট একটা হাতুড়ি দিয়ে। সুখ নেই, স্বস্তি নেই, হাসি নেই।

এসব ভাবনা আজ থাক। খোকনকে কোলে নিয়ে হাসতে শুরু করল। প্রমথ ওদেব দিকে তাকিয়ে।

রোদের কটকটে জ্বলুনি এখন আব নেই। বেলা গড়িয়ে এল। অমিযা তাড়া দিচ্ছে দোকানে যাবার জন্যে। ঘরে আদা নেই। বঁটি সরিয়ে উঠল প্রমথ। এতক্ষণ তার মাংস কোটা দেখছিল খোকন। চাঁদু বিকেলেব শুরুতেই বেবিয়েছে। কোথায় ওব ফুটবল ম্যাচ আছে। বাটনা বাটতে বাটতে পুতুল খোঁজ নিচ্ছে চৌবাচ্চাব। দেবি হলে বালতিতে শ্যাওলা সুদ্ধ উঠে আসে।

পাড়াব মুদির দোকানে আদা পাওয়া গেল না। তাই দূবে যেতে হল প্রমথকে। ফেরাব সময় খোকনকে দেখল রাস্তায় খেলছে। ওব সঙ্গীদেব মধ্যে ভুবন গয়লার নাতিকে দেখে ডেকে নেবার ইচ্ছে হল। তারপবই ভাবল, থাক, এখন বাড়ি গিয়েই বা করবে কি। তাছাড়া, ঘুপচি ঘরের মধ্যে আটকা থাকতেই বা চাইবে কেন। খোকনকে ভাল জামা-প্যান্ট কিনে দিতে হবে, উকিলবাবুব ছেলেদের কাছাকাছি যাতে আসতে পারে। উকিলবাবুর ছেলেরা বাসে স্কুল যায়, বেশ ইংরিজিও বলতে পাবে ওই বাচ্চা বয়সে।

মাংসে বাটা-মসলা মাখাচ্ছিল অমিয়া। প্রমথকে দেখা মাত্রই ঝেঁঝে উঠল।

এত দেরি করে ফিরলে, এখন বাটবে কে।

কেন, পুতুল কোথায়?

বিকেল হয়েছে, তার কি আর টিকি দেখাব জো আছে। সেজেগুজে বিবিটি হয়ে আড্ডা দিতে গেছে।

আচ্ছা আমিই নয় বাটছি।

বঁটি পাতল প্রমথ আদার খোসা ছাড়াবার জন্যে। অনেকখানি শাঁস উঠে এল খোসাব সঙ্গে। সাবধানে বটির ধার পরীক্ষা করল, ভোঁতা। তাহলে অত পাতলা করে খোসা ছাড়ায় কি করে অমিয়া, অভ্যাসে! অভ্যাস থাকা ভালো, তাহলে সময় কেমন করে যেন কেটে যায়। অবশ্য আলু বা আদার খোসা ছাড়িয়ে কতক্ষণ সময়ই বা কাটে। তবু ঘর-সংসার, রান্নাবান্না, ছেলেপুলে মানুষ করা, এটাও তো একবকমের অভ্যাসেই করে যায মেয়েরা, নাকি স্বভাবে করে। অমন স্বভাব যদি তাব থাকত, প্রমথ ভাবল বাঁচা যায। জীবনটা যেন

ডালভাত হয়ে গেছে। ওঠানামা নেই, স্বাদগন্ধ নেই, কিছু নেই, কিছু নেই, তবু কেটে যাচ্ছে দিনগুলো। আশ্চর্য এই ভোঁতার মতো বেঁচে থাকাটাও একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। বদ অভ্যাস।

থাক, তোমার আর কাজ দেখাতে হবে না।

অমিয়ার হাতে মসলা লেগে, হাত ধুয়ে জলভরা বাটিটা রেখে দিল সে। শিলের ধাবে আদাগুলো ঘষে নিয়ে বাটতে শুরু করল। কত সহজে কাজটা করে ফেলল ও, প্রমথ ভাবল, এটাও এসেছে ওই অভ্যাস থেকে। হাত-ধোয়া জলটুকু অমিয়া তো নর্দমাতেও ফেলতে পারত।

বাড়িতেই বসে থাকবে নাকি, বেরোবো না?

কোন কথা বলল না প্রমথ। অমিয়া মুখ ফিরিয়ে তাকাল তার দিকে।

খোকনের একটা ভালো নাম ঠিক করতে হবে।

করো না।

উকিলবাবুর ছেলেদের নামগুলো বেশ।

ওরা সাহেবি স্কুলে পড়ে শুনেছি, ছোটটা তো খোকনের বয়সী।

হ্যাঁ, বড়োটা শুনেছি ইংরিজিতে কথা বলতে পারে।

রামগতির পাঠশালায় খোকনকে ভর্তি করে দিও, দুপুরে বড় জ্বালায়।

উঠে পড়ল প্রমথ। ভেবেছিল আজ আর বাড়ি থেকে বেরোবে না। মাংস ফুটবে, ছেলেমেয়েরা কাছাকাছি জড়ো হবে, গল্প হবে এটা সেটার, আসন পেতে থালা সাজিয়ে দেবে অমিয়া, একসঙ্গে সকলে খেতে বসবে, গরম ভাত, গরম মাংস। অমিযা তাকিয়ে আছে, গলায় চটের মতো ঘামাচি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল প্রমথ।

উকিলবাবুর রকে বসে ছিলেন গৌর দত্ত। প্রমথকে দেখে কাছে ডেকে বললেন, দেখেছ কেমন গরম পড়েছে, এবার জোর কলেরা লাগবে।

নড়েচড়ে বসলেন গৌর দত্ত। প্রমথ ওঁব পাশে বসল।

শুধু কলেরা, আবার ইনফ্লুয়েঞ্জাও শুরু হয়েছে।

লক্ষ্য করে দেখলুম জানো—

গৌর দত্ত প্রমথর গা ঘেঁষে ফিসফিসিয়ে প্রায় যে-সুরে অনিল কুণ্ডুকে তার সংসাব থেকে বিধবা ভাজকেআলাদা করে দেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন, সেই সুরে বললেন, লক্ষ্য করে দেখলুম, জানো বোমাটা ফাটার পরই এই ইনফ্লুয়েঞ্জা শুরু হয়েছে, গরমও পড়েছে, ঠিক কিনা।

হ্যাঁ, গরমটা এবারে তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না।

লক্ষ্য করেছ যত বোমা সব জাপানের কাছাকাছি ফাটাচ্ছে। তার মানে কি? ইণ্ডাস্ট্রিতে খুব ফরোয়ার্ড বলেই তো ওদেব এত রাগ! আমাদের পুলুব আপিসে একটা জাপানি আসে, ভালো ইংরিজি জানে না, কথা বলতে খুব অসুবিধে হয় পুলুর, ও তো ফার্স্ট ডিভিশনে বি. এ. পাস করা। তা জিজ্ঞেস করেছিল নেতাজীর কথা। ওরা আবার আমাদেব চেয়েও শ্রদ্ধাভক্তি করে। কি উত্তর দিলে জানো? বোসেব মতো কেউ থাকলে তোমাদের ফাইভ ইযাব প্ল্যানগুলোয় চুরি হত না। ব্যাপাবটা বুঝতে পারলে!

হ্যাঁ, জিনিসপত্তর যা আক্রা হচ্ছে দিনকে দিন। মাংস তিন টাকায় উঠেছে।

এনেছ বুঝি আজ?

সামনের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলেন গৌর দত্ত। অন্যমনস্কের মতো লাঠিটা ঘোরাতে ঘোরাতে আবার বললেন, কি গরম পড়েছে, টিকে নিয়েছ? খাওয়া-দাওযা সাবধানে কোরো। ছেলেপুলেব সংসার, বলা যায় না কখন কি হয়।

হলে আর কি করা যাবে, সাবধানে থেকেও তো লোকে রোগে পড়ে।

ওই তো ভুল করো। আজ তোমার যদি, ভগবান না করুন, ভালো মন্দ কিছু একটা হয়, তখন সংসারের অবস্থাটা কি হবে ভেবেছ?

অস্বস্তিতে ছটফট করে উঠল প্রমথ। এসব কথা এখন ভালো লাগছে না। বোধহয় সংসারে গৌর দত্তর আর কিছু দেবার বা নেবার নেই। চাগিয়ে তোলা দরকার, আহা বুড়ো মানুষ।

একটু চাখবেন নাকি?

কি এনেছ, খাসি? রাঙ না সিনা?

গর্দান।

এ হে, খাসির রাঙ দারুণ জিনিস।

গৌর দত্তর গালে যেন পিঁপড়ে কামড়াল। চুলকোতে চুলকোতে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

বুঝলে আগে খুব খেতুম। সামনে জ্যান্ত পাঁঠা বেঁধে রেখেই হাঁড়ি হাঁড়ি ভাত উড়িয়ে দিতে পারতুম। এখন ছেলেরা লায়েক হয়েছে, রোজগার করছে, বৌদের হাতে সংসার। পুলুটাও হয়েছে বৌ-ন্যাওটা, বুড়ো বাপের যত্ন-আত্তির দিকে নজর নেই। তোমার বৌদি বেঁচে থাকলে এ অবস্থাটা হত না।

টিকিট কাটার সঙ্গে সঙ্গে বাস বিকল হলে যাত্রীদের মনের অবস্থার মতো আস্তে আস্তে থেমে গেলেন গৌর দত্ত।

দুঃখ হচ্ছে প্রমথর। বুড়ো মানুষটার নিজের বলতে আর কিছু নেই। এখন কোনোরকমে টেনেটুনে চিতায় ওঠার অপেক্ষা। যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন জীবনটা ধুকপুক করবে, সাধ-ইচ্ছে তৈরি হবে, পূরণ করতে চাইবে, অথচ পারবে না। এমন বাঁচার থেকে মরা ভালো। আহা বুড়ো মানুষটা মরবেই বা কেন।

চলুন গৌরদা, আজ একটু বেরিয়ে আসা যাক গঙ্গার ধার থেকে।

সে বড় দূর ভাই, তার চেয়ে পার্কে বরং গোটা কতক চক্কর দিয়ে আসি।

দুজনে উঠে দাঁড়াল। রাধু বাড়ি ফিরছে। প্রমথ তাকিয়ে থাকল তার দিকে। জড়োসড়ো ভঙ্গিতে ওদের পাশ দিয়ে রাধু চলে গেল।

তোমার বড় ছেলেটি ভালো।

হাসল প্রমথ।

হাঁটতে হাঁটতে গৌর দত্ত বললেন, ওরা আবার খুঁজবে হয়তো।

পার্কে ঢুকেও অনেক কথার জের টেনে তিনি বললেন, খুঁজলে আর কি হবে, নিজেরাই গপ্পোটপ্পো করবে। আশুর মেয়েকে নাকি মারধোর করেছে শাশুড়ি, আজ ওর যাবার কথা ছিল, কি ফয়সালা হল কে জানে। আমি তো বলেছিলুম হাতে-পায়ে ধরে মিটিয়ে আসতে খাট বিছানা টাকা তো এজন্মে দেবার ক্ষমতা হবে না আশুর।

প্রমথর এসব কথায় কান নেই, সে তখন ভাবছে পুতুল এতক্ষণে ফিরেছে ওর বন্ধুর বাড়ি থেকে। উনুন ধরিয়েছে। অমিয়া ওকে দেখিয়ে দিচ্ছে কেমন করে খুন্তি ধরলে মাংস কষাতে সুবিধে হয়। ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমেছে মেয়েটার কপালে, নাকের ডগায়। ঠোঁটদুটো শক্ত করে টিপে ধরেছে। চুড়িগুলো টেনে তুলেছে। দপদপে স্বাস্থ্য, বেশিদূর উঠবে না। পাতলা ভাপ উঠছে হাঁড়ি থেকে। না, এখনই কি উঠবে। এখনো তো জলই বেরোয় নি। অ[illegible] তো কখনো রাঁধে নি, নিশ্চয় বুক দুরদুর করছে আর আড়চোখে তাকাচ্ছে অমিয়ার দিকে। অমিয়া কি করছে? গালে হাত দিয়ে পিঁড়িতে বসে দেখছে। কি দেখছে, পুতুলকে? তাই হবে। হয়তো খুব মিষ্টি দেখাচ্ছে ওর কচি মুখটা আর ভাবছে হয়তো যে-কটা গয়না আছে ভেঙে কি কি গড়াবে ওর বিয়ের জন্যে। এতক্ষণে গন্ধে ম-ম করছে বাড়িটা। খোকন নাক কুঁচকে শুঁকছে ভালো লাগছে গন্ধটা তাই মিটিমিটি হাসছে আর হাঁড়ির কাছে আসার তাল খুঁজছে। পারবে না, অমিয়ার নজর বড় কড়া।

দুচার দিন হয়তো বলাবলি করবে, বলবে গপ্পে লোক ছিল, বেশ জমিয়ে রাখত সন্ধেটা। তারপর একসময় ভুলে যাবে। যেমন নির্মলদা কি নীলুকাকা মরে যাবার পর আর এখন কেউ নামই করে না। তোমরাও তেমনি ভুলে যাবে আমাকে।

দগদগে লাল হয়ে আছে কেষ্টচুড়ো গাছের চিমসে ডালগুলো। ওদের ফাঁক দিয়ে আকাশটাকে কেমন অন্য রকম লাগে যেন। লাগে চোখ নয় মনটা। রাধু টিউশনিতে যাবার আগে নিশ্চয় দেখেছে। দেখে কিছু বলেছে কি? বড় কম কথা বলে ছেলেটা। তেইশ বছরেই বুড়িয়ে গেছে ওর শরীর-মন। ওকে দেখলে অস্বস্তি হয়। মনে হয় হাসি-খুশি আনন্দ যেন কিছুই নয়। জীবনটা শুধু দুখ্যু, দুখ্যু আর দুখ্যু কাটানোর চেষ্টাতেই ভরা। অথচ ওব বয়স তেইশ। ওর বয়সটা যেন চিমসে-কাঠি ডালে ফুল ফোটার মতো। বয়সের ফাঁকফোকর দিয়ে যৌবনটাকে কেমন বুড়োটে দেখায়।

রকে বসে থাকলে এতক্ষণে আরো পাঁচজন জুটে যেত। তখন শুধু আমাকে নয় চক্ষুলজ্জার খাতিরে ওদেরও বলতে হত। তার চেয়ে এই বরং ভালো হয়েছে, বেমালুম খিদেটাও বেশ চনচনে হল।

কি তখন থেকে ভ্যাজর ভ্যাজর করছে বুড়োটা। বয়স বাড়লে হ্যাংলামোও বাড়ে। আঃ, কি হুড়োচাপ্পি শুরু করেছে ছেলেগুলো, মানুষ দেখে ছুটবে তো। লাগল হয়তো বুড়ো মানুষটাব। আহা ছেলেবৌরা যত্ন করে না। ফাঁসির আসামীও তো শেষ ইচ্ছা পূরণের সুযোগ পায়, অথচ মুখ ফুটে ওর ইচ্ছের কথা বলতে পারবে না কাউকে। গুমরে গুমরে মনেব মধ্যে গুমোট তৈরি করবে। এবারের গরমটা অসহ্য, তবু নাকি বেতিয়াফেরত মানুষগুলো হাওড়া-ময়দানে ভাজাভাজা হচ্ছে। বাইরে-ভেতবে সবখানেই অসহ্য হয়ে উঠেছে মানুষ। এই যে সকলে পার্কে বেড়াতে এসেছে, সেও তো গুমোট কাটাতেই। অমিয়াও আসতে পারে। কি এমন কাজ তার, ওইটুকু তো সংসার। না, এখন সংসারেব কথা থাক, তার চেয়ে ববং ওই গাছটার দিকে তাকানো যাক। রাধাচুড়ো। একটাও ফুল নেই গাছে। থাকা উচিত ছিল। কেননা কেষ্টচুড়োয ফুল ধরেছে। এই হয়, একটা আছে তো আব একটা নেই, সুখে জোড বাধে না কোনো কিছুই। এখন তার খুশি থাকতে ইচ্ছে করছে। অথচ অমিয়া, কি জানি এখন হয়তো পুতুলকে বকছে দু'পলা তেল বেশি দিয়ে ফেলেছে বলে।

চলুন গৌরদা, এবার ফেরা যাক।

এর মধ্যে? রান্না হয়ে গেছে কি!

রান্নার দেরি আছে। আপনাকে নয় বাড়িতে পাঠিয়ে দেবো চাঁদুকে দিয়ে।

তাই দিও, আমি বরং একটু ঘুরি, আর শোনো, চাঁদুকে বোলো আমার হাতে ছাড়া কাউকে যেন না দেয়, কেমন।

প্রমথ কাঁদুনে গ্যাসের শেল ফাটতে দেখেছে এই সেদিন, অনেকেব সঙ্গে সেও রুদ্ধশ্বাসে ছুটেছে, ঘোড়সোয়ার পুলিশের নাগাল ছাড়িয়েও ছুটেছে। তাই সে বোঝে অমিয়ার অবস্থাটা যখন উনুনে আগুন পড়ে। কোথায় পালাবে সে ওইটুকু বাড়ির চৌহদ্দি ছাড়িয়ে? যেখানেই যাক না, ধোঁয়া তাকে খেতে হবেই, ওই সময়টায় সকলেই উনুন ধরায়। ছাদে যে উঠবে তারও ফুরসত নেই। ঘরে বিকেলে কেউ থাকে না। ভাড়াটের বাড়ির একতলা সদর দরজা সব সময় হাট করা, মুহূর্তের জন্যেও ঘর ছাড়ার উপায় নেই।

আজও সেই রোজকার অবস্থা, তবু রক্ষে উনুন প্রায় ধরে গেছে। নিজের মনে গজগজ করছে অমিয়া আর হাওয়া দিচ্ছে। সাহায্য করতে গেল প্রমথ। তিড়বিড়িয়ে জ্বলে উঠল অমিয়া।

থাক, আর আদিখ্যেতা করতে হবে না।

অমিয়া চুল বেঁধেছে, গা ধুয়েছে, শাড়িটাও পরিষ্কার। প্রমথ বলল, তুমি পুতুলকে ডেকে আনো, ততক্ষণ আমি হাওয়া দিচ্ছি।

পাখাটা নামিয়ে দম-কাটা স্প্রিঙের মতো উঠে দাঁড়াল অমিয়া।

দাঁড়াও, মেয়ের আড্ডা শেষ হোক তবে তো ঘরের কথা মনে পড়বে। আসুক আজ, ওর আড্ডা ঘোচাচ্ছি।

তরতর করে ছাদে উঠে গেল অমিয়া। সেখান থেকে একটু গলা তুলে ডাকলে তৃপ্তিদেব বাড়ি থেকে শোনা যায়। ছাদ থেকে অমিয়া নামল আর সদর ঠেলে পুতুলও বাড়ি ঢুকল প্রায় একই সঙ্গে। একটুও আভাস না দিয়ে অমিয়া এলোপাথাড়ি চড় বসিয়ে দিল পুতুলের গালে, মাথায়, পিঠে।

পই পই করে বলি সন্ধে হলেই বাড়ি ফিরবি, সেকথা গ্রাহ্যই হয় না মেয়ের। কি এত কথা ফিসফিস, গুজগুজ, তৃপ্তির মাস্টারের সঙ্গে হাসাহাসি, কেউ যেন আর দেখতে পায় না, না?

বারে, আমি হাসাহাসি করেছি নাকি?

যেই করুক, তুই ওখানে থাকিস কেন, ঘরে আমি একা, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে সে খেয়াল থাকে না কেন? হাঁড়িটা উনুনে বসা।

অমিয়া ঘরে চলে গেল। উঠোনে গোঁজ হয়ে আঁচলটা মুঠোয় পাকাতে থাকল পুতুল। খামোকা মার খেল মেয়েটা। এইটুকু তো বয়েস, খাঁচার মতো ঘরে কতক্ষণ আর আটকা থাকতে মন চায়। উঠে এল প্রমথ রান্নাঘর থেকে।

মা যা বলল তাই কর।

ওর পিঠে হাত রেখে আস্তে ঠেলে দিল প্রমথ। পিঠটা বেঁকিয়ে ঠেলাটা ফিরিয়ে দিল পুতুল। গঙ্গাজলের ছড়া দিতে দিতে ওদের দেখে গেল অমিয়া।

রাগ করতে হবে না আর, কি এমন অন্যায় বলেছে? আজ বাদে কাল বিয়ে হবে, হাসাহাসি না করলেই তো হয়।

আমি মোটেই হাসাহাসি করিনি, তবু মিছিমিছি—

ওর পিঠে হাতটা রেখে দিয়েছিল প্রমথ, তাই আঙুল বেয়ে উঠে এল বাকি কথাগুলো। থরথরিয়ে পুতুল কাঁপছে।

বিয়ের পর যত পারিস হাসিস, কেউ বারণ করবে না। বড় হয়েছিস, বুদ্ধি হয়েছে তোর, তৃপ্তিদেব যা মানায় আমাদের কি তা সাজে?

শাঁখ বাজাচ্ছে অমিয়া। পুতুলের কাঁপুনি যেন বেড়ে গেল। বিশ্রী শাঁখের আওয়াজটা। শুভকাজে শঙ্খধ্বনি দেওয়া হয়, অথচ এখন মনে হচ্ছে মাটি টলছে ভূমিকম্পে, তাই মেয়েটা কাঁপছে। মৃদু ঠেলা দিল প্রমথ। এক-পা এগিয়ে তারপর ঘরে ছুটে গেল পুতুল।

দাও আরো আদর। দিন-দিন যেন বাঁদরী তৈরী হচ্ছে। অনেক দুখ্যু আছে ওর কপালে, বলে রাখলুম।

হাঁড়ি নিয়ে রান্নাঘরে যাচ্ছে অমিয়া, প্রমথ নরম সুরে বলল, আজকে না বকলেই হত।

কেন, আজ রথ না দোল যে বকব না।

শোবার ঘরে এল প্রমথ। পুতুল ফোঁপাচ্ছে। স্তূপ করা বিছানায় মুখ গুঁজে। শব্দটা সর্দি ঝাড়ার মতো শোনাচ্ছে। তার ওপর প্যাচপেচে গরম।

লক্ষ্মী মা আমার ওঠ, যা রান্নাটা শিখে নে। আরে বোকা শ্বশুরবাড়ীতে যখন রাঁধতে বলবে তখন যে লজ্জায় পড়বি, আমাদেরও নিন্দে হবে।

পুতুলের ফোঁপানি থামল। একটা চোখ বার করে, স্বরটাকে নামিয়ে বলল, বিয়ে করলে তো।

হেসে উঠল প্রমথ, পুতুল মুখ লুকোল।

তোর মাও বিয়ের আগে ঠিক অমন কথা বলত।

পুতুল আবার মুখ তুলল। চোখের কাজল ধ্যাবড়া হয়ে গেছে। আহা, মেয়েটা কেঁদেছে।

তুমি কি করে জানলে, মা বুঝি বলেছিল?

একই সঙ্গে দুজনে দরজার দিকে তাকাল। না অমিয়া নয়, খোকন এল।

চোখাচোখি হল পুতুল আর প্রমথর, হাসল দুজনেই। মেয়েটা দারুণ ভীতু হয়েছে। ওর মাও অমন ছিল, খালি দরজার দিকে তাকাত। রাত্রে ছাতে উঠত, তাও কত ভয়ে ভয়ে।

বলো না, মা বুঝি সেসব গপ্পো করেছিল?

হেসে খোকনের চুলে বিলি কাটল প্রমথ। সেসব গল্প কবে করেছিল অমিয়া, তা কি এখনো মনে আছে। চেষ্টা করলে টুকরো টুকরো হয়তো মনে পড়বে। কিন্তু সেকথা কি মেয়েকে বলা যায়। একদিন গলি দিয়ে গিয়েছিল একটা বেলফুলওয়ালা, কত কাণ্ড করে মালা কেনা হয়েছিল। আর-একদিন, ছাদের উত্তর পুব কোণায় তুলসীগাছের টবটার পাশে একটা ছোট্ট পৈঠে ছিল, একজন মাত্র বসতে পারে। পাছে বাবার ঘুম ভেঙে যায় তাই চুড়িগুলোকে হাতে চেপে বসিয়ে, পা টিপেটিপে সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ছুট দিয়েছিল অমিয়া রকটা লক্ষ্য করে। আচারের শিশি বিকেলে তুলে রাখতে ভুলে গিয়েছিল, ছাদের মধ্যিখানেই পড়ে ছিল সেগুলো। তারপর সে কি কেলেঙ্কারি। বড়বৌদি ছাদে উঠে এসেছিল, আর অমিয়া পাঁচিল ঘেঁষে বসে পড়েছিল দুহাতে মুখ লুকিয়ে।

হাসছ কেন!

এমনি। একটা কথা মনে পড়ল তাই।

অমন করে হাসলে কিন্তু তোমায় কেমন কেমন যেন দেখায়। বেশ লাগে দেখতে।

চোখ নামিয়ে হাসল প্রমথ। খোকন চলে গেল রান্নাঘরে। খুন্তি নাড়াব শব্দ আসছে, গন্ধও আসছে কষা মাংসের, রান্নাঘরে অমিয়ার কাছে এখন কেউ নেই। ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমছে গালে, কপালে নাকেব ডগায়। বার বার কাঁধে গাল ঘষাব জন্যে ঘোমটা খুলে গেছে। দুহাত সকড়ি, ঘোমটা তুলে দেবার কেউ নেই কাছে।

বসেই থাকবি, নাকি রান্নাঘরে যাবি।

না আমি শিখব না।

তোর মার কাছে শেখার জন্যে পাড়ার মেয়েবা আসত, বাটি বাটি মাংস যেত এবাড়ি ওবাড়ি।

অবস্থা ভালো ছিল তাই মা শিখতে পেরেছিল, আমি তো কোনোদিন রাঁধলামই না।

ওর বয়সেই মেয়েরা বিযের কথা ভাবে। অমিযা বলেছিল, সেও ভাবত, আব ভাবে বলেই একতলার ঘুপচি ঘরে জীবনটা সহনীয় হতে পাবে। স্বচ্ছল ঘরে পুতুলকে দেওয়া যাবে না, টাকা কোথায়! মেয়েটা সেকথা ভেবেও হযতো ভয় পায়। আসলে ভয় তো সকলেই পাচ্ছে, পুরুষ মেয়ে সকলে। নতুন বৌ অমিয়াব সময় মাংসেব সের ছিল ছ আনা আট আনা, পুতুলের সময় তিন টাকা। জিনিস-পত্তরের দাম বাড়ার জন্যে স্ট্রাইক হবে, হোক। মিহিরবাবু কবিতা লিখলেও বাজে কথা বলে না। খুন্তির শব্দ আসছে, কষা-মাংসের গন্ধ আসছে, মেয়েটাব মুখ শুকনো। অসহ্য লাগছে এই ঘরটা।

পুতুল আর প্রমথকে দেখে গম্ভীর হয়ে মুখ ঘুরিয়ে বসল অমিয়া। আলুর খোলা নিয়ে খেলা করছিল খোকন। পুতুল তাড়াতাড়ি কেড়ে নিয়ে কুটনোর ঝুড়িতে রেখে দিল, খোসা-চচ্চড়ি হবে।

গন্ধ উঠছে। এমন গন্ধ অমিয়ার হাতেই খোলে। ফুসফুস ভরিয়ে ফেলল প্রমথ। অমিয়ার গা ঘেঁষে পুতুল বলল, দাও না আমাকে।

উত্তর না দিয়ে অমিয়া শুধু খুন্তিটা নাকের কাছে ধরল। গনগনে আঁচ। একটুক্ষণ খুন্তি-নাড়া থামলেই তলা ধরে যাবে। পুতুলের কথায় কান দেবার ফুরসত নেই। পুতুল করুণ চোখে তাকাল প্রমথের দিকে।

দাও না ওকে, যখন রাঁধতে চাইছেই।

সবই যখন করলুম তখন বাকিটুকুও করতে পারব। খোকনের ঘুম পেয়েছে শুইয়ে দে।

সত্যিই তো। এখন আর করার আছে কি। জলভরা কাঁসিটা হাঁড়ির মুখে চাপা দেওয়া ছাড়া। মাংসের জল বেরোলে, কাঁসির উষ্ণ জলটা ঢেলে দেওয়া, সে তো একটা আনাড়িতেও পারে। তারপর সেদ্ধ হলে আলু, নুন আর ঘিয়ে রসুন ভেজে সাঁতলানো, বাস। হতাশ হয়ে তাকাল প্রমথ। হনুর গড়নের জন্যে এমনিতেই পুতুলের গালদুটো ফুলো দেখায়, এখন যেন আরো টেবো দেখাচ্ছে। ভাঙা ভাঙা স্বরে সে বলল, তৃপ্তিকে ওর বৌদি নিজে থেকে রান্না শিখিয়েছে, গোটা ইলিশ কাটা শিখিয়েছে, এবার ওদের মাংস এলে তৃপ্তি রাধবে। সেদিন আমায় খাওয়াবে বলেছে।

তাহলে তো তোকেও একদিন খাওয়াতে হয়।

হযই তো, আজকেই তো ওকে বললুম আমাদেব মাংস এসেছে, মা বলেছে আমি রাঁধব।

অমিয়ার দিকে চোখ রেখে এরপর পুতুল কিন্তু কিন্তু করে বলল, ওকে আমার রান্না খাওয়াব বলেছি।

গৌরদাও আজ বলল, দিওহে বৌমার হাতের রান্না। অনেক দিন খাই নি। কোত্থেকে শুনল কে জানে, বললুম দেব পাঠিযে। আহা বুড়ো মানুষটাব যা কষ্ট, ছেলেবৌরা তো একটুও যত্ন করে না।

হ্যাঁ, পুলুদার বৌ কি ভীষণ চালবাজ, একদিন গেছলুম, সে কি কথাবার্তা, যেন কত বি. এ, এম. এ পাস। কারুর আর জানতে বাকি নেই দু-দুবার আই. এ ফেল, তবু বলে বেড়ায পাস করেছে। আব রাস্তা দিয়ে হাঁটে যখন, তুমি দেখেছ বাবা যেন সুচিত্রা সেন চলেছে।

বোকাব মতো হেসে প্রমথ বলল, কে বললে তোকে।

তৃপ্তি। ও তো ভীষণ বায়স্কোপ দ্যাখে, তবে হিন্দী বই দ্যাখে না, খুব অসভ্য নাকি, মাস্টারমশাইও দ্যাখে না।

এমনি শুনে শুনেই মেয়েটা বায়স্কোপের খবর নেয। মনে পড়ছে না কোনো দিন বায়স্কোপে যাব বলে বায়না ধরেছে। বাপের অবস্থা বুঝে সাধ-আহ্লাদগুলো চেপে বাখে, বাবা-মাকে লজ্জায় ফেলে না। এ একমাত্র মেয়েরাই পারে, পুতুলেব মতো মেয়েরা। চাঁদুটা সামান্য হুজুগ উঠলেই পয়সা পয়সা করে ছিঁড়ে খেত, এখন আর পয়সা চায় না। টাকা নিয়ে এখানে ওখানে খেলে খেলে বেড়ায়। ভাড়া খাটলে মান-ইজ্জত থাকে না, কিন্তু কি করবে, উনিশ-কুড়ি বছবের ছেলে কখনো ফাঁকা পকেটে থাকতে পারে? রাধুর মতো ছেলে আর কটা হয়, পানটুকু পর্যন্ত খায় না। ভালো, ওরা সবাই ভালো, আহা বেঁচেবর্তে থেকে মানুষ হোক।

একদিন তোর মাকে নিয়ে যাস না বায়স্কোপে!

খোকনকে কোলে নিয়ে উঠোনে বেরিয়ে এসে গলা চেপে পুতুল বলল, হ্যাঁ, মা আবার যাবে। বলে, কতদিন সাধলুম চলো চলো, সকলেই তো যায়। তা নয়, মাব সব তাতেই বাড়াবাড়ি! একমিনিট বাড়ি না থাকলে সে কি ডাকাডাকি যেন পালিযে গেছি, এমন বিচ্ছিরি লাগে, সবাই হাসাহাসি করে। বাবুদার সামনেও মা অমন কবে।

ঘরে আইবুড়ো মেয়ে থাকলে অমন ডাকাডাকি সবাই করে, তোর মেয়ে থাকলে তুইও করতিস।

প্রমথ হাসল। তিতকুটে গলায় পুতুল বলল, তা বলে দিনবাত ঘরে বসে থাকব? বেরোতে ইচ্ছে করে না আমার? ঘরকন্নার কাজ সব সময় ভালো লাগে? তুমি হলে পারতে?

শেষ দিকে সপসপ করে উঠল পুতুলের গলা। খোকনকে নিয়ে সে ঘরে চলে গেল। রকে পা ঝুলিয়ে বসল প্রমথ। একতলাটা শান্ত। দোতলায় সামান্য খুটখাট, তিনতলায় ছাদ, বলা যায় বাড়িটা চুপচাপ। শুধু গোলমাল করছে পাশের বাড়ির স্কুল ফাইনাল ফেলকরা ছেলেটা।

ঘরে থাকতে ভালো লাগে না মেয়ের, বাইরেই বা যাবে কোথায়, গিয়ে করবেই বা কি। এবাড়ি ওবাড়ি যাওয়া আর আজে-বাজে কথা বলা— এতে লাভ কি? দেয়ালে ঠেস দিয়ে প্রমথ ঘাড়ের জাড় ভাঙার জন্যে মাথা পিছনে হেলাল। ক্ষতিই বা কি, এমনি করেই তো বাকি জীবনটা কেটে যাবে। মেঘের নামগন্ধ নেই, শুধু ঝকঝক করছে গুচ্ছেরখানেক তারা। অসহ্য গরম, অসহ্য।

হঠাৎ একদমক হাওয়া পেরেকে ঝোলানো বাসনমোছা ন্যাতাটা ফেলে দিল। হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে গা এলিয়ে দিল প্রমথ। ছটফটে গরমের মধ্যে একটুখানি হাওয়া বড় মিষ্টি লাগে। খোশবাই গন্ধ আসছে, হাঁড়ির ঢাকনাটা বোধহয় খুলল অমিয়া।

ঝিমুনি এসেছিল প্রমথর, ভেঙে গেল সদর দরজা খোলার শব্দে। চাঁদু এল। অমিয়ার সঙ্গে কথা হচ্ছে ওর, রাত্রে কিছু খাবে না বলছে। উঠে এল প্রমথ।

খাবি না কেন?

খাইয়ে দিল ওরা রেস্টুরেন্টে, সেমিফাইনালের দিনও খাওয়াবে। দুটো গোল হয়েছে, দুটোই আমার সেন্টার থেকে!

ভালোই হল, কাল তো বাজার আসবে না।

অমিয়া কালকের জন্যে চাঁদুব ভাগটুকু সরিয়ে রাখল। আড্ডা দিতে বেরুচ্ছিল চাঁদু, ডেকে ফেরাল প্রমথ।

তোর গৌর জ্যাঠাকে খানিকটা দিয়ে আয়।

কেন?

বিবক্তি, তাচ্ছিল্য আর প্রশ্ন, একসঙ্গে তিনটিকে অমিয়ার মুখে ফুটতে দেখে দমে গেল প্রমথ।

ওকে যে বলেছি, পাঠিয়ে দেব।

দেব বললেই কি দেওয়া যায়, অমন কথা মানুষ দিনে হাজারবার দেয়। এইটুকু তো মাংস! একে তাতে খয়রাত করলে থাকবে কি, কাল বাজার হবে না, খাবে কি কাল?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেবার দরকার কি, বলে দিও নয় ভুলে গেছলুম।

অমিয়া আর চাঁদুর মুখের দিকে তাকাল প্রমথ। একরকমের হয়ে গেছে ওদের মুখদুটো! ওরা খুশি হয় নি।

কিন্তু বুড়ো মানুষটা যে আশা করে বসে থাকবে।

থাকে থাকবে।

কথাটা বলে চাঁদু দাঁড়াল না। অমিয়া চুপ করে আছে। তার মানে, ওইটে তারও জবাব। আবার পা ঝুলিয়ে বসল প্রমথ। আকাশে গুচ্ছেরখানেক তারা। আচমকা তখন হাওযাটা এসে পড়েছিল, আর আসছে না। পুতুল চুপিচুপি পাশে এসে বলল, দিলে না তো! জানি, দেবে না। তখন মিথ্যে বলেছিলুম, তৃপ্তিকে মোটেই বলি নি যে মাংস খাওয়াব।

বেড়ালের মতো পুতুল ফিরে গেল। হয়তো তাই, বোকামি হয়ে গেছে। বুড়ো মানুষটা বসে থাকবে। ঝিমুনি আসছে আবার, দেয়ালে ঠেস দিয়ে গা এলিয়ে দিল প্রমথ।

সদর দরজায় আবার শব্দ হতে প্রমথর মনে হল গৌরদা বুঝি। ফিটফাট, ব্যস্ত ভঙ্গিতে বাবু সটান দরজায় এসে চাঁদুর খোঁজ করল, তারপর নাক কুঁচকে গন্ধ টেনে বলল, ফার্স্ট ক্লাস গন্ধ বেরোচ্ছে কাকিমা।

আঁচল দিয়ে শরীরটাকে মুড়ে পুতুল যেন ভেসে এল।

চেখে যাবেন কিন্তু।

তারপরই তাকাল অমিয়ার দিকে ভয়ে ভয়ে।

বাবারে বাবা, মেয়ের যেন তর সইছে না। খালি বলছে, বাবুদা কখন আসবে, ওকে দিয়ে চাখাব। নিজে রেঁধেছে কিনা।

যে কেউ এখন দেখলে বলবে, অমিয়া হাসছে। কিন্তু প্রমথর মনে হচ্ছে ও হাসছে না। হাসলে অত কুচ্ছিত দেখায় কাউকে? নাকি তার নিজেব দেখার ভুল! প্রমথ তাকাল বাবুর দিকে। চৌকো করে কামানো ঘাড়, চুড়ো করে সাজানো রুক্ষ চুল। বুক, কোমর, পাছা সমান। চোঙার মতো আঁটসাঁট প্যান্ট, উলটে দিলেই গুলতির বাঁট হয়ে যাবে চেহারাটা, ভাবলে হাসি পায়। কিন্তু হাসল না প্রমথ, ছেলেটা শ-দেড়েক টাকার মতো চাকরি করে।

মুখে আঁচল চেপে হাসছে পুতুল। অমিয়া জিজ্ঞাসা করল, কেমন হয়েছে।

ফুড়ুত করে হাড়ের মজ্জা টেনে বাবু বলল, গন্ধ শুঁকেই তো বলেছিলুম, ফাসক্লাস!

অমিয়া ওর খাওয়া দেখতে দেখতে জিজ্ঞাসা করল, চাঁদুব সেই কাজের কি হল?

বাবুর জিভ বাটিতে আটকে রইল কিছুক্ষণ, তারপরই তাড়াতাড়ি বলে উঠল, সে আর মনে করিয়ে দিতে হবে না। তবে বুঝলেন তো, স্কুল ফাইনালটাও যদি পাস করত তাহলে ভাবনা ছিল না। আজকাল বেয়াবার চাকরির জন্যে আই. এ পাস ছেলেরাও লাইন লাগায়। তবে আমিও এঁটুলির মতো লেগে আছি সুপারভাইজারেব সঙ্গে, রোজ ত্যালাচ্ছি।

চাঁদু না হয়, রাধুর জন্যে দ্যাখো।

না কাকিমা। রাধুটা আজকাল যেন কেমন হয়ে গেছে, চাকবিতে ঢুকে শেষকালে ইউনিয়নে ভিড়ুক আর আমায নিযে টানাটানি শুরু কববে তখন। এর ওপর আবার যা গরম বাজার চলছে।

হ্যাঁ, মিহিবকাকু বলছিলেন বেস্পতিবার নাকি স্ট্রাইক হবে।

আরে ও তো খুচরো স্ট্রাইক। বেশ বড়োসড়ো অল ইণ্ডিয়া স্ট্রাইকের কথাবার্তা হচ্ছে নাকি। হলে হয একবার, ব্যাটা সুপারভাইজারটাকে বাগে পেলে আচ্ছাসে ধোলাই দিয়ে দেব। মেজাজ কি ব্যাটার, যেন মাইনে বাড়ানোর কথা বললে ওকে গাঁট থেকে টাকাটা দিতে হবে। পাবলিকের টাকা পাবলিক নেবে, তাতে ক্ষতিটা কি হয়?

খালি বাটিটা নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিল বাবু, পুতুল টেনে নিল হাত বাড়িয়ে, জলের গ্লাসটাও এগিয়ে দিল সে। রুমালে ঠোঁট মুছে বাবু জিজ্ঞেস করল, চাঁদুটা গেল কোথায়, একটা কার্ড ছিল একস্ট্রা।

কার্ড কিসের, আপনাদের সেই অফিসের থিয়েটারের?

উহুঁ, যুব উৎসব। বলেছিলুম না আমার এক বন্ধু গল্প-টল্প লেখে, এর মধ্যে আছে, সে-ই যোগাড় করে দিল কার্ডটা। চাঁদু বলেছিল সতীনাথের গানের দিন যাবে, তা সেদিন আর যোগাড় হয়ে উঠল না।

কোন গানটা গাইল? 'সোনার হাতে'টা গেয়েছে?

ওটা, তারপর 'আকাশপ্রদীপ জ্বলে'টাও নাকি গেয়েছে।

আপনাকে তো সেধে-সেধে মুখ ব্যথা হয়ে গেল, তবু গানটা লিখে দিলেন না।

বেশ চলো, এখুনি লিখে দিচ্ছি।

. কয়লা দিয়ে উনুনে হাওয়া করছে অমিয়া। পুতুল আর বাবু যেন ভাসতে ভাসতে ঘরে চলে গেল। প্রমথর গা ঘেঁষেই প্রায়।

চটপটে, চালাকচতুর ছেলে। ও কি বিয়ে করবে পুতুলকে? ছেলেমানুষ, বলার সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়ে যাবে। তার থেকে ওর বাবাকে গিয়ে ধরতে হবে। মুশকিল বাধবে জাত আর দেনা-পাওনা নিয়ে। বাপের মুখের ওপর ওর কথা বলার সাহস হবে না।

তুমি ওখানে বসে রইলে কেন, ঘরে ওরা একা রয়েছে না?

প্রমথ তাকিয়ে রইল অমিয়ার দিকে। কত সাবধানে আঙুলের ফাঁক দিয়ে চাল-ধোয়া জলটা ফেলছে। অমন কবে মনের কুৎসিত সন্দেহগুলোকেও তো ছেঁকে ফেলে দিতে পারে। থাকলেই বা ওরা একসঙ্গে একটুক্ষণ, ক্ষতিটা কি তাতে।

ঘরে নয়, ছাদে যাবে বলে উঠে দাঁড়াল প্রমথ। সিঁড়ি পর্যন্ত গিয়ে থামল। ঘরে ওরা হাসাহাসি কবছে, ছাদে গেলে অমিয়া রাগ করবে নিশ্চয়। আজ ওকে রাগাতে ইচ্ছে করছে না। রান্নাঘরে গিয়ে গল্প করলে কেমন হয়, আগডুম-বাগডুম যা খুশি। মেজবৌদিকে সেদিন দেখলুম ধর্মতলায় গাড়ি থেকে নামছে, এখনও পেটকাটা জামা পরে, কিংবা, দক্ষিণাবাবু কি সব ওষুধ খাইয়ে বৌকে প্রায় মেরে ফেলার যোগাড় করেছিল। তবে কাজ ঠিকই হাসিল হয়েছে। পেটেরটা বাঁচেনি। কিংবা, একটা দিন দেখে গুরুঠাকুরের কাছে গিয়ে মন্তব নেবার কথাটা পাড়লে হয়, ভাবছিল প্রমথ। পুতুল ঘর থেকে বেরিয়ে তার কাছে এল।

ছোড়দা তো নেই, কার্ডটা নষ্ট হবে, ওর বদলে আমি যাব? বাবুদা বলছে এমন উৎসব নাকি এর আগে হয়নি, না দেখলে জীবনে আর দেখা হবে না। নাচ, গান, সিনেমা, থিযেটাব সব নাকি দেখা যাবে, যাব?

গেলে ফিরবি কখন?

কত আর দেরি হবে, ঘণ্টাখানেক দেখেই চলে আসব।

কচি শশার মতো কবজিটা যেন মুট করে ভেঙে ফেলবে পুতুল আঙুলেব চাপে। এইটুকু কথা বলেই ও হাঁপিয়ে পড়েছে।

তোর মাকে একবাব বলে যা।

বান্নাঘবেব দরজা থেকে কোনোরকমে পুতুল বলল, ছোড়দা তো নেই। তাই আমিই যাচ্ছি, তাড়াতাড়ি ফিরব'খন!

একটা কাঁচা কয়লা বিরক্ত করে মারছে। সেটাকে তুলে ফেলে দেওযাব চেষ্টাতে অমিয়া ব্যস্ত। প্রমথ কৈফিয়ত দেবার সুরে বলল, বাড়ি থেকে বেবোয় টেবোয় না তো, যাক ঘুরে আসুক।

কে?

সাঁড়াশিতে চেপে ধরে কয়লাটাকে উনুন থেকে বাব করে আনতে আনতে অমিযা বলল, কে, পুতুল?

হ্যাঁ, কি যেন উৎসব হচ্ছে বলল।

চলে গেছে?

না, কেন।

রান্নাঘর থেকে বেরোতে যাচ্ছিল অমিয়া। পথ আটকে দাঁড়াল প্রমথ।

কেন আবার, রাত্তিরে মেযেকে ছেড়ে দেবে একটা ছেলের সঙ্গে!

দিলেই বা কি দোষ হবে। হাঁপিয়ে ওঠে না ঘরে বসে থাকতে থাকতে? শুধু ছাদ আব গল্প করা। এ ছাড়াও তো অনেক কিছু আছে। মাবধোর করলেই কি মেয়ে ভালো হবে।

প্রমথ চুপ করল বুক ভবে বাতাস টেনে। দাঁত চেপে কথা বলতে বেশ কষ্ট হয় কিন্তু উপায়ই বা কি, ওঘরে পুতুল আর বাবু রয়েছে। থমথম করছে অমিয়াব মুখ। ঘাম নামছে থুতনি বেয়ে কিলবিলে পোকার মতো, ফবসা গালে সেঁটে বসা উড়ো চুলকে টাকে মাটির ফাটা দাগের মতো দেখাচ্ছে। সত্যিই ফেটে পড়ল অমিয়া।

আমি যখন পারি, ও পারবে না কেন, কেন পারবে না। শুধু ওর কথাই ভাবছ, কেন ভাবার আর কিছু নেই তোমার? বলে দিচ্ছি ওর যাওয়া হবে না।

চুপ, আস্তে, দোহাই আজ আর চেঁচিও না।

আঙুল বাঁকিয়ে দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল প্রমথ। দপদপ করছে তার রগের পেশী। পিছু হটে এল অমিয়া। প্রমথর নখের ডগাগুলো ভীষণ সরু।

চুপ করব কেন। আমি অন্যায় কথা বলেছি? মেয়েকে কেন তুমি ছেড়ে দিতে চাও একটা ছেলের সঙ্গে, তা কি বুঝি না ভেবেছ।

চোখে চোখ রেখে ওবা তাকাল। অমিয়ার চাউনি কসাইয়ের ছুরির মতো শান দিচ্ছে। মাংসেব খোলা হাঁড়িতে চোখ পড়ল প্রমথর, থকথক করছে যেন রক্ত।

কি বুঝেছ তুমি, বলো কি বুঝছ?

দুহাতে অমিয়ার কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিল প্রমথ। খোঁপাটা খুলে পড়ল, চোখদুটো মরা পাঁঠার মতো ঘোলাটে হয়ে এল, ঠোঁট কাঁপিয়ে অমিয়া বলল, তুমি আমার গায়ে হাত তুললে।

অন্ধকার উঠোনে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে পুতুল আর বাবু। কোনো সাড় নেই যেন ইন্দ্রিয়গুলোর। তবু ছাদে যাবার সময় প্রমথর নাকে চড়াভাবে লাগল পাউডারের গন্ধ। মেয়েটা সেজেগুজে অপেক্ষা করছে, করুক। মাথা নিচু করে প্রমথ ওদের পাশ দিয়েই ছাদে যাবার সিঁড়ি ধরল।

ছাদেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। রাধু ডেকে তুলল প্রমথকে। থালার সামনে বসে আছে অমিয়া। ঠাণ্ডা ভাত আর মাংস। ছেলেমেয়েরা শুয়ে পড়েছে।

পুতুল শুয়ে পড়ল যে এর মধ্যে।

শরীর খারাপ, কিছু খায় নি।

কথা দুটো শুকনো কড়কড়ে। খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত আর কেউ উচ্চবাচ্য করল না। মাংসের সবটুকুই খেল প্রমথ। শুধু মেটুলির টুকরোগুলো ছাড়া। মেটুলি ভীষণ ভালোবাসে অমিয়া, অথচ সবটুকুই সে প্রমথকে দিয়ে দেবে। প্রমথও না খেয়ে বাটিতে রেখে দেবে। তখন মিষ্টি ঝগড়া ভালো লাগত আর মাংসও আসত নিয়মিত। আজকেও প্রমথ মেটুলি রেখে উঠে পড়ল। কলতলায় অনেকক্ষণ ধরে কষের দাঁত থেকে মাংসের আঁশ টেনে বার কবল। ভিজে গামছা দিয়ে গা-মুছে যখন সে শুয়ে পড়ল তখনও অমিয়ার রান্নাঘর ধোয়া শেষ হয়নি।

অনেক রাতে উঠোনে বেরিয়ে এল প্রমথ। ঘরের মধ্যে যেন চিতা জ্বলছে। একটুও হাওযা নেই, ঘুম নেই, মেঘও নেই। পায়চারি শুরু কবল সে বকের এমাথা ওমাথা। একটা এরোপ্লেন উড়ে গেল। মুখ তুলে তাকাল প্রমথ। একটুখানি দেখা গেল, লাল আর সাদা আলোটা পালটা-পালটি করে জ্বলছে আর নিভছে। মাত্র কতগুলো তারা দেখা যায় উঠোন থেকে। ছাদে উঠলে আরো দেখা যাবে। দেখেই বা কি হবে। ওরাও তো দেখল আজ মাংস এসেছে অনেকদিন পর, কিন্তু তাতে হল কি। পাতে মেটুলি রেখে সে উঠে পড়ল আর নির্বিকার হয়ে শুধু তাকিয়ে রইল অমিয়া। এখন মনে হচ্ছে অমিযা যন্ত্রের মতো তাকিয়ে ছিল। কিন্তু সেও তো যন্ত্রেব মতোই শুধু অভ্যাস মেনে মেটুলিগুলো পাতে বেখে দিয়েছিল। পায়চারি থামাল প্রমথ। অমিযাও উঠে এসেছে।

ঘুম আসছে না বুঝি?

না, ভয়ানক গরম লাগছে।

পিঠের কতগুলো ঘামাচি মারল অমিয়া। দু একটা শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল প্রমথ।

ছাদে যাবে?

কেন, এই তো বেশ।

বরাবরই তোমার কিন্তু ঘামাচি হয়।

অমিযা পিঠের উপর কাপড় টেনে দিল।

বসবে?

পাশাপাশি বসল দুজনায়।

পুতুলের জন্যে ছেলে দ্যাখো এবার।

হ্যাঁ, দেখব।

চাঁদুটাকেও একটা যা হোক কাজেকম্মে ঢুকিয়ে দাও, কদ্দিন আর টোটো কবে কাটাবে।

হ্যাঁ, চেষ্টা করতে হবে।

রাধু বলছিল আই. এ পরীক্ষাটা দেবে সামনের বছব।

ভালোই তো।

শান্ত রাত্রির মাঝে ওদের আলাপটা, কল থেকে একটানা জল পড়ার মত্যো শোনাল। ওবা অনেকক্ষণ বসে রইল চুপচাপ, পাশাপাশি। কেউ কারুর দিকে তাকাচ্ছে না। দুজনেরই চোখ সামনের শ্যাওলা-ধরা দেয়ালটাকে লক্ষ্য করছে।

কি দরকার ছিল মাংস আনার।

অমিয়ার স্বরে ক্ষোভ নেই, তাপ নেই, অনুমোদন নেই। শুধু যেন একটু কৌতূহল। তাও ঘামাচি মারার মতো নিস্পৃহ। মুখ না ফিবিয়ে প্রমথ বলল, কি জানি। তখন কেমন ভালো লাগল, অনেক কথা মনে পড়ল, মনটাও খুশি হল। ভাবলুম আজ সবাই মিলে একটু আনন্দ করব।

চুপ করে রইল প্রমথ। মুখ ফিরিয়ে একবাব তাকাল। অমিয়াও তাব দিকে তাকিযে।

আজ পুতুলকে দেখে বারবার তোমাব কথা মনে পড়ছিল। কত মিষ্টি ছিলে, চঞ্চল ছিলে, ছটফটে ছিলে। আর ওকে কাঁদিও না।

মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল প্রমথ, তাবা জ্বলছে। একটা কামার মানুষকে তাতিযে বিরাট এক হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে চলেছে, তারই ফুলকিগুলো ছিটকে উঠেছে আকাশে। ছাদে উঠলে আরো অনেক দেখা যাবে। অমিয়ার পিঠে হাত রাখল প্রমথ। থরথব কবে কাঁপছে ওর পিঠটা।

জানো আমি, মনে হচ্ছে আমি আব ভালোবাসি না, বোধহয় তুমিও বাস না। তা না হলে তোমার মনে হবে কেন আমি তোমার গাযে হাত তুলতে পারি। অথচ সত্যি সত্যি তখন ইচ্ছে হয়েছিল তোমার গলা টিপে ধরি। অমি, এখন একটা মড়া আগলে বসে থাকা ছাড়া আব আমাদের কাজ নেই।

অমিযার পিঠে হাত বোলাল প্রমথ। খসখসে চামড়া, মাংসগুলো ঝুলে পড়েছে আলগা হয়ে, মেরুদণ্ডের গিঁটগুলো হাতে আটকাচ্ছে। মুখ তুলল প্রমথ, যে-কটা তাবা দেখা যায়, সেদিকে তাকিয়ে শান্ত স্বরে বলল, কেঁদো না, মরে গেলেই মানুষ কাঁদে, আমি কি মরে গেছি।

তারপর ওরা বসে রইল অন্ধকারে কথা না বলে।

কৃষ্ণকীর্তন

রতন ভট্টাচার্য

রমেন যখন কেতনপুরে নামল তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। চারপাশ জুড়ে বৃষ্টি পড়ছে ঝম্‌ঝম্‌ করে। সমস্ত স্টেশনটা নির্জন। মানুষ নেই, জন নেই। কি রকম খাঁ খাঁ স্তব্ধতা। শেডের নীচে সিমেন্টের বেঞ্চের ওপর দুজন কুলি কাপড় মুড়ে শুয়ে আছে। ওদিকের প্লাটফর্মে স্টেশনের অফিস, প্রকাণ্ড ঝুপঝুপে দুটো গাছের নীচে নিরুপায় অন্ধকারে কেরোসিনের আলোয় ঝিমুচ্ছে। রমেন অবাক হয়ে কয়েক মুহূর্ত শেডেব নীচে দাঁড়িয়ে থাকল। চারপাশে অন্ধকার; হাওয়া, বৃষ্টি। রানীবৌদি বলে দিয়েছিলেন স্টেশন থেকে নেমে বাঁ দিকে গ্রামের মধ্যে দিয়ে পথ। মিনিট দশেক হাঁটলে বাজার। বাজার পাব হলে খাল। খালের ওপব বাঁধানো পোল। পোল পেরিয়ে ডান দিকে নেমে খাল ববাবব সামান্য হাঁটলেই বাড়ি। বানীবৌদিব বাড়ি। রানীবৌদি আর নরেনদা।

হাওযা অন্ধকার আর বৃষ্টির মধ্যে সমস্ত পথটা স্পষ্ট যেন দেখতে পাচ্ছিল বমেন। বাড়ি থেকে বেবোবার সময় কে ভেবেছিল এমন বৃষ্টি হবে, এমন চাবপাশ জুড়ে মাতাল বৃষ্টি। রমেনের হাসি পাচ্ছিল। বানীবৌদি জানেন না বমেন আসছে। এই বৃষ্টিতে ভিজে জাব হয়ে রমেন যখন রানীবৌদির সামনে গিয়ে দাঁড়াবে, রানীবৌদি এমন অবাক হয়ে যাবেন, ঠোঁট ফুলিয়ে এমন হাসবেন যে রমেন একটা কথাও বলতে পারবে না।

রমেন আগেই ভিজেছিল। ট্রেনে আসতে আসতে। ট্রেনেব দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্ষেত, মাঠ, গাছ, আকাশ দেখতে দেখতে। রমেন শেড থেকে বেবিয়ে এল। মাথার ওপব আকাশ একেবাবে মেঘে মেঘে থমথমে হয়ে আছে। লাইন পার হয়ে বাঁ দিকে নামতেই রাস্তাটা চোখে পড়ল। জল কাদা অন্ধকারে মাখামাখি হয়ে আছে। রাস্তার দুধারে বাড়ি। বাড়ি আর জঙ্গল। বমেন অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে হাঁটছিল। ঘটনাটি কি সুন্দর। একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত, নতুন রাস্তা দিয়ে হাওয়া বৃষ্টি আর অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে রমেন হেঁটে চলেছে। এই বাস্তার শেষে একটা দোতলা বাড়িতে রানীবৌদি থাকেন। রানীবৌদি আর নরেনদা। নবেনদাব ঠাণ্ডা, লম্বা চেহারাটা চোখের ওপর ভাসছিল রমেনের। পাড়ার সকলে বলতো পাগল। কেমন অক্লেশে কলকাতার কলেজের চাকরি ছেড়ে দিয়ে গ্রামে এলেন মাস্টারি করতে। আর রানীবৌদি। মনে মনে কি রকম একটা অসহ্য উত্তেজনা বোধ করছিল রমেন। ভাবতে অবাক লাগে ছ মাস আগেও রানীবৌদিরা রমেনদের নীচের তলায় ভাড়া থাকতেন। রানীবৌদি। গত ছ মাসে ছবার দেখা হয়েছে রানীবৌদির সঙ্গে। নিজে এসে দেখা করেছেন। ছ মাসে রানীবৌদি চিঠি লিখেছেন উনিশটা।

অসম্ভব পিছল রাস্তা। তার ওপর কাদা। অনবরত হড়কে হড়কে হাঁটছিল রমেন। মাথা বেয়ে, গা বেয়ে টপটপ করে জল পড়ছিল। পাজামা আর পাঞ্জাবী ভিজে গায়ের সঙ্গে লেপ্টে গেছে। হাওয়ায়, ভিজে জামা কাপড়ে কেমন শীত-শীত করছিল রমেনের। রাস্তাটা কিছুটা এগিয়ে বাঁ দিকে বাঁক নিয়েছে। বাঁ দিকে বেঁকলেই বাজার। বাজার মানে কতগুলো ঘর। বৃষ্টির

ছাট ঢুকবে বলে ঘরের ঝাঁপগুলো সব অনেকখানি করে নামানো। বাজারে লোক নেই। ঘরগুলোর মধ্যে দু একজন করে বসে আছে। বিড়ি বাঁধছে। হিসেব করছে। রমেন অবাক হয়ে দেখছিল। সব যেন শুয়ে পড়া। বাজারের মাঝখান দিয়ে লম্বা রাস্তা। বাজারের মাঝখানে মাঝখানে বড় বড় গাছ। রমেন এগোচ্ছিল। বাজার শেষ হতেই খাল আর পোল পাওয়া গেল। সমস্ত পোলটা কাদায় পিছল। পা টিপে টিপে পার হল রমেন। তারপর খালের ধার দিয়ে ডান দিকে এগোতেই দোতলা বাড়ি। আঃ। একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল রমেন। চারপাশে বড় বড় অনেক আমগাছ। সমস্ত বাড়ি অন্ধকার। রাস্তার ওপর রক। রকে উঠে রমেন দাঁড়াল, কয়েক মুহূর্ত। বাইরে বৃষ্টি। সারা বাড়ি অন্ধকার। রমেনের অবাক লাগছিল। এই বাড়িটার একটা ঘরে রানীবৌদি আছেন। রানীবৌদি। কি আশ্চর্য। পকেট থেকে ভিজে রুমাল বের করে মুখটা মুছে ফেলল রমেন। তারপর দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে ডাকল, রানীবৌদি।

কেউ সাড়া দিল না। আমগাছের পাতার ওপর বৃষ্টি পড়ার শব্দ। বাতাসের শব্দ। খালের জলে পাঁচ হাজার ব্যাঙ ক্রমাগত ডাকছে। চারপাশে অন্ধকার। রমেন আবার ডাকল, রানীবৌদি।

একটা ভীষণ অন্ধকার। এক পাশ দিয়ে ওপরে ওঠবার সিঁড়ি। রকের সিমেণ্ট উঠে গেছে। কিরকম খসখসে। সামনের দেওয়াল হাড় বার করা। না, কোন সাড়া নেই। রানীবৌদিরা নেই নাকি এখানে। রমেনের সর্বাঙ্গ চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল পড়ছিল। এখন আচমকা একটা ভয় কি রকম সারা গায়ে কিলবিল করে উঠল। রমেন এবার সোজা এগিয়ে গিয়ে দরজার কড়া জোরে নাড়া দিল। পুরোন বাড়িটার চতুর্দিকে কারা যেন হঠাৎ হেসে উঠল খটখট করে! এবার যেন ভেতরে সাড়া পাওয়া গেল। কে? তারপর আলো হাতে দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়ালেন রানীবৌদি। প্রচণ্ড বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত একেবারে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। কথা বললেন না। বলছিলেন না। শেষে কি রকম আচমকা হেসে ফেললেন। 'ও মা, রুনু!'

রমেন হাসছিল।

'ঈস্! একেবারে ভিজে গেছ।'

'ভিজব না। যা বৃষ্টি নামিয়েছ।'

'আমার বয়ে গেছে।' রানীবৌদি ঠোঁট উল্টে হাসলেন, 'ছাতা আনোনি কেন?'

'বাড়ি থেকে বেরোবার পর তো বৃষ্টি নামল।'

'বেশ হয়েছে। এখন ঘরে এস।' উনি দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন।

রমেন হাসল। 'আগে একটু জল দাও। পা ধুই।'

রানীবৌদি ভেতরে গেলেন। জল আনলেন। 'নাও। ধুয়ে ফেল পা।'

রমেন পা ধুয়ে ঘরে ঢুকল। অদ্ভুত প্রকাণ্ড ঘর। ঘরের দেওয়ালগুলো পুরোন, কিন্তু ভালো। হাড় বার করা নয়। উল্টো দিকে বিরাট বিরাট দুটো জানলা। হারিকেনের স্বল্প আলোয় সমস্ত ঘর জুড়ে কেমন ছায়াছায়া অন্ধকার। রানীবৌদি একটা জামা দিলেন, একটা কাপড় দিলেন। জামাকাপড় পাল্টে, মাথা মুছে মেঝেয় পাতা বিছানায় বসল রমেন। বলল, 'রানীবৌদি কেতনপুরে এলুম তাহলে।'

রানীবৌদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন রমেনকে। বললেন, 'আমিও সেই কথাই ভাবছি। কখন রওনা দিয়েছিলে?'

'বাড়ি থেকে?'

'হ্যাঁ।'

'তিনটের সময়। আর বাড়ি থেকে বেরোতেই এই বৃষ্টি। বিশ্রী কাণ্ড।'

'বিশ্রী কেন?' ঘরের স্তিমিত আলোয় রানীবৌদির ফর্সা টকটকে রঙটা কি রকম তামাটে দেখাচ্ছিল। 'কলকাতায় তোমার বৃষ্টির দিন ভালো লাগত। মনে আছে, বৃষ্টি নামলে অনেক রাত পর্যন্ত আমরা গল্প করতুম।'

রানীবৌদির চোখ দেখা গেল না। রমেনের চোখে লজ্জাব ছাযা পড়ল। রানীবৌদি টিপে টিপে হাসছিলেন। 'বাড়ির সকলের খবর কি?'

'ভালো।'

'আর তোমার। তোমার খবর কি?'

'আমার কিসের খবর?'

রানীবৌদি কাত হয়ে সোজা রমেনের চোখের দিকে তাকালেন। 'তোমার কোনও খবর নেই? কোন নতুন খবর।'

অপ্রস্তুত হয়ে হাসল রমেন। 'কি যে বল।'

'না। আমি তো আর এখন তোমাদের নীচের তলায থাকি না। তুমি কার বই এনে দাও। কার সঙ্গে গল্প কর। রুনু, এখন তুমি কাকে ভালোবাসো?'

ভয়ানক লজ্জিত হয়ে পর্ডেছিল রমেন। বিশ্রী আক্রোশে মজা করে করে কথা বলছেন বানীবৌদি। রমেন শেষবারের মতন প্রতিবাদ কবল, 'কি সব বাজে বাজে কথা বলছ তুমি।'

'বাজে কেন?'

'কোন মানেই হয় না। তুমি খুব জান আমি কারও বই আনি না। কাউকে....।' কথা শেষ না করে অপ্রস্তুত হয়ে হাসল বমেন।

রানীবৌদি একটা স্টোভ ধরিয়ে জল চডিযেছিলেন। জল ফুটছিল। বাইরে জলের হাওয়াব শব্দ। ঘরের আধো অন্ধকাবে স্টোভেব সোঁ-সোঁ আওয়াজ। বানীবৌদি হাঁটু মুড়ে বসেছিলেন। হাঁটুর ওপর চিবুক রেখে রানীবৌদি সোজা তাকালেন বমেনেব দিকে। 'তবে এই ছ মাসের মধ্যে একদিনও আসোনি কেন?'

'এখন আসব।'

'তোমার তো মিথ্যে কথা বলতে আটকায় না।'

'না না। সত্যি আসব।'

কিছু না বলে হাসলেন রানীবৌদি। চা করলেন। বমেনকে দিলেন। রমেন চা খাচ্ছিল। বানীবৌদি চা খাচ্ছিলেন। স্টোভটা জ্বলছিল।

'নরেনদা কোথায়?' রমেন চা খেতে খেতে রানীবৌদির দিকে চেয়ে হাসল।

রানীবৌদি এক পলক দেখলেন রমেনকে। বললেন, 'কলকাতায়।'

'কলকাতায়!' কি রকম চমকে উঠল বমেন। আচমকা বুকেব ওপর হাতুড়ির ঘা পড়ল একটা। 'নরেনদা এখানে নেই? কবে গেছে কলকাতা?'

'আজ।'

রমেন একদৃষ্টে দেখছিল বানীবৌদিকে। 'আজ ফিববে না?'

'না।'

নরেনদা বাড়ি নেই। নবেনদা আজ ফিববে না। বাইরে অবিশ্রাম বৃষ্টি। অন্ধকার। আমগাছে হাওযার মাতামাতি। খালের জলে ব্যাঙ ডাকছে। আব এত বড প্রকাণ্ড বাড়িটায় কেবল রমেন আর রানীবৌদি। রানীবৌদি স্টোভের ওপর কি চাপিযেছেন। স্টোভটা জ্বলছে। একটা দারুণ উত্তেজনায় রমেনের হৃৎপিণ্ড কাঁপছিল। প্রকাণ্ড ঘরের স্তিমিত আলোয় রানীবৌদিব ছাযাটা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ছায়াটাকে দেখছিল রমেন। রানীবৌদির ছায়া ক্রমশ বড় হয়ে সমস্ত ঘরটাকে ভরে ফেলছিল। দারুণ এক সুখানুভূতিতে ডুবে গিয়ে রমেন হাসল। দক্ষ প্রেমিকেব মতন গলা কাঁপিয়ে বলল, 'রানী, একটা গান গাইব?'

রানীবৌদি ফিরে তাকালেন। ভুরু কুঁচকে দেখলেন বমেনকে। বললেন, 'গান গাও ক্ষতি নেই। আত্মীয়তাটুকু উঠিযে দিলে কেন? ভদ্রলোক নেই শুনে সাহস বেড়ে গেল বুঝি। বীবপুরুষ।'

রমেন শুয়েছিল। উঠে বসল। একটু এগিয়ে গেল।

রানীবৌদি হেসে ফেললেন। বললেন, 'বড় বেশী সাহস দেখাচ্ছ যে। ভদ্রলোক নেই। কিন্তু আর একজন আছেন। মাসীমা। এ বাড়ির মালিক।' বলতে বলতে রানীবৌদি ভেজানো দরজার দিকে মুখ ঘুরিয়ে আচমকা ডাকলেন, 'মাসীমা। বাইরে কেন? ভেতরে আসুন না।'

যেন এই প্রকাণ্ড প্রাচীন বাড়ির কোন এক অন্ধকার কোণ থেকে নিঃশব্দে একটা হাওয়া উঠে এল। এসে ধাক্কা মেরে ঘরের দরজাটাকে খুলে দিল। খোলা দরজা দিয়ে ভেসে এল ভিজে হাওয়া আর জলের শব্দ। ঘরে ঢুকলেন একটি অদ্ভুত ছোট্ট মানুষ। মাসীমা, রানীবৌদির মাসীমা।

রানীবৌদি বললেন, 'মাসীমা, আমার মামাতো ভাই। কিন্তু এমন পাগল দেখুন, ওর সঙ্গে আগে থেকে চেনা ছিল বলে, বলে, না দিদি বলব না। কলকাতা থাকে। বি এ পড়ে।'

মাসীমার গায়ের রঙ বিশ্রী কালো। যেন একরাশ অন্ধকার। মুখটা বুঝি কত কালের। কোন ভাবের ছায়া পড়ে না। খট্‌খট্ করে বললেন, 'বি এ পড়ে। বেশ বেশ। রানী, জামাই তো রাত্রে ফিরবে না'।

'না।' রানীবৌদি আচমকা চোখ তুলে দেখলেন মাসীমাকে। 'কাল বিকেলে ফিরবে।'

'বেশ বেশ।' মাসীমা রমেনের দিকে ফিরলেন, 'দিদির কাছে বেড়াতে এসেছ বাবা, একটু যত্ন হওয়া দরকার। কিন্তু কি দিনেই এলে। জামাই বাড়ি নেই। এদিকে বৃষ্টি। ফিরে গিয়ে খুব নিন্দে করবে দিদির।'

'না মাসীমা।' রানীবৌদি হাসলেন, 'ও আমার নিন্দে করবে না। আমায় ভালোবাসে খুব।'

'তাই নাকি।' একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করলেন মাসীমা। 'তা হবে। আর দুপুর থেকে যা বৃষ্টিটা শুরু হয়েছে। বুঝলে ছেলে, গ্রামে অন্য সময় যেমন-তেমন কিন্তু বর্ষা কালেই মরণ। একদণ্ড টিকতে ইচ্ছে করে না।'

রমেন হাসল। কি রকম ভয়াবহ। বিচিত্র একটা জীবের মতন মনে হচ্ছিল মাসীমাকে। আর কথা বলার কি ভঙ্গি। ঘরের দরজা খোলা। খোলা দরজার ওপাশে অন্ধকার আর বৃষ্টি। মাসীমা আরও একটু এগিয়ে এলেন। একেবারে রানীবৌদির গায়ের কাছে। জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রাঁধছ। কি খাওয়াবে ভাইকে?'

'কি খাওয়াব আর।' ভাঁজ করা হাঁটুর ওপর রানীবৌদি নাকটা মুছলেন। 'যা বৃষ্টি। এমন বৃষ্টি মাথায় করে এসেছে। আমি তো রাত্রে রান্নাই করব না ভেবেছিলুম। ভাত চাপিয়েছি। তারপর দেখি। বোধহয় দু তিনটে ডিম আছে।'

'একেবারে মন্দ কি। এই বৃষ্টির মধ্যে গরম গরম ভাত ডিম....।' কথা বলতে বলতে দরজার দিকে এগোচ্ছিলেন মাসীমা, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ওপরের ঘরটা খুলে দিয়েছি। একবার টপ করে গিয়ে বিছানাটা করে দিয়ে এস।'

রানীবৌদি অবাক হয়ে গেলেন। 'কার কথা বলছেন মাসীমা?'

'তোমার ভাইয়ের। ও রাত্রে থাকবে তো।'

'হ্যাঁ। কিন্তু ওপরে কেন? এই এত বড় ঘরে দুজন থাকতে পারব না? খুব পারব।'

আশ্চর্য অন্ধকার আর বিস্ময়কর মাসীমার মুখ। যেন পাথর কেটে তৈরী। বললেন, 'এত বড় ঘর। পারবে না কেন। তবে কলকাতার ছেলে। ওপরে শোওয়াই তো অভ্যেস। ওপরে শুতেই ভালো লাগবে।' কথা শেষ করে মাসীমা আর দাঁড়ালেন না। বাইরের বৃষ্টি ভেজা অন্ধকারের মধ্যে ঠকঠক করতে করতে বেরিয়ে গেলেন। রমেন এক ঝটকায় বিছানার ওপর উঠে বসে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'কী সাঙ্ঘাতিক!' রানীবৌদি মুখ ঘুরিয়ে হাসলেন।

'হাসছ যে?'

'হাসব না?'

'আশ্চর্য!' রমেন ভুরু কুঁচকে বললে, 'কোথাকার কে এক বুড়ি, তাকে এত প্রশ্রয় দিয়েছ।'

রানীবৌদি এখনও হাসছিলেন। বললেন, 'ওর তিনকুলে কেউ নেই যে।'

'নেই তো তোমার কি?'

'মরবার আগে যদি বাড়িটা দিয়ে যায়।'

রানীবৌদি ভাত নামিয়ে ডিম চাপিয়েছিলেন। এখন ডিমের ঝোলটা টগবগ করে ফুটছিল। একটানা সোঁ সোঁ আওয়াজ করে স্টোভটা জ্বলছিল। মাঝখানে আধ ঘণ্টাব জন্যে বৃষ্টি একদম ধরে গিয়ে জলে ভেজা ঠাণ্ডা হাওয়া ছেড়েছিল। বেশ জোরালো হাওয়া। কিন্তু এখন আবার বৃষ্টি নেমেছে। রমেন বালিশের ওপর মুখ রেখে তাকিয়েছিল। রানীবৌদি বিব্রত হয়ে হাসলেন, 'কি দেখছ। অমন করে তাকাচ্ছ কেন?'

রমেন চোখ সরিয়ে নিল না। কি রকম গভীর গলায় বললে, 'রানীবৌদি, সমস্ত জীবনটা এখানেই কাটিয়ে দেবে! এই বৃষ্টিকাদা। এই অন্ধকার। গ্রাম।'

রানীবৌদির হাসি বিস্তৃত হল। বললেন, 'কি করব!'

'কেন? কলকাতা যাবে।'

'কার সঙ্গে?' মুখ নামিয়ে রানীবৌদি পায়ের বুড়ো আঙুলটা মেঝের ওপর ঘষছিলেন। 'কে নিয়ে যাবে? তুমি?'

'ও কথা বোলো না।' রমেন অপ্রস্তুত হয়ে হাসল। 'যদি যাও, এখুনি নিয়ে যাব।'

'নিয়ে রাখবে কোথায়?'

'সে আমি বুঝব।'

'আর দুদিন বাদে যখন আমি পুরোন হয়ে যাব।'

'এ একটা কথা হল—'

'কথা নয় কেন?' রানীবৌদি সুন্দর করে মাথা নাড়লেন। 'তুমি ছেলে। তোমার ভাবনা কি। একটা পুরোন হবে, আর একজন পাবে। কিন্তু আমি? আমার?'

'তোমার কি?'

'আমার কি হবে। আমি কার গলায় ঝুলব তখন?'

রমেন এক মুহূর্ত চুপ করে রইল। আলাপটা কোনদিকে গড়িয়ে কোথায় শেষ হবে, বুঝে উঠতে পারছিল না। কোথায় যেন একটা দুঃখ খচ্ করে উঠল। বললে, 'রানীবৌদি, তোমরা মেয়েরা অদ্ভুত। মুখে একরকম আব ব্যবহাবে অন্যরকম। তুমি আমায় চার বছর ধরে বুঝতে দাওনি যে তুমি আমায় ভালোবাসো।'

এমন স্পষ্ট করে বলায় রানীবৌদির চোখ মুখ কিরকম লাল হয়ে উঠল। বললেন, 'তাই কি?'

'না। সেই তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না। আমার ওপর নির্ভর করতে পার না।'

রানীবৌদি মুখ তুলে সহজ হয়ে হাসলেন। স্পষ্টত রমেন রেগে গেছে। বেশ লাগছিল। বললেন, 'রুনু, এখানে এসেছি ছ'মাস। এই ছ'মাসে তুমি ক'বার এসেছ এখানে? তোমার ওপর যদি নির্ভর না করেই থাকি তো কিছু অন্যায় করেছি কি?'

যদিও রানীবৌদি হেসে হেসে বলছিলেন কিন্তু মনের মধ্যে একটা বেদনাবোধ কষ্ট দিচ্ছিল রমেনকে। কেমন অসহায় লাগছিল। এই প্রাচীন প্রশস্ত ঘর। এখানে বিছানায় কাত হয়ে রমেন রানীবৌদিকে দেখছে। বাইরে অন্ধকার, বৃষ্টি, ঠাণ্ডা হাওয়া। অথচ কিরকম বিরক্ত মনে হচ্ছিল নিজেকে।

রানীবৌদি হাসি লুকিয়ে বললেন, 'কি রাগ হল নাকি?'

'রাগ হবে কেন?'

'শুয়ে পড়লে?'

'এমনি।'

'তোমার শোয়া রোগটা আর গেল না। মনে আছে কলকাতায় আমাদের ঘরে এসে খালি শুয়ে পড়তে। কত বকতুম। তবু শুনতে না তুমি। একজন শুয়ে থাকলে কি গল্প জমে?'

রমেন পুরোন রঙচটা ছাদের দিকে তাকিয়ে বললে, 'রানীবৌদি, এই জলবৃষ্টি মাথায় করে কলকাতা থেকে এত দূরে গল্প জমাতে আসিনি।'

'এ তো রাগের কথা। তবে কি করতে এসেছ?'

'জানি না।' ভীষণ ভারি আর গম্ভীর শোনাল রমেনের গলার আওয়াজ। কিন্তু ভেতরে ভেতরে কিরকম হাসি পাচ্ছিল তার। রাগটা কেন, কিসের জন্যে ধরতে পারছিল না। সমস্ত ব্যাপারটাকে কেমন বিচিত্র মনে হল।

রানীবৌদি হাসছিলেন। 'পুরুষদের সব ভালো। কিন্তু একটুকুতেই একেবারে দাঁত নোখ বেরিয়ে পড়ে। তোমাকে রাগের কথা কি বলেছি? এই রুনু!'

'আমি বলেছি তুমি আমায় রাগের কথা বলেছ?' রমেন টেনে টেনে উত্তর দিল।

রানীবৌদি স্টোভ থেকে কড়াইটা নামালেন। স্টোভটা নিভিয়ে দিলেন। বললেন, 'আচ্ছা রুনু, আমি তোমার চেয়ে একটু বড়। তাই না?'

'হবে।'

'হবে নয়। তোমার মনে নেই। আমরা সেই অন্ধকারে ছাদে বসে কত গল্প কবতুম। তুমি খালি আমার চুলে হাত দিতে। ধমকাতুম, চুলে হাত দিও না রুনু। তোমার চেয়ে না আমি বয়সে বড়। তুমি শুনতে না। কতরকমের ছেলেমানুষি করতে। তোমার মনে নেই।'

'মনে আছে। কিন্তু সে কথা দিয়ে কি হবে।'

'না, কিছু হবে না। এমনি বলছি। বলতে ভালো লাগছে। ছ'মাসে উনিশখানা চিঠি দেবাব পর তুমি এসেছ। এসে মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে আছ। কি, না রাগ হয়েছে। তুমি তবু রাগ কর। কিন্তু আর একজন? তার রাগ দুঃখ অনুরাগ কিছুই নেই। মাটির মানুষ। আমার কি দুঃখ তিনি বুঝতেই পারেন না। বেশ তো আছি। খাচ্ছি, বেড়াচ্ছি, ঘুমাচ্ছি।'

রমেন বালিশের ওপর কনুই রেখে রানীবৌদির দিকে তাকিয়ে ছিল। বললে, 'থামলে কেন? বেশ তো হচ্ছিল।'

রানীবৌদি অপ্রস্তুত হয়ে হেসে ফেললেন। বললেন, 'না, রাগ শুধু তোমাদেরই একচেটিযা নয়। আমরাও জানি।'

'তাই বলে তুমি ঐসব কথা শোনাবে।'

রানীবৌদি ঠোঁট টিপে হাসলেন। 'তুমি রাগলে কেন?'

'আমি! না আমি রাগিনি।'

'তবে উঠে বোসো।'

'আচ্ছা নাও।' রমেন সত্যি সত্যি উঠে বসল। 'বল কি বলবে?'

'কি আর বলব?' মিষ্টি করে হাসলেন রানীবৌদি। 'অমন তেড়েফুঁড়ে শুনতে চাইলে আব বলব কি করে। তুমি রাগ করলে কেন?'

'জানি না। হঠাৎ কিরকম মনে হল।'

রানীবৌদি উঠলেন। একটা আসন পেতে এক গ্লাস জল দিলেন। 'নাও খেতে বোসো। রাত কত হল কে জানে? মাসীমা ছটফট করছেন।'

রমেন উঠে পড়ল। হাত-পা আলগা করে, টান করে আলস্য ছাড়ল। মাথাটা কেমন ভার হয়েছে। চুলগুলো এখনো ভিজে। না, ভেজাটা অন্যায় হয়েছে। এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলল। অন্ধকার বারান্দা। কিন্তু রমেন পরিষ্কার দেখল, সাদা কাপড় পরা একটা কালোছাযা দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। রকের অন্ধকারে দাঁড়িযে অন্ধকাব

সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে থাকল রমেন। না। কিছু মনে হচ্ছিল না। কোন রাগ, ঘৃণা, ভয় কিছুই না। বাইরে আমগাছগুলো অন্ধকারে দাঁড়িযে দাঁড়িয়ে একটানা ভিজছে। পাশে খালের জলে বৃষ্টি পড়ার শব্দ।

'অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছ? ঝাপটা আসছে না?'

রানীবৌদি। রমেন ফিরে দাঁড়াল। 'বুড়িটা এখানে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের কথা শুনছিল।'

'জানি।'

'তুমি জানতে?'

কিরকম অবাক হয়ে গেল রমেন। 'কিছু বল না ওকে?'

'কি বলব?'

'এরকম দাঁড়িয়ে থাকা অন্যায়।'

'অন্যায় কি? আমাকে পাহারা দিচ্ছে। ভালোই তো। এস, খাবে এস।'

রানীবৌদি ভেতরে ডাকছেন। কিন্তু এখানে এই অন্ধকারে এমন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। ছ'মাস আগে কলকাতায় এমন অন্ধকারে ওরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থেকেছে। রমেন ফিস্ ফিস্ করে বললে, 'এখানে মাদুর পেতে একটু বসবে?'

উত্তর দিতে এক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন রানীবৌদি। বললেন, 'এখানে কেন?'

'না এমনি। কলকাতার ছাদে যেমন বসতুম। এখানটা অবশ্য আরও সুন্দর। বৃষ্টি হচ্ছে।'

'পাগলামি কোরো না। চল, ভেতরে চল। খেয়ে নাও। রাত অনেক হয়েছে।'

রানীবৌদি ভেতরে চলে এলেন। রমেনও এল। রমেন মুখটাকে হাসি-হাসি করে রাখছিল। কিন্তু ভেতরে রাগ হচ্ছিল। ঠিক রাগ নয়। ক্ষোভ। দুঃখ। রমেন আসনে বসেছিল। রানীবৌদি ভাত বাড়ছিলেন। বললেন, 'কি, আবার রাগ হল না তো?'

রমেন হাসল। উত্তর দিল না। একটু বাদে আচমকা মুখ তুলে বললে, 'রানীবৌদি, আমি ওপরে ঐ ডাইনীর সঙ্গে শোব না।'

'কেন?'

'না। আমার ভালো লাগছে না।'

'তবে কোথায় শোবে?'

'এইখানে।'

না। ভূতটা এখনও নামেনি ঘাড় থেকে। রানীবৌদি দেখছিলেন রমেনকে। বললেন, 'এক ঘরে তোমার সঙ্গে রাত কাটালে ভদ্রলোক আমাকে তাড়িয়ে দেবে যে।'

'আমি জানি না। আমি এ ঘরে শোব।'

রানীবৌদি হেসে উঠলেন। ঘরের আলো আর অন্ধকারে সেই হাসি অনেকক্ষণ কিরকম পাকিয়ে পাকিয়ে উঠতে থাকল। হাসতে হাসতে বললেন, 'তাহলে এককাজ কব। তুমি এখানে শোও। আমি ওপরে যাই।'

কিরকম অসহায় মনে হচ্ছিল নিজেকে রমেনের। রমেন হঠাৎ চুপ করে গেল। মনের মধ্যে কেমন একটা বোঝা চেপেছে। কিরকম বিরক্তিকব লাগছে। এতবড় একটা দীর্ঘ রাত। কেমন করে রাতটা কাটবে, কোন কথার পর কি বলা উচিত ঠিক গুছিয়ে ভাবতে পারছিল না রমেন। হঠাৎ বললে, 'তাহলে কলকাতার ছাদে যেমন গল্প কবতুম, তেমন একটু গল্প করতে দাও।'

'মানে, আমার চুলে হাত দেবে একটু?'

'না।'

'আমার মাথা টিপে দেবে?'

'না।'.

বানীবৌদি কৌতুকে চোখ দুটো বড় বড় করে বললেন, 'তবে কি?'

রমেনের লজ্জা করছিল। একবার চোখ তুলে রানীবৌদির দিকে তাকাল রমেন। বলল, 'তুমি জান। কিন্তু বলছ না।'

'আমি জানি!' 'হ্যাঁ।' আচমকা রানীবৌদির চোখে চোখ রাখল রমেন। 'তোমাদের আসবার দিন রাত্রে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে...।'

বানীবৌদি বিব্রত হয়ে হাসলেন। গলাটা কিরকম ধরে আসছিল। বললেন, 'খেয়ে নাও।'

রমেন বললে, 'বল রাজী।'

বানীবৌদি মাথাটা হাঁটুর মধ্যে গুঁজে দিযে টেনে টেনে ফিস্ ফিস্ করে বললেন, 'রাজী। কিন্তু..।'

'কিন্তু কি?

'এখানে নয়।'

রমেন খেয়ে মুখ ধুয়ে ঘরে ঢুকতেই রানীবৌদি একটা হারিকেন নিয়ে বললেন, 'চল, তোমায় শুইয়ে রেখে আসি।'

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এল ওরা। ওপরে দুখানা ঘর। দুখানা ঘরের সামনে একটা বারান্দা। বারান্দার সামনেটা কতগুলো লতানে ফুলগাছে ঝাপসানো। সামনে খানিকটা ফাঁক। সেদিক দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। দূরে খালের ওপর পোল। পোলের ওদিকে বাজারেব আলো। সমস্ত আকাশটা কিবকম লাল হয়ে গেছে। বৃষ্টি পড়ছে একটানা।

এ ঘরটাও নীচের ঘরেব মতই বড়। বড় বড় জানালা। জানালাগুলো খোলা। শিক নেই। পাল্লা নেই। আমগাছেব ভেজা মাথাগুলো অন্ধকারে ঝাপসানো হয়ে আছে। পাতার উপর বৃষ্টি পড়ার টুপটুপ শব্দ।

রানীবৌদি তোশকের ওপর চাদর পাতছিলেন। বললেন, 'মাসীমা হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে।'

রমেন কিছু না বলে বিছানায় বসল। রানীবৌদি সরে গিয়ে একটা খোলা জানালাব কাছে চুপ কবে দাঁড়িযে রইলেন। ঠিক এই মুহূর্তটা অদ্ভুত। কিরকম ভারি আর অসহ্য মনে হচ্ছিল রমেনের। ঘরটা সুন্দর। বিছানা সুন্দর। রানীবৌদি সুন্দর। কেউ কোন কথা বলছিল না।

রানীবৌদি মাঝে মাঝে একটা হাত জলের মধ্যে বার করে দিচ্ছিলেন। বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বৃষ্টি দেখছিলেন। অন্ধকার দেখছিলেন। 'রুনু, চুপ করে গেলে কেন?'

এক অদ্ভুত উত্তেজনায় রমেনের বুকের ভেতরটা তোলপাড় করছিল। আশ্চর্য সব। ইশারায় ফুলে ফুলে উঠছিল হৃৎপিণ্ড। মাথার মধ্যে, গলায়, ঘাড়ে, পিঠে কিরকম অবসাদ। যেন কী এক নেশায় সমস্ত চৈতন্য ঘোর হয়ে আসছে। রমেন বিড়বিড় করে বললে, 'কি বলব!'

রানীবৌদি রমেনকে দেখছিলেন না। বাইরে তাকিয়ে ছিলেন। কিরকম বাঁকিয়ে বাঁকিযে বললেন, 'সব কথা ফুরিয়ে গেল নাকি?'

রমেন কোন উত্তর দিল না। বুকের দ্রুত ওঠানামায় কেমন বিব্রত হয়ে ছিল সে।

রানীবৌদি ঘরের মধ্যে মুখ ফেরালেন। রমেনকে এক পলক দেখলেন। বললেন, 'তাহলে ঘুমোও তুমি, আমি যাই।'

হঠাৎ যেন দমটা বন্ধ হয়ে আসতে চাইল রমেনের। কোন রকমে বললে, 'কিন্তু তুমি যে কথা দিলে...।'

রানীবৌদি চুপ করে থাকলেন।

দক্ষ লম্পটের মত রমেন আকর্ণ হাসল। 'আমি যাব।'

'রানীবৌদি ফিস্ ফিস্ করে বললেন, 'তোমার ইচ্ছে। এস।' তাবপর রমেনের ওঠবার আগেই বাইরে বারান্দার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বললেন, 'একটু দাঁড়াও। বারান্দাটা দেখে আসি একবার।'

রানীবৌদি বারান্দার দিকে এগিয়ে গেলেন। রমেন বসে আছে। কিবকম ক্লান্ত আর অসহায়। ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরের অন্ধকারে মাসীমার গলায় আওয়াজ পাওয়া গেল।

'বিছানা করে দিয়েছ রানী?' যেন একটা সাপ বাতাসে ফণা দুলিয়ে হিস্ হিস্ করে উঠল।

রানীবৌদি বিড়বিড় করে কি বললেন, রমেন শুনতে পেল না।

'হারিকেনটা রেখে যাচ্ছ কেন?' মাসীমার গলার আওয়াজ এগিয়ে এল। 'তোমার তো একটাই আলো।'

রানীবৌদি সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছিলেন। হারিকেনটা নিতে ফিরে এলেন আবার।

মাসীমা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার খাওয়া হয়ে গেছে নাকি?'

'না।'

মাসীমা ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। রমেনকে বললেন, 'তোমার আবার একলা শুতে ভয় করবে না তো বাবা।'

রমেন কঠিন গলায় বললে, 'না।'

রানীবৌদি হারিকেনটা নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, 'রুনু, যদি কিছু দরকাব পড়ে, আমায় নীচে গিয়ে ডেকো।'

মাসীমা বাধা দিয়ে উঠলেন, 'না-না। তোমাকে আবার রাত দুপুরে কেন ডাকবে। আমিই তো আছি। যা দরকাব হয়, আমিই দেব।'

রানীবৌদি আলো নিয়ে অন্ধকারে নীচে নেমে গেলেন। মাসীমাও বেরিয়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে। সমস্ত ঘটনাটা কিরকম আশ্চর্য দ্রুত ঘটল। রমেনের ভেতরটা যেন পুড়ে যাচ্ছিল। প্রতি মুহূর্তে একটা প্রচণ্ড আক্রোশে ভেঙে পড়তে ইচ্ছে করছিল। এখন সমস্ত ঘর ফাঁকা। বাইরে অন্ধকার। বৃষ্টি। নীচে খালের জলে ব্যাঙ ডাকছে। আমগাছের মাথাগুলো ঝাপসানো। জলে-ভেজা একটা ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরের অন্ধকারে খেলা করছিল। রমেন বালিশটা বুকের নীচে দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় তার সর্বাঙ্গ কাঁপছিল। বিশ্রী কান্না পাচ্ছিল। গলাটা শুকিয়ে গেছে।

সবটাই কেমন বিচিত্র। বাড়ি ছেড়ে বেরোবার পব থেকে, এখন পর্যন্ত সমস্ত টুকরো টুকরো ছবিগুলো মনে পড়ছিল রমেনের। একদিন রানীবৌদির সঙ্গে একত্রে এক বাড়িতে থেকেছে রমেন। ছ'মাস আগের সেই সব পুরোন দিনের কথা মনে পড়ছিল। রানীবৌদি রমেনকে ভালোবাসে। রমেন জানে। জানে বলেই না এসেছে। কিন্তু.....?

ঘরটা ভীষণ অন্ধকার। ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীত করছিল রমেনের। রমেন কি করবে বুঝে উঠতে পারছিল না।

রাত বাড়ছিল। এখন রাত কত রমেন জানে না। মনে হচ্ছিল যেন একযুগ আগে রানীবৌদি নীচে নেমে গেছেন। রানীবৌদি কি করছেন এখন। সময় পার হয়ে যাচ্ছিল। কত অজস্র মুহূর্ত। রমেনের মাথার মধ্যে ভার হয়ে গেছে। কিছু ভাবতে পারছিল না। স্থির হয়ে কিছু ভাবতে ভালো লাগছিল না রমেনের। না। শুধু অশান্ত হাওয়া আর বৃষ্টি ছাড়া এ-পৃথিবীতে আর কোন শব্দ নেই রমেন ঘুমুতে পারছিল না। হালকা বুক নিয়ে কিরকম অসহায়ের মতো ছটফট করছিল।

কতক্ষণ অসহায়ের মত ছটফট করল রমেন। রমেন জানে না কোথায় যন্ত্রণা। কিসের যন্ত্রণা। তারপর রানীবৌদির নেমে যাওয়ার প্রায় এক যুগ পরে রমেন বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ঘুম-না-হওয়া নেশায় মাতালের মত লাগছিল। মাতালের মতন মাথাটা ভার হয়ে

ছিল। রমেন মনে করতে চেষ্টা করছিল, ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা। তারপর সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে নেমেই সেই দরজা। রানীবৌদি।

রমেন পা টিপে টিপে বারান্দায় বেরিয়ে এল। যেন ওৎ পেতে ছিলেন, এমনি ভঙ্গিতে বারান্দার ঝাপসানো অন্ধকারের মধ্যে থেকে মাসীমা বলে উঠলেন, 'ঘুম হচ্ছে না বুঝি?'

রমেন চমকে উঠল, ভয়ে কেঁপে উঠল সর্বাঙ্গ। 'একটু বাইরে যাব।'

ছুটে এলেন মাসীমা। 'নীচে যাচ্ছ কেন? নীচে কোথায় যাবে?'

রমেন চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মাসীমা আরও এগিয়ে এলেন, 'এই যে। এদিক দিয়ে এগিযে যাও। বাবান্দাব একেবারে কোণে। জায়গা আছে।'

কখন সকাল হয়েছে। বৃষ্টি নেই। সাবা আকাশ এখনও মেঘে-মেঘে থমথমে হয়ে আছে। মনে হয, এই বুঝি ভোর হল। রানীবৌদি স্টোভ ধবিয়ে চা করছিলেন। রমেন পা ছড়িযে পাশে বসে আছে। এখন ঘরটাকে অন্যরকম দেখাচ্ছে। যেন গত রাত্রে এই ঘরে একটা উৎসব ছিল। এখন দিনের বেলায় মেঘলা আলোয় ঘরটাকে আরও জীর্ণ, আবও প্রাচীন দেখাচ্ছিল। রানীবৌদি হাঁটুর ওপর মুখ রেখে রমেনেব দিকে চেয়ে ছিলেন। বললেন, 'রুনু, তুমি কি সত্যি এবেলা চলে যাবে?'

রমেন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'হ্যাঁ।'

'এবেলা না গেলেই নয়?'

রমেন হাসল। 'না, রানীবৌদি।' বলে তাকিয়ে থাকল। যেন খুব লক্ষ্য করে দেখছিল রানীবৌদির মুখে তাঁর মাসীমার কথা লেখা আছে কিনা?

রানীবৌদি স্টোভ থেকে জলটা নামালেন। স্টোভটা বন্ধ করে দিলেন। অমনি সমস্ত ঘর কিরকম আচমকা স্তব্ধ হয়ে গেল।.এই স্তব্ধতায় রানীবৌদির চোখের দিকে তাকিয়ে বমেন হাসল। 'রানীবৌদি, কাল সারারাত ঘুমুইনি।'

বানীবৌদি চোখ নামিয়ে বললেন, 'জানি।'

রমেন অবাক হয়ে বললে, 'জান। কি করে জানলে?'

'কাল সারারাত রকে বসে ছিলুম।'

বাঁধ

জহির রায়হান

আর কিছু নয়, গফরগাঁ থাইকা পীব সাইবেরে নিয়া আস তোমরা। অনেক ভেবেচিন্তে বললেন রহিম সর্দার।

তাই করেন হুজুর, তাই করেন! একবাক্যে সায় দিল চাষী'বা।

গফরগাঁ থেকে জবরদস্ত পীর মনোয়ার হাজীকেই নিয়ে আসবে ওরা। দেশ জোড়া নাম মনোয়ার হাজীর। অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি তিনি। মুমূর্ষু বোগীকেও এক ফুঁয়ে ভালো করেছেন এমন দৃষ্টান্ত আছে।

সেবার করিমগঞ্জে যখন ওলাবিবি এসে ঘরকে ঘর উজাড় করে দিচ্ছিল তখন এই মনোয়ার হাজীই রক্ষা করেছিলেন গাঁটাকে। সাধ্য কি ওলাবিবি মনোযার হাজীর ফুঁয়ের সামনে দাঁড়ায়। দিন দুয়েকের মধ্যে তল্পিতল্পা গুটিয়ে পালিয়ে গেল ওলাবিবি, দু'দশ গাঁ ছেড়ে। এমন ক্ষমতা রাখেন মনোয়ার হাজী।

গাঁয়ের লোক খুশি হয়ে অজস্র টাকা পয়সা আর অজস্র জিনিসপত্র ভেট দিযেছিল তাঁকে। কেউ দিয়েছিল বাগানের শাক-সব্‌জি। কেউ দিয়েছিল পুকুরের মাছ। কেউ মোরগ-হাঁস। আবার কেউ দিয়েছিল নগদ টাকা। দুধের গরুও নাকি কয়েকটা পেয়েছিলেন তিনি। এত ভেট পেয়েছিলেন যে, সেগুলো বাড়ি নিতে নাকি তিন তিনটে গোরুব গাড়ি লেগেছিল তাঁব। সেই সৌভাগ্যবান পীর মনোয়াব হাজী! তাঁকেই আনবে বলে ঠিক কবল গাঁয়ের মাতব্বরেরা, চাষী আর ক্ষেত মজুররা।

কিন্তু পীরকে আনতে হলে টাকার দরকার। পীর সাহেব কি এমনি আসবেন? তাঁব জন্যে বিশেষ ধরনের পাল্‌কি চাই। আট বাহকের পাল্‌কি। ঘি ছাড়া কোন কিছু মুখেই রোচে না পীর সাহেবের। গোস্ত ছাড়া ভাত খান না। খাবার শেষে এক প্রস্থ মিষ্টি না হলে খাওয়াটাই অসম্পূর্ণ রয়ে যায় তাঁর। তাই টাকার দরকাব।

-- টাকার চিন্তা করলে তো চলবো না। যেমন কইরা অউক পীর সাহেবেরে আনতে হইবো। কোমর ঘিঁচে বলল জমির ব্যাপারী। পর পর দুইডা বছর ফসল নষ্ট অইয়া গেল, খোদা না করুক, এইবার যদি কিছু অয়, তাইলে যে কোনমতেই জান বাঁচান যাইবো না। শেষের দিকে কান্নায় ভিজে এল জমির ব্যাপারীর কণ্ঠস্বর।

পর পর কত বছর বন্যার জলে ফসল নষ্ট হয়ে গেছে ওদের। ভরা বর্ষা শুরু হতেই বাঁধটা ভেঙ্গে যায়। আর হড় হড় করে পানি এসে ভাসিয়ে দিয়ে যায় সমস্ত প্রান্তরটাকে।

কপাল চাপড়িয়ে খোদাকে অনেক ডেকেছে ওরা। অনেক কাকুতি মিনতি ভরা প্রার্থনা জানিয়েছে খোদার দরবারে। কিছুতেই কিছু হয়নি। খোদা কান দেননি ওদের প্রার্থনায়। নীরব থেকেছেন তিনি। —নীরব থাকবো না? খোদা কি আঁর যর তার ডাকে সাড়া দেন! গাঁয়ের লোকদের বোঝাতে চেষ্টা করল জমির মুন্সি। খোদার ওলিদের দিয়া ডাকাইলে পর খোদা শুনবো। মন টলবো। তাই কর, পীর সাইবেরে নিয়া আস তোমরা।

ঠিক হল বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তুলবে ওরা। অবশ্য চাঁদা সবাই দেবে। দেবে না কেন? বান ডাকলে তো আর একা রহিম সর্দারের ফসল নষ্ট হবে না, হবে সবার। সবাব ঘরেই অভাব-অনটন দেখা দেবে। সবাই দুঃখ ভোগ করবে। ধুঁকে ধুঁকে মরবে, যেমন মরেছে গত দু'বছর। কিন্তু মতি মাষ্টার যুক্তি তর্কের ধার ধাবে না। চাঁদা চাইতেই বেগে বলল, —চাঁদা দিমু? কিসের লাইগা দিমু? ওই লোকডার পিছে ব্যয় করবার লাইগা?

মতি মাস্টারের কথায় দাঁতে জিভ কাটল জমির মুন্সি।

— তওবা, তওবা, কহেন কি মাস্টার সাব। খোদাভক্ত পীব, আল্লার ওলি মানুষ। দশ গাঁয়ে যারে মানে, তাব নামে এত বড় কুৎসা!

— ভালো কাজ করলা না মাস্টার, ভালো কাজ করলা না। ঘন ঘন মাথা নাড়ল জমিব ব্যাপারী। পীরের বদ দোয়ায় ছাই অইয়া যাইবা।

কথা শুনে সশব্দে হেসে উঠল মতি মাস্টার।— কি যে কও চাচা, তোমাগো কথা শুনলে হাসি পায়।

— হাসি পাইবো না, লেখাপড়া শিখাতো এহন বড় মানুষ অইয়া গেছ। মুখ ভেংচিযে বললেন জমির ব্যাপাবী। চাঁদা দিলে দিবা, না দিলে নাই, এত বাহাত্তরী কথা ক্যান?

কিন্তু বাহাত্তরী কথা আরো একজনের কাছ থেকে শুনতে হল তাদের। শোনালো দৌলত কাজীর মেজ ছেলে রশিদ। শহরে থেকে কলেজে পড়ে। ছুটিতে বাড়িতে এসেছে বেডাতে। চাঁদা তোলার ইতিবৃত্ত শুনে সে বলল,— পাগল আর কি, পীর আইনা বন্যা রুখবো। এ একটা কথা অইলো?

— কথা নয় হাবামজাদা! জমির মুন্সি কোন জবাব দেবার আগেই গর্জে উঠলেন দৌলত কাজী নিজে। আল্লার ওলি, পীর দরবেশ, ইচ্ছা কবলে সব কিছু করতে পারে। সব কিছু করতে পারে তাঁবা। এই বলে নূহ নবী আর মহাপ্লাবনের ইতিকথাটা ছেলেকে শুনিয়ে দিলেন তিনি।

খবরটা রহিম সর্দারের কানে যেতে দেরী হল না। দু-দশ গাঁয়ের মাতব্বর রহিম সর্দার। পঞ্চাশ বিঘে খাস আবাদী জমির মালিক। একবার রাগলে, সে রাগ সহজে পড়ে না তাঁর। জমির মুন্সির কাছে থেকে কথাটা শুনে রাগে থর থর করে কেঁপে উঠলেন তিনি,— এ্যাঁ খোদার পীরেরে নিয়া ঠাট্টা তামাসা। আচ্ছা, মতি মাস্টারের মাস্টারি আমি দেইখা নিমু। দেইখা নিমু মইত্যা এ গেরামে কেমন কইরা থাহে। অত্যন্ত রেগে গেলেও একেবারে হুঁশ হারাননি রহিম সর্দার। কাজীর ছেলে রশিদের নামটা অতি সন্তর্পণে এড়িয়ে গেলেন তিনি। কাজী বাড়ি কুটুম্ব বাড়ি, বেয়াই বেয়াই সম্পর্ক, তাই।

পীর সাহেবের নূরানী সুরত দেখে গাঁয়ের ছেলে বুড়োরা অবাক হল। আহা! এমন যার সুরত, গুণ তার কত বড়, কে জানে! ভক্তি সহকারে পীর সাহেবের পায়ের ধুলো নিল সবাই।

—গরীব মানুষ হুজুর! মইরা গেলাম, বাঁচান। হুজুরের পা জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে উঠলেন জমির ব্যাপারী।

জমির ব্যাপারী বোকা নন, বোঝেন সব। খোদার মন টলাতে হলে আগে পীর সাহেবের মন গলাতে হবে। পীর সাহেবের মন গললে এ হতভাগাদের জন্যে খোদার কাছে প্রার্থনা করবেন তিনি। তারপরেই না খোদা মুখ তুলে তাকাবেন ওদের দিকে।

পীর সাহেব এসে পৌঁছলেন সকালে। আর ঘটা করে বৃষ্টি নামল বিকেলে। বৃষ্টি, বৃষ্টি, আর বৃষ্টি। সারাটা বিকেল বৃষ্টি হল। সারা রাত চলল তার একটা ঝপঝপ ঝনঝন শব্দ। সকালেও তাব বিবাম নেই।

প্রতি বছর এ সময় শ্রাবণ মাসের 'ডাক্তর'। কেউ কেউ বলে বুড়োবুড়ির 'ডাক্তর'। এই ডাক্তরের আয়ুষ্কাল পনের দিন। এই পনের দিন একটানা ঝড় বৃষ্টি হবে। জোরে বাতাস বইবে। বাতাস যদি বেশি থাকে আর অমাবস্যা কি পূর্ণিমার জোয়ারের যদি নাগাল পায়, তাহলে সর্ব্বনাশ। নির্ঘাত বন্যা!

— খোদা, রক্ষা কর। রক্ষা কর খোদা। রহম কর এই অধমগুলার ওপর। কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন জমির ব্যাপাবী। মনে মনে মানত করলেন। যদি ফসল নষ্ট না হয় তাহলে হালের গরু জোড়া পীর সাহেবকে ভেট দেবেন তিনি।

গম্ভীর পীর সাহেব ঢুলে ঢুলে তছবি পড়েন আর খোদার মহিমা বর্ণনা করেন সবার কাছে। খোদার মহিমা বর্ণনা শেষ হলে পীর সাহেবের মহিমা বর্ণনা প্রসঙ্গে অসংখ্য আজগুবি ঘটনার অবতারণা করেন তাঁর সাকরেদরা।

মনে মনে অবশ্য আশা জাগে চাষীদের। আনন্দে চকচক করে ওঠে কোটরে ঢোকা চোখগুলো। ভীড়ের মাঝ থেকে গনি মোল্লা ফিসফিসিয়ে বললেন, —কই নাই মনার পো? এই পীর যেই সেই পীর নয়, খোদাব খাস পীর।

কথাটা মিনু পাটারীর কানে যেতে গদগদ হয়ে বলল সে, —শুন নাই তোমরা? সেইবার এক বাঁজা মাইযা পোলারে এক তাবিজে পোয়াতী বানাইযা দিছলেন তিনি। শুন নাই।

যারা শুনেছে তারা মাথা নেড়ে সায় দিল, হ্যাঁ, কথাটা সত্যি। আর যারা শোনেনি তারাও সেই মুহূর্তে বিশ্বাস করল কথাটা। পীর সাহেব সব পারেন। ইচ্ছে করলে এই ঝড় বৃষ্টিটাকে এই মুহূর্তে থামিয়ে দিতে পারেন তিনি। কিন্তু থামাচ্ছেন না প্রয়োজনবোধে থামাবেন তাই।

কিন্তু মতি মাষ্টার বিশ্বাস করল না কথাটা। হেসে উড়িয়ে দিল। বলল,— ঝড থামাবে ওই বুড়োটি? মন্তর পড়ে ঝড় থামাবে?

— হ্যাঁ, থামাবে। আলবৎ থামাবে। আকাশভেদী হুংকার ছাড়লেন গনি মোল্লা। চোখ রাঙিয়ে ফতোয়া দিলেন। এই নাফরমান বেদীনগুলো গাঁয়ে আছে দেইখাই তো গাঁয়ের এই দুরবস্থা।

হ্যাঁ, ঠিক কইছ মোল্লার পো। তাঁকে সমর্থন করলেন বুনো তিনজী মিঞা। এই কাফেরগুলারে গাঁ থাইকা না তাড়াইলে গাঁয়ের শান্তি নাই। কিন্তু গাঁয়ের শান্তি রক্ষার চাইতে 'ঢল' রেখাটাই এখন বড় প্রশ্ন। প্রকৃতি উন্মাদ হয়ে পড়েছে। ক্ষুব্ধ বাতাস বার বার সাবধান করছে। ঢল হইবো ঢল। পানি ভরা চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন তিনজী মিঞা।

রক্ত দিয়ে বোনা সোনার ফসল। হায়রে ফসল!

হঠাৎ পাগলের মতো চিৎকার করে ওঠেন তিনি,— খোদা।

মসজিদে আজান পড়ছে। পীর সাহেব ডাকছেন সবাইকে। এস —মিলাদ পড়তে এস— এস মঙ্গলের জন্য এস।

টুপিটাকে মাথায় চড়িয়ে বৃষ্টির ভেতর ভিজে ভিজেই মসজিদের দিকে ছুট দিলেন জমির ব্যাপারী। যাবার সময় ঘরের বৌ-ঝিদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেলেন, এ রাত ঘুমাইবার রাত নয়। বুঝলা? অজু কইরা বইসা খোদারে ডাক।

অজুটা সেরে উঠে দাঁড়াতেই কার একটা হাত এসে পড়ল ছকু মুন্সির কাঁধের ওপর। জমির মুন্সির ছেলে ছকু মুন্সি। গাঁট্টাগোট্টা জোয়ান মানুষ। প্রথমটায় ভয়ে আঁতকে উঠে জিজ্ঞেস করল, — কে?

— ভয় নাই, আমি মতি মাষ্টার।

— ব্যাপার কি? এ রাত্তির বেলা? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল ছকু।

মতি মাষ্টার বলল,-— যাস কনহানে?

— যাই মসজিদে। ছকু জবাব দিল। ক্যান তোমরা যাইবা না?

— না। স্বল্প থেমে মতি মাষ্টার বলল। এক কাজ কর ছকু। মসজিদে যাওযা এহন রাখ। ঘর থাইকা কোদাল নিয়া বাইর অইয়া আয়। যা জলদি কর।

— কোদাল দিয়া কি অইবো? রীতিমত ঘাবড়ে গেল ছকু মুন্সি।

— যা ছকা। কোদাল আন। পেছন থেকে বলল মস্ত শেখ।

এতক্ষণ পুরো দলটার দিকে চোখ পড়লো ছকু মুন্সির। একজন দুজন নয়, অনেক। অন্ততঃ জন পঞ্চাশেক হবে। সবার হাতে কোদাল আর ঝুড়ি। মতি মাষ্টার এত লোক জোটালো কেমন করে? কাজী বাড়ীর পড়ুয়া ছেলে রশিদকে দলের মধ্যে দেখে আরো একটু অবাক হল ছকু।

ব্যাপারটা অনেক দূর আঁচ করতে পারল সে। গতকাল এ নিয়েই কাজী পাড়ায় বুড়ো কাজীর সঙ্গে তর্ক করছিল মতি মাষ্টার। গত কয়েক বছর কি খোদারে ডাকেন নাই আপনারা? হ্যাঁ, ডাকছিলেন। কিন্তু ফল কি হইছে? ফসল কি বাঁচছে আপনাগো? বাঁচে নাই। তাই কইতে আছলাম কেবল বইসা বইসা খোদারে ডাকলে চলবো না। এ কয়টা গাঁয়ে মানুষতো আমরা কম নই। সবাই মিলে বাঁধটারে যদি পাহারা দিই,— সাধ্য কি বাঁধ ভাঙে?

মতি মাষ্টারের কথা শুনে দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে এসেছিলেন বুড়ো কাজী। অশ্রাব্য গালি-গালাজ করেছিলেন তাকে। সে কাল বিকেলের কথা। মসজিদে আজান হচ্ছে। পীর সাহেব ডাকছেন সবাইকে, এস— মিলাদ পড়তে এস— এস মঙ্গলের জন্য এস।

সবার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল ছকু। তারপর টুপিটাকে মাথায় চড়িয়ে মসজিদের দিকে পা বাড়ালেন। খপ করে ওর একখানা হাত চেপে ধরলো রশিদ,— ছকু।

— এই ছকা। ক্ষেপে উঠলো পণ্ডিত বাড়ীর চাঁদু।

অগত্যা, কোদাল আর ঝুড়ি নিয়ে বেরিয়ে এলো ছকু মুন্সি।

মাইল খানেক হাঁটতে হবে ওদের। তারপর বাঁধ।

নবীন কবিরাজের পুকুর পাড়ে এসে পৌঁছতেই জোরে বিদ্যুৎ চমকে উঠে। প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল একটা। ভয়ে আঁতকে উঠে থমকে দাঁড়ালো ছকু। খোদা সাবধান করছে তাঁদের। খবরদার যাইও না।

— যাইও না মাষ্টার। থামো থামো। হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো ছকু মুন্সি। খোদা নারাজ হইবো, মসজিদে চলো সবাই।

— ইস, চুপ কর ছকু। বৃষ্টিতে ভিজে কাঁপছে মতি মাষ্টার। এখন কথা কইবার সময় নাই। জলদি চল।

আবার চলতে শুরু করলো ওরা।

দূরে মসজিদ থেকে দরূদের শব্দ ভেসে আসছে। পীর সাহেবের সঙ্গে গলা মিলিয়ে দরূদ পড়ছে তিনজী মিঞা, জমির ব্যাপারী, রহিম সর্দার ও আরো কয়েকশ জোয়ান জোয়ান মানুষ। অসহায়ের মত উর্ধ্বে হাতে তুলে চিৎকার করছে তারা। হে আসমান জমিনের মালিক! হে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কর্তা। হে রহমানের রহিম! তুমিই সব। তুমি রক্ষা কর আমাদের। ওদিকে মরিয়া হয়ে কোদাল চালাচ্ছে মতি মাষ্টারের দল। এ বাঁধ ভাঙতে দেবে না তারা। কিছুতেই না।

তাদের সোনার ফসল ডুবতে দেবে না তারা। কখনই না।

ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ আকাশ বিদ্যুৎ চমকিয়ে বাজ পড়ছে। সোঁ সোঁ শব্দে বাতাস বইছে। খরস্রোতা নদী ফুলে ফেঁপে ভয়ংকর রূপ নিচ্ছে। অমাবস্যার জোয়ার। নির্ঘাত বাঁধ ভেঙ্গে পড়বে।

হায় খোদা! ঘরেব বৌ ঝিয়েরা করুণ আর্তনাদ করে ফরিয়াদ জানায় আকাশের দিকে চেয়ে। দুনিয়াতে ইমান বলে কিছু নেই তাই তো খোদা রাগ করেছেন। মানুষ গোরু সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবেন তিনি। ধ্বংস করে দেবেন এই পৃথিবীটাকে, পাপে ভরা এই পৃথিবী।

দুরু দুরু বুক কাঁপছে তিনজী মিঞার। চোখের জলে ভাসছেন জমির ব্যাপারী। আর ঢুলে ঢুলে তছবি পড়ছেন।

হায়রে ফসল! সোনার ফসল!

এ ফসল নষ্ট হতে পারে না। টর্চ হাতে ছুটোছুটি করছে মতি মাষ্টার।

কোদাল চালাও! আবো জোরে!

বাঁধে ফাটল ধরেছে। এ ফাটল বন্ধ করতেই হবে।

অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে কোদাল চালাচ্ছে ওরা।

মন্তু শেখ চিৎকার করে বললে— আলির নাম নাও ভাইরা, আলির নাম নাও।

— আলির নামে কাম হইবো শেখের পো? বললে বুড়ো কেরামত।

— তারচে একডা গান গাও। গায়ে জোশ আইবো।

মন্তু শেখ গান ধরলো। গানের শব্দ ছাপিয়ে হঠাৎ বাজ পড়লো একটা কাছে কোথায়। কোদাল চালাতে চালাতে মতি মাষ্টারকে আর তার চৌদ্দ পুরুষকে মনে মনে গাল দিতে লাগলো ছকু মুন্সি, খোদার সঙ্গে লাঠালাঠি। হা-খোদা, এই কি জমানা আইছে। খোদা, এই অধমের কোন দোষ নাই। এই অধমেরে মাপ কইরা দিও।

ঝুড়ি মাথায় বিড় বিড় করে উঠলো পণ্ডিত বাড়ীর চাঁদু,— হাত-পা গুটাইয়া মসজিদে বইসা বইসা ঢল রুখবো না আমার মাথা রুখবো। তারপর হঠাৎ এক সময়ে মতি মাষ্টারের গলার শব্দ শোনা গেল,— আর ভয় নাই রে চাঁদু। আর ভয় নাই। এবার তোরা একটু জিরাইয়া নে।

এতক্ষণে হাসি ফুটলো সবার মুখে। শ্রান্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁধের ওপর এলিয়ে পড়লো অবশ দেহগুলো। পঞ্চাশটি ক্লান্ত মানুষ। সূর্য তখন পূর্ব আকাশে উঁকি মারছে।

আধ-আলো অন্ধকার। আকাশ বেয়ে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। মৃদুমন্দ বাতাসের তালে তালে নাচছে সোনালী ফসল। মসজিদ থেকে বেরিয়ে হঠাৎ সেদিকে চোখ পড়তে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো জমির ব্যাপারী। ডোবেনি ডোবেনি। ফসল তাদের ডোবেনি। ডুবতে

দেননি পীর সাহেব। খুশিতে চক্ চক্ করে উঠলো জমির মুন্সির চোখ দুটো। দৌড়ে এসে পীর সাহেবের পায়ে চুমো খেলেন গনি মোল্লা। ডোবেনি ডোবেনি। ফসল তাদের ডোবেনি। ডুবতে দেননি পীর সাহেব।

এক মুহূর্তে যেন চাঙ্গা হয়ে উঠেছে সমস্ত গাঁ-টা। ছেলে বুড়ো সবাই হুমড়ি খেয়ে ধেযে আসছে পীর সাহেবের পায়ে চুমো খাবার জন্যে।

ঘুম চোখে তখনও ঢুলছেন পীর সাহেব। স্বল্প হেসে বললেন,— খোদাব কুদরতের শান কে বলতে পারে।

সাগরেদরা সমস্বরে বলে উঠলো,— সারারাত না ঘুমাইযা খোদাবে ডাকছেন আমাগো পীর সাব। বাঁধ ভাঙ্গে সাধ্য কি?

পীর সাহেব তখনো হাসছেন। স্বল্প পরিমিত হাসি আপেলেব রক্তিমাভাব মত ফেটে ছড়িয়ে পড়ছে মুখের সর্বত্র।

কোন এক উর্মির জন্যে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

কবে কোন এক সুদূব নীহারিকা থেকে সে যেন যাত্রা করেছিল, এখনও সে হেঁটে যাচ্ছে। অবিরাম এই হাঁটা। জানালায় দাঁড়ালে তার এসব মনে হয়। নীল আকাশ দেখলে এমন মনে হয়। অবারিত মাঠে কোন গাছের মতো তার তখন দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। এই করে এক জীবন, এক জীবন না বহু জীবন সে বুঝে উঠতে পারে না। সে হেঁটে যাচ্ছে। যেমন আজই কেন জানি মনে হল, সকালে তার বের হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। বাস-রাস্তা পার হয়ে কোন গ্রাম্যপথে হেঁটে গেলে হয়ত দেখতে পাবে পৃথিবীটা অন্য রকমের। অচেনা পৃথিবী, না, এই চিরপবিচিত পৃথিবী। সে তারই বাসিন্দা চিবকাল, চিরদিনের বাসিন্দা।

সে বুঝতে পারে, অর্ধশতাব্দী সে এই পৃথিবীব বুকে পার করে দিয়েছে। অর্ধশতাব্দী কত বড কাল। অথবা কালের ঘরে এই সময়টুকু কত পরমায়ুর ভগ্নাংশ, মাপার কোন নিক্তি যদি এখন সে হাতের কাছে পেয়ে যেত। বেশ জাঁকজমক করে গতকালটা তার পঞ্চাশতম জন্মদিবস পালিত হয়ে গেল। সকালে উঠে মনে হচ্ছে, এটা না হলেই ভালো ছিল। যেন কেউ বলে দিল, ওহে এবারে পুরানো বৃক্ষ হয়ে গেলে। সবুজ বৃক্ষের জন্য এবারে তোমাকে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। অথচ তার জানালাব পর্দা তেমনি বাতাসে উড়ছিল। বোগেনভিলিয়া গাছটায় এখনও দু চার গুচ্ছ সাদা লাল ফুল ঝুলে আছে। টবে কটা লিলি ফুল ফুটেছে। ঘুঘু পাখির ডাক কানে আসছিল। ঘুঘু পাখির ডাক তাকে গভীর এক নির্জন দুপুরের কথা মনে করিয়ে দেয়। সে কেমন তখন ভীতু বালকের মতো মুখ কবে রাখে।

তখনই মনে হয় কোন এক অতীব গভীর নির্জনতা থেকে সে এসেছিল— আবার সেই এক অন্ধকার সর্বস্ব নির্জনতায় চলে যাচ্ছে। সে আগের মতো হৈ চৈ করতে পাবে না। খুশি হলেই মালপত্র বাঁধাছাঁদা করে কোন দূরের গ্রহে যাবে বলে রওনা হতে পারে না। আজকাল তার বাইরে বের হতে বড় ভয় করে। যেন সে ভারি একা হয়ে যাবে। পথ হারিয়ে ফেলবে।

পাশের ঘর থেকে কেউ ডেকে যাচ্ছে, সে শুনতে পাচ্ছে না। কে ডাকে? মা বা ঠাকুমা, সেই শীতের সকালে ঘুম ভাঙতে না চাইলে কেউ যেমন করে ডাকে। বড় উঠোন জুড়ে বাড়ি, টিন কাঠের ঘর। উত্তরের ঘর দক্ষিণের ঘর পুবের ঘর পশ্চিমের ঘর। তার সংলগ্ন আর এক উঠোন, রান্নাঘর, নিরামিষ ঘর। বাড়ির সামনে ফুলের বাগান, তার পাশে ঠাকুরঘর। দক্ষিণের পুকুর লাগোয়া গোয়ালবাড়ি। মা বাবা কাকা জ্যাঠা ঠাকুমা ঠাকুরদা, ইস্কুলের হেডমাস্টার মশাইর জন্য বৈঠকখানা, কত কি! নড়ে চড়ে বেড়াত। আতাফলের গাছে একটা পাখি এসে বসলে সেজ কাকিমা টের পেত, কুটুম আসবে। সেই ইষ্টিকুটুম পাখিটা উড়ে যেত না। পাখিটা ডাকত কু-উ—টু-ম্। সে তার দাদাদের সঙ্গে গাছটার নিচে গিয়ে বসত। গাছের ডালে একটা নীল রঙের পাখি। সুদূর থেকে খবর নিয়ে এসেছে, কেউ রওনা হয়ে গেছে কোথাও যাবে বলে। যেমন তাকে রওনা দিতে হবে। পাখিটা কি টের পেয়ে গেছে! সে কি উড়ে চলে যাচ্ছে আর এক কুটুম বাড়িতে, ডাকছে— কু-উ-টু-ম।

— কখন থেকে ডাকছি, শুনতে পাচ্ছ না কেন?

সে তাকাল। তারপর বলল,— তুমি আমাকে ডাকছ?

— ডাকছি না তো কী করছি।

— আমার কেন যে মনে হল ঠাকুমা ডাকছে।

— তুমি আমাকে ঠাট্টা করছ?

— না, না, ঠাট্টা না। রাগ করছ কেন রাখি।

— রাগ করব না তো কি।

— বয়স হয়ে যাচ্ছে বলে রাগ করছ?

সে দেখল তার বউর ঠোঁটে হাসি। বয়সকে এখনও তুচ্ছতাচ্ছিল্য কবতে জানে। সব সময় ব্যস্ত। সংসারের এত টুকিটাকি কাজ থাকে কেন। রাতে বিছানায় উঠে না গেলে দুজনের কোন কথাই প্রায় হয় না। রাখির তখন সারাদিনের অভিযোগ। বড মেয়েকে কে চিঠি দিয়েছে। আজকাল মেয়ের কাছে এত চিঠি আসে কেন? চাকরবাকর নিয়ে অভিযোগ। কাজ নিয়ে অভিযোগ। তখন কত রাজ্যের অভিযোগ নিয়ে রাখি হাজির হয়। যেন সে আদালতের হাকিম। হাকিম না আসামী। কি যে আশ্চর্য কখনও নিজেকে মনে হয় হাকিম, আবার কখনও আসামী। বিছানায় অন্য অস্তিত্ব আছে টের পেতে তিথি নক্ষত্র গুনতে হয়। আসলে মানুষ নির্জনতা থেকে আসে, নির্জনতায় ফিরে যায়। তার এখন ফিরে যাবার সময়। রাখির ঠোঁটে হাসি দেখে সে আজ আর জোরে হা হা করে হেসে উঠতে পারল না।

— তুমি যাচ্ছ তো।

— কোথায়?

— বারে, কাল বৌভাত। চিঠিটা কোথায়?

— আমার কাছে কোন চিঠি নেই রাখি!

— কে রেখেছে?

— মেয়েদের জিজ্ঞেস কর।

— কাল তো আঠার তারিখ তুমি কি পরে যাবে, কিছু বলছ না। শেষে যাবার সময় খুঁতখুঁত করলে আমি জানি না।

— তুমি যাবে না?

— আমি যাই কি করে?

— তা হলে আমিই যাই কি করে।

— জানি না বাপু। যা খুশি কর। কেউ না গেলে, সোনাকাকা খুব দুঃখ পাবে। বড় ছেলের বিয়েতে গেলে না। মেয়ের বিয়েতে না। এবাবে নিজে এসে বুড়ো বয়সে বলে গেছে। তোমার যাওয়া দরকার। তোমার মেয়েদের বিয়েতে কেউ আসবে না দেখো।

এই একটা ভয় ঢুকেছে ইদানিং। তারও বাড়িতে দুচার বছরের মধ্যে ম্যারাপ বাঁধা হবে। সানাই বাজবে। আলোর ফুলকি জ্বলবে টুনি ফুলের মতো। সারা বাড়িঘর তখন মানুষ জন ভরে না থাকলে মানাবে না। সেও সোনাকাকার মতো নেমন্তন্নের চিঠি নিয়ে বাড়ি বাড়ি যাবে। বলবে, আমার প্রথম কাজ। না গেলে দুঃখ পাব। একটা দুঃখ থেকে আর একটা দুঃখ। মেলায় সে একবার অসুখের জন্য যেতে পারেনি। পাতার বাঁশি কিনতে পারেনি। সে অর্জুন গাছের নিচে বসে গোপনে কেঁদেছিল। কেউ না এলে তাকে আবার গোপনে কাঁদতে হবে।

সে বললে, যাব না বলিনি! তোমার মেয়েরা কেউ যাবে? যদি যায় বল?

— ওরা যাবে কি করে? পরীক্ষা সামনে।

— একদিনে আর কত ক্ষতি হবে। সোনাকাকা আমাদের বাড়িতে কত বড় মানুষ ছিলেন। না গেলে টের পাবে কি করে।

— পরীক্ষার পর ওদের নিয়ে আমি একবার ঘুরে আসব।

আসলে রাখি এড়িয়ে যেতে চাইছে। সোনাকাকা আরও দুবার চিঠি দিয়েছিল, বৌমাকে নিয়ে ঘুরে যাবে। তোমার কাকিমার ইচ্ছে, তোমার ছেলে মেয়েদের দেখবে। রাখি যাবে যাবে

করে এড়িয়ে গেছে। শেষ বয়সের মুখ কি গোপনে লুকিয়ে রাখতে চায় রাখি। যুবতী বয়সটা পার হয়ে গেল। যখন দেখার মতো ছিল, তখনই দেখল না, এখন আর দেখে কি হবে। সে ভাবল নির্জনতার চিঠি রাখির ঘরেও কেউ বোধ হয় গোপনে রেখে গেছে। চিঠিটার খবর রাখি কাউকে দিতে চায় না। তাকেও না।

সে মনে মনে হাসল। সকাল বেলাটায় তার লেখালিখির কাজ থাকে। আজ কেন জানি কিছুই লিখতে ভাল লাগছে না। রাখিকে বলা দরকার কাল যদি যায়, রাতে ফিরে আসবে না। কাকার সঙ্গে তার অনেক জরুরি কথা বাকি আছে। সেটা এ সময়ে সেরে নিতে না পারলে আর সময় পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া আরও কি সব গোপন খবর যেন উঁকি দিয়ে যায়। উর্মি ঠিক আসবে। কবে থেকে আর একবার উর্মিকে দেখবে বলে বসে আছে। কেউ জানেই না, এ বাড়িতে শুধু কাকার চিঠিই আসেনি, সঙ্গে আরও একটা গোপন চিঠি এ বাড়ির নীল ডাকবাক্সে কেউ রেখে গেছে।

— সে আবার ডাকল ঃ রাখি।

রাখির কোন উত্তর পাওয়া গেল না।

— গীতা!

গীতা এ বাড়ির কাজের মেয়ে। সে দৌড়ে এলে বলল, — তোমার বৌদিকে ডাক না।

এ-বাড়িতে এই মানুষটাকে কেউ বড় ভয় পায় না। গীতা বলল,— কিছু লাগবে?

— না, কিছু লাগবে না।

— কিছু হারিয়ে গেছে!

সে বুঝতে পারল, গীতা রোজকার মত আশা করছে, লেখার টেবিলে বসে তার যেমন রোজ কিছু হারায়, এই যেমন কলম ঠিক থাকে না, লেখার পাতা হাওয়ায় উড়ে যায়, কোথায় কি সব নোট থাকে, সময়মত তা হাতের কাছে পাওয়া যায় না, আর তখন চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়। আজ অবশ্য সকালটা তার একান্ত গোপন চিঠিতে ভরে আছে বলে ছেলেমানুষের মতো চিৎকার চেঁচামেচি করছে না। বরং কিছুটা সুবোধ বালকের মত বসে আছে এবং তাতেই হয়ত গীতা কিছুটা অবাক হয়ে গেছে, যে মানুষটা রোজ কিছু হারায়, আজ একদম ঠিকঠাক, তার আশ্চর্য হবারই কথা। সে ফের বলল, তোমার বৌদিকে ডাক। খুব জরুরি কথা আছে।

জরুরি কল পেয়ে রাখি হাজির ঘরে। — আমাকে ডাকছ?

— শোন বলছিলাম, তুমিও চল। অনেকদিন স্বামীস্ত্রীতে কোথাও যাই না।

— এ-জন্য ডাকছ?

— কেন ডাকতে পারি না।

— অনেক কাজ। কাগজ এসেছে। দিয়ে যাব?

আসলে এগুলো কথাই নয়। ভেতরে মানুষের কোন গণ্ডগোল থাকে। সে ওপরে ভেসে থাকার জন্য কথা বলে। কিন্তু কথা সরিয়ে দিলেই বোঝা যায়, এই সব কথার গভীরে আরও অনেক কথা। সে বলল, কাকার সঙ্গে কিছু জরুরি কথা আছে বলেই যাব। না হয় যেতাম না।

রাখি বিস্মিত হল খুব। বলল, — কাকার সঙ্গে তোমার কি জরুরি কথা।

— না, এই যে কাকা আমাদের এতবড় পরিবার থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল— তাতে কাকা কোন কষ্ট বোধ করেন কি না!

— সবাই তোমার মতো নয়।

সে জানে রাখি খোঁটা দিচ্ছে। সে অবসর পেলেই মার কাছে চলে যায়, ভাইয়েদের কাছে চলে যায়। কিন্তু রাখি কোনবার যায় না। রাখি যেতে চায়, তার বোনেদের বাড়ি, তার দাদাদের বাড়ি। তার মার কাছে গিয়ে রাখি থাকতে ভালবাসে। এটা হতেই পারে। বাপের বাড়ি মেয়েরা যাবেই। সে তার মেয়েদের নিয়ে যেতে চায়। আত্মীয়স্বজন সবাইকে চিনে না রাখলে হবে কেন, এই চিনি পিসিমার বাড়ি, এই যে দেখছ, এ তোমার সেজদাদুর বাড়ি,

আমার বাবা কাকা জ্যাঠা মিলে বড় সংসার, ছেলের হাত ধরে যেতে চায় কোন আমলকি বনে। বাবা সেখানে একটা আশ্রমের মতো বাড়িঘর বানিয়ে আছেন। রাখি সেখানে যাওয়া পছন্দ করে না। গ্রাম জায়গা আলো পাখা নেই, গরমে সাপের উৎপাত। মেয়েরা কিংবা ছেলে শেষে কোন দুর্ভোগে না জানি পড়ে যাবে। রাখি কোথায় অলক্ষ্যে বসে যেন করাত চালিয়ে যাচ্ছে তার এবং পরিবারের মধ্যে। বাবার শরীরে যে পুরোনো গন্ধটা পাছে সে কত মহার্ঘ রাখি বোঝে না। অনীশ, তনু মনু সবাই তো এক পায়ে খাড়া। বাবা যাব। রাখির তখন নানারকম অজুহাত। কোনবার বেড়া ডিঙোতে পারলে তনু মনু অনীশ যায়। বাবার পুরোনো গন্ধটা নিতে ওরা খুব ভালবাসে। বাবাও কেমন সবুজ টাটকা গন্ধে ছেলেমানুষ হয়ে যান। বুড়ো বয়সে গাছ থেকে কোন গাছে কি আম, কি তার নাম, কি-ভাবে খেতে হয় সব পেড়ে পেড়ে খাওয়ান। সন্ধ্যায় হ্যারিকেনের আলোতে মাদুরে বাবা, চারপাশে সে তনু মনু অনীশ, বাবার সেই ভূতুড়ে মাঠের গল্প, বিলের গল্প, গজার মাছের গল্প— রাখি জানেই না তাতে কি স্বাদ যে আছে।

সে খুব বিষণ্ণ গলায় বলল,— জান রাখি আমিও শেষে সোনাকাকা হয়ে যাই। সম্পর্কহীন মানুষ। আমার বড় ভয় করে।

রাখি বলল,— তোমার জরুরি কথাবার্তা তাড়াতাড়ি শেষ কর, সকালের খাবার এখন পর্যন্ত দিতে পারিনি।

সে বুঝতে পারে রাখির এ-সব কথা পছন্দ নয়। রাখি চায় না, সে এ-ভাবে কথা বলুক। সব মানুষেরই একটা পুরোনো স্বভাব থাকে। তা থেকে তাকে বের করে আনতে হয়। রাখি মানুষটার পুরোনো স্বভাব প্রায় তছনছ করে দিয়েছে। বাড়ি গিয়ে আজকাল দেখেছে, আলো পাখা ছাড়া তার কষ্ট হয়। সে দুদিনের বেশি বাড়িতে থাকতে পারে না। বেশি দিন জোর করে থাকতে গেলে নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। সে তো এমন ছিল না। এই যেমন এবছর সে যাবে যাবে করেও বাবাকে দেখতে যেতে পারেনি। বাবার বিরাট ফর্দ এসেছে। রাখি বাবার সবই কিনে পাঠিয়ে দিয়েছে। লবঙ্গ, জায়ফল, এলাচ, কিসমিস, আরও কত কি। সে বাড়ি যাবে বললেই, রাখির কেমন আতঙ্ক দেখা দেয়। এই গরমে যাবে। এখন তো ওখানে লু বইবে। টিনের চাল, জানালা নেই। হাওয়া ঢোকে না। রাতে ঘুমাতে পারবে! আগে সে রাখির আতঙ্কে ভয় পেত না। কিন্তু এখন তার মনে হয়, রাখি তার ভাল চায়। রাখি তাকে সুস্থ রাখতে চায়। এত বড় বাড়ি, নিচে চারখানা বার বাই ষোল ঘর, ওপরে, তার এবং রাখির আলাদা ঘর, মোজেইক করা মেঝে, ডিসটেমপার করা দেয়ালের হলুদ সবুজ নীল রঙ সবই একটা রঙে বাধা পড়ে আছে। সে তো আর সে নয়। রাখি, তনু মনু অনীশ মিলে সে। তার একার ইচ্ছে আর এখন কোন ইচ্ছে নয়।

সে কেমন কাতর গলায় বলল,— রাখি, তুমি আমার জন্য একটু সময় দিতে পার না।

— বলবে তো। আমি কি শুনছি না।

— কাল আমার কি উপনয়ন হল!

রাখি তার মানুষটার স্বভাব বিশ বাইশ বছরে ভালই জেনে ফেলেছে। মানুষটা তাকে আসলে ঠাট্টা করছে।

রাখি বলল,— তার মানে?

— এই ধর আবার দ্বিজ হলাম। যাকে বলে পুনর্জন্ম। এই অর্থাৎ বলছিলাম, বাবা মা'র কাছে বিশ বাইশ বছর, তোমার কাছে বিশ বাইশ বছর, বাবা মা যে দাগ ধরিয়ে দিয়েছিল, বিশ বাইশ বছরে তা ঘষে ঘষে তুলে দিয়েছ, এখন বুঝেছ? তাই ঘটা করে উৎসব করলে, ঘটা করে জানান দিলে এতদিনে মানুষটার মতিগতি ফিরেছে। আর তখনই তার মনে হল, উৎসবে বন্ধুবান্ধব, ভক্ত পাঠকপাঠিকা অফিসের সহকর্মী থেকে বেয়ারা সবাই এসেছে। কেবল তার পরিবারের আত্মীয় স্বজনরা বাদ। এমন কি শ্যালক শ্যালিকা, তস্য আত্মীয়রাও এসেছেন। সে বলল, রাখি, অবিনাশ এল না। ছোট এল না। চিনি পিসি এল না। কেউ না।

— না এলে কি করব। আমি নিজে গিয়ে বলে এসেছি।

— কোন ফাঁকি ছিল না তো!

— আমি জানি না। আমাকে তুমি অযথা দায়ী করবে না।

— না না রাগ করছ কেন! তারা আসবে না কেন বুঝতে পারি না। আমি সমীর দুলাল রবি এক সঙ্গে কত বড় মাঠ ভেঙে গেছি। পরাপরদির মেলায় ঘুরে ঘুরে বিন্নির খৈ-বাতাসা খেয়েছি। কি যেন চেয়েছিলাম তখন এখন ঠিক মনে করতে পারছি না। আমার আপনজন কেউ এল না কেন?

রাখি ঝড়ের মুখে খুব কথা বলতে পারে না। চুপচাপ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকল।

সে আবার বলল, — আমার জন্মদিন এই প্রথম। তাও পঞ্চাশ বছরের মাথায়। হঠাৎ তোমাদের মাথায় কেন যে এটা এল!

রাখি বুঝতে পারে গতকাল সবাই এসেছিল শুধু ওর আত্মীয় স্বজনরা বাদে। সারাদিনই উৎফুল্ল ছিল। বিকেলের দিকে কেবল বলছিল ওরা তো এল না।

ওরা কারা রাখি প্রথমে বুঝতে পারে নি। পরে বুঝেছে; কিন্তু এই সকালে তাকে ডেকে নানা রকমের প্রশ্ন করায় বুঝতে পেরেছে, তার পিসিমা, দাদা বৌদিরা, এবং ছোট কাকা না আসায় সে ক্ষুব্ধ। কিন্তু সে কি করবে তার জন্য। আসলে জেলাসি। সংসারের সেই সরল বালকটি এমন জায়গায় চলে আসবে বোধ হয় তারা বুঝতে পারেনি। প্রাচুর্য কাউকে কাউকে পীড়া দেয়।

রাখি বলল,— সকালবেলায় আমাকে ঘাঁটিও না।

সে বুঝতে পারছিল, আর একটু বললেই, চোখ জলে ভরে আসবে। যখন পেরে ওঠে না, অথবা এমন সব কথা রাখির বলার ইচ্ছা হয়, যা তার প্রকাশ করতে কষ্ট, তখন বালিকার মতো কেঁদে ফেলে রাখি।

সে এবার টেবিল থেকে মুখ তুলে প্রায় দু যুগের অর্ধাঙ্গিনীকে দেখল। এখন কেন যেন টের পায় সত্যি রাখি তার অর্ধাঙ্গিনী। এ-বয়সে এ-ছাড়া কিছু আর মনে হয় না। প্রেমিকা, রহস্যময় নারী আর এখন রাখিকে সে ভাবতে পারে না। অথচ মানুষের একজন প্রেমিকা বড় দরকার। সোনাকাকার ছেলের বৌভাতে সে যাবে। উর্মি আসবে। শৈশবে সে উর্মিকে মাত্র একবার দেখে ছিল। তারপর সে পথ হেঁটে কোন জায়গায় যাবে বলে রওনা হয়েছিল। আসলে সে বার বার উর্মির কাছেই যেতে চেয়েছে। সে যে এখানে এসে পৌঁছেছে, তাও উর্মির জন্য। সে বলল, বৌভাতে যাব। ধুতি পাঞ্জাবি পরেই যাব।

এ-গল্প, জীবনের যে কোন কৃতী মানুষের গল্প। এর নায়ক যেই হোক, তাকে আমি এতক্ষণ সে বলে চালিয়েছি, সে অর্থাৎ কৃতী মানুষটির নাম এখানে রাখা গেল অবনীশ। অবনীশ যাচ্ছে আসলে উর্মির কাছে। বৌভাতে নয়। সে উর্মিকে সেখানে গেলে দেখতে পাবে। উর্মি, সোনাকাকার বড় শালীর মেয়ে। সোনাকাকার বিয়েতে অবনীশ বরযাত্রী গিয়েছিল। অবনীশের তখন কৈশোরকাল, সোনাকাকা তখন অবনীশের জীবনে দেখা সব চেয়ে সৌভাগ্যবান মানুষ। সেই সোনাকাকার বিয়েতে সে উর্মিকে দেখেছিল। বিরাট প্রাসাদের মতো বাড়ি, ঝাড় লণ্ঠন, সানাই, নীল সবুজ আলোর মধ্যে কতরকমের ব্যান্ড-পার্টি। সদর দরজা দিয়ে বিয়ের চত্বরে ঢোকার মুখেই অবনীশ দেখেছিল, সাদা ফ্রক গায়, লাল রিবন বাঁধা চুলে ছোট্ট এক এলিস দাঁড়িয়ে। হাতে গোড়ের মালা বরযাত্রীদের হাতে হাতে দিচ্ছে। কখনও সুঘ্রাণ ছড়িয়ে দিচ্ছে শরীরে। অবনীশের মনে হয়েছিল, ছোট্ট এক ফুলপরী, যেন পাখা লাগিয়ে দিলে তক্ষুনি উড়ে যাবে। মেয়েটি তার হাতেও গোড়ের মালা দিয়েছিল, তাকিয়েছিল, তারপর কি হয়েছিল, যেন অবনীশের, সে দেখেছিল, একটি সাদা ঘোড়া সামনে। ঘোড়ার পিঠে সে, আরো কে একজন।

ঘোড়ার পিঠে ছুটতেই মনে হয়েছিল, সে আর কেউ নয় উর্মি। দু হাতে তার বেলফুলের মালা। খোঁপায় তার বেলফুলের মালা। গলায় বেলফুলের মালা। গায়ে সাদা সিল্ক, চোখে কাজল, আর কি সুঘ্রাণ শরীরে। সে তাকে সাপটে ধরে রেখেছে। তার এলোচুল হেমন্তের বাতাসে উড়ছে। উর্মিকে সে সেবারই মাত্র একবার দেখেছিল। দেখার পর সে কেমন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। বিয়ে বাড়িতে সে যতক্ষণ পেরেছে চুরি করে তাকে দেখেছে। আর একবার মাত্র উর্মি তার দিকে চোখ তুলে দেখেছিল। কি গভীর চোখ আর অধীরতা। না আরও একবার। মনে হচ্ছে, না আরও একবার। সেই শৈশবে, প্রথম উর্মিকে দেখে ভেবেছিল, তার চাই লাল রঙের ঘোড়া, তার চাই নির্জন বালিয়াড়ি, তার চাই অনন্ত অসীম আকাশ। সেখানে সে আর উর্মি, আর কেউ না। তারপর ক্রমান্বয়ে হাঁটা, সেই উর্মি কবে কোথায় কিভাবে হারিয়ে গেল।

সোনাকাকা গেটের সামনে ইজিচেয়ারে শুয়ে। তাকে দেখেই যেন প্রাণ পেল। বলল,— যাক তালে তুই এলি।

অবনীশ জানতে চাইল, — আর কে কে এসেছে?

সোনাকাকা দুঃখ করলেন, বাড়ির থেকে সেই একমাত্র হাজির। আর কেউ আসেনি। সে একবার জিজ্ঞেস করবে ভাবল, উর্মি এসেছে কিনা। কিন্তু সঙ্কোচ হল।

অবনীশ কেমন লজ্জার মাথা খেয়ে বলল, — বড় মাসি আসে নি।— সে জানে উর্মি বড় মাসির মেয়ে। বড় মাসি এলে যেন উর্মিরও আসার কথা।

— এসেছে। ভিতরে যা।

সোনাকাকার ছেলে মেয়েরা এসে বলল, —রাঙাদা, এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন, ভেতরে যাও।

চারপাশে এত আলো, এত সমারোহ যে চোখ ঝলসে যাচ্ছে। উর্মির এখন কত বয়েস। আর তখনই সহসা কেমন সে ম্রিয়মাণ হয়ে গেল। উর্মি তো আর এক জায়গায় বসে নেই। সেও তার মতো পথ হেঁটে গেছে। আর কেন যে এ-কথাটা এতদিন একবারও মনে হয়নি। বয়স মানুষকে ছন্নছাড়া করে দেয়। ঝড়ের পর গাছপালার মতো ছিন্নবিছিন্ন মনে হয়। সে আর ভিতরের দিকে ঢুকতে সাহস পেল না।

আর এ সময় কে যেন টিপ করে প্রণাম করল। আরে এই তো সেই উর্মি!

পাশ থেকে কে বলল, — আমার মেয়ে। আমাকে চিনতে পার?

অবনীশ বলল, — না।

— আমি উর্মি।

— ধুস তুমি উর্মি হতে যাবে কেন! ও উর্মি।

উর্মি বলল,— তাই। তারপর চলে গেল।

অবনীশ বুঝতে পারল না, এ-কথায় উর্মি আঘাত পেয়েছে কি না।

কিন্তু কিছুক্ষণ পর উর্মি এল, বলল,— শোন একটা কথা আছে। ইনি আমার কর্তা। আলাপ করিয়ে দি। তুমি আমাদের বাড়িতে গেছিলে বিশ্বাস করত না।

একজন ঢ্যাঙা প্রৌঢ় মানুষ। উর্মির চেয়ে সাত আট বছরের বড় হবে।

—মেসো বলছিল আপনি আসবেন। আমাদের সৌভাগ্য শেষে দেখা হল। উর্মি আপনার কথা খুব বলে।

অবনীশ কিছু বলতে পারল না। যে তেজী ঘোড়াটার স্বপ্ন উর্মি তাকে দেখতে শিখিয়েছিল, সেই উর্মিই হয়ত মানুষটার ঘরবাড়িতে রাখির মতো চোপা করে। সে কি ভেবে শিশুর মতো বলল, তোমার মেয়েকে পাঠিয়ে দাও। ওর সঙ্গে আমার ভারি আজ কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে। উর্মি মেয়েকে ডেকে দিলে অবনীশ চুপচাপ অনেকক্ষণ সেই কিশোরীর পাশে বসে ইষ্টিকুটুম পাখির ডাক শুনল। দ্বিতীয় উর্মিকে ছেড়ে তার আর কোথাও যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। মনে হল মানুষ জীবনে সব সময়ই কিছু না কিছুর কাঙাল থাকে।

কিংবদন্তি

অমলেন্দু চক্রবর্তী

বাঁশের মাচার এক কোণে ঝুলছিল হ্যাজাকের আলোটা। সেই সন্ধে থেকে একটানা ভঁসভঁস ফুঁসছে। তেল পুড়ছে, ঝাঁকে-ঝাঁকে পোকা এসে কিলবিল করে ঘুরছে চারদিকে, ঠোক্কর খেয়ে পুড়ে পুড়ে মরছে। জোয়ানবুড়ো মাগীমদ্দা মানুষগুলির মতো। ওষুধ নেই, পথ্যি নেই, ডাক্তারবদ্যি কিছু নেই, যেন মরলেই হলো।

অমাবস্যের রাত। আকাশ ঝেঁপে ঘুটেঘুটে আঁধার। তিন ক্রোশ চার ক্রোশ দূরের-দূরের গ্রামগঞ্জ, খানাখন্দ, বুক-টান করা মাঠের পর মাঠ সব কালো করে গগন জুড়ে চাপ-চাপ আঁধার। ঠায় ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে আছে গাছপালা, বাঁশবন, ঝোপজঙ্গল। একটু বাতাস নেই, নিশ্বেস নিতে কষ্ট, বুকে টান ধরে। গায়েগতরে শুধু নোনতা ঘামের ঢল। চিমসে পেটে কালো কালো মানুষগুলি ধুঁকতে ধুঁকতে আসে, হাঁটু ভেঙে বসে, মাটিতে লুটোয়— মা, মা গ, রক্ষে কর মা গ। মাঠ পুইড়ে খাক হল, হালনাঙল সব বিকোল, দেশ জুইড়ে ভাগাড়। স্বজনস্বজাতি শ্যালশকুনে খায়...

মায়ের-থানে তাকিয়ে থাকতেও ভয়।

ভয়। মায়ের-থান সাজিয়েছে জোয়ানমরদ বাউরিরা, যারা এই অকালেও ঘরের বাপ-মা, স্বজনস্বজাতিকে টেনে-হিঁচড়ে সোনাডাঙার মাঠের ভাগাড়ে শেয়ালশকুনের মুখে ফেলে আসতে পারে।

চারটে বাঁশ পুঁতে মাচা, বাহারের খেজুরপাতা আর কামিনী গাছের ডাল দিয়ে ঘিরেছে চারদিক। চার-চারটে ধুনুচি থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে, সরু হয়ে ওপরের ছাউনিতে ধাক্কা খেয়ে ছড়িয়ে পড়ে পাকে পাকে মোচড় দিয়ে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আড়াল করে দিচ্ছে শ্মশানকালীর মূর্তি। লাল-কাপড়-পরা কাপালিক ঠাকুর ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় মিশে গেলেন। আধ বস্তা ধানের পেন্নামী দিয়ে দূরের গাঁ থেকে আনতে হয়েছে বামুনঠাকুরকে। আকাল-মড়কের দিনে কেউ আর চায় না মুখপানে। দেশ-গেরামের মানুষগুলি আর মানুষ নেই কেউ। শুয়োরের মতো মাটি শোঁকে। সুযোগ পেলেই হাড়মাস চিমসে খেতে চায়।

ড্যাং ড্যাং ড্যাং বাদ্যি বাজে। নিঝুম রাতের মাঠে মাঠে ছড়ায়। ধরাস ধরাস করে বুকগুলি, চোখের পলক পড়ে না। বাউরিদের গাঁয়ে এমন বাদ্যি বাজেনি কোনোকালে। কিন্তু রা কাড়ে না কেউ। চুপটি করে বসে থেকে বুকের ভেতর সিঁধিয়ে যায় বাচ্চাবুড়ো সকলেই। খিদেয় তেষ্টায় কাতরায়। ধোঁয়ার নাচন দেখে আর ভাবে— অমন সোনার-মাঠ ভাগাড় হলো কোন বিধাতার শাপে?

সব জ্বলে-পুড়ে খাক। চোত-বোশেখের মাঠ, পোয়াতি বৌ-এর পেট খালাস হলে যেমনটা হয়, ফেটে ফেটে চৌচির। বড় বড় হা। লাঙল ফেললে ঈষ ডোবে না, মোষবলদের পা হুমড়ি খেয়ে পড়ে। দেড় ক্রোশ দু-ক্রোশ লম্বা মস্ত মাঠের একপাশে পঞ্চাশ-ষাট ঘর বাউরিদের ছোট গ্রাম। মাঠের পিঠে ছোট আঁচিলের মতো। ইঁদারা নেই। পঞ্চাইতের টেপা-কল ছিল

একটা, গেল দু-সন ধরে পড়ে পড়ে মরচে ধরল। হাত দিলে শুধু খটাং খটাং। এঁদোডোবা, পানাপুকুর দু-একটা যা-ও-ছিল, অগস্ত্যমুনি শুষে নিলেন। তলানিব কাদাও শুকিয়ে কাঠ, পায়ে-পায়ে বেঁধে। রাতদুপুরে গোয়ালের দড়ি ছিঁড়ে গাইবলদ মাঠে মাঠে ছোটে। তেষ্টা! তেষ্টার টানে সারা মাঠ জুড়ে ডাক ছেড়ে ছুটতে ছুটতে আঁধার রাতে কোথায় চলে যায়। সব ফেরে না। দু-চারটের খোঁজ মেলে— মাঠের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে মরে পড়ে আছে। শেয়ালশকুনের মোচ্ছব। শিবঠাকুরের বাহন। চাষির ঘরে মা-বাপ। শোকে-দুঃখে তেষ্টায় বুকের-ছাতি ফাটে। সইতে পারে না চাষি। চোখ ফেটে জল গড়ায়। জিভের ডগায় লোনাস্বাদ। তেষ্টা। জগৎ জুড়ে ছেলেবুড়ো, মাগীমদ্দা সকল মানুষের বুক পুড়িয়ে খরখরে খরার আগুন। নির্দয় আকাশ। কুকুর বেড়ালের মতো মানুষের বাচ্চাগুলি বাউরি বৌ-ব বুক খাবলে ধরে, মাই কামড়ে রক্ত চোষে। যন্ত্রণায় কাতরায় বৌ। কার বৌ, কার বাচ্চা। এক বাউরি বৌ-এর দুধ-জমানো-বুকে অন্য সব বাউরি-বাচ্চাদের মোচ্ছব।

ঝাঁকে ঝাঁকে শকুন ওড়ে গাঁয়ের আকাশে। মেটে ঘরের চালে, বাড়ন্ত মরাই-এর ওপর, তালখেজুরের ডগায়, শেতলা মায়ের থানে, ঘরের দাওয়ায়, নিকোনো উঠোনে শকুন। দিনদুপুরে পরান বাউরির ন্যাংটা মেয়েটাকে উঠোন থেকে ছুঁচোল ঠোঁটের ডগায় গেঁথে উড়িয়ে নিয়ে গেল একটা শকুন। মেয়েটার কান্নায় পড়শীরা ছুটে এসে ভিড় করল। হাঁ করে ঘাড় উঁচিয়ে দেখল সবাই, সাতজন্মে এমন অলক্ষুণে কাণ্ড দেখেনি, শোনেনি গ কেউ— চার মাসের একটা শিশুর বুকচেরা কান্না সীতা মায়ের মতো উড়ে যাচ্ছে আকাশে, টশটশ রক্ত ঝরছে মাটিতে। ফোঁটা-ফোঁটা রক্তের দাগ খুঁজে জোয়ানরা মাঠের দিকে অনেকদূর এগোল। বিশাল ডানার ছায়াটা মাঠের ওপর পাক খেয়ে খেয়ে হারিয়ে গেল কোথায়। সেই থেকে একটা ভয়, দিনের রোদ্দুর আর পুণ্যিমের চাঁদনি সব আঁধার হয়ে গেলে, শকুনের ডানা-ঝাপটানির তলায় ভয় আর তরাসে বুক কাঁপতে থাকে। মুখ তুলে কথা কইবার সাহস নেই। কি সব্বোনেশে কাল গ। অমন ছিষ্টিছাড়া মরণ। জন্মো জন্মো পাপের ভোগান্তি গ। অকল্যেন। ঘরে ঘরে কান্না আর নাভিশ্বাস। বমি আর পায়খানায় মাখামাখি। মাগীমদ্দা ছেলেবুড়ো প্রাণপণে মাটি আঁচড়ায়। জল! তেষ্টার জল! এক ফোঁটা জলের আশ মিটাযে দাও গ ভগমান। হেই মা রক্ষেকালী। মা শেতলা। মা গ...

সোনাডাঙা মাঠের ধারে একটা গভীর ডোবার তলায় কাদামাটির ঘোলাটে জল খুঁজে পেল বাউরিরা। রাতদুপুরের তেষ্টায় জলের নেশায় ছুটে এসেছে গাইবলদমানুষ, হুমড়ি খেয়ে মরে পড়েছে পাশাপাশি। সেই জলে বিষ ছিল। বিধাতার শাপ। সেই বিষেই মড়ক এল। মরণ...

পালুই-এর তলায় অন্ধকার থেকে, ঝোপজঙ্গলের ফাঁকে চুকচুক করে জিভ চাটতে চাটতে দিনদুপুরে বেরিয়ে এল শেয়ালরা। সোনা বাউরির বুড়ো বাপ হাড়-জিরজিরে নধর-বাউরির ঘরের ভেতর গিয়ে কামড়ে ধরল। তাড়া খেয়ে পালাল বটে, কিন্তু গল্‌গল্ বমি করতে করতে এবং ক্ষিদেয় তেষ্টায় সেই বমি চাটতে চাটতে বুড়ো ধুঁকে ধুঁকে মরে গেল। মরণটা ছড়িয়ে পড়ল ঘরে ঘরে। জোয়ানমরদ যারা তখনও ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াতে পারে, বুঝতে পারে না, কি করবে। মাঠের মাঝে মাঝে ছেঁড়া ছেঁড়া গ্রাম— সুতাহাটি, জাগুলি মাতালি কোমপুর, দুলেবাগদীবাউরি ক্ষেতমজুর গরিব কিষেনদের বাস। দূর থেকেই দেখা যায় সব গাঁয়ের আকাশেই কাকচিলের মতো টান-টান ডানা-মেলা শকুন, মাঠ ভরে ভাগাড়, আমকাঁঠালতেঁতুল বট-অশ্বত্থের পাতা ঢেকে ডানা ঝাপটাচ্ছে শকুনের পাল। আর রক্ষে নেই। ডাক্তার-বদ্যি নেই। আসবে না কেউ। আসেও না। আড়াই ক্রোশ দূরে সরকারি পাকারাস্তার ধারে বামুনকায়েত, মালিকজোতদার কত্তাবাবুদের গ্রাম। হাটবাজাব

দোকানপাট ডাক্তারবদ্যি টেপাকল ইঁদারা শান-বাঁধান-দীঘি সব আছে বাবুদের। শহর থেকে বাবুদের লোক এসেছিল, ছুঁচ ফুঁড়ে দিয়ে গেছে জনে জনে, মাঠ পেরিয়ে গরিবদের গাঁয়ে আসেনি অ্যাদ্দুর। গাঁয়ের বুড়ো মুরুব্বি ফকির বাউরি মরদ-জোয়ান মদন, কানু, বিশে নন্দকে নিয়ে বোশেখ-মাসের আগুন মাথায় বয়ে ভরদুপুরে গিয়েছিল বাবুদের দোরে। সরকারি হাসপাতালের ডাক্তারবাবু, যামিনী ডাক্তার, নলেন কবরেজ— সকলের পায়ে মাথা কুটে কান্নাকাটি করে ফিরে এল। কেউ এলেন না। পেটে দানা নেই। পোকামাকড়ের মতো কাতরাচ্ছে মরছে মানুষ। ওরা পেট পুরে জল খেয়ে এল, তিনটে মেটে-ঘড়ায় জল নিয়ে এল গাঁয়ে। জল। এক দুপুর ধরে কয়েক হাজার মেয়েপুরুষের সঙ্গে লড়াই করে জল এনেছে। মাঠের আল বেয়ে ঘড়া-মাথায় ওদের আসতে দেখেই গাঁয়ের ছেলেবুড়োমাগীমদ্দা পিল্‌পিল্ করে ছুটে গেল লোভে, দু পা সোজা করে দাঁড়াতে পারে, এমন যতগুলি মানুষ ছিল, সবাই। সোরগোল তুলে হুমড়ি খেয়ে পড়তেই তিনটে ঘড়া মাটিতে পড়ে গুঁড়িয়ে গেল। গড়িয়ে গড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ল মাঠে। মাঠের তেষ্টা আকাশ ভেজায়। মানুষের সাধ্যি কি? দু-ঘড়া জল চোখের পলকে শুকিয়ে গেল আল্‌কেউটের গর্তে। নন্দ বাউরির মাথার ঘড়াটাও যাচ্ছিল। পড়ি-পড়ি করে হাত ফসকে যাবার আগেই লাফ মেরে হাত বাড়িয়ে ওটা নিজের মাথায় কেড়ে নিয়ে ছুটতে শুরু করল সদা বাউরির মেয়ে টেঁপি। এক-কুড়ি বয়সের ডবকা ছুঁড়ি। হাড়েমাসে ফুলেফেঁপে ভয়ঙ্কর। ঘড়াটাকে মাথায় বসিয়ে সোজা ছুটল গাঁয়ের দিকে। একঘড়া জল। অমন সাধের অমেত্ত। ও বেহায়া ছুঁড়ি একা লিবেক কেনে? রোগা-আধমরা টিঙটিঙে মেয়েপুরুষ কাচ্চাবাচ্চা সবাই মিলে মেয়েটাকে ছেঁকে ধরল আলের ওপরই।

'ই আমার তরে লয় গ, তুদের দিব। জনে জনে ভাগ কইরে দিব. . হা-পিতোশ করিস নাই... ই তুদের...'

কে শোনে। সবাই মিলে খামচে ধরেছে। কিলচড়খামচি আর কামড়, মেয়েটা সামলাতে পারল না। মাথার ওপরই ঘড়াটা ফাটল। গল্‌গল্ করে টেপাকলের ঠাণ্ডা-জল ওর দেহ ভিজিয়ে ওর জট-পাকানো লালচে দীঘল চুল, নাকমুখঘাড়-গলাবুক, বুকের কাপড় সব ভিজিয়ে স্নান করিয়ে দিলো।

আহ্, কি সুখ! যেন বর্ষার জলে কাদা-মাঠে ধান রুইতে নেমেছে মনে হয়। আরামে চোখ বোজে টেঁপি। এবং তখনই ওকে নিয়ে হুটোপুটি। ওর শরীর চাটে জোয়ানবুড়ো মাগীমদ্দারা। সোমত্ত মেয়েমানুষের টগবগে শরীর। পুরুষ-মানুষের জিভে শেয়ালের লালা। সর্ব অঙ্গ জ্বলে। যৈবন! যৈবন! সোমত্ত মেয়েমানুষের শরীলটাই যে মরণের পোকা গ। আকালে মড়কে বাঁচি যদি, শরীল রাখি কুথা! মেয়েটা বাঁচতে চায়। চারদিকে মারধর করে বেরোতে চেষ্টা করে। কিন্তু ওর ভেজা-শাড়ির আঁচল ধরে টান। টেঁপি চিৎকার করে ডাকে, দু-হাতে প্রতিরোধের চেষ্টা— 'নজ্জা গ, মেয়েমানুষের এজ্জত...' ভেজাশাড়ির আঁচল টেনে দাঁতে কামড়ে, চুষে চুষে গলা ভেজায় দেশ-গাঁয়ের চেনা-মানুষেরা। সব জানোয়ার বনে গেছে, সবাই শেয়ালকুত্তা। মেয়েটা ভয় পেল, দু-হাতে বুকের মাই চেপে তাকিয়ে দেখে, মানুষগুলি মানুষ নয় কেউ, ওরা এবার মানুষের রক্ত চুষে খাবে। উদোম মাঠের মাঝখানে ছেঁড়া-তালিমারা ন্যাতান্যাতা পুরোনো শাড়িটা ঘরের মানুষের হাতে চলে যেতেই সম্পূর্ণ ন্যাংটো হয়ে, এক-কুড়ি বয়সের তাজা মেয়েটা অমন কাঁচা বয়সের ডাগর শরীরটা নাচাতে নাচাতে আলের পথ ধরে মেয়েমানুষের লাজলজ্জা, ভয়ডর সবকিছুর মাথা খেয়ে, ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরের দিকে ছোটে। সুপুষ্ট শরীরটা নেশা ছড়ায়, উদোম বুক লাফায়। উপায় নেই। ঘরের মানুষ লজ্জা কাড়লে, তামাম দুনিয়ার বেবাক মানুষই যে জানোয়ার বনে যায় গ...

মানুষ নয়, যেন একরাশ শেয়াল-শকুনের ভিড় ঠেলে গাঁয়ে উঠে এসে টেঁপি ঘরের দিকে ছোটে। তেঁতুলতলায় গাছের গুঁড়ি আঁকড়ে মরে পড়ে আছে একটা মানুষ। একপাল শকুন বসে মোচ্ছব করছে। সোনা বাউরির ঘরের ভেতর মেয়েমানুষের গোঙানি, মা-শেতলার থানে তিনটে শেয়াল গন্ধ শুঁকছে। গাঁয়ের পাশে সোনাডাঙ্গার মাঠে ভাগাড়, গাইবলদের সঙ্গে স্বজনজাতিকে টেনে টেনে ফেলা হচ্ছে ভাগাড়ে, শেয়ালশকুনের কাড়াকাড়ি, সারা গ্রাম জুড়ে মরামানুষের পচা দুর্গন্ধ। মেয়েটা কোনো দিকে তাকায় না, প্রায় নির্জন শ্মশানগ্রামের ওপর দিয়ে দৌড়ে এসে নিজের মাটির ঘরে ঢুকে নিশ্বেস নেয় আর হাঁপায়। এই মড়কেই দুদিন আগে মরেছে মা-টা, বমিপেচ্ছাবপায়খানায় গোটা শরীরে পচা গন্ধ মেখে ধুঁকছে বুড়ো-বাপ। কথা কইতে পারে না, ভাঙা চোয়ালে শুকনো জিভ টেনে ঠোঁট চাটে। চোখে জল। মেয়েটা সামনে এসে দাঁড়াতেই, যেন মাটিতে-লেপটে-থাকা রুগ্ন শরীরে একটা কাঁপুনি লাগল হঠাৎ, পলক না-ফেলে ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে থাকে সদা বাউরি। নড়ে না টেঁপি। শ্মশানকালীর ভয়াল-মূর্তিতে বাপের চোখে চোখ রেখে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে! ভাঙা চালে শকুন ডাকে। অক্ষম দুটো হাত তুলে কি যেন বলতে চেয়ে, বলতে না পেরে চোখের ওপর বমি করতে করতে পাঁজরা ছিঁড়ে মরে যায় সদা বাউবি এবং এত যন্ত্রণা দেখেও হাত বাড়িয়ে বুড়ো-বাপকে ধবল না মেয়েটা। মাটিতে আছড়ে পড়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদে— 'কেউ বাঁইচবেক নাই বাপ। সোদর ভাই আমার বুক চেইটেচে, সোদব বোন বুকের-কাপড় টেইনে আমায় ন্যাংটা কইরেচে। দেশগাঁয়ে আর মনিষ্যি নাই গ বাপ। সব্বায শ্যাল-কুত্তা ..'' এবং তখনই গাঁয়ের আর দশজনকে নিয়ে ছেদাম বাউবি ঘিবে ধরল ঘব— 'ডাইনি মাগী, স মাগীটো রাক্কুসী গ। সোয়ামীব ঘর কইরবেক নাই, মাগী পাছা নাচাইয়ে বেরাবেক দিনভর। ব্যাটাছেইলের চরিত্তির খুইবেক। বেতের বেলা পেট খসাবি দিনেব বেলায় চোখ লাচাবি। মর, মর... থুঃ... ওয়াক থুঃ... পাপ, পাপে ভইরল দেশ, ভাগাড় হল গাঁ... দূর কর, দূর কর, উ মাগীটোকে জ্যান্ত ভাগাড়ে দে আয সব..'

টেঁপি মাটিতে মুখ থুবড়ে কাঁদে। চোখের ওপব জোয়ানমরদ বাউবিবা বুড়ো বাপটাকে পা ধরে মাটি ঘেঁষড়ে টেনে হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে গেল। ভাগাডে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। শেয়ালশকুনে খাবে। টেঁপি কাঁদে— 'আমার দুষ নাই গ বাপ্। দুষ নাই. '

যমেরও অরুচি গ! সেই কত সন আগে একরত্তি বয়সে বিয়ে হয়েছিল অনেক দূরে। বাসে চেপে যেতে হয়। ন্যাদামখালি গাঁয়ের খুনে-ডাকাত প্যালা বাউরির ঘব। ক-বছর আব ঘর করেছিল! একদিন রাতে হাতকড়া বেঁধে মবদটাকে ধরে নিয়ে গেল পুলিশ। হাজতে পচে মরল, না-কি কী যে হলো, আর ফিরল না কোনোদিন। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে কুড়ুল নিয়ে কোপাতে এল শ্বশুর, বঁটি নিয়ে তেড়ে এল বুড়ি শ্বাশুড়ি। সেখানেও শাপান্তি ছিল— 'ডাইনি...'

সেই থেকে বাপের ঘরে পালিয়ে এসেছে টেঁপি। আর ফেরেনি। শরীল! টেঁপি বোঝে না, সে-দোষটা কার? গায়েগতরে, হাড়েমাসে সোমত্তা বয়সের শরীরটা যদি ধেই-ধেই করে বেড়ে ওঠে, তবে দুষবে কেনে লোকে? ওর শরীরের পাপে মড়ক? পিঠ টান করে সোজা হয়ে দাঁড়াল সে-মেয়ে। জটা-বাঁধা এলোচুলে খোঁপাটা গুলতি পাকাল। প্রচণ্ড জেদে আরেকটা পুরনো ছেঁড়া-শাড়ি গায়ে জড়িয়ে বুক চিতিয়ে রাস্তায় নামল আবার। কারুর ঘরের বাঁধামেয়েমানুষ নয় সে, কোনো ব্যাটাছেলের পুষ্যি নয়। গায়েগতরে খেটে খায়, ঘরামির কাজ করে, তিন ক্রোশ হেঁটে গিয়ে বেড়াবনীর হাটে বসে লাউটা-কুমড়োটা বিকিয়ে আসে। আবাদের দিনে জোতদার ধান-রুইবার আগাম দিতে চাইলে টেঁপির জন্য আলাদা দর। তিন-তিনটে মেয়েছেলের কাজ সে একা করবে। সেই টেঁপি মড়কের মুখে ধন্বন্তরী। পেটে দানা নেই, পথ্যি নেই। আকাল। শবীরে আর সয় না। তবু কার ঘরে কে মরল,

পায়খানা-পেচ্ছাববমিতে কে মাখামাখি, কাকে ভাগাড়ে ফেলতে হবে— মেয়েটার ভয় নেই, ডর নেই, ক্লান্তি নেই, ঘেন্না নেই, গোটা গাঁয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায়।

কিন্তু সেদিন রাতের বেলা, গাঁয়ের সবাই যখন ঘরে ঘরে ঘাপ্‌টি মেরে ছিল পেটের কামড়ানিতে তিষ্টোতে না পেরে কি-যে দিশেহারা খুন চাপল ন্যাড়া বাউরির মাথায়, বৌ-বাচ্চাদের কুপিয়ে মারল ঘরের ভেতর। দিনভর রাতভর যেখানে ডাক ছেড়ে কাতরাচ্ছে মানুষ, চিৎকার-কান্নায় কান পাতল না কেউ। যারা এল দু-চারজন, ভয়ে সিটিয়ে গেল বীভৎস দৃশ্যে— রক্তের বান ছুটছে মেঝের গড়ানিতে। নিঃসাড় পড়ে আছে শরীরগুলি। রক্তমাখা কুড়ুল হাতে নিয়ে হাঁটু ভেঙে বসে বেঁহুশের মতো ঢলে পড়েছে ন্যাড়া বাউরি। পড়শীদের দেখেই ভেউ ভেউ কান্না তারস্বরে।

মুখের রা নেই কারুর। এ-ওর দিকে চায়। গাছের এচোড় আর কাঁঠাল হলো না, কলার কাঁদি পাকল না, কাড়াকাড়ি হুটোপুটিতে সব সাবাড় করে, পুঁইপালং চিবোনোর পরও যারা ঘাস খেয়ে টিঁকে ছিল, ন্যাড়া বাউরির কাণ্ড দেখে সবাই বোবা বনে গেল। অবিশ্বেস! খিদের জ্বালায় মানুষ এখন মানুষ খাবে। জোয়ানমরদ বাউরিরা শুকোতে শুকোতে মুষড়ে পড়ল এবার। তাগদ গেছে, দম ফুরিয়েছে, গায়ে গতরে ফুর্তি নেই। আকাশের দিকে ঘাড় উঁচিয়ে তাকায়। নির্দয় আকাশ। ওরা ভাবে বাবুদেব কাবচুপি। অমন হাজারগণ্ডা ফাঁদ আছে বাবুদেব। গরিব মারার ফাঁদ। সব পারে, চাষিকে জল দিতে পারে না বাবুরা? মাঠ কুপিয়ে কেনেল কাটে, রাস্তা বানায়, বাস চলে, বিজলি জ্বালায, বারোমাসী ধানের বীজ আনে, মেঘ আনতে পারে না? জোয়ান চাষি মদনা চিৎকাব করে হাঁকে— 'পালাইয়েঁ যাব গ। চল সবে, পালাইয়েঁ যাই— সবাই কেমন ধাক্কা খেলো। পায়ের-আঙুল থেকে মাথার-তালু অবদি তিরতির রক্ত ছোটে। শিরশির শিরশির— 'যাব কুথাকে গ।'

'শ'রে গ, লঙবখানায়...'

'লাড়ের টান পিছনে রেইখ্যে বাপঠাকুদ্দাব ভিটে ছেইড়্যে তুরা জোযানমরদ চইল্যে যাবি শ'বে। যা যা... আটকুইড়্যার ব্যাটা বেইমান যা। লাতজামাই কইর‍্যে ঘরে পুইষবেক তুদের শ'রের মানুষ, যা যা, হারামি বাঞ্চোৎ..'

গোটা শরীরে চাড় দেয় মদনা। ফুঁসে ওঠে— 'কইরব কি এখানে? বাঁইচব নাই...'

কথাটা মনে ধরে। এক ঝটকায় নড়ে ওঠে বেবাক মেয়েপুরুষ।

মানিক বাউরি বুড়োমানুষ, আকালের গপ্‌পো বলে। সেই অনেক অনেক সন আগে এক আকালের বেত্তান্ত। ব্রতকথার মতো শোনে সবাই, ভয়ে শিউরে ওঠে। সবাই গিয়েছিল শহরে লঙরখানায়। কেউ ফেরেনি। যারা জোয়ানমবদ, চাবুক খেয়ে মরল। সোমত্ত বৌ-ঝিরা শরীর বিকোল পয়সা গুণে গুণে। বাঁচল না। বুড়োবুড়ি কাচ্চাবাচ্চা পথেই পড়ে পড়ে মরল সবাই— 'পাড়া-গাঁয়ের মনুষ্যি আমরা, জলের মাছ, শ'রের ড্যাঙায় বাইচব নাই...'

মানিক বাউড়ির কথায় কুঁকড়ে যায় মানুষগুলি। শেতলা মায়ের থানে মন্দিরের চূড়ায় শকুনগুলি ডানা ঝাপটায়। ভাগাড়ে শেয়াল ডাকে।

'কিন্তুক আমরা বাঁইচব কেমন কইরে? সি বিধেন দাও গ মুড়ল..'

সবগুলি দাঁত-পড়া গালে ঘন ঘন চোয়াল চোষে বুড়ো মানিক মোড়ল। বিধেন। ন্যাড়া-বাউরির হাতে রক্তমাখা কুড়োলটা চোখে ভাসে। কুড়োলটা দেখতে দেখতে মায়েব হাতের খাঁড়া হয়ে উঠল, খাঁড়ার চোখে আগুন। আর রক্তের স্রোতে মুণ্ডমালিনী মায়ের সেই বাক্‌কুসী নেত্য! ছানি-পড়া-চোখে জগৎ আঁধার। মানিক বাউরি স্পষ্ট দেখতে পায়, দেশ-গাঁ জুড়ে কালীকরালীর দামাল নাচন। স্বজনস্বজাতি একে একে সব গেল, শেয়ালশকুনে কাড়াকাড়ি। 'ই নেত্য থাইম্‌বেক নাই গ...' শেতলা মায়ের থানে দাঁড়িয়ে জনে-জনে শুধোয়

মোড়ল— 'মায়ের পূজো দিতে হবেক গ। শ্মশেনকালী মা, তেনার হাতে-হাতে মুণ্ডমালা, জিভে রক্ত, পায়ের গোড়ায় শ্যালের হা। সি পায়ে রক্তজবা দে পেন্নাম কত্তে হবেক গ সব্বায়কে। আমি স্বপন দেইখেছি... হে...ই ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া মেঘবরণ কেশ গ মায়ের, পূজো দিলে জল ঝইরবেক মাঠে, হবেক গ, ফের হবেক, সব হবেক। জোতজমি, গাইবলদ, কাচ্চাবাচ্চা, ঘরদোর সব হবেক...

বুড়ো মোড়লের চোখে সত্যি স্বপ্ন কথা বলে।

স্বপন। পিঠেপেটে-এক ক্ষুধার্ত মানুষগুলি হা হয়ে অবাক হয়ে শোনে। বাঁচার নেশা ধরায়।

স্বপন। জোয়ানমরদ বাউরিরা বিশ্বাস করে না। মদন, বিশে, কানু, নন্দ, ভোলা জোট বাঁধে, ঝাঁকড়া মাথায় গাজনের নাচ খেলিয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়ায়—

'উ বুড়া মুড়লের স্বপন না বুজরুকি। মাইনব নাই, যাব...'

'যাবি কুথাকে...,'

'শ'রে লঙরখানায়...'

'শ'রের লেশায় মইরবি নাই মদনা, শ'র শত্তুর...'

'বুড়া মুড়লের বাক্যি অগ্‌গেহ্যি কবিস নে শুয়ার, সইবেক নাই...'

মানুষগুলি হতবিহ্বল। আকাশ আর মাঠ-ভরা আঁধারে দিশে হারায়— কার বাক্যি সত্যি? আঁধার রাতের মাঠ জুড়ে শেয়াল-শকুনের মোচ্ছব! না ওই স্বপন? বুড়ো-মোড়লের স্বপ্নটা চোখে চোখে সংক্রামিত হয়। বুক ধড়াস্ ধড়াস্ কাঁপে।

খিদের জ্বালায় পাগল হয়ে বুনো জানোয়ারের মতো আঁধার রাতে টেঁপিকে জাপটে ধরল মদন। কাঁটানটে শেয়ালকাঁটা ঝোপের ধারে টেনে নিয়ে আছড়ে ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পুরুষমানুষেব বুকের তলায় চিৎ-করা কাছিমের মতো বেকায়দায় হাত পা ছোঁড়ে মেয়েটা— 'আকালমড়কের দিনে শ্যালশকুন হোস নে মদনা। তুরে সব দিব। দশজনের কতা ভেইবে দ্যাখ। মুড়লের কথা শোন, মান্যি জন...

আঁধার রাতে বাঘের ভয়ঙ্করে বুকের ওপর খাবলা মারল বিশে।

টেঁপি হাসে— ' মেয়েমানুষ নে শুতি চাস্! তুর নাজ নাই বিশে? তুই মোর খুড়িব পেটের ভাই। তুর-বাপ মোর বাপ সোদর ভাই ছেল রে! তুকে জন্মাতে দেখলাম সিদিন। কোলে নে ঘুরেচি কত। দিব রে, তুকেও দিব। শরীল দিব। দেশস্বজাতি বাঁচা, কতা শোন তুর বাপ, আমার বাপ সোনাড্যাঙার মাঠের ভাগাড়ে। শ্যালশকুনে হাড় চিবুচ্চে তেনাদের। মুরদ না তুই? দেশের লোককে মেইবে পালায়েঁ বাঁচতে চাস্। থুঃ, ঝ্যাটা... ঝ্যাঁটা মারি তুব মুকে...'

চুকচুক্ করে ভোলা আসে রাতের আঁধারে। ঘাড়ের মাংস কামড়ে ধরে পেছন থেকে। জোয়ানমদ্দার বুকের মধ্যে লেপটে গিয়ে আদরে লাট খায় টেঁপি— 'তুর বাজা-বৌ যা পারে নাই আমি তুকে দিব। কতার পূব্বে দেশ-গাঁয়ের দশজনকে বাঁচা ভোলা, বাঁচা...'

জনে জনে ভোলায় টেঁপি। শরীর বাঁধা রাখে। আকালের দিনে পাপপুন্যি নেই। মাঠে-মাঠে ঢেউ খেলিয়ে সোনার ধান নাচুক, শেয়ালশকুন ভাগাড়ে যাক, গোয়ালঘরে গাইবলদ আসুক— রাতে উঠে পোয়াল দেব, ডাবায় ভরে খোল দেব, নতুন খড়ে ঘর ছাইব, ঝিলপুকুরে সাঁতার দেব, পোলুই ফেলে মাছ ধরব। সেদিন... টেঁপি ভাবে...যদি কথা রাখতে হয়, তবে নিজেকে ছিঁড়েখুঁড়ে দেব। ছেনাল মেয়েকে দুষবে মানুষ। দুষুক। কিন্তু...

স্বচ্ছ জলে রুপোলি মাছের মতো টেঁপির চোখে স্বপ্ন খেলা করে— সোনার দিন এলে মদনা বিশে ভোলা শেয়ালশকুন থাকবে না আর, ফের সব মানুষ হয়ে যাবে। তার আগে এ-আঁধার তাড়াতে হবে— 'ই আঁধার শত্তুর'।

আরো একটা স্বপ্ন থেকে যায়— মানিক বাউরির স্বপন। গোটা গাঁয়ের মানুষের চোখে মোড়লের স্বপ্নটা লেপটে গেছে। শহরের বাবুরা মাঠ পেরিয়ে আসে না অ্যাদ্দুর, জোতদার-মহাজনরা পাকা-ধানের-আঁটি গোনার মনিব। মোড়ল! মোড়ল ছাড়া পথ নেই। কিন্তুক্...

বুকের খাঁচায় আবার খামচানি। ট্যাকা? সবশুদ্ধু ছ'মাসের খোরাকির চাল থাকে না ঘরে, গরিবের উঠোনে ধানের মরাই বাজা-বৌ-এর পেট, খড়ের পালুই থুরথুরে কুঁজো-বুড়ির চুলের গুছি। এর ওপর আকালের টানে সব গেছে— ঘটিবাটি, গাইবলদ হাললাঙল সব। তবু মায়ের-জিভে রক্তের তেষ্টা। পূজো চাই। বুড়ো-মোড়লের স্বপন। দেশ-গাঁয়ের এত এত স্বজাতির মরণ দেখেও বেঁচে ছিল বুড়ো। এখন খিদেয়-তেষ্টায় মাটি আঁচড়াচ্ছে আঁধার-ঘরে। গাছের ডগায় শুকনো খেজুরপাতার মতো পড়ি-পড়ি করেও ঝুলছে পরানটা। মরণের আগে মায়ের পায়েব রক্তজবা ছুঁইয়ে দিতে হবে বুড়ো-মোড়লের ললাটে।

টেঁপি লাফিয়ে লাফিয়ে ঘরে-ঘরে ছুটল— 'দাও গ, দাও। যা আচে দাও সব। ফের দাদন দাও গ তুমরা, টেপসই দাও মা'জনের কাগজে। রক্কেকালী মা-ঠাকরুন মোদের জন্মে জন্মে মা'জন...'

কলাগাছের গায়ে বাঁশের শক্ত ঠেকনা দিয়ে চাঙা রাখে মদনা বিশে ভোলাকে, যৌবনকে—'নাউসেন-বীর না তুরা? বুড়া-ঢ্যামনারা মুরদ দেখা। তা নইলে মেয়েছেইল্যার নাথি তুদের কপালে। অ...'

দল বাঁধে টেঁপি। বিশে ভোলা মদনাকে নিয়ে জোয়ানমরদের দল। মরামানুষেব দেশে জাগ্রত শ্মশানকালীর পূজো! জন্মো-ভিখিরির ঘরে চাল বাড়ন্ত হোক, খুদকুড়া না-থাক, ভিখ মাগতে হবে বামুনকায়েত জোতদার মহাজনদেব দোরে। ভিক্ষে না জোটে বাতের আঁধারে পুকুরের-মাছ কলার-কাঁদি চুরি করতে দোষ নেই। অকাল-মড়কের চিম্‌সে পেটে উপোসী থেকে ভোগ সাজাতে হবে মায়ের থানে। ঢ্যাম কুড়কুড় বাদ্যি বাজিয়ে পিতিমে আনতে হবে ভিনগাঁয়ের কুমোরপাড়া থেকে, পুরুতঠাকুব ডেকে আনতে হবে সাধ্যিসাধনার পায়ে ধবে। চারদিকের ন্যাড়া গাছপালা, লতাপাতা সবই যখন হা-ভাতে মানুষের পেটে, তবু বাহারের চালচিত্তিরে সাজাতে হবে মায়ের থান। দেশ-গাঁ স্বজাতি বাঁচাতে হবে গ। বাঁচতে হবে। যাব যা আছে, দাও। যে-যা পারো, করো। ঘরে ঘরে দিকে দিকে উন্মাদিনীব ঝড় কাঁপিয়ে ছুটে বেড়ায টেঁপি...মায়ের চরণের বক্তসিঁদুর মাথায় মেখে নাও গ তুমরা। মা ভয়ঙ্করী।

আজ সেই পূজোর বাত। ঘোর অমাবস্যে।

রাত দু-পহর পেরিয়ে তিন-পহরে পূজোর জোগাড় শেষ হল। ঝোপজঙ্গলের জোনাকি আর আকাশের লাখো লাখো তারাকে অন্ধ করে অমাবস্যের রাতে হ্যাজাকের বাতি জ্বলে বাউরিদের গাঁয়ে। পেট-মোটা ঢোলের গায়ে মোহনঢুলির হাতের-কাঠি তিড়বিড়িয়ে নাচে ড্যা-ড্যা-ড্যাং, ড্যাং-ড্যাং-ড্যাং...কাঁসি ধরেছে মোহনের বেটা। তালে তালে নাচে। ঝিঁঝিঁ পোকা বোবা বনে গেছে, মাঠে-বাদাড়ে শেয়ালের রা নেই। বোকাহাবা, ভয়ার্ত মানুষগুলি জটলা পাকিয়ে চুপটি করে থাকে। উদোম গায়ে শীত-শীত করে। নড়ে না। ধোঁয়ার বাস লাগে, নাকে চোখে জ্বলে! একপলকে তাকিয়ে থাকে মায়ের থানে— শ্মশেনচিতার ধোঁয়া পাক খেয়ে খেয়ে, পাক খেয়ে খেয়ে বাস ছড়িয়ে ঢেউ খেলিয়ে চাগিয়ে যাচ্ছে ছড়িয়ে যাচ্ছে দিগবিদিক পেরিয়ে মাঠে মাঠে, বড় বড় মাঠের ওপারে আরও দশটা গাঁয়ে দশ মুলুকে। যেখানে যাবে সেখানেই জমাট ধোঁয়া মেঘ হয়ে ভাসবে, আকাল মরবে ধোঁয়ার আড়ালে। ধোঁয়ার মেঘে মা-কে খোঁজে সবাই, মায়ের রক্তমাখা চরণ।

আঁধার ঠেলে কোত্থেকে টেঁপি এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আলোর চত্বরে দৌড়ে এসেছে। হাঁপাতে থাকে।

গরম লোহার ছ্যাঁকা লাগল গায়ে। নড়ে উঠল মানুষগুলি— মায়ের থানে কুলটা মাগী তুই? ভাতার-খেকো, রাক্‌কুশি...

কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারে না কিছু। তাকিয়ে থাকে শুধু। এই আকালের দিনে নিজের হাতে মেয়েটা পায়খানাপেচ্ছাব কেঁচেছে মানুষের। কিন্তু গতর রেখেছে ঠিক। তাই সন্দ হয়, রাক্‌কুশির পেটে পেটে...

অমাবস্যের আঁধার গায়ে মেখে দাঁড়ায় মেয়েটা। লাল ডুরি কাটা শাড়িতে সুপুস্টু বুক পাছা ঢাকা পড়ে না। গোল-গোল সুডোল হাত-পা, পিদিমের মতো মুখ-চোখ, জট-বাঁধা এলোচুল পিঠ ছাপিয়ে কাঁধে-বুকে পড়ে আঁধার রাতের বর্ণ। টেঁপি নিজেও বোঝে, ঘৃণার চাবুক লাগছে তার গায়ে। পালিয়ে যায় না, দাঁড়িয়ে থেকে মায়ের-থানে ধোঁযার পাক দেখে। ধোঁয়ার বাস নাকে লাগে, চোখ জ্বলে। শরীর জুড়োয় সুখে।

'কই গ, পূজোর জোগান কই সব...' যেন মেঘ গর্জায় নিঝুম রাতের বিনিমেঘের আকাশে।

মানুষগুলি চমকে উঠল। মিনমিন করে কাঠির নাচন থেমে যায় মোহন-ঢুলির হাতে, কাঁসিও থামে। সবাই তাকিয়ে দেখে। ধোঁয়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছেন কাপালিক ঠাকুর। মাথায় আর গোলগাল গাল ভবে বটের ঝুরির মতো জটা, সিঁদুবমাখা কপাল। যেন মেঘের ভেতর থেকে উঠে এলেন সগগের সন্ন্যেসী ঠাকুর— 'এ পূজো হবেক নাই...'

হবেক নাই! চিমসে পেটে খিঁচুনি ধরে, বুকের পাঁজরায় মোচড় লাগে— 'হবেক নাই কেনে গ ঠাকুর।' মানুষগুলির আর্তনাদ!

কাপালিক ঠাকুর বিড়ি ধরালেন। চোখ পড়ল টেঁপির ওপর। গোলাগোলা চোখের আগুন। টেঁপি ঝিম্ মেরে দাঁড়িয়ে থাকে। পোড়ে না।

'পঞ্চমুণ্ডের আসন কুথাকে তোদের? পাঁচটো মাথার খুলি, সেইখেনে মায়ের কারণবাবি থাইকবেক। নইলে পূজো হবেক নাই...'

'সি ত সব আপুনি আইনবেন গ ঠাকুর। কতা ছেল...'

'চোপ্ বাঞ্চোৎ...' কাপালিক ঠাকুরের চোখের আগুন টেঁপির শরীর চাটে। কথা কয় না টেঁপি! খিঁচিয়ে উঠলেন মানুষগুলির দিকে— 'সব আইনব? কেনে? কতা ছেল না, পাঁচটো মাথার খুলি ঠিক রাখবি। আমি আইনব নাই। তোদের মোড়ল কুথাকে? ডাক্ . '

মাগীমদ্দা এতগুলি মানুষের আর্তনাদের মধ্যে সিধু বাউরি ডাক পেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঠাকুরের পায়ে— 'গরিবমানষের সব্বোস্বি দে' পূজোর জোগাড় গ ঠাকুর। বাঁচাও, বাঁচাও ..'

সাষ্টাঙ্গে পড়ে পায়ের দিকে হাত বাড়াতেই লাফ মেরে পিছু হটলেন ঠাকুর— 'আরে ছ্যা ছ্যা, এই সর সর হারামজ্যাদারা, শুদ্দুব চণ্ডাল, ছুঁবি নাই ছুঁবি নাই...'

এবার সব মানুষ টেঁপির দিকে চায়। ঝোপের আড়ালের শেয়ালগুলির মতো পা টিপেটিপে সেয়ানা চোখ মেলে উঠে আসে সামনে— 'তুই, তুই, মায়ের থানে তুই কেনে এলি রাক্‌কুশি আবাগী মাগী, সব্বোনেশী...'

শেয়ালগুলি চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। কুতকুতে চোখে অবিশ্বাসের বিষ। জলবিচুটির জ্বালা। চোখ বুজে ঝিম্ মেরে দাঁড়িয়ে থাকে টেঁপি। মানুষের মাংস মানুষ খায়। আকালের মড়কের নিয়ম। 'তুই কেনে এলি এখেনে। সর্ব্বোনেশী। তুই এলি আর বাদ সাইধলেন ঠাকুর...' উত্তেজনা বাড়ে। স্বজাতির অবিশ্বেস। জ্যান্ত যদি পুঁতে দেয় মাটিতে, যদি ছুঁড়ে মারে শেয়ালশকুনের মুখে? উপায় থাকবে না বাঁচার।

এলোচুলে হাত পড়ে, কার শক্ত হাতের থাবা। মুড়ি-ভাজার গরম বালি চিড়মিড় করে বুকের ভেতর। ঝামটা মেরে তাকায় টেঁপি। কাপালিক-ঠাকুর। একমাথা জটা আর দাড়ির জঙ্গলে বেহ্মদত্যির হাসি। রক্তজবার ধাঁচে দগদগে ললাটের তলায় চোখ দুটো সিঁদুরের রঙে লাল। রক্তচোখের তেনয়ন গ! ভুরভুর নেশার বাস।

'এটো কে বটেক?'

'সদা বাউরির কইন্যে গ ঠাকুর। সোয়ামী খে' বাপের ঘরে এল, ই আকালে মাকে খেলে, বাপকে খেল...'

'অ...' ঠাকুরের দাঁতে বেহ্মদত্যি মুখ খিঁচোয়।

সন্নেসীঠাকুরকেও দিতে হবেক গ— সুখবাসনার আগাম এই শরীর। মায়ের পূজোর প্রথম নৈবিদ্যি। শক্ত দুটো হাতের মুঠোয় টান বাড়ে চুলের গোড়ায়। যখন ধড় থেকে মুণ্ডুটা ছিঁড়ে নিতে চায় সগগের লোভ, অসহায়ভাবে চারদিকে মানুষ খোঁজে টেঁপি। আপন মানুষ! স্বজাতির চোখগুলি ঠাকুরের লীলা দেখে। পাপের শাস্তি নিজেই বুঝে নিচ্ছেন সগ্গের দেব্‌তা।

আরেকটা থাবা পড়ল বুকের ওপর। গোটা শরীরটা ধরে বেহ্মদত্যিব টান। টেঁপি যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে—'পাঁচটো মাথার খুলি দিব গ ঠাকুর। ই পূজোটো হবেক গ হবেক...'

'লাইগবেক নাই...' বেহ্মদত্যির বুকের তলায় টেঁপির শরীর কাঁপে।

'লাইগবেক...'

'না... আ...'

একটা হ্যাঁচকা-টানে ছিটকে গিয়ে আঁধারে লাফ মারে টেঁপি। শাড়ির আঁচলে টান। পিঠ বাঁকিয়ে ঝুঁকে পড়ে, উদোম-বুক চুলে ঢেকে শাড়িটা নিজের গায়েই লেপটে রাখতে চায়। বেহ্মদত্যি হাসে। স্বজনস্বজাতিরা পিছিয়ে যায় ভয়ে। ড্যাবডেবে চোখে ভিড়মি লাগে তাদের— দেবতা মানুষের লড়াই। ই কোন আকালের শাপ গ। আকালের-মেয়ে দাঁত মুখ খিঁচে প্রাণপণ শক্তিতে নিজের কাপড় টানে। পারে না। দম ফুরিয়ে আসে। হাতের-পাতায় জ্বালা, শরীর নেতিয়ে পড়ে। গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে আসে বেহ্মদত্যি। মায়ের কারণপানে টালমাটাল রক্তজবা-চোখে আর জিভেব লালায় হা হা করে লোভ। টেঁপি চিৎকার করে ওঠে। আকাশবাতাস কাপে— 'মায়ের থানে শরীলের ওপর তুমার লোভ কেনে গ ঠাকুর! সি ত আকালমড়কের লোভ...'

বেহ্মদত্যি হাসে। দেবতা আর রাকক্কুশির টান। দ্রৌপদী-ঠাকরুনের লজ্জা টানে দুযোধন। স্বজনস্বজাতি ঘরের-মানুষগুলি শিউরে শিউরে পিছিয়ে যায়। দেবতার লীলা। ভয়াল সেই দেবতার দিকে তাকিয়ে রক্তে রক্তে, ঘেন্নায়, টানে টানে পাকে পাকে আঁধারে ঘুরতে ঘুরতে টেঁপি নিজেকে ছাড়তে থাকে। কালো কালো রোমশ দু-হাতে পুকুরের বেড়াজাল টানে দুযোধন। শাড়িটা উঠে আসে আঁধার থেকে। উঠে আসে, উঠতে থাকে...একসময় মেয়েটো হাতের নাগালে পৌঁছোতেই শাড়ির সবটা হাতে এসে যায়। মানুষগুলি দম আটকে মরে, জটলা বেঁধে সিঁটিয়ে যায় ভয়ে— 'ই আঁধারে গেল কুথাকে মেয়েটো? খেয়োগোখরো তেঁতুলগোখরো চাঁদবোড়া খড়িস কেউটে, ঝোপে ঝোপে শেয়াল, গাছ গাছ শকুন...'

উত্তরের-মাঠের ধারে বুড়ো-অশ্বথের তলায় শুকনো কাঠ আর পাতা জ্বেলে সন্ধে থেকেই পচাই গিলে বেহুঁশ পড়ে ছিল বাউরিঘরের জোয়ানমরদরা। লাজ-নেই সরম-নেই। মেয়েটো একেবারে মাঝখানে এসে লাফিয়ে পড়ল। দগদগে রক্তজবার লালে জ্বলছিল নিভন্ত আগুন। নেশার ঘোরে ভিরমি খেয়ে আঁৎকে উঠল তাজা বয়সের মানুষগুলি। ঘুটঘুটে আঁধারে শ্মশানকালীর নেত্য। লালচে আগুনে ন্যাংটো মায়ের ভয়াল মূর্তি।

নেশায় টলমল শরীর। ভয়ে কোমর ছেঁচড়ে পিছোতেও দুড়মুড় টলে পড়ল জোয়ানমরদরা।

'গাঁয়ের লোকে ই আকালে বিশ্বেস কইরে ট্যাকা দেল তুদের হাতে, সি ট্যাকায় তুদের মাল এইনেচিস্ মুখপোড়া বেজন্মা! ই পিচ্ছাব গিলচিস্ লুকয়েঁ লুকয়েঁ... গু-খা, মুত খা, মেয়েছেইল্যার লাথি তুদের মুখে...'

ওরা চমকায়। মানুষের ভাষায় কথা বলে সগগের মা-ঠাকরুন? বিশ্বেস হয় না দেখে। চোখ রগড়ে ভালো করে তাকায়— আঁধার! আঁধারে মায়ের মূর্তি! গায়ে গা ঘেঁষে গলায় গলা জড়িয়ে দলা পাকায় মরদগুলি।

'চ' মদনা, যাই...'

'কুথাকে?'

'সুনাড্যাঙার ভাগাড়...'

'ডর লাগে গ'। আঁধার ..'

'ডর! নাউসেন মুরদ না তুরা? মাঠে নাঙল চইষে আবাদ করবি, খাল কেইটে জল আইন্‌বি, মাঠ কেইটে আস্তা গইড়বি, ঘরের মাগের পেটে ছেইলে দিবি, কিসেব মুরদ তুরা?'

'শ্যাল শকুনের ডর গ, আঁধার রেতের ডর...'

'ই আকালে তুর বাপ্ মইরেচে মদনা, তুদের মা মইরেচে বিশে, আমার মা-বাপের মাস সব শকুনে চিইবুচে, শ্যালে হাড় চুইষচে। চ ভোলা যাই..'

'কুথাকে?'

'ভাগাড়ে..'

'কেনে!'

'বাপের মাথার খুলি আইন্‌ব। পূজো হবেক।'

'কার পূজো গ?'

'আঁধার-রেতের মায়ের..'

অমাবস্যের নিঝুম রাতে সোনাডাঙার মাঠ জুড়ে লাখো লাখো শেয়াল ডেকে ওঠে, মাথার ওপর গাছের ডালে-ডালে শকুনরা ডানা ঝাপটায়। গনগনে আচে দপ্ করে হঠাৎ জ্বলে উঠল আগুন। আঁধার-রাতের-মশাল লাল আগুনের ছোঁয়াচ লাগল শরীরে। চোখের নেশায় ঘোর কাটে, রক্তের নেশায় মাতন লাগে। আঁধার আঁধার... জগৎ জুড়ে আঁধার ঘিরেছে দশদিক। অমাবস্যের আঁধার। শেয়ালরা স্বাদ পায়। হাড়মাংসের স্বাদ। আঁধার থেকে উঠে আসে সন্তর্পণে, পা টিপে টিপে। কালো কালো হাত— ক্ষুধা, ছুঁচোল ছুঁচোল নখ— লোভ, লালা ঝরা জিভ— তেষ্টা। হাতগুলি থাবা মারে, নখগুলি আঁচড়ায়, জিভ চাটে শরীর। আঁধার আঁধার। শরীর ভরে যন্তরনা। শেয়ালগুলির হিংস্রতায় সারা শরীর রক্তাক্ত হবার আগেই হঠাৎ, সম্পূর্ণ অতর্কিতে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে, উত্তর থেকে উত্তরে, আরও উত্তরে, সোনাডাঙার মাঠে আঁধারের সমুদ্দুরে ঝাঁপ দিল আঁধার রাতের কন্যে। মাঠ জুড়ে লাখো লাখো শেয়ালের উল্লাস, আকাশ ভরে শকুন। শকুনরা ডানা ঝাপটায়। ডানা-ঝাপটানির বাতাস কাঁপে থরথর থরথর। মাঠের পর মাঠ জুড়ে আঁধার ঘিরে উথালপাথাল তোলপাড়।

অসার দাঁড়িয়ে থেকে আবার পচাই-এর হাঁড়ি টেনে নেয় বাউরি জোয়ানরা।

দূরে নতুন করে হাতের কাঠির নাচন লাগে মোহন-ঢুলির ঢাকে। আকাল তাড়ুয়ার বাদ্যি।

আর, আঁধার রাতের কন্যে হাঁটে সোনাডাঙার মাঠে। বাপঠাকুদ্দার মাথার খুলি খুঁজতে হবে তাকে।

নন্দনকানন

সোমনাথ ভট্টাচার্য

রামতনু দাঁড়িয়ে রয়েছে লিফট্‌-এর বন্ধ দরজার সামনে। লিফটম্যান-এর অপেক্ষায়। যার ওপর তাকে নন্দনকাননে নিয়ে যাবার জন্য পি-এ-টু ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সতী মিত্রের গোপন নির্দেশ দেওয়া আছে।

এখানে দাঁড়িয়ে মাথার ওপর সমস্ত অফিস বাড়ীটাকে রামতনুর মনে হচ্ছিল দিগন্তবিশারী ধূ-ধূ মাঠের মাঝখানে প্রকাণ্ড পত্র-পল্লবে নিবিড় এক ছায়া-শীতল গাছ, গাছতলায় সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চতুর্দিক জুড়ে রোদেকানা দুপুর, স্তব্ধ। শুধু গাছটার ঘন ডাল-পালার অগোচর আড়ালে কোথায় একটা মৌচাক আছে। সেখান থেকে মধু সঞ্চয়রত মৌমাছির পাখার বিরামহীন অনুচ্চ গুণগুণ ধ্বনি ভেসে আসছে!

রামতনু যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানকার পরিবেশ গাছতলার মতই ছায়াময় এঁটে বন্ধ করা জানালার কাঁচের শার্সীর গা-বেয়ে ফেলা নীলা রং-এর পর্দায় ছেঁকে বাইরে থেকে যে আলোটুকু এসে পৌঁছচ্ছে তার রং নীলাভ। সেই আলোর ডিমের কুসুমের মত রং দেয়ালের গা-বেয়ে তেলের মত গড়িয়ে পড়ছে মোজেকের মেঝেতে। সব মিলিয়ে গাছ-তলার মতই ছায়াময় ছায়াঘন পরিবেশ। ছায়াঘন আর শীতল। পুশিং ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই রামতনুর গা শিরশির করে উঠেছিল। তৎক্ষণাৎ তার মনে হয়েছিল পাঞ্জাবির ওপর কোটটা চাপিয়ে এলে ভাল হত। ...কালকের ঠাণ্ডাটা তাকে বেশ জখম করেছে। রামতনু প্রথমটা বুঝতে পারেনি। পরে ভেবেছিল, আমি একটা আস্তো হাঁদারাম। এদিককার সবটাই, আপ-টু ফোর্টিন্থ ফ্লোর, যে এয়ার কনডিশনড করা এতো আমি অন্তত এক লক্ষবার শুনেছি— কিন্তু এত জেনেও বুঝতে পারিনি! আর তারপরই রামতনু বল ও বীর্যবর্ধক বলে বিজ্ঞপ্তির কবিরাজী ওষুধের শেষটুকু খাওয়ার জন্য জিভ বার করে খল চাটার মত খুব শ্রদ্ধাসহকারে এই শীতলতা শরীরের সমস্ত স্নায়ু দিয়ে শুষে নিতে শুরু করেছিল। আর মধুসঞ্চয়ে ব্যাপৃত মৌমাছিদের পাখার অনুচ্চ গুনগুন ধ্বনির মত রামতনুর যা মনে হচ্ছিল তা হচ্ছে মৌচাকের কোটরের মত কোটরে কোটরে চেয়ার টেবিল র‍্যাক ফাইল কাগজ ফেলা ঝুড়ির সঙ্গে ঠাসা চার হাজার কর্মচারীর সমস্ত অট্টরোল। এই অট্টরোলকে এখানে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল মৌমাছির সুর বুনুনি গুনগুনুনি। কেননা, বাইরে সেই যাবতীয় কটকটে শব্দ করিডোরের পার্টিশানের মোটা ঘষা-কাঁচের আবরণ ভেদ করে এখানে পৌঁছতে মিয়ানো ছোলা ভাজার মত হয়ে যাচ্ছিল। রামতনুর মাঝে মাঝে এজন্য মনে হচ্ছিল যে, পার্টিশানের সুদৃশ্য কাঁচটা হয়ত স্পেশ্যাল কোনো অর্ডার দিয়ে তৈরি। বিশেষ কেমিক্যাল কিছু মিশিয়ে অথবা বিশেষ কোনো প্রক্রিয়ায় তৈরি। যার বিশেষত্ব বা গুণ হচ্ছে বাইরের এই সমস্ত শ্রুতিকটু শব্দগুলোকে টেনে নিয়ে একটা সুরের মত কিছু করে এখানে পৌঁছে দেওয়া। কেননা, এখান দিয়ে বস্‌-রা সর্বদা যাতায়াত করেন। পরে রামতনু ভাবল কিছুই অসম্ভব নয়। বিজ্ঞানের এ যুগ আর কিছুতেই অপারগ নয়। নইলে মেরু প্রদেশের বরফের

পাহাড়ের তলায় ভুই-পটকার মত কে ক্যামনে একটা বোমা ফাটালে। অত্যদ্ভুৎ সব রশ্মি বেরিয়ে এল। ফলে, কোলকাতা শহরের সদর রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম্‌। পুরোভাগে একটা ছ্যাকরা গাড়ী কোলকাতা দেখতে আসা দেহাতী শোয়ারী সমেত নট-নড়ন চড়ন। পেছনে পিঁপড়ের সারির মত প্লি মাউথ্‌ স্টুডিবেকার অ্যামবাসেডার থেকে ট্রাম বাস পর্যন্ত তদবস্থার। এদিকে ট্রাফিকের আলো লাল থেকে হলুদ, হলুদ থেকে সবুজ, সবুজ থেকে আবার হলুদ-লাল হতে থাকল। অপারেশন থিয়েটারে রোগার্তের ফুসফুসে ছুরি বসিয়ে ডাক্তার, নার্স, আগ্রহী মেডিক্যাল স্টুডেণ্টদের চোখের আলো দপ করে ফিউজ্‌ হয়ে গেল। কিন্তু, মাথার ওপর প্রকাণ্ড শ্যাডোলেস লাইটটা নিত্য যেমন জ্বলে তেমনি কোথাও এক তিল ছায়া না রেখে জ্বলতে লাগল খর দীপ্তিতে। কোলের ছেলেকে বুকে চেপে ধরে তার খড়খড়ে শুকনো ঠোঁটের কাছে ভারী পুষ্ট স্তন এগিয়ে দিতে দিতে মা-ছেলে, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-বাৎসল্য সব মিলিয়ে 'হিউম্যান ফ্যামিলি' চিত্র-প্রদর্শনীর একটা চিত্তাকর্ষক স্টিল ফটো হয়ে রইল।

এ প্রসঙ্গে শীর্ষশক্তিদের বৈঠক ঢাকাখোলা হাঁড়ি থেকে ওঠা কষা মাংসের ঘ্রাণের মত উত্তেজক আলোচনা, মনীষীদের স্বেচ্ছা-কারাবরণ, বৈজ্ঞানিক ও চিন্তাশীলদের পরস্পর-বিরোধী কথাবার্তা, রাত জেগে বাছা-বাছা শব্দ ঘষে ঘষে দাঁত ধারালো করে প্রত্যূষের সম্পাদকীয় স্তম্ভে বিপক্ষ দলের দিকে তাকিয়ে দাঁত ঘষাঘষি এবং শেষ পর্যন্ত সব কিছু চলন্ত ট্রেনের কামরায় সময়-যাপনের আলোচনায়, চায়ের দোকানের গুলতানিতে, ছুটির দিনে মোড়ের মাথায় অবসর বিনোদনের আলোচ্য বিষয়ে পর্যবসিত হতে দেখে সমস্ত ব্যাপারটাকে রামতনু আঙুলের ফাঁক থেকে পোড়া সিগারেটের মত আলগোছে ফেলে দিয়েছে।... এসব এখন আর তার মনে কোনো উত্তেজনাই জাগ্রত করে না।

এ প্রসঙ্গে তার সুচিন্তিত অভিমত হচ্ছে, এসব অমোঘ। হবেই। এসবই অদৃষ্টের বিধান.. অদৃষ্টের মহালীলা... পাপ...পাপের পরিপূর্তি...কলির অন্তিম...। ইনএভিটেবল ব্যাপার সব।

এখন কেউ যদি তাকে তার অভিমতকে যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে বলে— সে পারবে না। সে দৃঢ় স্বরে একটা কথাই বলবে, দ্যাখো ওসব কচকচির মধ্যে আমি নেই। আমার, এই মনে হয়েছে।

রামতনুর নিজেরই খুব খারাপ লাগতে লাগল। বস্তুত ঠিক এই মুহূর্তে নন্দন কাননে যাবার জন্য লিফট-এর বন্ধ দরজার সামনে লিফটম্যান-এর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে এসব নিরর্থক চিন্তায় নিজেকে ভারাক্রান্ত করা তার অভিপ্রেত ছিল না।

বরং, রামতনু ভাবল, অন্য কিছু ভাবি। আর কিছুক্ষণেব মধ্যে আমি যে রাজ্যে যাচ্ছি সেখানকার কথা ভাবি। যেখানে আমাদের বস্‌-এরা হাঁফ ফেলতে যান। হাঁফ ফেলে তাজা হতে যান। সেখানে শুধুই আনন্দ— অফুরন্ত, অ-ফুরন্ত। যেখানে শান্তি পায়ের পাতাডোবা নরম গালচের মত সর্বত্র বিছানো— সেখানকার কথা ভাবি।

পরম বিশ্বাসে এবং একান্তভাবে নির্ভরতার হর্ষে রামতনুর সমস্ত মন, সমস্ত শরীর পুনর্বার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

রামতনু ভাবল, এবার আমি আমার সৌভাগ্যের কথা ভাবি। যে সৌভাগ্য আমায় সেই অপরিসীম শান্তি আর অফুরন্ত আনন্দের রাজ্যে নিয়ে চলছে। যেখানে সব কিছুই ভাবহীন— যেখানে খালি মুক্তি আর মুক্তির উল্লাস।

রামতনুর অন্তরস্থিত বিশ্বাস যেন পিদিমের বুক ভর্তি টলটলে তেল। সেই তেল শুষে শুষে রামতনুর দুটি চোখ জ্বলতে লাগল। হর্ষে আবেগে জ্বলতে লাগল সজল শিখায়।

সত্যি করে গর্ব করার মত যে আমার কিছুই নেই এ আমার চেয়ে ভালো করে আর কে জানে... রামতনু ভাবল, এই সৌভাগ্যই আমার সেই গর্ব,— একমাত্র গর্ব। যে-সৌভাগ্য এই অফিসের আড়াই হাজার কেরাণীর ছকে ফেলা ভাগ্য থেকে আমার ভাগ্যকে পৃথক করেছে। রামতনু মনে মনে বলল, সতী তুমিই আমার সেই ছকে ফেলা ভাগ্যকে সৌভাগ্যে উন্নীত করেছ। নইলে আমার মত এক মাছিমারা কেরাণীর ভাগ্যে কি আর সে-রাজ্যে যাবার সুযোগ মিলত। সতী, বুক থেকে উঠে আসা বাষ্পের মেঘ রামতনুর গলা বুঁজে এল। সতী, তোমার কাছে যে আমি কি পরিমাণ কৃতজ্ঞ তা প্রকাশ করবার মত, জানাবার মত ভাষা আমার জানা নেই। তুমি যে আমাদের ছেলেবেলার সেই দিনগুলিকে পুরোপুরি ভুলে যাওনি, এত উঁচুতে উঠেও আমায় চিনতে পেরেছ, আমার যাজ্ঞা পায়ে করে তুমি ঠেলে সরিয়ে দিতে পারতে কিন্তু তা না করে এত বড় একটা রিস্ক ফর-নাথিং নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে আমায় সে-রাজ্যে যাবার সুযোগ করে দিয়েছ— এ আমার আশার চেয়েও স্বপ্নের চেয়েও বেশী।...

রামতনু শব্দ করে গলা ঝাড়ল। শ্বাসনালী দিয়ে খানিকটা গাঢ় কফ জিভের ওপর উঠে আসতে তৎক্ষণাৎ রামতনু বুঝতে পারল ঠাণ্ডা লাগাতে যে সর্দিটা গতকাল মাথা, চোখ, মুখ ঝামরে তুলছিল আজ সেটা বুকে বসেছে। আশ্চর্য মলমে ঠিকমত কাজ হয়নি, আজ বাড়ী ফিরে বুকে পুরোনো ঘি মালিশ করতে হবে। অভ্যাস মত রামতনু তারপর এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে বালিভর্তি লাল রং-এর গায়ে সাদা অক্ষরে লেখা 'থু থু ফেলিবার পাত্র' লেখা পাত্রটা খুঁজল। পেল না। না পেয়ে কফ গিলে ফেলল।

রীতিমত পোশাক সজ্জিত একজন বেয়ারা এসময় পুশিং-ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকে কোথায় যেন যাচ্ছিল। রামতনু চোখ তুলে তাকাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। রামতনুর মনে হল লোকটা আগাগোড়া ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে। লক্ষ্য করেছে বলেই লোকটার দৃষ্টিতে বিস্ময় কৌতূহল এই সব স্বাভাবিক জিনিসগুলো ছাড়াও সেগুলোকে ছাপিয়েও ঘৃণা এবং অবজ্ঞা এবং একটা নাক সিঁটকোনো— ভাব ফুটে উঠেছে। এ স্থলে বিস্ময় এবং কৌতূহলকে রামতনু স্বাভাবিক বলেই ধরে নিচ্ছিল। কেননা, যারাই এখান দিয়ে যাচ্ছিল-আসছিল তাদের দৃষ্টিতে যুগপৎ বিস্ময় এবং কৌতূহল ফুটে উঠেছিল। সকলের দৃষ্টিতে একই জিনিস প্রত্যক্ষ করতে করতে রামতনু ব্যাপারটাকে খুব স্বাভাবিক বলে ধরে নিচ্ছিল। নিজের মনকে এই বোঝাচ্ছিল, হবে নাই বা কেন! আমার মত একটা লোককে এখানে, আর বিশেষ করে এই লিফটটার সামনে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে লোকে অবাক তো হবেই। পাগল-ছাগল বলে এখনো অর্ধচন্দ্র দিচ্ছে না— এই রক্ষে।

কিন্তু বেয়ারাটার নাক সিঁটকানো ভাবটা রামতনু কিছুতেই যেন সহ্য করে নিতে পারছিল না। বেয়ারাটা তার দিকে পেছন ফিরেছে বুঝতে পেরেই রামতনু পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল, ভা-রী ডাঁট! খাস ডিপার্টমেণ্টেব বেয়ারা কি না সব। রামতনু মনে মনে গলার পর্দা চড়াল, দেখতাম, দেখতাম ও'রকম গদাই-লস্করী চলন কোথায় থাকত— যদি আজ বস্-রা থাকতেন অফিসে। বস্-রা আজ সবাই দিল্লীতে কিনা। থাকলে দৌড়-ঝাপ করতে করতে আর সেলাম ঠুকতে ঠুকতে হাত-পায়ের নড়া ছিঁড়ে যেত।

. রামতনু মুখ ঘুরিয়ে নিল। ঢেউ-খেলানো ঘোলা রং-এর কাঁচের পার্টিশানের গায়ে ব্যস্ত সমস্ত ছায়ারা নড়ছে চড়ছে। চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। রামতনুর ছায়াগুলোকে দেখে মনে হল যেন ময়রার দোকানে শো-কেসের মধ্যে বন্দী হয়ে পড়া মৌমাছি, বোলতা। খাদ্য-সংগ্রহ করতে ঢুকে এখন আর বেরুতে পারছে না। পাখার ঝাপটা দিয়ে শো-কেসের কাঁচের গায়ে আঘাত করতে করতে নিস্তেজ এবং ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের যাবতীয় স্নায়ু শ্লথ করে দিয়ে রামতনু প্রকাণ্ড একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, উঃ খুব বেরিয়ে এসেছি যা

হোক! ভাগ্যে আমার বেরিয়ে আসার গোপন ছিদ্রটা নজরে পড়েছিল। নইলে আমারও ওই দশা হত। অতঃপর রামতনু এই অফিসের আড়াই হাজার কেরাণীর ভাগ্য থেকে নিজের ভাগ্যকে পৃথক করতে পারার সৌভাগ্যের জন্য আরও একদফা গর্ব বোধ করে নিল।

পাঞ্জাবির হাতা ফাঁক করে রামতনু ঘড়ি দেখল! যদিও সামনেই দেওয়ালে একটা একেবারে হাল-ডিজাইনের ঘড়ি আটকানো রয়েছে। রামতনু নিজের ঘড়িতে সময় দেখে সে ঘড়িটাও দেখল এবং যথারীতি ঠিক করে উঠতে পারল না কোন্ ঘড়ির সময়টা সঠিক। তারপর ভাবল, আমার ঘড়িটা একবার অয়েলিং করা দরকার।

রামতনুর মনে হল, ঘড়ির কাঁটায় সময় যেন আর বসছে না। অথচ, এই আধ ঘণ্টা আগে সে যখন ডিপার্টমেণ্টে নিজের টেবিলের সামনে বসে আউটওয়ার্ড রেজিস্টারে দু'মাস আগের পেনডিং ডেস্প্যাচ্ এনট্রি করছিল, তখন তার মনে হচ্ছিল পার্ট-টাইম কাজের মত ঘড়ির কাঁটা দু-হাতে সময় সরাচ্ছে। সে কিছুতেই সময়মত, সতী যে সময় দিয়েছিল দেড়টা, সেই সময়ে লিফ্ট-এর সামনে পৌঁছতে পারবে না। লিফ্ট্ম্যান তাকে লিফ্ট-এর সামনে না দেখে লিফ্ট্ উঠিয়ে নিয়ে যাবে। অথচ লোকটা ইউনিয়নের পাণ্ডা-ব্যক্তি জোয়ারদারবাবুর মগজে কিছু প্রবেশ করাবার জন্য ব্যাড়র-ব্যাড়ব বকেই চলছিল। জোয়ারদারবাবু এমন ভাব দেখাচ্ছিলেন যেন অখণ্ড মনোযোগ সহকারে সমস্ত শুনছেন। রামতনুর দৃঢ় ধারণা জোয়ারদারবাবু খটাশ-চোখের দৃষ্টি খুব মোলায়েমপানা করে মনোযোগ দিয়ে শুনছে, যতই এই ধরনের ভাব ফোটাতে চেষ্টা করুন না কেন, আসলে ভাবছেন অন্য কিছু। হয়ত ডানপাশের টেবিলের হিমাংশুর কথা ভাবছিলেন। পরশুদিন তার মুখের ওপর দেওয়া হিমাংশুর জবাবের কথা ভাবছিলেন। ঠিক কি ভাবে হিমাংশুকে টাইট্ দেওয়া যায় হয়ত এই তার অভিনিবেশের বিষয় ছিল। ফলে, এইসব সাত-পাঁচ ভেবে সে আগে থেকে বলে রাখা ছুটিটাও জোয়ারদারবাবুর কাছ থেকে চেয়ে নিতে পারছিল না। লোকটা ব্যাড়র-ব্যাড়র করে এক মুহূর্তের জন্যে না থেমে বকে চলছিল। এদিকে ঘড়ির কাঁটায় সময় ছুটে চলছিল হু হু করে।

সামনে ডেস্প্যাচ্ রেজিস্টারটা খোলা। রামতনু ছক্কাটা ঘরে একের পর এক বসিয়ে চলছিল লেটার নাম্বার ডেস্প্যাচ্ ডেট্ ইত্যাদি ইত্যাদি।

— যদিও আপাত-দৃষ্টিতে দেখলে মনে হয় আমাদের গত আন্দোলন, ধর্মঘট ব্যর্থ...

জোয়ারদারবাবু শুনছিলেন। লোকটা নন্-স্টপ বকে চলছিল। এলোপাথারী রেডিয়োর স্টেশন ধরা কাঁটার নব ঘুরিয়ে চললে যেমন এক-একটা স্টেশন বেজে উঠে মিলিয়ে গিয়েই আবার অন্য একটা স্টেশন রেডিয়োর স্পীকারে বেজে ওঠে— তেমনি লোকটার কথার টুকরো মাঝে মাঝে রামতনুর কানের পর্দায় এসে আঘাত করছিল কখনো উঁচু, কখনো নীচু পর্দায়।

—তার জন্য আমাদের যে ক্ষয় এবং ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে, সত্যি করে তা অপূরণীয়...

স্রেফ্ বুক্নি—। তা এখানে কেন। মনুমেণ্টের চাতালে কি ঘাস গজিয়ে গ্যাছে নাকি। রামতনু মনে মনে লোকটাকে ভেংচি কেটেছিল।

রেডিয়োর স্পীকারে এবার যে শব্দ-তরঙ্গ ধরা পড়ল সেটা খুব কাছের। হয়ত আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রই—। খুউব জোর। বাংলা খবরের মত।

— কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, গত আন্দোলনের ব্যর্থতা আগামী আন্দোলনের মেরুদণ্ড। ব্যর্থতা আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছে। আমাদের অনেক ভুলকে আমরা জানতে পেরেছি, অনেক ত্রুটির বিষয় সচেতন হতে পেরেছি। এ সবকিছুই হবে আমাদের আগামী ধর্মঘটের...

ঘণ্টা হবে। রামছাগলের গলার।

তারপর কথাগুলো রামতনু ঠিক শুনতে পাচ্ছিল না। কিন্তু গলার সুর শুনে, বলার ভঙ্গী দেখে তার কেবলই মনে হচ্ছিল লোকটা যা বলছে তা যেন তার খুব পরিচিত। এই সুর, এই ভঙ্গী যেন তার খুব চেনা। নিঃশ্বাসের সঙ্গে গন্ধ টেনে নেবার মত রামতনু লোকটার কথার অন্তর্নিহিত বক্তব্যটুকু ধরার চেষ্টা করেছিল। পরক্ষণেই তার কাছে ব্যাপারটা জলবৎ হয়ে গেছিল। এতক্ষণে অরিন্দম, আসল কথায় এসো যাদুমণি। ধর্মঘট তহবিল নাম দিয়ে তোমাদের আরও কিছু খ্যাঁচার তাল। নইলে, তোমাদের পেট ভরছে না, বদমাইসি করার খরচ কুলোচ্ছে না। রামতনু মনে মনে নিজেকেই বলল, সব বিশ্বাস করতাম— যদি না সেদিন স্বচক্ষে দেখতাম লোকটাকে একট হর্স-টেল করে চুলবাঁধা, হাতা আর পেট-কাটা জামা পরা মেয়ের সঙ্গে বাজনা-বাজা রেস্টুরেণ্ট থেকে বেরুচ্ছে—।

তিতি-বিরক্ত হয়ে রামতনু ভেবেছিল, আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে অন্তত এইসব ফোর-টোয়েন্টির কারবার নেই—।

জোয়ারদারবাবু তার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, কই হে রামতনু, উঠলে না। তোমার যে একটার সময় কোথায় আরজেণ্ট দরকারে যাবার কথা ছিল।

এক মিনিট আগে আড়চোখে দেখা ঘড়ির দিকে রামতনু এবার সর্বসমক্ষে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বুক পকেটে কলম গুঁজতে গুঁজতে সশব্দে উঠে দাঁড়িয়েছিল, একদম খেয়াল ছিল না স্যার—।

জোয়ারদারবাবু বলেছিলেন, যাও—। সঙ্গে সঙ্গে আগামী সপ্তাহের মধ্যে পেনডিং কাজের ক্লীয়ারেন্সের কথা মনে করে দিয়েছিলেন। রামতনু মনে মনে বলেছিল, চাইলেই যেন সবকিছু মোয়ার মত ঈশ্বর-পুত্র জোয়ারদারের হাতে এসে ধরা দেবে! মুখে বলেছিল, হয়ে যাবে স্যার।

রামতনু অস্থির এবং অধৈর্য হয়ে পড়েছিল। দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে এক পায়ের ওপর শরীরে ভর রেখে দাঁড়িয়েছিল। সেই অবস্থাতেই ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল— লিফ্‌টটার দরজাটা পাথরের দেওয়ালের মত স্তব্ধ নিরেট। অগত্যা রামতনু কাঁধের পেশীগুলোকে একটা ঝুঁকুনী দিয়ে শ্লথ করে দিয়ে মুখে ছোট্ট একটা হতাশাসূচক শব্দ করে ঘাড় ঘুরিয়ে নিল। রামতনুর মুখটা দেখাতে লাগল রসকষহীন একটা শুক্‌নো হর্তুকির মত।

গতকালের কথা মনে পড়ল। মনে হতে রামতনুর সর্বাগ্রে যা মনে হল, তা হল কালকের একপশ্‌লা বৃষ্টিতেই তার ঠাণ্ডা লেগে গেছে। কাল যে-সর্দি মাথা-মুখে ঝাম্‌রাচ্ছিল আজ সেই-সর্দি বুকে বসেছে। আশ্চর্যমলমে কাজ হয়নি। বাড়ী গিয়ে বুকে পুরোনো-ঘি মালিশ করতে হবে। তারপর মনে পড়ল পাঁচটা সাতের লোক্যাল্ কাল সাঁইত্রিশ মিনিট লেট্ ছিল। বাড়ী পৌঁছতে তার সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছিল। বিপত্তির মূলে এক ভদ্রলোক। ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছিলেন— হাত ফস্‌কে চাকার তলায়। পরে, কামরার মধ্যের আলোচনায় সে শুনতে পেয়েছিল ভদ্রলোক নাকি কোন এক অফিসের কেরাণী।

তিনটে হুইসিল্ দিয়ে ট্রেন থেমে যেতেই রামতনু মনে মনে বলেছিল, হল আজ—। এখন রামতনুর মনে হল, ভদ্রলোক যদি পুরোপুরি মারা পড়তেন— অর্থাৎ মৃত্যুটা স্থির জেনেও খানিকটা জ্যান্ত না থাকতেন তা'হলে সম্ভবত ট্রেনটা অতটা লেট করত না। এবং তারপরই রামতনুর মনে পড়ল তিনটে তিনটে সিঁড়ি ভেঙে উঠোন থেকে রক-এ উঠেই সেই আবছা অন্ধকারে সাইকেলের চাকার সরু লিক্‌লিকে দাগটাকে তার বুকে হেঁটে যাওয়া সাপের বুকের দাগের মত মনে হয়েছিল। সাপের বুকের দাগের মত সাইকেলের চাকার দাগটা ঘরে ঢুকে গেছিল। সে বুঝেছিল, দুপুরে মৃণাল এসেছিল— কোনো সিনেমা-পত্রিকার কারেণ্ট ইস্যু দিতে। বৃষ্টিতে ভিজবে বলে সাইকেলটা ঘরে তুলে রেখেছিল। রামতনুর মনে

পড়ল ঠাণ্ডাটা যে সত্যি করে তাকে আক্রমণ করেছে সে তখনই তা প্রথম অনুভব করেছিল। তার রগদুটো টন্‌টন্‌ করে উঠেছিল।

আঃ কখন যে লিফট্‌ম্যান আসবে। আমায় নিয়ে যাবে এখান থেকে। রামতনুর অধীরতা, অস্থিরতা আকুলতায় রূপান্তরিত হয়ে উঠছিল ক্রমেই।

মালতী রোজ যেমন করে তেমনি ডেলি-রিপোর্ট পেশ করেছিল, জান আজ শ্যামাপদবাবুর বড় ছেলেটা আদুরীকে পণ্ডে দিয়েছিল। বলতে গেলাম তো শ্যামাপদবাবুর বড় ছেলে বললে, আদুরী নাকি ওদের বাগানের বেড়া ভেঙে বাগানে ঢুকে কাশীর বেগুনের চারাক'টা মুড়িয়ে খেয়েছে। পণ্ড থেকে আদুরীকে ছাড়াতে দেড় টাকা লাগল।

রামতনুর মুখের মধ্যে তখন পরোটায় পাকানো বেগুন-ভাজা। সেই অবস্থাতেই সে যথেষ্ট উত্তেজনা অনুভব করেছিল, উহুঃ কাশীর বেগুন। কোনোকালে কাশীর বেগুন দেখেছে। শুয়োরের বাচ্চা সব।

— জানো আজ কাণ্ড হয়েছে। মালতী উনুন থেকে কেট্‌লী নামাতে নামাতে বলেছিল, ছাদে বড়ি শুকোতে দিয়েছিলাম খেয়াল ছিল না। দুপুরে বৃষ্টি এসেছিল, আড়াই সের ডালের বড়ি ভিজে একেবারে ঘণ্টো।

পরোটা চিবোতে চিবোতে চোয়ালের পেশীগুলো কঠিন হয়ে উঠেছে রামতনু অনুভব করেছিল। খেয়াল থাকবে কি করে। তুমি কি আর তখন তোমাতে ছিলে। মৃণাল এসেছিল যে—। লোকসান সব আমাতেই বর্তাক। ছাগল ছাড়াতে দেড় টাকা, আড়াই সের ডালের বড়ি— আসে কোত্থেকে এসব। মালতী চা ছাঁকছিল। মালতীর মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রামতনু বলেছিল, মৃণাল এসেছিল—?

— এসেছিল। এসে বেচারীর এক ফেরার—। বৃষ্টি নামল। যায় কি করে? ও তো বৃষ্টির মধ্যে যাবেই—। বলে ওদের ক্লাবের ম্যাচ্‌ আছে— দেখতে যাবে। আমি বললাম পাগল হয়েছ। এই বৃষ্টিতে তোমায় ছেড়ে দি আর একটা অসুখ-বিসুখ বাঁধিয়ে বস।

ভারি দরদ! রামতনু মনে মনে হেসেছিল ঠোঁট বাঁকিয়ে। এদিকে আমি যে পাক্কা ন'টায় দুটো ভাত কোনোরকমে নাকে-মুখে গুঁজে গেছি আর এই ফিরছি। নাক টানছি। চোখ-মুখ লাল।— এদিকে এখনও মহারাণীর নজর পড়ল না।

উনুনে এ সময় কিছু ছিল না। মালতীর সমস্ত শরীর জুড়ে আগুনের শিখার দাপাদাপি। রামতনু বেশ শব্দ করে কোঁচার খুঁটে নাক ঝেড়েছিল। তাকের ওপর থেকে কাপ-ডিস্‌ নামাতে মালতী উঠে দাঁড়িয়েছিল। কাপ-ডিস্‌ নামিয়ে আবার ছেঁড়া কথার সুতো ধরেছিল, তার চেয়ে এক কাজ কর। মৃণালকে বললাম, সাইকেলটা ঘরে উঠিয়ে আমার সঙ্গে গল্প কর। বৃষ্টি না-থামলে তোমায় ছাড়ছি না আমি। আঙুল ছুঁইয়ে চায়ের একটা কুচী পাতা তুলে নিয়ে মালতী তার দিকে কাপটা এগিয়ে দিয়ে বলেছিল, এ মাসের 'প্রেক্ষাপটটা' জোড়াকুলুঙ্গি-তে আছে। পড় যদি তো পড়। কালই ফেরত দিতে হবে।

এ এক মন্দ খেলা নয়। রামতনু মনে মনে মালতীকে উদ্দেশ করে বলেছিল, এই বই দেওয়া-নেওয়া— এই তোমাদের পাতানো দেওর-বৌদির সম্পর্কটা কিন্তু মালতী— বেশ। বেশ মিষ্টি। অনেকটা সিলোফেন্‌ পেপারে মোড়া মিষ্টি টফির মত। যেহেতু ব্যাপারটা খুব মধুর তাই পিঁপড়ে লাগার ভয়, তাই সিলোফেন্‌ পেপার। বাজারে আজকাল সিলোফেন্‌ পেপারটা বেশ চালু হয়েছে।

মালতী ডালের কড়া চাপিয়ে দিয়েছিল উনুনে।

রামতনু ভেবেছিল, অথচ, এই মেয়েটাকে আমি ভালবেসে বিয়ে করেছিলাম। ভালবাসায় বিশ্বাস করেছিলাম। উঠে দাঁড়িয়ে রামতনু বলেছিল, আশ্চর্যমলমের শিশিটা কোথায়?

মালতী চোখ তুলে তাকিয়েছিল, কেন? কি হবে?

আঃ, যা বলছি তার উত্তর দাও।

জোড়া-কুলুঙ্গিতে। মালতী চোখ নামিয়ে হাতের কাজ সারতে সারতে ছোট্ট করে উত্তর দিয়েছিল।

পাশ-বালিশ আঁকড়ে বিছানায় শুয়ে রামতনুর মনে হয়েছিল, সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে রাখা রুমালটা সর্দিতে ভিজে সপ্‌সপে। টাগ্‌রা জ্বালা করছে।— তৃষ্ণা। চোখ তাকাতে কষ্ট হচ্ছে। সারা মাথা মুখ সর্দিতে ঝাম্‌রে উঠেছে।— উঠোনের একপাশে বাঁধা ছাগলটা চেঁচাতে শুরু করেছিল এ সময়। রামতনুর মনে হচ্ছিল উঠে গিয়ে ছাগলটার জিভ্‌টা টেনে ছিঁড়ে দিয়ে আসে।

এই এদিক ফেরো। মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

চৌকিটা শব্দ করে নড়ে উঠেছিল। রামতনু অনুভব করেছিল, মালতী চৌকির উপর উঠে বসেছে। সঙ্গে সঙ্গে মালতীর হাতের স্পর্শ অনুভব করেছিল কপালের উপর। — রামতনু কথার উত্তর দেয়নি। ফেরেনি।

মালতী অপেক্ষা করেছিল খানিকক্ষণ। তারপর আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেছিল। মালতীর ঠোঁট তার কানের পাশে। মালতীর বুক তার পিঠের সঙ্গে লেপ্‌টে আছে। মালতী স্বরে গাঢ়তা এনেছিল, এই, কেন তুমি এরকম বদ্‌লে যাচ্ছ বলত। কেন এরকম হয়ে যাচ্ছ দিনদিন!

রামতনু সেই অবস্থাতেই একবার চোখ তাকিয়েছিল। মালতী ঘরে ঢুকে হ্যারিকেনের শিখাটাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। সেই আলোতে প্লাস্টার-খসা অপরিষ্কার ঘরের দেওয়াল, শ্যাওলা-ধরা ঘরের শিলিং, পাঁজরের মত কড়ি-বরগায় সাজানো নীচু ছাদ— সমস্ত মিলে একটা অতি কদর্য চেহারা নিয়ে ঘরটা তার চোখের সামনে ফুটে উঠেছিল।— ছাগলটা চেঁচিয়ে চলছিল তারস্বরে। রান্নাঘর থেকে ভাতের ফ্যান্‌-পোড়া কটু গন্ধ ঘরের বাতাস ভারী করে তুলেছিল। সর্বোপরি মালতীকে— মালতীর স্বরের গাঢ়তাকে রামতনুর মনে হচ্ছিল ছেঁদো ন্যাকামি, মালতীর স্পর্শকে তার মনে হচ্ছিল একটা মাকড়সার আলিঙ্গনের মত, রক্তমোক্ষণেই যার একমাত্র আনন্দ এবং পরিতৃপ্তি...

— আপনার নাম রামতনু সরকার?

মাথার ঠিক হাতখানেক ওপরেই যেন একটা জলভরা মেঘ গুড়গুড় করে ডেকে উঠল। রামতনু ভয় পেয়ে চমকে ঘাড় ফেরাল। দেখল বিশাল একটি লোক ঘাড় হেঁট করে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

— রামতনু সরকার? ডেস্‌প্যাচ্‌ ডিপার্টমেন্টের ক্লার্ক?

জলদগম্ভীর স্বরে লোকটা জিজ্ঞেস করল। তার মুখের বাতাস রামতনুর কপালে লাগল।— কপালের ওপর থেকে কয়েকটা চুল সরিয়ে দিল। অন্য সময় যে-কেউ তাকে ঠিক এভাবে কেরাণী বললে রামতনু চটে যেত। কিন্তু এ-সময় এই বিশাল লোকটার কথায় রাগতে সাহস পেল না। রামতনু বশংবদ কৃতজ্ঞের মত ঘাড় হেঁট করল। এতক্ষণ লোকটার বুকের কাছে রামতনুর মাথাটা ছিল। শিরদাঁড়া বাঁকিয়ে ঘাড় হেঁট করাতে রামতনু যেন লোকটার কোমরের কাছে গিয়ে পড়ল। রামতনু কথা বলতে পারল না। সেই অবস্থায় ঘাড়, মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, হ্যাঁ...হ্যাঁ...।

আরও খাদে গলার স্বরের পর্দা নামিয়ে লোকটা বলল, চলুন।

রামতনু এতক্ষণে বুঝল, এতক্ষণে যেন রামতনু তার সংবিৎ পুনরায় ফিরে পেল, ফিরে পেয়ে বুঝল, এই লোকটাই সেই লিফট্‌ম্যান—। যে তাকে নন্দনকাননে নিয়ে যাবে। সতী যার ওপর তাকে নন্দনকাননে নিয়ে যাবার গোপন-নির্দেশ দিয়েছে।

চকিতে রামতনুর দৃষ্টি দেয়ালের ঘড়িটার ওপর গিয়ে পড়ল। দেখল, কাঁটায় কাঁটায় দেড়টা।

লিফ্‌টের দরজাটা সম্পূর্ণ খোলা রয়েছে অনুভব করেও রামতনু লিফ্‌টের ভেতরটা দেখতে পাচ্ছিল না। কেননা, লোকটার বিশাল চেহারা তার সামনের সবকিছু আড়াল করে রেখেছিল।

লোকটা পাশ ফিরে রামতনুকে লিফটের ভেতরে যাবার রাস্তা করে দিল। রামতনু এবার নরম স্বপ্নাভ আলোকে উজ্জ্বল লিফটের অভ্যন্তর দেখতে পেল। পলকমাত্র, রামতনু মুগ্ধ হয়ে গেল। মুগ্ধ হয়ে ভাবল, এটা তো লিফট্ নয়, রথ। পুষ্পকরথ। — পুষ্পকরথে চড়ে আমি নন্দনকাননে চলেছি।

কখন যে লিফট্‌টা উঠতে শুরু করেছে রামতনু বুঝতে পারেনি। রামতনু এখন যে কোমল কার্পেটটার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে তার সুখানুভূতি ঠিক কি রকম, কী জাতীয় ভেবে ঠিক করতে না-পেরে দিশাহারা হয়ে ভাবছিল, হবে না, এই লিফট্‌টা দিয়ে বস্-রা যে সর্বদা ওঠেন-নামেন।

রামতনু অনুমান করছিল, কাজ করতে করতে বস্-রা ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তখন শ্রান্তিতে বস্‌দের মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করে। চোখের পাতা ভারী হয়। শরীরের স্নায়ুরা শ্লথ হয়ে পড়ে। পরিশ্রান্ত পায়ে বস্-রা গিয়ে দাঁড়ান নির্দিষ্ট জায়গায়। বেয়ারা বোতাম টিপে ডাক দেয় পুষ্পকরথকে। সোঁ করে পুষ্পকরথ এসে দরজা খুলে দাঁড়ায়। বস্-রা পুষ্পকরথে চড়ে সোজা চলে যান নন্দনকাননে। নন্দনকানন বস্-দের শ্রান্তি হরণ করে, ক্লান্তি হরণ করে। বস্-রা আবার সুস্থ, তাজা হয়ে ফিরে আসেন।

লোকটা তার বিশাল অবয়ব নিয়ে লিফটের প্রায় সমস্ত দরজাটা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। রামতনু তার পেছনে। রামতনু লোকটার প্রকাণ্ড চেহারাটা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। লোকটার মাথার পাশে ঘরে ঘরে লাল আলোর ফোঁটা জ্বলছে, নিভছে। অগত্যা রামতনু তাতেই মনোনিবেশ করল।

চারের ঘরের আলো নিভে গেল। পাঁচের ঘরে জ্বলে উঠল। রামতনু ভাবল, আর ক নিমেষই বা—।

লোকটা সামনে থেকে সরে দাঁড়াল।

রামতনু সবিস্ময়ে দেখল, তার মনকে ফাঁকি দিয়ে কখন পনেরোর ঘরে লাল আলোর ফোঁটা জ্বলে উঠেছে।

আলো এসে রামতনুকে স্নান করিয়ে দিল। বাতাস ঝাঁপিয়ে পড়ল রামতনুর শরীরের ওপর।

আবেশে-আবেগে রামতনু চোখ মুদল, আঃ এ-হচ্ছে নন্দনকাননের আলো, বাতাস।

একঝাঁক প্রজাপতি যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল— ছেঁকে ধরে অভ্যর্থনা করল তাকে। রামতনুর মনে হল সে-যেন এক প্রজাপতিদের রাজ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে। রৌদ্রের মত প্রজাপতিদের পাখ্‌নার রং। প্রজাপতিরা তার পায়ের নীচে বিছিয়ে দিয়েছে নিজেদের— নিজেদের উষ্ণ নরম শরীরকে। প্রজাপতিরা যেন তাদের শরীরকে তার পায়ের তলায় পিষ্ট হতে দেবে। তার চলাকেও আর মসৃণ, আরামপ্রদ, সুখকর করাই যেন প্রজাপতিদের এই আত্মদানের উদ্দেশ্য। প্রজাপতিদের রাজ্য থেকে, নিজের শরীরের ওপর থেকে দৃষ্টি তুলে রামতনু ঘাড় উঁচু করে তাকাল।— মাথার ওপর মাধবীবিতান। সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে ছেঁড়া কাগজের মত টুক্‌রো টুক্‌রো নীল রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ। মাধবীবিতানে বাতাস লাগল মৃদুমন্দ—। মাটির ওপর শুয়ে থাকা প্রজাপতিরা আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠল। পাখা বাড়াল। যে প্রজাপতিরা তার সর্বশরীর ব্যাপী ছড়িয়ে ছিল তারা শিউরে উঠল। রামতনুর বিহ্বল দৃষ্টি তাকে ঘিরে অসংখ্য আনন্দ-উদ্বেল নৃত্যরতা প্রজাপতিদের ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না কিছুক্ষণ। তার চতুর্দিকে প্রজাপতিরা নানা ভঙ্গিতে উড়তে লাগল, নাচতে লাগল। তারপর প্রজাপতিরা

আবার নিথর হল। শান্ত হয়ে বসল মাটিতে। তার সর্বশরীরে। যে যেমনটি ছিল ঠিক সেইভাবে। বসে ঝিম্ ঝিম্ করে পাখা কাঁপাতে লাগল। রামতনু ভাবল, এই মাধবীবিতান দিয়ে বস্-রা যখন হেঁটে যান তখন রোদ রং-এর এই সব প্রজাপতিরা, হয়ত বা জ্যোৎস্নার বাদামী প্রজাপতিরাও তাদের এমনি করে জড়িয়ে ধরে, এমনি করে নৃত্য করে তাদের ঘিরে। বস্দের মনকে খুশি করে, আহ্লাদিত করে।

মাধবীবিতানের মৃদু-মন্দ বাতাস তখন বিতান থেকে নেমে নন্দনকাননের ফুটন্ত, অর্ধ-ফুটন্ত ফুলেদের সুড়সুড়ি দিয়ে হাসিয়ে নাচিয়ে অস্থির করে তুলেছে। ফুলেরা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে। ঢলে ঢলে পড়ছে এ ওর গায়ে। রামতনু বিমুগ্ধ হয়ে দেখল তার সামনেই নন্দনকাননের ফুলেদের রাজ্য। রাজ্য নয়, রাজ্য তুচ্ছ— এ সাম্রাজ্য। দিগন্ত পর্যন্ত নন্দন-কাননের ফুটন্ত, অর্ধ-ফুটন্ত আর কুঁড়িদের অবিচ্ছিন্ন বিস্তৃতি। শুধু সামনে নয়,— চতুর্দিকেই। চতুর্দিকের কোনো দিক থেকেই রামতনুর দৃষ্টি প্রতিহত হয়ে ফিরে এল না। রামতনুর চোখের মণিতে দিগন্তের ছায়া পড়ল।

একেবারে পাশেই শুক্নো পাতার ওপর সাপ হেঁটে গেলে যেমন শব্দ হয় তেমনি সর-সর শব্দ হতেই রামতনু চমকে উঠল। যে-বাতাস ফুলেদের হাসিয়ে নাচিয়ে উধাও হয়েছে ভেবেছিল রামতনু, আসলে সে-বাতাস যে তার পাশেই নিঃশব্দে ছিল তা বুঝতে পারেনি। ফুলেদের স্পর্শে স্পর্শসুখে মূর্ছিত হয়ে সে-বাতাস ফুলেদের বিছানায় শুয়েছিল। রামতনুব পাযের সাডা পেযেই জেগে উঠে চন্দ্রমল্লিকাদের ছেড়ে হাততালি দিতে দিতে ছুটে গেল ফুলেদের অন্য পাড়ায়।

চন্দ্রমল্লিকাদের পাড়া ছেড়ে রামতনু ফুলেদের যে পাড়ায় এসে উপস্থিত হল সে ফুলেদের নাম সে জানে না। মোমের মত সেই সব ফুলেদের রং সাদা। মাথায় নীল পাগড়ীর টোপর। হাল্কা মিষ্টি একটা গন্ধ মসলিনের ওড়নার মত এ-পাড়াকে ঢেকে রেখেছে। এ-পাড়ায় সূর্যেব আলো ফুলেদের গা-বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। যেন মোমবাতি ফুলেদের মাথায় জ্বলছে নীল শিখা আর তারই তাপে ফোঁটায় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়ছে মোম।

রাস্তার দু-পাশে মন্দিরের চূড়াব মত লোহার জালের গা-বেয়ে লতিয়ে উঠেছে মধুলতা। লতায় লতায় ফুল ঝুলছে থোকা থোকা। আকণ্ঠ মধুর ভারে বাসন্তী-রং-এর মধুফুলেদের শরীর ভার। শরীরে মধুর ভার— তারা তাই নিশ্চুপে রোদ পোহাচ্ছে। রোদে গা-এলিয়ে, রোদে গা সেঁকে সে-বুকের মধুকে আরও গাঢ়, আরও মিষ্টি, আরও সুগন্ধী করছে।

পথ এমনই মজার যে, পথ কখনই শেষ হচ্ছে না। এই পথ দিয়ে রামতনু হেঁটে চলেছে। দু'পাশে ফুলেদের সাম্রাজ্য। অবিচ্ছিন্ন এবং অবিরাম। পথ নিজের খুশিমত দুমড়েছে, মুঁচড়েছে, বাঁক নিয়েছে— বাঁক নিয়ে অন্যদিকে ঘুরে গেছে। মোট কথা, রামতনু যে-পথ দিয়ে চলেছে তার যেন আদি নেই, অন্তও নেই। আর তাতে করে নন্দনকানন যে কত দূর বিস্তৃত, কত প্রকাণ্ড, রামতনু দিগন্ত পর্যন্ত তার দৃষ্টিকে প্রসারিত করেও হদিশ করতে পারছে না। পথটা যে তাকে কোথায় নিয়ে চলেছে তাও সে বুঝে উঠতে পারছে না। পথের দু-পাশে ফুলেরা কোথাও পাড়ায় পাড়ায় আলাদা হয়ে রয়েছে। আবার কোথাও পাঁচ গাঁয়ের হাটুরে মানুষ এক হাটে এসে জড়ো হওয়ার মত জড়ো হয়েছে। বসে-দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে জটলা করছে।

মাঝে মাঝে রামতনু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছিল। গন্ধটা যে কোথা থেকে ভেসে আসছে রামতনু বুঝতে পারছিল না। অথচ গন্ধটা তাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করছিল। প্রতিবার সামনে ফুলেদের যে-কোন পাড়া দেখে রামতনুর মনে হচ্ছিল গন্ধটা বোধহয় সামনে ফুলেদের ওই পাড়া থেকে আসছে। সেখানে গিয়ে সে হিস্-হিস্ করে নিঃশ্বাস টানছিল। কিন্তু গন্ধ শুঁকে তার মনে হচ্ছিল, না এ-গন্ধটা সে-গন্ধ নয়।...

সেই বাতাস কোথায় ছিল। হঠাৎ একেবারে সামনেই ফুলেদের পাড়ায় এসে উপস্থিত। ফুলেদের হাসিয়ে নাচিয়ে ঝরা-পাপড়ির ঘূর্ণি তুলে হাসতে হাসতে উধাও হয়ে গেল। আবার, আবার রামতনু সেই গন্ধটা পেল। বাতাসটা যেন মজা পেয়ে রামতনুকে খানিকটা ক্ষেপিয়ে দেবার জন্যে সেই গন্ধটা সঙ্গে করে এনে তার গায়ের ওপর সবটুকু ঝরিয়ে দিয়ে উধাও হয়ে গেল। রামতনু পেছন ফিরে খানিকক্ষণ ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল। তারপর প্রতিবারের মত আরও একবার একই ভুল করল। —সামনে ফুলেদের পাড়ায় বাতাস এতক্ষণ মাতামাতি করে গেছিল, সেই মনে করে হন্‌হন্ করে সামনে এগিয়ে গেল। নাকের পাটা ফুলিয়ে ফুলিয়ে নিঃশ্বাস টানল।

যদিও রামতনু আবারও ব্যর্থ হল। সেই গন্ধটা পেল না বলে মনক্ষুণ্ণ হল। সত্যি বলতে কি এ-ফুলের কোনো গন্ধই নেই। কিন্তু ফুলগুলো দেখে রামতনু মুগ্ধ হয়ে গেল। এমন ফুল তো সে ইতিপূর্বে দেখেইনি, এমন বর্ণসুন্দর ফুল যে হয়, হতে পারে এও তার ধারণার বাইরে ছিল। অবশ্য রামতনু তৎক্ষণাৎ মনেমনে বলল, আমি কিইবা দেখেছি। কতটুকুই বা জানি।

হেঁট হয়ে ফুলেদের দেখে মাথা তুলে সামনে তাকাতেই রামতনু অবাক হয়ে গেল। আবেগে, আনন্দে, উত্তেজনায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, আরে সতী! তুমি?

সতী হাসল, মিস্টার রাঘবন নেই। হাতে কাজকর্মও নেই। বসে থাকতে থাকতে— বোরড লাগল, তাই চলে এলে এখানে—। রামতনু সতীর কথার শেষটা এমনভাবে নিজে টেনে নিল যেন ব্যাপারটা তার খুবই জানা। তারপর বলল, কিন্তু আমি কি ভেবেছিলাম জানো সতী? তুমি গতকাল বিগ্-বসের সঙ্গে সকালের প্লেনে দিল্লী চলে গেছ।

সতী বলল, দিল্লীতে, এমারজেন্ট্ মিটিং ডিরেক্টোরিয়াল বোর্ডের। যতদূর জানি, আগামী ধর্মঘটের ব্যাপার মিটিং-এর এজেণ্ডা। টপ্-সিক্রেট্ ব্যাপার। এসবের মধ্যে কি আমরা থাকতে পারি। হাজার হলেও— অন্যমনস্কতা থেকে ফিরে রামতনুর দিকে তাকিয়ে সতী বলল, হাজার হলেও মাস গেলে আমরাও তো পে-সিটে সই করি। যাকগে, তোমায় এখানে আসতে আট্‌কায়নি তো কেউ—

রামতনু চোখের দৃষ্টিকে কঠোর, মুখের পেশীগুলোকে শক্ত করল, আট্‌কাবে কী সতী। দারোয়ান দরজা খুলে দাঁড়াল— গট্‌গট্ করে হেঁটে এলাম। কাঁটায় কাঁটায় দেড়টা— লিফটটা এসে সামনে দরজা খুলে দাঁড়াল, যন্ত্রের মত ব্যবস্থা সব। তুমি অর্ডার দিয়েছ, আটকাবে কোন শা— রামতনু অতিযত্নে উৎসাহের বল্গা টেনে ধরল।

সতী বলল, তারপর দেখলে সব। কি যেন বল তোমরা! ও হ্যাঁ, প্যারাডাইস্— তোমাদের প্যারাডাইসের দেখলে সব?

সতী কথা বলতে বলতে ক'পা এগিয়ে গেছিল। রামতনু একটু জোরে পা ফেলে পেছন ধরল, কই আর দেখলাম। কতটুকুই বা দেখলাম। মজা কি জানো সতী, কি দেখেছি, কতখানি দেখেছি আসলে তাই-ই বুঝে উঠতে পারছি না। আমি শুধু গন্ধে পাগল হয়ে পথে পথে ফিরছি। বলতে বলতে রামতনুর যেন হঠাৎ মনে পড়ল, সতী, ওই গন্ধটা কোথা থেকে আসছে বলত। — কিছুতেই আমি ধরতে পারছি না।

কোন্ গন্ধ? — ব্যালে-নর্তকীদের মত দীঘল করে আঁকা সতীর ভ্রূতে ছোটছোট ঢেউ উঠল।

ওই যে, পাচ্ছো না তুমি? রামতনু নিজেই নাকের পাটা ফুলিয়ে দুবার ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস টানল, ওই যে— মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ একটা—।

ও, সতী গন্ধটা পেয়ে বলল।

অতিমাত্রায় উৎসাহিত হয়ে রামতনু বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ। ওইটাই, ওইটাই।

ও গন্ধটা আসছে— বলতে গিয়ে সতী থামল। থেমে, হাসতে গিয়ে আল্‌তো করে দাঁত দিয়ে পাত্‌লা ঠোঁট চেপে ধরল।

সতীর সহাস্য মুখের দিকে তাকিয়ে রামতনুর চোখ-মুখ কৌতূহল ও উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, ব্যাপারটা কি, অাঁ—। ব্যাপারটা কি!

সতী বলল, এই গন্ধটা সেখান থেকে আসছে যেখানে আমরা সব শেষে যাব। বলতে গেলে ওইটাই তোমাদের নন্দনকাননের লাস্ট্‌ ডেস্‌টিনেশন্‌।

প্রথমটা রামতনুর নিজেকে খানিকটা বিমূঢ় মনে হচ্ছিল। তাড়াতাড়ি সে-ভাব কাটিয়ে উঠে বলল, কোথায় শেষ আর কোথায় শুরু, সে আমার জেনেও কাজ নেই সতী। আমি এখানে চোখ থাকতেও কানা। তুমি যাবে, আমি তোমার পেছনে পেছনে। রামতনুর কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে আসছিল ক্রমশঃই, তুমি আমায় এখানে আসবার সুযোগ করে দিয়েছ! শুধু তাই নয়— নিজে এসেছ, নিজে আমায় নিয়ে চলেছ... এ যে আমার কাছে কি, কতখানি, নামতে নামতে গলার স্বর এমন খাদে নেমে এসেছিল যে, রামতনু বুঝল এরপর কিছু বললেও সতী হয়ত শুনতে পাবে না। চুপ করে গেল।

বুকের ওপর আড়াআড়ি হাতে হাত জড়িয়ে সতী এগিয়ে চলছিল। হাওয়ায় সতীর ঘাড়ের ওপর স্তবকে স্তবকে নেমে আসা ঈষৎ রুক্ষ চুল উড়ছিল, স্বর্ণচাপা ফুলের রং -এর শাড়ীর অাঁচল।

গ্যালারীতে সাজানো এই যে ক্যাক্‌টাসগুলো দেখছ— সতী ঘাড় ঘুরিয়ে রামতনুর মুখের দিকে তাকাল, এগুলো পৃথিবীর নানান দেশ থেকে আনানো হয়েছে। কোনোটা হয়ত মরুভূমির মধ্যে হয়েছিল— কোনোটাকে হয়ত ন্যাড়া পাহাড়ের ফাটলের ভেতর থেকে উপ্‌ড়ে আনা হয়েছে। দেশ-বিদেশের অর্কিড্‌ আর ক্যাক্‌টাস্‌ সংগ্রহ মিস্টার সেনগুপ্তের একটা হবি।

সোৎসাহে রামতনু বলল, মিস্টার সেনগুপ্ত, মানে আমাদের সেজ বস্‌।

এই তো সেদিন প্লেনে নিউগিনি থেকে পাঁচটা পাঁচ রকমের অর্কিড এসে পৌঁছল। যতদূর জানি. সাড়ে চার থেকে পাঁচ হাজারের মত খরচ পড়েছিল।

বিস্ফারিত বিস্ময়ে রামতনু বলল, কতো!

হাজার পাঁচেকের মতন, ছোট করে উত্তর দিয়ে সতী বলল, কিন্তু এর মধ্যে তিনটে গাছ কিছুতেই বাঁচানো গেল না। মিস্টার সেনগুপ্তের মনমেজাজ্‌ তো ভীষণ খারাপ।

ই—স্‌। তিন হাজারই বরবাদ। রামতনু খুবই বিমর্ষ বোধ করল।

সুতরাং, আবার অর্ডার দিতে হল।

যাক্‌— রামতনু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল! এখন মিস্টার সেনগুপ্তের মেজাজ আর এতটা খারাপ নয়ত — জিজ্ঞেস করতে গিয়ে রামতনুর দৃষ্টি সামনের এক জায়গায় আটকে কৌতূহলী হয়ে উঠল, সতী ওটা কি? কিছু একটা তৈরী হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে?

ও হচ্ছে তোমাদের ছোটো বস্‌ মিস্টার পাণ্ডের কাণ্ড। ছোটো-খাটো একটা সুইমিং পুল তৈরী করাচ্ছেন। গয়া ডিস্ট্রিক্‌টের লোক। ছেলেবেলায় ফল্গুর তীরে দাঁড়িয়ে ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে পার হবার স্বপ্ন দেখতেন। যাক্‌, সে সব আর হয়নি। কিন্তু সাঁতার দেওয়ার অভ্যাসটা ছাড়তে পারেননি। তাই ওই সুইমিং পুল,—

রামতনুর ভীষণ ইচ্ছে করছিল এই সুইমিং পুলটা তৈরী করাতে কত খরচ পড়েছে সতীকে জিজ্ঞেস করে। কিন্তু সোজাসুজি প্রশ্নটা উত্থাপন করতে সাহস পাচ্ছিল না। অথচ,

কৌতূহল তাকে অস্থির করে তুলছিল। শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে গলা পরিষ্কার করে রামতনু বলল, আচ্ছা সতী, এটাও বেশ একটা খরচার ব্যাপার তাই না?

এখানে খরচের কথা কেউ ভাবে না। এখানে শুধু ইচ্ছে—। সতী চলতে চলতে বলল, ইচ্ছা ছাড়া কেউ এখানে অন্য কিছুর মূল্য দেয় না।

সতীর মুখের দিকে চোরাচোখে চেয়ে রামতনু মুহূর্তে গুটিয়ে নিল নিজেকে, তাতো বটেই, তাতো বটেই। এটা হচ্ছে ইচ্ছাপূরণের রাজ্য।

সামনে রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে। বাঁক নিয়ে সামনে তাকাতেই রামতনুর দুটো চোখ যেন ধাঁধিয়ে গেল। চোখের পলক ফেলতে ভুলে গেল। রামতনুর মনে হল, এক গলিত প্রবালের সমুদ্রের সামনে সে দাঁড়িয়ে। তার সামনে এক জীবন্ত গলিত প্রবালের সমুদ্র, ফুলছে, ফাঁপছে, ফুঁস্‌ছে। তাব সামনে থেকে এইমাত্র যে-ঢেউটা জীবন্ত গভীর থেকে মাথা তুলল, সেই ঢেউ নীল দিগন্তকে আঘাত করতে ভেঙে ভেঙে এগিয়ে গেল।

এখানকার একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছ? সতীর কথাগুলো যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এল— নাকি হাওয়া, হাওয়া এখানে উদ্দাম বলে সতীর কথাগুলো বহু দূর থেকে বলা কথার মত মনে হল, রামতনু ঠিক করে উঠতে পারল না।

বিশেষত্ব। রামতনু খানিকটা বিহ্বল দৃষ্টি চারপাশে বুলিয়ে বলল, কি জানি সতী— ঠিক বুঝতে পারছি না।

এখানকার সব গোলাপই লাল। লাল রং ছাড়া এখানে অন্য কোন রং এর গোলাপ নেই। জুনিয়ার মিস্টার দেশাইয়ের লাল রং-এর ওপর ভয়ঙ্কর ফ্যাসিনেশান। ওনার পি-এ, স্টেনোর হয়েছে বিপদ। বেচারীরা কেউ লাল রং-এর পোশাক ছাড়া অফিসে আসতেই পারে না।

রামতনু চোখ মুখ কুঁচকে হাসল, রাঙা বস্ কি না তাই রাঙা রং ছাড়া আর কিছুতেই মন ওঠে না।

হাতের ছোট্ট রুমাল সতী মুখের ওপর বোলাল, ওঃ তোমার সঙ্গে বকর বকর করতে করতে আমার গলা শুকিয়ে গেছে। চল একটু গলা ভিজিয়ে নেওয়া যাক।

রামতনু পুলকিত হয়ে উঠল. সে সব ব্যবস্থাও আছে নাকি সতী এখানে।

মানুষের সুখের জন্য যা যা দরকার— সতী আলগোছা ঘাড়ের ওপর থেকে চুলেব ঝালর সরিয়ে দিল, সমস্তই এখানে কোল্ড স্টোরেজে রাখা অসময়ের সব্জীব মত সর্বদাই মজুত।

আহ সুখ! সে কি জিনিস। রামতনু মনে মনে বলল, তাইতো, সেই জন্যেই তো এখানে আসা—

সতী বলল, কি বিড়বিড় করছ আপন মনে?

রামতনু বাকী কথাগুলো গিলে ফেলল নিমেষে, ও কিছু না।

যদিও তখনও গোলাপের রাজ্যের মধ্যে দিয়ে তারা হেঁটে চলছিল, তখনও গোলাপের রাজ্য শেষ হয়নি, কিন্তু রামতনু গোলাপের গন্ধ ছাপিয়েও আবার সেই গন্ধটা পাচ্ছিল। শুধু তাই নয়, প্রতিটি পদক্ষেপে সেই গন্ধ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছিল ক্রমেই। রামতনু বেশ বুঝতে পারছিল নন্দনকাননের শেষ গন্তব্য আর বেশী দূরে নেই। প্রতিটি পদক্ষেপ শেষ-গন্তব্যকে ক্রমেই নিকট থেকে নিকটতর করে আনছে।

সতী থামল। রামতনু দেখল, তার সামনেই পথের শেষ। এক লতাকুঞ্জের দ্বারে এসে পথ থেমেছে। দরজাটা ঘন সবুজ রং-এর ঢেউ-খেলানো কাঁচের, তাতেই রামতনু অনুমান করল সরস সবুজ ঘন-বুনোটের লতার চাদরের আড়ালে কংক্রিটের শক্ত দেওয়াল রয়েছে।

সবুজলতার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে অসংখ্য নীল রং-এর ফুল ফুটেছে। ফুলেরা তাদের গন্ধকোষের দ্বার খুলে দিয়ে বিহ্বল করে রেখেছে নন্দনকাননের বাতাস।

এস, সতী দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল।

খানিকটা ঠাণ্ডা বাতাস এসে গায়ে লাগল। — এ ঘরটা এয়ার কণ্ডিশণ্ড করা, পূর্ব অভিজ্ঞতা রামতনুকে স্মরণ করিয়ে দিল।

ঘরে ঢুকে রামতনুর মনে হল, সে যেন ছেলেবেলায় ইংরিজি ছবিতে দেখা অরণ্যচারী কোনো মানুষদের আস্তানায় এসে হাজির হয়েছে। ঘরের চতুর্দিকের দেয়ালে গহন অরণ্য স্তব্ধ। নিশ্ছিদ্র ঝোপঝাড়ের মাথা ছাড়িয়ে প্রাচীন গম্ভীর বনস্পতিরা তাদের শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে দিয়েছে। ঝুরি নামিয়ে দিয়েছে। খোলা ছাতির মত মাথার ওপর তাদের পত্র-পল্লবের নিবিড় সমারোহ। পত্র-পল্লবের ফাঁকে-ফাঁকে আকাশের আরক্ত বর্ণচ্ছটা। চতুর বর্ণ ব্যবহারে সুমসৃণ মেঝে। তৃণহীন কাঁকুরে মাটির মত বন্ধুর। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত যে কৌচ, সোফাগুলো রয়েছে রামতনুর মন হল সেগুলো যেন অরণ্য থেকে আহরিত কাঠ, কুড়ুল ফেঁড়ে আর কাঠের গুঁজি ঠুকেঠুকে তৈরী। মৃত বাঘ, বন্যমহিষ, মৃগচর্ম এই সব কৌচ-সোফার গদির গাত্রাবরণ। আশেপাশে টি-পয়-এর মত যে টেবিলগুলো ছড়ানো রয়েছে সেগুলো যেন গাছের গুঁড়ির খণ্ডাংশ ছাড়া অন্য কিছু নয়।— যদিও রামতনু ঘ্রাণে যে মৃদু বার্ণিশের গন্ধটা পাচ্ছিল মনে হচ্ছিল সেটা এইসব টেবিল কৌচ, সোফার গা থেকেই আসছে। এমন কি এই পরিবেশে টি-পয়ের ওপর কোনটাকে দেখে রামতনুর মনে হচ্ছিল যেন কালো কুচকুচে একটা পাহারাদার কুকুরের বাচ্চা। এখন নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। কারো সাড়া পেলেই শরীর কুঁকড়ে সাদা ঝকঝকে ধারালো দাঁত বার করে উঠে দাঁড়াবে।

এই সেই জায়গা,— রামতনু অনুমান করল, যেখানে এসে আমাদের বস্‌রা তাদের অফিসের আঁটোসাটো পোষাক আলগা করে দেন— টাইয়ের ফাঁস নামিয়ে দেন, সার্টের দুটি-একটি বোতাম ছেড়ে দেন, কোমরের বেল্টের ঘর বাড়িয়ে দিয়ে মিটমিট করে আঙুল মটকান।

দাঁড়িয়ে রইলে কেন বস। সতী একটা সোফার ওপর শরীর ছড়িয়ে দিল।

মৃদু একটা আলো প্রায় গন্ধের মত সমস্ত ঘবটায় ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু রামতনু এদিক-ওদিক বিস্তর খোঁজাখুঁজি করেও আলোর বাল্বগুলো দেখতে পাচ্ছিল না। মাথার ওপর তাকিয়ে খানিকক্ষণ লক্ষ কবে আবিষ্কারের আনন্দে রামতনুর চোখমুখ উজ্জ্বল হযে উঠল। রামতনু মনে মনে বলল, বুঝেছি, বুঝেছি আকাশের এই রক্তিম বর্ণচ্ছটা আসলে অস্তগামী সূর্যের,— সমাসন্ন সন্ধ্যার—

শরীর টানটান করে মুখের ওপর হাতের উল্টোপিঠ রেখে সতী হাই তুলল, টায়ার্ড—।

রামতনুর চোখে সহানুভূতির ছায়া পড়ল, হবেই তো, বাইরে যা কটকটে রোদ এখন।

স্খলিত আঁচল কাঁধের ওপর, বিন্যস্ত করে সতী উঠে দাঁড়াল, আসছি, বসো।

কোথায় যাচ্ছ, চারপাশে তাকিয়ে রামতনু যেন খানিকটা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল।

এইখানেই—

সতী উঠে একটা সোফার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল দেয়ালের দিকে। দেয়ালের ওদিকটায় বড় একটা কাঠের সিন্দুকের মত কি-যেন একটা রয়েছে— রামতনু লক্ষ করেও জিনিসটা যে কি বুঝে উঠতে পারছিল না। ওখানে দাঁড়িয়ে সতী কখনো ঝুঁকে পড়ছিল, ঝুঁকে পড়ে কিছু তুলে নিয়ে দেখে আবার নামিয়ে রাখছিল, এটাওটা নাড়ছিল— রামতনু পেছন থেকে খানিকটা বিমূঢ়ভাবে লক্ষ করে যাচ্ছিল। রামতনুকে সচকিত করে একসময় ঘরের মধ্যে বাজনা বেজে উঠল। বাজতে থাকল। সতীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রামতনুর চোখের পাতা ছোট হয়ে আসছিল—সেই চোখের পাতা পরিপূর্ণ খুলে গেল। অল্পক্ষণ

বাজনা শুনে রামতনুর মনে হল, এই পরিবেশের সঙ্গে— এই অরণ্য, অস্তোন্মুখ সূর্যের ম্রিয়মাণ আলো, ঘুমন্ত কুকুরের বাচ্চার মত ফোনের সঙ্গে এই বাজনার কোথায় যেন একটা অদ্ভুত মিল রয়েছে। এই পরিবেশের জনাই যেন এই বাজনা। এই বাজনার জন্যই চারিদিকের এই পরিবেশ যেন ক্রমেই জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

সতী ফিরে এল। রামতনুর দিকে তাকিয়ে বলল, কেমন লাগছে?

গ্র্যা-গু, রামতনু কপালের মাঝ বরাবর ভ্রূ উৎক্ষেপ করল। একটু নীরবতা। যন্ত্রের সামান্য শব্দ। আবার বাজনা বেজে উঠল।

কি খাবে বল?

রামতনুর মনে পড়ল অফিসের চেয়ারে বসে থাকলে পরমেশ্বর এতক্ষণে দ্বিতীয়বার এসে সামনে দাঁড়িয়ে চায়ের দাগ-লাগা সিল্ভারের কেটলী নাড়িয়ে শব্দ করে ড্রয়ার থেকে গেলাস বার করে দিতে ইঙ্গিত জানাত। কে জানে এখানে সেসব ব্যবস্থা আছে কি না। দ্বিধাগ্রস্তভাবে রামতনু সতীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, এক গেলাস জল পাওয়া গেলে হত সতী।

জল।

রামতনুর নিজেকে ভীষণ বোকা বোকা লাগতে লাগল। কেননা, মনে হল সতী যেন অতিকষ্টে তার পাতলা ঠোঁট ফেটে বেরিয়ে আসতে চাওয়া ঝক্‌ঝকে দাঁতের সারি ঢাকল। উদ্‌গত শব্দ গিলে ফেলল।

আচ্ছা দাঁড়াও দেখি কি ব্যবস্থা করতে পারি।

সতী কৌচের ওপর বসে বসেই পাশের একটা টি-পয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ল। কাঁধের ওপর থেকে আঁচল খসে পড়ল! রামতনুর গা শিরশির করে উঠল। তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিল। তারপর সবিস্ময়ে লক্ষ করল, আলমারির কব্জা-দেওয়া পাল্লাব মত টি-পয়ের একটা দিক খুলে গেছে। ভেতর থেকে সতী দুটো গেলাস্ বার কবল, তারপর একটা সুদৃশ্য বোতল। আস্তে ঠেলা দিয়ে পাল্লাটা বন্ধ করে দিল।

জিনিসটা কি সতী? রামতনু যেন অনেক চেষ্টা করেও কৌতূহল চাপতে পারছিল না।

বাজনার শব্দ ছাপিয়ে টুব্ করে ছিপি খোলাব শব্দ হল। সতী হাসল, ভয় নেই, খাবাপ জিনিস কিছু নয়।

কি যে বল— মুহূর্তে গলার স্বর কৃতজ্ঞতায় আর্দ্র করে ফেলল রামতনু। অস্থিরতায় হাঁটু নাড়ল, তবু জিনিসটা মানে জিনিসটা কি— অ্যাঁ।

শ্যামপেন, সতী গেলাসের ওপর বোতলের মুখ কাত করে ধরল।

শ্যাম্-পে-ন্, রামতনু হাঁটু নাড়াতে ভুলে গেল। সমস্ত শরীর যেন পাথর রামতনুর, দুটো চোখ অস্বাভাবিকভাবে বিস্ফারিত হয়ে সমস্ত মুখের আদলটাই একেবারে বদলে দিল।

একটা গেলাস পূর্ণ করে আর একটায় ঢালতে গিয়ে সতী মুখ তুলে রামতনুর মুখের দিকে তাকাল, আপত্তি আছে নাকি?

রামতনু যেন ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠল। হাতের তালুতে তালু ঘষল, না না আপত্তি কেন হবে।

বাজনা থেমেছে। রামতনু যেন তার চতুর্দিকে ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঝিল্লিরব শুনতে পেল।

সতী গেলাস তুলে ধরল। রামতনু প্রথমটা বুঝতে পারল না কি করবে। তারপর ইংরিজি ছবির কথা মনে পড়ল। তাড়াতাড়ি গেলাস ঠোকাঠুকি করবার জন্য গেলাস তুলতে গিয়ে দেখল সতী ঠোঁটে গেলাস ঠেকিয়েছে। রামতনু গেলাসের দিকে বাড়ান হাত গুটিয়ে নিল তাড়াতাড়ি।

রামতনুর মনে হচ্ছিল তার চারপাশে অরণ্য আস্তে আস্তে জেগে উঠছে। গুহাগহ্বরে, ঝোপঝাড়ের অন্ধকার তলায়, গাছের ঘন ডালপালার আড়ালে অরণ্য জাগছে।

সতী গেলাসের ওপর বোতলের মুখ কাত করে ধরল। রামতনু স্মরণ করে উঠতে পারল না সতী ইতিমধ্যে কতবার এমনি করে নিজের গেলাস ভর্তি করে নিয়েছে।

রামতনুর গেলাসের ওপর বোতল কাত করতে গিয়ে সতী থমকালো। মুখের দিকে তাকাল, কি ব্যাপার? গেলাস ভর্তিই যে।

খাচ্ছি, খাচ্ছি, রামতনু চোখ টিপল। তুমি চালিয়ে যাও—। তারপর একটু ইতস্তত করে দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বলল, সতী নেশা হয়ে যায় যদি—।

রক্তের ছিটে ফুটে উঠেছে সতীর গালে, কপালে। কাঁচপোকার মত ঝক্‌ঝকে চোখ তুলে সতী রামতনুর মুখের দিকে তাকাল, ক্ষতি কি, হোক না একটু।

বাজনা থেমে গেল।

দাঁড়াও রেকর্ড বদলে দিয়ে আসি, আধশোয়া অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়াতে সতী দেরী করল। সোজা হয়ে বসল অল্পক্ষণ। ফাঁপানো চুলের ওপর দিয়ে হাত টেনে নিয়ে ঘাড়ের ওপর রাখল। তারপর কৌচের একটা হাতল খাম্‌চে ধরে উঠে দাঁড়াল।

টি-পয়ের ওপর গেলাসটার দিকে তাকিয়ে রামতনুর মনে হচ্ছিল, কানায় কানায় সুখ তার হাতের নাগালের মধ্যে। এখুনি সে তার দুটি তৃষ্ণার্ত ঠোঁট সিক্ত করে নিতে পারে— কিন্তু রামতনু সময় নিচ্ছিল, সময়কে বিলম্বিত করছিল। সেই রকম সময় নিচ্ছিল যে-রকম সময় চরম সুখে নিজেকে তৃপ্ত করতে প্রয়োজন।

আবার বাজনা বেজে উঠল। রামতনুর মনে হল এবার যে-বাজনা বাজাচ্ছে, সে-বাজনার তালেব দোলা তাব রক্তকে আঘাত করছে। চারপাশের অরণ্যের মত তার রক্তও জেগে উঠেছে।

কিছু মনে করো না— সতী চিতাবাঘের ছালে মোড়া একটা সোফার গদির ওপর শরীর এলিয়ে দিল। প্লিজ গ্লাসটা একটু এগিয়ে দেবে।— সতী হাত বাড়াল।

সতীর খোলা হাতের দিকে তাকিয়ে রামতনু গেলাস এগিয়ে দিল। সতী গেলাসটা বুকের ওপর বসাল।

বাজনার তাল দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠেছে। অনেক গলায় একটা কোলাহল যেন বাজনার সঙ্গে তাল রেখে তালে তালে বাজনার শব্দকে ছাপিয়ে উঠছে আস্তে আস্তে। সতীর চাঁপা রং-এর শাড়ীর আঁচল লুটোচ্ছে মাটিতে। এক পা উঁচু করে তুলে দিয়েছে সোফার ঠেসান দেবাব জায়গাটার ওপর আর একটা পা চিতাবাঘের ছালে মোড়া গদির ওপর এলিয়ে পড়ে রয়েছে। বুকের ওপর গেলাসে তরল শ্যামপেন টল্‌টল্‌ করছে। বাজনার তালে তালে সতীর কোমর নড়ছে— সতীর সমস্ত শরীর বাজনার ছন্দ আর তালের আরক রসে জেরে উঠেছে।

রামতনুর চোখ সূঁচল হয়ে এল; চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। রামতনুর মনে হল কোন ফাঁকে তার জুতোর ভেতর একটা পিঁপড়ে ঢুকে পায়ের তলার চামড়ায় সুড়সুড়ি দিতে শুরু করেছে। রামতনু পায়ের বুড়ো আঙুলের ঠেলা দিয়ে জুতো খুলে ফেলল। হাত বাড়িয়ে গেলাস তুলে নিল। ঠোঁটের সামনে গেলাস তুলে রামতনু মনে মনে বলল, এইবার, এইবার আমি এই গেলাসের বর্ণহীন সুখের রাজ্যে চলে যাচ্ছি—

মিশমিশে কালো রং-এব কুকুর বাচ্চার মত ফোনটা যেন এতক্ষণ রামতনুকে সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ করে যাচ্ছিল, রাগে গরগর করে উঠল।

ঠোঁট গেলাসের কানা ছুঁয়ে রয়েছে, রামতনু ফোনের দিকে তাকাল। তারপর সতীর দিকে।

মুখে ছোট্ট একটা বিরক্তির আওয়াজ করে শুয়ে শুয়েই কানে রিসিভাব চেপে সতী সাড়া দিল।

রামতনু কিছুই শুনতে পাচ্ছিল না। চমকে উঠল। সতী ধড়মড় করে উঠে বসেছে। সতীর চোখেমুখে আতঙ্ক, সর্বনাশ হয়েছে— রিসিভার ধরা হাত কাঁপছে সতীর।

কি হল! রামতনু সতীকে দেখে ভয় পেল।

মিস্টার রাঘবন—। রিসিভারের দিকে তাকিয়ে সতী বলল।

আমাদের বিগ্ বস। কোথায়?

এই অফিসে—।

সে কি! রামতনুর গলা কেঁপে গেল, মিস্টার রাঘবন তো দিল্লীতে—

মিটিং শেষ হতেই প্লেন ধরেছেন। তারপব দমদম থেকে সোজা অফিসে। অফিসে এসে আমার খোঁজ করেছেন, আমায় দরকার পড়েছে। ফোনে বললেন, এখুনি আসছেন এখানে।

চাকরি যাবে—। প্রচণ্ড একটা আঘাতে সমস্ত শরীর যেন কেঁপে উঠল। রামতনুর হাত থেকে গেলাসটা মাটিতে খসে পড়ে চুরমার হয়ে গেল, কি করব সতী?

নিজের দিকটাই ভাবছ শুধু, সতীর চোখে ঘৃণা জ্বলে উঠল, এখানে তোমার সঙ্গে আমায় দেখলে মিস্টার রাঘবন কী ভাববেন সেটা একবার ভেবেছ?

তাতো বটেই, তাতো বটেই, রামতনু উঠে দাঁড়িয়েছিল, কি করব সতী এখন—

সতী ককিয়ে উঠল, যা হয় কর তাড়াতাড়ি— আমি কিছু ভাবতে পারছি না।

রামতনু অসহায়ের মত চারিদিকে তাকাল। তারপর প্রায় এক রকম ছুটেই ঘব থেকে বেরিয়ে এল। রোদে চোখ ঝল্‌সে গেল। গবম হাওযা ঝাঁপিয়ে পডল শবীরেব ওপর। সামনের দিকে তাকাতেই চক্রবালের নীল-দিগন্ত রামতনুকে আশ্বস্ত করল। স্বস্তিব নিঃশ্বাস ফেলে রামতনুর মনে হল, সে বৃথাই ভয় পেযেছে। দিগন্তবিস্তৃত নন্দনকাননেব কোন ফুলের ঝোপের আড়ালে সে লুকিয়ে থাকবে— মিস্টার রাঘবন তার হদিশই পাবেন না।

সময নষ্ট করা উচিত নয়। রামতনু পরম নির্ভরতায় ছুটতে শুরু কবল। দু পাশে বঙীন স্রোতের মত নন্দনকাননেব ফুলেদের সাম্রাজ্য। ঘাড় তুলেই একেবারে সামনেই ডবল ডেকার বাস দেখার মত রামতনু হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিল নিজেকে। ভযে রামতনুর সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ছলাৎ কবে বক্তের ঢেউযেব আঘাতে মনে হল তার ফুস্‌ফুস্ ফেটে যাবে। বিদ্যুতেব মত ঘুবে দাঁড়িযে রামতনু চোখ বন্ধ কবল। অন্ধেব মত হাতড়ে পেছনে শক্ত মত কিছু পেল মনে হল, শক্ত কবে চেপে ধবল। নিঃশ্বাস খানিকটা সহজ হতে রামতনু অনুভব করল, দুহাতের মুঠোয শক্ত কবে সে যা ধবে আছে, সেটা আসলে— ভয়ঙ্কর কষ্টে রামতনু বিকৃত স্ববে যেন নিজেকেই শোনাল না না।

সময় নেই। রামতনু সামনের দিকে তাকাল। নীল দিগন্ত তাকে বরাভয জানাল।

রামতনু যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। তবু পায়ের গতি বাড়িয়ে দিযে, গতিতে সাবধানতা এনে এগিয়ে গেল : শুঁয়োপোকার মত শুঁড় তুলে ওটিওটি ট্রাম হাঁটছে, পিঁপড়ের সারির মত যানবাহনের স্রোত, রঙীন ট্রেতে রাখা জলের মত সাযেবদেব সুইমিং পুলের নীল জল, নক্সা করে সবুজ টার্কিশ তোয়ালের মত ময়দান রোদে শুকোচ্ছে— রামতনুর এতক্ষণে যেন মনে পড়ল, এটা তাদের অফিস বাড়ীর ছাদ। ছাদের পরই ভযঙ্কর শূন্যতা। সে শূন্যতাকে বিস্তৃতি বলে বিশ্বাস করেছিল।

রামতনু ছুটতে ছুটতে এসে দরজা খুলে দাঁড়াল, সতী—

বাজনা বন্ধ। সতী মেঝের ওপর হেঁট হয়ে বসে তাড়াতাড়ি গেলাসের ভাঙা টুকরোগুলো হাতে তুলছিল। চমকে উঠেই মুখে যন্ত্রণায় বিকৃত একটা শব্দ করে আঙুলটা চোখের সামনে তুলে ধরল। রামতনু দেখল, সতীর আঙুলের ওপর কুঁচ ফলের বীচির মত একফোঁটা গাঢ় রক্ত ফুটে উঠেছে। সতী দু-ঠোঁটের ফাঁকে আঙুল চেপে ধরল। এখনও দাঁড়িয়ে আছ, সতীর গলা দিয়ে আর্তস্বর বেরিয়ে এল।

কোথায় যাব সতী,— রামতনুর স্বরে কাতরতা ফুটে উঠল। তুমি ফোন করে লিফট্‌টা আনিয়ে দাও— নেমে যাই।

তুমি কি পাগল হয়েছ—। মিস্টার রাঘবন হয়ত এতক্ষণে লিফট্‌-এ উঠে পড়েছেন। লিফট্‌ উঠতে শুরু করেছে হয়ত।

তাহলে, কি করব সতী।

উঃ আমি কিচ্ছু ভাবতে পারছি না। সতী যেন এখুনি কান্নায় গলে পড়বে। তোমার সঙ্গে আমায় এখানে দেখলে মিস্টার রাঘবন যে কি ভাববেন—

না না, তোমার কোনো ক্ষতি হতে আমি দেব না সতী, রামতনু গলায় জোর এনে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করল সতীকে। অনুনয়ে রামতনুর স্বর চেপে এল, আচ্ছা সতী, তুমি যদি মিস্টার রাঘবনকে একটু বুঝিয়ে বল, বুঝিয়ে বল আমি তোমার এ বয়সের নয়— বালিকা কালের ফিঁয়াসে ছিলাম, তাহলে...

সোফার ওপর হাত, হাতের ওপর মাথা রেখে সতী ডুকরে উঠল, তুমি কি আমায় মেরে ফেলতে চাও—

না না।

রামতনু বাইরে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর আর যেন তাড়াহুড়ো নেই, এমনি ভাবে নীলদিগন্তের দিকে এগিয়ে গেল।

রোদে শুকোতে দেওয়া নক্সা করা সবুজ টার্কিশ তোয়ালের মত ময়দান, রঙীন ট্রেতে রাখা জলের মত সায়েবদের সুইমিং পুলের নীল জল, পিঁপড়ের সারির মত যানবাহনের স্রোত শুঁয়োপোকার মত শুঁড় তুলে গুটিগুটি হাঁটা ট্রাম... ছোট হতে হতে রামতনুর দৃষ্টি পনেরোতলা নীচে পাথরের টালি বসানো ফুট পাতের সেই জায়গাটায় এসে কেন্দ্রীভূত হল, যে জায়গাটা যেখানে সে দাঁড়িয়ে ঠিক তার নীচেই।

সীমানা ছাড়িয়ে

প্রলয় সেন

কামরায় উঠেই জানলার কাছের একটা সীট দখল করল গোপা। রমেন তখন মানিব্যাগ খুলে কুলির পাওনা চুকিয়ে দিচ্ছে। গোপা প্রয়োজনমত শাড়ি টেনেটুনে আঁট করে বসল। জানলায় কনুই বিছিয়ে তাকাল বাইরের দিকে। ওদিকে রমেন মালপত্তরের হিসেব মেলাচ্ছে। একবার গোড়ালি উঁচু করে বাঙ্কের দিকে গলা বাড়াচ্ছে, আর একবার হাঁটু মুড়ে ঝুঁকে সীটের তলা দেখছে। ট্রাঙ্ক-সুটকেস হোল্ডঅল বেতের ঝুড়ি ফ্লাস্ক— গোনাগুনতি শেষ করে এসে বসল গোপার মুখোমুখি। পকেট থেকে সোনা-রঙের সিগারেট-কেসটা বের করে বলল, উফ্, বাইরে বেরুনোর যা ধকল, আগে জানলে—। রমেনের কণ্ঠস্বরে বিরক্তির লেশমাত্র ছিল না, বরং আত্মপ্রসাদের। গোপা তখন বাইরের দিকে পলকহীন তাকিয়ে। সেই পুরোন ছবি। নানা মাপের লোকজন। কেউ চলছে, কেউ বা অলস ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে। একটা ফেলে-আসা স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলে।

কামরায় তৃতীয় প্রাণী বলতে এক বুড়োমতন ভদ্রলোক। দূরের সীটে উল্টোদিকে মুখ করে বসে। সচিত্র বিলিতি ম্যাগাজিনের পাতা খুলে মগ্ন। এটা ঠিক বেড়াবার সীজন নয়। চেঞ্জারেরা সব ফিরে আসছে। রমেন অনেকদিন ধরে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। হঠাৎ ছুটি মিলে গেল, তাই এই অসময়বিহার। রমেন গলার কাছের বোতামটা খুলে দিল। তাবপর সোনা-রঙের কেসের মসৃণ পিঠে আলতো করে সিগারেট ঠুকতে শুরু করল। এমন সময ঘণ্টি বেজে উঠতে মুহূর্তে সব কোলাহল নিভে গেল। একটু পরেই হুইসল দিয়ে ট্রেন নড়েচড়ে উঠল। রমেন তখন বুক শূন্য করে ধোঁয়া ছাড়ছে। দু'পাশের মন্থর ছবিগুলি ধীরে ধীরে ভেঙে যাচ্ছে। ট্রেন প্ল্যাটফরমের বাইরের আলোয এসে পড়তে গোপা বমেনের দিকে ফিরে তাকিয়ে চাপা ধমকের সুরে বলল, এই, হাঁ কবে অসভ্যের মত দেখছ কি?

রমেন লক্ষ করল, ওর গোলাপী রঙের মুখখান৷ খুশিতে টলটল করছে। সে চড়া গলায় জবাব দিল, বারে৷ নিজের বিয়ে কবা বউকে দেখব না তো কি— আব্দার!

গোপা চোখ মটকে দূরের ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বোঝাতে চাইছিল। রমেন মস্তানের মত ঠোঁট উল্টে বলে উঠল, বয়েই গেছে— গোপা কপট রাগে জানলার দিকে মাথা সরিয়ে নিতে গিয়ে ঘোমটা গেল খসে। ওর বেলকুঁড়ি দুলটা ঈষৎ নড়ে উঠল। নরম চিবুকে ভাঙাবিকেলের রোদ গড়িয়ে পড়ে চিকচিক করে উঠল। বিয়ে হয়েছে সেই কবে। বৈশাখের শুরুতে। ছ'সাত মাস হয়ে গেল। এতদিনে দুজনে বেরুতে পারল। খবরটা শুনে অফিসের সাবরডিনেটরা বলাবলি করেছে, ছোট সাহেব হনিমুনে চললেন। বাবা গররাজী ছিলেন। ছেলের ওপর তাঁর বিশ্বাস কম। তাঁর আশঙ্কা একটাই, শেষটায় বউকে ফেলে রেখেই না ফিরে আসে রমেন। বড়দা অবশ্য হাঁ-হুঁ করেনি। বড়বউদি হেসে বলেছে, বুঝিনে ঠাকুরপো, আজকালকার হালচাল। একদিন আমাদেরও তো বিয়ে হয়েছিল। ঝুনু, বড়দার মেয়ে, বায়না ধরেছিল সঙ্গে যাবে। ভাগ্যিস সামনে ওর পরীক্ষা, তাই ছাড় পাওয়া গেছে।

একমাত্র গরজ ছিল মার। এইজন্যেই তো কবি বলেছেন, তুমিই ধন্য, ধন্য হে। মা বলেছে, ওদের দুজনের একটু নিরিবিলি হওয়া দরকার। কলকাতায় তার সুযোগ কই। গোপা কিন্তু আগাগোড়া ভাবলেশহীন ছিল। এখন দেখে মনে হচ্ছে, তলে-তলে ও-ও খুব খুশী।

গাড়ি গতি নিচ্ছে। এক একটা দৃশ্য গড়ে উঠতে না উঠতে মিলিয়ে যাচ্ছে। বড়বাড়ির মাথায় ওষুধের বিজ্ঞাপন, চিমনির ধোঁয়া, চোঙখোলার বস্তি, লেভেল ক্রসিং। রমেন হাত বাড়িয়ে দগ্ধশেষ সিগারেটের টুকরো বাইরে ছুঁড়ে দিল। তারপর ঘড়ির ব্যাণ্ড আলগা করতে করতে বলল, কি ভাবছ?

রমেনের কথায় চমক ভেঙে নড়েচড়ে উঠে গোপা বলল, নাহ্। এমনি—

বাড়ির কথা মনে পড়ছে বুঝি? এ ক'মাসে দিব্যি লক্ষ্মীবউটি বনে গিয়ে যা পপুলারিটি তোমার,— বলতে বলতে রমেন রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে শুরু করল।

বাইরে হেমন্তের আকাশ। ঘরবাড়িপুকুরবাগান ভেদ করে গাড়ি ছুটছে। গোপা ছোট করে নিশ্বাস ছাড়ল। শ্বশুরবাড়ির কথা মনে পড়তে গায়ে জ্বর এল। সকাল থেকে গভীর রাত অবধি কেবল কাজের জাল বুনে যাওয়া। প্রতিদিন একই নিয়মে। এখন বিকেল ক'টা। চারটা হবে। সুইন্‌হো স্ট্রীটের ফ্ল্যাট বাড়িতে এতক্ষণে অগ্নিকাণ্ড শুরু হয়ে গেছে। দুপুরের খাওয়া শেষ করে পা মুড়ে দু'দণ্ড বসবার পর্যন্ত ফুরসুৎ মেলেনি। মলি এলেন কলেজ থেকে। ওর জলখাবারের বন্দোবস্ত চাই। সুখাদ্য না হলে ধিঙ্গি মেয়ে নাকিসুরে কান্না জুড়ে বসবে। বড়দির চলাফেরা বারণ। আট ন'বছর বাদে ছেলেপুলে হতে চলেছে। মা নড়তে-চড়তে পারেন না। আর একটু শীত পড়লেই ছানি কাটাবেন। ওদিকে ভোলাকে দিয়ে শ্বশুরমশায় ঘন ঘন তলব পাঠাচ্ছেন। দ্বিপ্রহরিক নিদ্রান্তে হাতমুখ ধুয়ে অনেকক্ষণ হল অপেক্ষা করছেন। ঝুলবারান্দায় ডেকচেয়ারে গা এলিয়ে পড়ে আছেন। বিকেলে ওঁর সুজির পায়েস বরাদ্দ। বাটি নিয়ে ছুটতে হবে দোতলায়। পায়েসের বাটিটা হাতে তুলে দিতেই দাঁড়াতে বলবেন। তারপর কিছুক্ষণ চলবে বাক্যবর্ষণ। সংসারবিষয়ে উপদেশ-দান। ওঁর সারা দেহে তখন অতিরিক্ত বিশ্রাম-জনিত আলস্য। বকে বকে ঝরঝরে হবেন। ওদিকে রান্নাঘরে উনুনে গরম দুধ উথলে পড়ে যাচ্ছে। দিনকতক হল ফ্রিজটা চলছে না। ঠিকে-ঝি কামাই করছে। ধোপা এসে সদরদরজায় বসে আছে। এমন সময় নিচ থেকে খোকা হাঁক পাড়ল। ওর ক্লাবে যাবার সময় হয়েছে। বাবু চা চাইছেন।

বাইরের দৃশ্যে চোখ পড়তে অবাক হল গোপা। শহরের শেষ চিহ্নটুকু কখন মুছে গেছে। গাড়ি এখন প্রান্তরের মাঝখানে। বড় করে একটা নিশ্বাস ছেড়ে গোপা বুকের ভার হাল্কা করতে চাইল।

নতুন বাড়িতে এসে গোপা খুব খুশী। ঠিক যেমনটা চেয়েছিল। স্টেশন থেকে খানিক দূরে। কাছাকাছি লোকালয় নেই। বাড়িটা রমেনের অফিসের এক কলিগের। মাঝেমধ্যে তিনি সপরিবারে বেড়াতে আসেন। ফলে ছোটখাট সংসার পাতবার মত জিনিসপত্র সবই আছে। বাড়িটা দেখাশুনা করার জন্য একজন লোক আছে। নাম কাক্রু। জাতে মাহাতো। দশাসই চেহারা। ছোট বাড়ি, একটা টিলার ওপরে, বাংলো ধরনের। দুটো ঘর। একটা বেশ বড়। ছোট ঘরটা ড্রইংরুম হিসেবে চমৎকার। ঘরের চারদিক ঘিরে বারান্দা। পিছনের বারান্দার এক কোণা থেকে প্যাসেজমত খানিকটা চলে গিয়েছে রান্নাঘর বাথরুমের দিকে। প্যাসেজের পাশেই মস্ত চৌকোনো উঠোন। উঠোনের শেষে এক সার আতাগাছ। বাড়ির সীমানা ঘিরে কিছু ইউক্যালিপটাস আর ঘোড়ানিম দাঁড়িয়ে।

সামনের বারান্দায় দাঁড়ালে ভারি সুন্দর একটা ছবি ফুটে ওঠে। বাড়ির সীমানা ছাড়ালেই উঁচুনিচু জমির সার। স্থানীয় লোকেরা জমিকে বলে ডাহি। ডাহির শেষে দূরে শালবনের নিবিড় জড়াজড়ি। তার পিছনে আদিগন্ত পাহাড়। হঠাৎ চোখে পড়লে মেঘমালা বলে ভ্রম হবে। দুপুরবেলা অনেকক্ষণ ওদিকে তাকিয়ে থাকলে উজ্জ্বল রেশমী রৌদ্রে মনে হয়, পাহাড়গুলো একটু একটু করে এগিয়ে আসছে।

দুটো দিন যেতে না যেতে সব কিছু নিঁখুত করে সাজাল গোপা। একটু নড়চড় হবার জো নেই। উঠতে বসতে রমেন এখন গোপার নিয়মের অধীনে। আলনা-হ্যাংগারে জামাকাপড় ঠিক ঠিকমত সাজানো। ছোটঘরের দেয়াল-আলমারীতে রাইটিং প্যাড বই কালিকলম রয়েছে। বেতের চেয়ারদুটো মুখোমুখি বসানো, অবসরসময়ে গল্প করার জন্যে। ড্রেসিংটেবিলটা বড়ঘরে এমন জায়গায় আছে যাতে বারান্দার সিঁড়িতে পা দিয়েই চোখে পড়ে যায়। বাথরুমের দেয়ালে হোয়াটনটে পেস্ট টুথব্রাশ তেল সাবান সাজিয়ে রাখা হয়েছে। শোবার ঘরের কাচের শার্সিআঁটা জানলায় পর্দা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। বুদ্ধি করে দুটো পেতলের ভাস নিয়ে আসা হয়েছিল। ও দুটো শিয়রের কাছের টেবিলে রাখা হয়েছে। সকালবেলা বাজারফেরতা কান্দ্রু কোত্থেকে চমৎকার কিছু ফুল নিয়ে আসে। পাহাড়ী মল্লিকা মুচুকুন্দ হিমঝুরির ডাঁটি। সারারাত মিষ্টিগন্ধ ছড়ায়। গোপার শুধু একটাই আফসোশ, তানপুরাটা আনা হল না। কত করে মলি বলেছিল। শুক্লপক্ষের শুরুতে ওরা এসেছে। সকাল সকাল জ্যোৎস্না ওঠে। বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে গলা ছেড়ে গান গাওয়া যেত। একদিন মাঝরাতে ওদের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। কাচের শার্সি গলে ঘরে একরাশ জ্যোৎস্না ঢুকে পড়েছিল। ওরা দুজন আর ঘুমোতে পারেনি। দরজা খুলে উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছিল। হাত ধরাধরি করে অনেকক্ষণ পায়চারি করেছিল। ওদের কারুর মুখে কথা ছিল না। দূরে সাঁওতালপল্লীতে মাদল বাজছিল। ডাহি থেকে তিতির কেঁদে কেঁদে উঠছিল।

শেষরাতে গোপার ঘুম ভাঙে। একটু বাদেই বাইরে সকাল ফুলের মত ফুটে উঠবে। ঘরের ভেতর তখনও আবছায়া। গোপা চোখ মেলতে দেখে, রমেনের বিশাল লোমশ বুকের মধ্যে ওর মুখ ঢাকা পড়ে আছে। সারারাত তাপ দিয়ে দিয়ে রমেন এখন শান্ত, নিদ্রামগ্ন। গোপা জানে, এখন ওকে জাগিয়ে তুললে অনর্থ ঘটবে। শেষরাতের দিকে ওর ঘুম গাঢ় হয়। ডেকে তুললে শিশুর মত হাত-পা ছুঁড়ে অস্ফুট চেঁচাবে।

খুব আস্তে খাট থেকে নেমে দরজা খুলে পিছনের বারান্দায় এসে দাঁড়ায় গোপা। থামে পিঠ রেখে অর্থহীন তাকিয়ে থাকে। আকাশে তখনও গুটিকয় তারা, বাদামী রঙের আলো ছিটোচ্ছে। একটু একটু করে চারদিক ফর্সা হতে থাকে। আতাগাছের সার ঘাসঝোপ ঘোড়ানিমের জাফরি স্পষ্টতর হয়ে উঠে। এমন সময় গেটের সামনে গরুর গাড়ির চাকার বিশ্রী আওয়াজে গোপার ঘোর কাটে। এদেশে জলের বড়ই অভাব। দূরগ্রামের ইঁদারা থেকে একটা লোক জল দিয়ে যায়। কয়েক ড্রাম জল। সারাদিনের স্নান-রান্নার মত। গোপা কয়েকটা হাই তুলে আলস্য তাড়ায়। তারপর ঘর থেকে দরকার মত শাড়ি ব্লাউজ নিয়ে বাথরুমে চলে যায়।

নিরিবিলিতে এসে গোপার শুচিতা যেন বেড়ে গেছে। ইঁদারার হালকা টলটলে জল। সুগন্ধি সাবান ঘসে শরীরটা ঝরঝরে করে নেয়। সকালের দিকে বেশ শীত। তবু স্নান করে নিলে সারাটা দিন চমৎকার কাটে। রমেন বলে, আচ্ছা এখানে এসে তোমাকে এত ভাল লাগছে কেন বলো তো? গোপা উত্তর করে না। শুধু টসটসে দু'ঠোঁটের পাতা ভেঙে হাসে। ওদিকে কান্দ্রু উঠোনে দাঁড়িয়ে। হাতে থলি ভর্তি বাজার। বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। উজ্জ্বল রৌদ্রে চারদিক ঝকঝক করছে। বাজারের থলিটা হাতে নিয়ে

গোপা দু-চারটে বৈষয়িক কথাবার্তা বলে। তারপর কিছুক্ষণের জন্যে কাজের ছুটি, চলে যায় ডাহিতে। ধানকাটা শুরু হয়ে গেছে।

এরপর কাজ শুরু হল। প্রথমেই স্টোভ ধরানো। গোপা প্রতিদিন অভিনব একটা কিছু করে রমেনকে অবাক করে দেয়। গাজরের হালুয়া কড়াইশুঁটিব সিঙাড়া শালগম-লেটুস-টোম্যাটোর স্যালাড। এ ছাড়া ডিমসেদ্ধ, গরম এক বাটি দুধ তো রয়েছেই। ব্রেকফাস্টের বহর দেখে রমেন থ' বনে যায়।

সসপ্যানে জল ফোটে। ছুরি দিয়ে পেঁয়াজ কাটতে কাটতে বাইরের দিকে চোখ পড়ে গোপার। নিকোনো উঠোনে আতাগাছের ছায়াদের চঞ্চল মাতামাতি। আকাশটা কি ঝলমলে। কেউ যেন গুঁড়ো গুঁড়ো সোনা ছড়িয়ে দিয়েছে চারধারে। সতেজ হাওয়া বইছে। ইউক্যালিপটাসেব শিরশিরানি শুরু হয়ে গেল। এতক্ষণে হলুদ পাখিটা ঘোড়ানিমেব পাতার আড়াল থেকে শূন্যে ঝাঁপ দিল। রৌদ্রের শুভ্র স্রোত কেটে চলেছে শালবনের দিকে। ধীরে ধীরে গোপার স্মৃতি ঝাপসা হতে থাকে। একটা ভাব পেয়ে বসে ওকে। অনেক করেও সুইনহো স্ট্রীটের কর্মচঞ্চল বাড়িটার ছবি মনে মনে গড়ে তুলতে পারে না। দোতলাব শোবার ঘব ডাইনিং টেবিল শ্বশুরঠাকুরের মুখ—, সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যায়।

ওদিকে রমেনের ঘুম ভেঙে গেছে। হাত বাড়িয়ে দেখেছে গোপা নেই। অথচ আশ্চর্য, জেগে উঠবার আগে, অর্ধচেতনায়, তার কেবলই মনে হচ্ছিল, গোপা তাব বুক জুড়ে উষ্ণতা দিচ্ছে। মাছের পাখনার মত চিকন পায়ের পাতা ঘসছে তাব পায়ে। আর সেই মিষ্টিগন্ধটা রাতের কথা মনে কবিযে দিচ্ছে। চীনে লণ্ঠনটা ফুঁ দিয়ে নিভিযে দিয়ে কম্বলের ভেতব ঢুকবার আগে দুহাত দিয়ে মস্ত খোঁপাটা খুলে দিয়েছিল গোপা। অর্ধনিমীলিত চোখে রমেন দেখেছিল রাশি রাশি চুল ঝাঁপিযে পড়ছে অন্ধকারে। আর সেই নেশা ধরিয়ে দেওয়া গন্ধ। রমেন পাশ ফিরল। একটুবাদেই গোপা আসবে প্রভাতী চা নিয়ে। চোখ মেলতে ইচ্ছে কবছে না। খানিকক্ষণেব এই ইচ্ছাকৃত অন্ধত্ব রমেনকে মনোরম কিছু ভাববার সুযোগ দেবে।

পাথুরে মাটিতে পা দিয়েই গোপা যেন অন্য মানুষ। মাত্র সাত দিন হল ওরা এসেছে। এর ভেতরেই গোপাকে আর চেনা যাচ্ছে না। নতুন বলে মনে হচ্ছে। বাড়িব সঙ্গে মিলিয়ে ভাবতে গেলে অবাক হতে হয। ওখানে সব সময় কাজের ভিড়ে। আড়ালে আবডালে। আর এখানে এসে, এই আলো হাওয়া নির্জনতা জ্যোৎস্নায়। জমাটবাঁধা মেঘ ফিকে হয়ে যেন ঝিরঝির করে বৃষ্টি নামল। ঘরময় সে সারাদিন ছুটোছুটি করছে। আতাগাছের ছায়াদের হিলিবিলি শুরু হল, ইউক্যালিপটাস তানপুরার মত বাজছে, মহুয়াগাছতলায় রাখাল ছেলেদেব কলগুঞ্জন, দূরের পাহাড়ে রেশমী শূন্যতা কাঁপছে— এ সব কিছুর মধ্যে কার উপস্থিতি।

চায়ের কাপ নিয়ে গোপা আসছে। বারান্দায় পদশব্দ জেগে উঠতে রমেন সচকিত হল। সাতসকালে উঠে গোপার এতটা তৎপরতা অসহ্য লাগে। মোটে তো দুটি প্রাণী। রমেন সবেগে দেয়ালের দিকে পাশ ফিরল। কম্বলটা গলা অবধি টেনে নিয়ে নিঃসাড় পড়ে রইল। গোপা ঘরে ঢুকে নিঃশব্দে এগিয়ে এসে শিয়রের কাছের টেবিলে চায়ের কাপটা রাখল। ও মিটিমিটি হাসছিল। আশ্চর্য অলস হয়ে গেছে রমেন। দিনবাত শুয়ে বসে কাটাচ্ছে। এ ক'দিন একবারের জন্যে ঘর থেকে নড়ানো গেল না। ধূর্ত বেড়ালের মত শুধু ওৎ পেতে আছে। গোপাকে কাছে পেলে কেবলই দৃশ্যের পর দৃশ্য নাটক জমিয়ে তুলছে।

এই—ই—ই—, বলে মিষ্টি করে ডাকতে গিয়ে গোপা খাটের কাছে এল। তারপব ঝুঁকে পিঠে ধাক্কা মারল। রমেন তখনো নিঃসাড়। এবার গোপা খাঁটের প্রান্তে বসে পড়ল। কম্বলেব ভেতর ঠাণ্ডা হাতটা ঢুকিয়ে দিয়ে গলায় সুড়সুড়ি কাটতে রমেন চকিতে পাশ ফিরল। অব্যর্থ-ভঙ্গীতে গোপার কোমর জড়িয়ে ধরে আধো আধো গলায় বলে উঠল, হু-উ-ম্।

গোপা ওকে ঝাঁকানি দিতে দিতে গলার স্বর চড়ালো, আচ্ছা মানুষ তো। কখন আটটা বেজে গেছে। ওঠো।— রমেন গোপার কথা গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে ওর ঠাণ্ডা হাতটা ধরে টানতে লাগল, প্লিজ, ভেতরে এসো না, লক্ষ্মীটি। রমেন বিলক্ষণ জানে, প্রতিদিনেব মত আজও গোপা ওর আদর পাবার আশায় নাগালের ভেতর ধরা দিয়েছে। আর এখন, সবে বাথরুম থেকে এল, ওর ভেজা চুলে কি মিষ্টি গন্ধ, সারা শরীরে কি মাদকতা।

গোপার ঠাণ্ডা হাতটা রমেনের লোমশ বুকে চলাফেরা করছে। গোপা বলল, না, আজ আর কোনো দুষ্টুমি নয়। ওঠো দেখি।। ভাবছি আজ নদীটা দেখতে যাব— রমেন ওর কোলে মাথা রাখল। বলল, আজ নয়। আর একদিন যাওয়া যাবে। শরীবটা তেমন ভাল লাগছে না।— কান্‌হুর মুখে গোপা শুনেছিল, শালবনের ওপাশে ছোট একটা নদী আছে। পাহাড়ের গা ঘেঁষে। শান্ত নির্জন জলধারা। গাছে কতরকমের পাখিদের ভিড। কথাটা শোনা অবধি রমেনকে তাড়া দিচ্ছে গোপা। রমেন কেবলই এড়িয়ে যাচ্ছে। আজ গোপা নাছোড়বান্দা। ও সজোরে মাথা নেড়ে বলল, না, আজই যাব। আর ক'দিনই বা আছি। শেষে দেখাই হবে না—

রমেন এবার নড়েচড়ে উঠে বলল, তার মানে! আমরা এখনও তো বেশ কিছুদিন থাকব। কাল যে চিঠি পাঠিয়ে দিলাম অফিসে—। গোপার জায়গাটা খুব ভাল লেগে গেছে। যৌথ পরিবার। বাইরে বেরুনোই এক সমস্যা। গোপা এসে থেকে পীড়াপীড়ি করছে। সেইমত বমেন আরো দিনপনের মত ছুটির কথা জানিয়ে অফিসে চিঠি দিয়েছে। গোপা রমেনেব কোন কথার উত্তর না করে টেবিল থেকে কাপটা তুলে ওব হাতে দিল। রমেন কাপটা নিতে না নিতেই গোপা উঠে দাঁড়াল। দুপা পিছিয়ে গিয়ে হেসে ফেলল। বলল, ওসব কথা বুঝি না বাপু। আজই যাব। চটপট দাড়ি কামিয়ে স্নান করে নাও তো। অনেক দূরের পথ—। রমেন কিছু বলার আগেই ও বড় বড় পা ফেলে বাইরে বেরিয়ে গেল।

ডাহির পথে নামতে বেশ বেলা হল। বৌদ্রের তাত মরে গিয়ে তখন চাবদিক নিঝুম হয়ে আসছে। প্রস্তাবটা ছিল গোপার। কার্যত দেখা গেল গরজটা রমেনেরই বেশী। বারোটার মধ্যে ও জামাকাপড় পরে তৈরি। গোপাব আর হয় না। সব ব্যাপারে ওর সতর্কতা সত্যই পীড়াদায়ক। পাগলামি শুরু করে দিল। ওয়াটাববটল্, ফ্লাস্ক ভর্তি চা, তিনব্যাটাবির টর্চ, টিফিনকেরিয়ারে শুকনো খাবার-ডিমসেদ্ধ রুটি। এ ছাড়া চাদর লংকোট ভিকসের বড়ি ইত্যাদি তো আছেই। দেখে মনে হবে, ওবা বুঝি রীতিমত একটা অভিযানে বেরুচ্ছে।

ডাহির মাঝখান দিয়ে পায়ে-চলা পথ গিয়েছে এঁকেবেঁকে। কোথায় এক এক খণ্ড ধানজমি। দুএকটা মহুয়াগাছ চোখে পড়ছে। উঁচুনিচু পথে ঠিকমত এগুনো যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ হাঁটতে এক সাঁওতালপল্লীর কাছে এল ওরা। গোপা একটা ঘরের কাছে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ধানঝাড়াই হচ্ছিল ওখানে। এক টিবির ওপর দেখা গেল এক বুড়ো বসে আনমনে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। পাখি ধরবার আশায় জাল বিছিয়ে রেখেছে। কোথাও ঝোপের আড়ালে রাখাল ছেলেদের জটলা। ওদের সাড়া পেয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে।

গোপা আগে আগে চলছিল। রমেন অনেক পিছনে। ওকেই যাবতীয় জিনিসপত্র বইতে হচ্ছে। এক একবার গোপা ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল। আঁচল উড়িয়ে পশ্চাদ্‌বর্তী রমেনকে ইশারায় ডাকছিল। রমেন মনে মনে গজরাচ্ছে, দাঁড়াও, একবার শালবনের কাছে পৌঁছোই, মজা দেখাচ্ছি তোমার—। মাথার ওপরে হেমন্তের সংকেতহীন আকাশ, অকরুণ। যেন একটা প্রকাণ্ড গম্বুজেব খোল। মুখ তুলে তাকালে মাথা ঘুরতে শুরু করে। সামনেব দিকে চোখ

মেললে সেই একই দৃশ্য। উঁচু নিচু পথে চলতে দূর শালবনের এক লুকোচুরি খেলা। আর ধূ ধূ ব্যঞ্জনাবিহীন প্রান্তরে অবিরল মাঠপোকার ডাক। ক্ষীণ মন্থর। চেতনা ধূসর করে তোলে।

শালবনের কাছে পৌঁছোতে বেলা পড়ে এল। রৌদ্রে এতক্ষণ খানিক আভা ছিল। দেখতে দেখতে চারিধার মলিন হয়ে আসছে। দিনশেষের বাতাসে শালবন কাঁপছে। পাতাঝরার মত শীত পড়েনি তখনো। ফলে শালবনের নিচের দিকটা বেশ পরিষ্কার। লম্বা লম্বা গাছের অবকাশে ওপাশের অনেকটা দেখা যাচ্ছে। শালবনের পরেই খোয়াইমত বেশ খানিকটা জায়গা। তার প্রান্তে নদীর উঁচু পাড়। পিছনে বিস্তীর্ণ পাহাড়।

শালবনের ভেতরে ঢুকতেই বুকের ভেতরটা ছলাৎ করে উঠল। অসংখ্য পাখির এলোমেলো চিৎকার। অতর্কিত আততায়ীর মত অকস্মাৎ চেতনাকে স্তব্ধ কবে দিল। বনের ভেতরটা ছায়াছায়া। দিনের সঞ্চিত তাপটুকু জুড়িয়ে মাটি শীতল হয়ে আসছে। গাছের ডগায় রক্তিম আলো শেষবারের মত ছটফট করছে। গোপা অনেকটা এগিয়ে গেছে। ওকে দেখা যাচ্ছিল না। রমেন চেঁচিয়ে ডাকল, গোপা, দাঁড়াও না। কোথায় গেলে—

গোপা ততক্ষণে খোয়াইতে নেমে পড়েছে। রুক্ষ খোয়াই। শুধু কাঁটাগাছ আর ঘাসঝোপ ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। উঁচু নিচু ভূখণ্ড। যেমন স্তব্ধ উর্মিমালা। দেখে মনে হয়, বহু যুগ আগে দূরপাহাড়ের জলধারায় নিমগ্ন ছিল এই খোয়াই। চকিতে দিনের শেষ আলোটুকু নিভে যাচ্ছিল। অন্ধকার থাবা বসাচ্ছে মাটিতে। চারিধার কি শব্দহীন। আর শব্দহীন বলেই সব কিছু অন্ধকার দ্রুত বিমর্ষ হয়ে পড়েছে। এমন সময় শালবনের ভেতর আকুল ডাক শোনা গেল রমেনের। গোপা মুখ তুলে তাকাল সামনের দিকে। দেখল, নাতিদূরে নদীর উঁচু পাড় ঘেঁষে অকম্পিত বৃক্ষের সার, অন্ধকারে সমুদ্ধত। যেন এক প্রাচীন দুর্গপ্রাকারে সারিবদ্ধ প্রহরীব দল। বর্শা হাতে অচঞ্চল দাঁড়িয়ে, শত্রুর অপেক্ষায়। আর বৃক্ষরাজির ঠিক পিছনে, দুই পাহাড়ের খাঁজে ন্যাপথলিনের মত বিবর্ণ এক চাঁদ, নিটোল। গোপা ঘুবে দাঁড়াতে চাইছিল।

একটু পরেই রমেন খোয়াইতে নেমে এল। ও গোপাকে দেখতে পেয়েছে। টর্চের আলো জ্বেলে সতর্ক পায়ে রমেন গোপার কাছে এল। অন্ধকারে মুখ স্পষ্ট দেখা না গেলেও বোঝা যাচ্ছিল, ও খুব অখুশী। গম্ভীর গলায় বলল, একা একা চলে এলে। শেষে যদি তোমায় খুঁজে না পেতাম—। — গোপা ওর ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল। ওব শরীর স্পর্শ করল। কোন কথা বলল না। রমেনকে ধরে চলতে লাগল অন্ধের মত।

নদীর পাড়ে এসে ঝোলাঝুলি নামাল রমেন। বলল, সতরঞ্চিটা পাত দেখি, বসি একটু আবাম করে।— তারপর বিশ্রী একটা হাই তুলে হাত পায়ের গিঁঠ ছাড়াতে লাগল। পাহাড়ী নদী! একটা বড গাছকে শুইয়ে দিলে পারাপার করা যায়। অনেকটা খাড়ি। নিচের জলধারা চোখে আসে না। ওপারে কিছুটা পরিত্যক্ত প্রান্তর। তারপর দিগন্তব্যাপী উঁচু নিচু পাহাড়ের মৌন। বিবর্ণ চাঁদ এখন অনেকটা উঠে এসেছে। একটু একটু করে আলো ফুটছে। গোপা নিঃশব্দে সতরঞ্চি পাতল। তাবপর মুখ তুলে তাকাতে দেখল, গাছের ফাঁক দিয়ে চেরা চেরা আকাশ দেখা যাচ্ছে। কোথাও একটু বাতাস নেই, শাখাপ্রশাখার আন্দোলন নেই। এমন কি নিচের অন্ধকারে নিমগ্ন জলধারাব ক্ষীণতম শব্দও শোনা যাচ্ছে না।

· রমেন জুতোশুদ্ধ সতরঞ্চির ওপর গা এলিয়ে দিল। অন্যসময় হলে গোপা প্রতিবাদ করত। এখন করল না। বরং ওর শরীব ছুঁয়ে বসল। রমেন একটা সিগারেট ধরাল। অন্ধকারে সিগাবেটের আগুন জোনাকির মত জ্বলে জ্বলে উঠছে। বারকযেক নির্বিকার ধোঁয়া ছেড়ে বমেন বলে উঠল, ফ্লাস্কটা খোলো দেখি, চা খাই। গলাটা শুকিয়ে গেছে।— এতটা পথ হেঁটে আসবার সময় গোপাকে নিবিড় করে পাবার সংকল্প বুকেব ভেতর জমাট

বেঁধেছিল। কিন্তু, এখন পথশ্রমের পর রমেন ক্লান্ত। ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে ওর হাতে তুলে দিতে দিতে গোপা নিচু সুরে বলল, আর কিছু খাবে?—

রমেন মাথা নাড়ল, না এখন নয়। ভাল করে জ্যোৎস্না উঠুক, তারপর—। —চাঁদটা ধীরে ধীরে রূপোলি হয়ে উঠছে। জ্যোৎস্নার সর পড়ছে আকাশে। গাছের অন্ধকার শামিয়ানার তলা থেকে রমেন চেঁচিয়ে উঠল, একটা গান ধরো দেখি। শুনি—। মাটি থেকে ঠাণ্ডা ভাপ উঠছে। আলোছায়ায় মৌন পাহাড় ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। গোপা বলল, না, গান-টান নয়। একটুবাদেই উঠব। এতটা পথ ফিরে যেতে, — বলতে বলতে ওর গলায় স্বর জড়িয়ে এল। ডাহির দীর্ঘপথের ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠতে গোপা নিস্তেজ হয়ে পড়ল। রমেন চেঁচিয়ে উঠল, তোমার আর কি! দিব্যি তো এলে খোলা হাত-পায়ে। আর আমি. একগাদা মালপত্তব নিয়ে। ইম্‌পসিবল, এখন কিছুতেই যাওয়া হচ্ছে না।

রমেন অহেতুক চেঁচিয়ে কথা বলছে। গোপার অসহ্য বোধ হচ্ছিল। কেননা সেই শব্দমালা চারদিকের গভীর নীরবতায় বেসুরো লাগছিল। একসময় রমেন হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা ছুঁড়ে দিল জলের দিকে। নিঃশব্দে জুতোর স্ট্র্যাপ খুলল। গোপা হাত উঁচিয়ে তাড়াতাড়ি ওর পাঞ্জাবির এক অংশ ধরে ফেলল। দমবন্ধ করে বলল, একি! উঠলে কেন?— অন্ধকার শাখাপ্রশাখার নিচে টান-টান হযে দাঁড়িয়ে থাকা বিরাট রমেনের মুখখানা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। রমেন ততক্ষণে পাঞ্জাবির আস্তিন গুটোচ্ছে। গম্ভীর গলায বলল, বসো একটু। নদীতে নামছি। এখ্‌খুনি ফিরে আসব। — গোপার কিছু বলার ছিল, কিন্তু সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। ও শুধু ককিয়ে উঠল, ন্‌না—। — রমেন হাঁটু ভেঙে নদীর দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে। এবাব শবীরের ভারসাম্য রাখার জন্য হাত দুটো দুপাশে ছড়িযে দিল। তারপর এক পা এক পা করে নামতে শুরু করল। গোপা জড়ানো গলায় ডাকল, যেয়ো না। লক্ষ্মীটি, আমার কথা শোনো রমেন—। — এই প্রথম গোপা ওর নাম ধরে ডাকছে। রমেনের পায়ের তলায় কুচি কুচি নুড়ি বিঁধছে। শাখাপ্রশাখার আবছায়ায সামনের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। রমেনের একবার ঘুরে দাঁড়াতে ইচ্ছা করছিল। ওর ধারণা, গোপা এতক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। হাত দুটো বুকের মধ্যে জড়ো করে কাঁপছে। ভয় পেলে ওকে অদ্ভুত দেখায়। কিন্তু ঘুবে দাঁড়াতে সাহস হল না। খাড়িপথ। মুহূর্তে পা হড়কে গড়িয়ে গভীরে নেমে যাবার সমূহ সম্ভাবনা। ওপারের কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। পিছনে পাহাড়, অন্ধকারে নিবিড় হয়ে আছে। মাঝখানে শূন্যতার ব্যবধান। নিচে কোথাও নদী, শব্দহীন। শুধু অনির্দেশ পথ হাঁটা।

এভাবে কিছুটা নেমে আসার পর ভিজে ভিজে শীতলতার স্পর্শ পেতে রমেন বুঝল, সে জলধারার কাছাকাছি চলে এসেছে। আরো দুপা এগুতে জলের হদিশ মিলল। এতক্ষণে ছায়ার শাসনের বাইরে আসা গেল। এখন চন্দ্রালোকে তটভূমি স্পষ্ট। রূপোলি জলধারা চকচক করছে। রমেন অবাক চোখে দেখল এক শান্ত ঘুমন্ত নদীকে। ওর তর সইছে না। পা চালিয়ে নেমে এল জলের কাছে। তাড়াতাড়ি একটা পা ডুবিয়ে দিল জলেব ভেতর। আর সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরকার শূন্যতা ভীষণভাবে স্পন্দিত হয়ে উঠল। সাদা চোখে তাকালে নদী শান্ত, নিস্তরঙ্গ। অথচ তলে তলে কি তীব্র স্রোত। জলের টানে ঠিকমত পা রাখা যাচ্ছে না। আর কি ঠাণ্ডা, বরফের কুঁচির মত বিঁধছে। বিবর্ণ চাঁদটা মাথার উপরে উঠে এসেছে। রমেন ওপরের দিকে মুখ তুলে তাকাল। মরা জ্যোৎস্নায় জড়ানো আঁকাবাঁকা একফালি আকাশ, অনেক উঁচুতে। চাঁদটা এখন উজ্জ্বল। মস্ত রূপোর থালার মত। ওপার থেকে একটা পাহাড়েব মুণ্ডু অতিকায় জিরাফের মত লম্বা গলা বাড়িয়েছে চাঁদটার দিকে। যেন গিলে ফেলতে চাইছে চাঁদকে। আর ভয়ার্ত চাঁদ খুব আস্তে আস্তে নেমে আসছে। লুকোতে চাইছে

নদীজলে। রমেন ডাইনে তাকাল। অন্ধকার গাছের নিবিড়তায় গোপাকে দেখা যাচ্ছে না। নামবার সময় টের পায়নি। এখন এই তীব্র শীতল নদীজলে পা ডুবিয়ে রমেন বুঝতে পারছে, সে নিজের অগোচরে, নিতান্ত খেলাচ্ছলে, পৃথিবীর প্রান্ত থেকে কতটা গভীরে নেমে এসেছে। জলের ভেতরকার পা-টা ধীরে ধীরে পাঁকের মধ্যে গেঁথে যাচ্ছে। শিরা-উপশিরার ভেতর দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে। রমেন বুঝল, এইভাবে আর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে তার চোখের সামনে দিয়ে ভয়ার্ত চাঁদ পাহাড়ের মুণ্ড বৃক্ষের সার— সবকিছু একটু একটু করে ক্ষয়ে যাবে। আর সে একসময় জলের নিচেকার আলোড়নের ভেতর শীতলতার ভেতর ডুবে যাবে।

এমন সময় দূর বৃক্ষরাজির অন্ধকার থেকে গোপা 'র-মে-ন' বলে আর্ত চেঁচিয়ে উঠল। সেই চিৎকার বুকের ভেতর বিঁধে যেতে রমেন সচকিত হল। তীব্র হিম জলধারার মধ্যে নিমজ্জমান রমেনের কাছে ওই মানুষী শব্দোচ্চারণই একমাত্র অবলম্বন। এবং সেই শব্দের টানে সমস্ত নিমগ্ন আকর্ষণ থেকে নিজেকে মুক্ত করে সে উঠে এল তটভূমিতে। তারপর, বন্যজন্তুর মত চার হাত পায়ে ভর করে অতটা খাড়ি পথ ভেঙে রমেন ঠিক এসে পৌঁছুল বৃক্ষের অন্ধকার শামিয়ানার কাছে। গাছের নিচে এসে দেখল দুহাত বুকের মধ্যে জড়ো করে গোপা থরথরিয়ে কাঁপছে। রমেন এগিয়ে এসে ওর শরীর ছুঁয়ে ডাকল, গোপা—। কিছু বলার আগেই গোপা এলিয়ে পড়ল ওর বুকে।

একটু পরে রমেন নিঃশব্দে সতরঞ্চি ফ্লাস্ক লংকোট— সবকিছু গুছিয়ে নিল। তারপব ওবা দুজন ধীবে ধীবে নদীতীর থেকে খোয়াই শালবন বিস্তীর্ণ ডাহি অতিক্রম করল। এতটা পথ, ওরা সুখ-দুঃখ-চেতনার অতীত এক রহস্যময় বোধে ভর করে, যেন দুঃস্বপ্নের ভেতব হেঁটে হেঁটে, অনেক ঘুরে গভীর রাতে ঠিক সেই টিলার ওপবকার বাংলো-বাড়িতে এসে পৌঁছুল।

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙতে পাশ ফিরে গোপা দেখল, রমেন নেই। আলোয় ঘর ভেসে যাচ্ছে। বেলা আটটার কম হবে না। গোপার উঠতে ইচ্ছা করছিল না। শরীরের ভাঁজে ভাঁজে অবসাদ জড়িয়ে আছে। তবু উঠতে হল। বিছানা থেকে উঠে টলতে টলতে পিছনেব বারান্দায় এসে দেখল, রমেন ইউক্যালিপটাস গাছতলায় দাঁড়িয়ে। রৌদ্রের দিকে পিঠ রেখে সিগারেট টানছে। একবার ইচ্ছা হল ওকে ডাকবে। কিন্তু ডাকল না। বাথরুমে চলে এল। কাল রাতে ফিরে আসার পর ওরা উল্টোদিকে মুখ করে শুয়ে পড়েছিল। ও যে কখন পাশ থেকে উঠে চলে গেছে, গোপা টেরও পায়নি। এমনও হতে পারে, ওর ঘুম আসেনি। খানিক বিছানায় শুয়ে থেকে একসময় উঠে পড়েছে। দরজা খুলে বাইরে এসেছে। সারারাত বারান্দায় পায়চারি করেছে।

চোখে জল দিতে জ্বালা করতে শুরু করল। শীত শীত করছে। অন্যান্য দিনের মত প্রভাতী স্নানের কোনো প্রেরণাই পেল না গোপা। তবু, অভ্যাসবশত গায়ে জল ঢালতে শুরু করল। এক একবার আয়নার দিকে চোখ পড়তে থেমে যাচ্ছে গোপা। চোখের কোণে কালি পড়েছে। মুখভর্তি বুটি বুটি হলুদের ছোপ, যেন গত রাতের জ্যোৎস্নার আঁশ জড়িয়ে আছে। গোপা তাড়াতাড়ি সাবান তুলে নিয়ে মুখে ঘষতে লাগল। এখন সময় উঠোন থেকে রমেন বিশ্রী চেঁচিয়ে ডাকল, গোপা, এই গোপা। একবার বাইরে এসো তো, শিগ্‌গীরই—

রমেনের অতর্কিত চিৎকারে বিরক্ত গোপা সাবানমুখেই দরজা খুলে বাইরে এল। ওর সারা কাপড়ে জল। ব্লাউজটা ভিজে জবজব করছে। কপাল থেকে বুকের অনেকটা পর্যন্ত চুল এলোমেলো লেপ্টে আছে। গোপা তাকিয়ে দেখল, রমেন উঠোনের ঠিক মাঝখানে

দাঁড়িয়ে। ওর পিছনে একটু দূরে কাদ্রু। রমেনের দুহাতে দুটো মুরগি ঝুলছে। মুরগি দুটোর গলার কাছে গভীর ক্ষত। সেই ক্ষত চুঁইয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে নিকোনো উঠোনে। টাটকা রক্ত, গাঢ় লাল। কিছুক্ষণ আগে আতাগাছের পিছনকার ঘাস-জঙ্গলে মুরগি দুটো কাটা হয়েছে। এখনও ওরা প্রাণপণে হাত-পা ছুঁড়ছে। গোপা ধমকের সুরে বলল, তুমি কাটলে? আশ্চর্য! কেন, কাদ্রুকে দিলে হত না!— রমেন দুপাটি দাঁত বের করে বিস্রস্ত গোপার দিকে তাকিয়ে শরীর কাঁপিয়ে বিশ্রী হাসতে শুরু করল। গোপা তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে সজোরে দরজা বন্ধ করল। তখনও রমেনের অট্টহাসি থামেনি।

রান্না শেষ করে খেতে বসতে বেলা আড়াইটা বেজে গেল। টাটকা মুরগি। অনেকক্ষণ ধরে সেদ্ধ করেও বুনো গন্ধ ছাড়ানো গেল না। অজ জায়গা। ভিনিগার জাফরানের কথা এখানে ভাবাও যায় না। আতাগাছের ছায়ায় পাশাপাশি বসে খাবার প্রস্তাবটা ছিল রমেনের। কাদ্রু ভাল করে উঠোন ধুইয়ে দিয়েছিল। থালায় ভাত-মাংস ঢেলে দেবাব পর রমেন বায়না ধরল, নিজের হাতে করে গোপা ওকে খাইয়ে দেবে। এতে গোপার ভীষণ আপত্তি। কাদ্রু বারান্দায় বসে। ও কি ভাববে। রমেন গম্ভীর হয়ে গেল, কোন কথা বলল না। মাথা নিচু করে চটপট খাওয়া শেষ করল। শুধু উঠে যাবার সময় বলল, লজ্জাটজ্জা বাজে কথা। আসলে আমার কোন কিছুই তোমার আর ভাল লাগছে না। সে কথাটা স্পষ্ট বললেই তো পাবতে — । তারপর হন্‌হন্‌ করে বাথরুমের দিকে চলে গেল। গোপা কিছু বলার সুযোগ পেল না। ওর গলায় তখন ভাত আটকে গেছে।

হাতমুখ ধুয়ে রমেন ছোট ঘরে গিয়ে বসেছে। একটার পর একটা সিগাবেট টেনে যাচ্ছে। কাদ্রুকে খেতে দিযে গোপা রান্নাঘবে এল। অবেলায় খাওয়া হল। মাংস বয়েছে প্রচুর। ভাত হতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। ওদিকে কাদ্রু চীনে লণ্ঠনদুটো ঝেড়েপুছে পরিষ্কাব করে জ্বালিযে দুঘরে টাঙিয়ে দিয়ে এসেছে। চায়েব কাপ নিয়ে ছোট ঘবে ঢুকতে গোপা দেখল, বেতের চেয়াবে গা এলিয়ে দিয়ে রমেন বাইরের দিকে উদাস চোখে তাকিযে আছে। চায়েব কাপটা হাতে তুলে দেবার সময ও কোন কথা বলল না। গোপা যখন ফিরে যাচ্ছে তখন ডাকল, শোনো—। — গোপা ঘুরে দাঁড়াল। থমথমে গলায় বমেন বলল, আজ রাতে কিছু খাব না কিন্তু। খিদে নেই— । — গোপা বলল, সে কি! অনেকটা মাংস রয়েছে যে। তাছাড়া ভাত বাঁধলুম—। —বমেন বলল. কাদ্রুকে দিয়ে দাও। ওব ছেলেপুলেরা পেলে খুশী হবে। — গোপা এ কথাব কোন জবাব দিল না। কেননা, ও জানে, আর কিছু বলতে গেলেই অনর্থ ঘটে যাবে। বিশেষ কবে বমেনের বিশ্রী চেঁচিয়ে কথা বলায় গোপার খুব ভয়।

এরপর কয়েক ঘণ্টা,— যতক্ষণ না ভাল করে জ্যোৎস্না ফুটল, মস্ত রূপোর থালাব মত চাঁদটা মাথার ওপরে চলে এল, ইউক্যালিপটাসের শিবশিবানি থামল,— ততক্ষণ গোপা ঘর বারান্দা উঠোনময় উদ্দেশ্যহীন ঘুরতে লাগল। শোবাব ঘবে ঢুকে অনেকক্ষণ ধবে বিছানা পাতল, আয়নাব সামনে দাঁড়িয়ে পরিপাটি করে চুল বাঁধল, ফ্লাওযার ভাসেব জল পাল্টালো, পাপোশটা একবার ঘরেব ভেতর ফের বাইরে রাখল। কাদ্রুকে পোঁটলায় কবে ভাত মাংস দিয়ে ফিরে আসতে দেখল, রমেন বড়ঘরে চলে গেছে। গোপা এবার ছোট ঘরে তালা লাগিয়ে পিছনের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। গোপা খানিকটা সময় কাটাতে চাইছিল, যাতে রমেন ঘুমিয়ে পড়ে।

একসময় পা টিপে টিপে বড় ঘরে ঢুকতে গোপা দেখল চীনে লণ্ঠনটা নেভানো। জানলার পর্দা তোলা। ঘরের কিছু অংশ জুড়ে চাঁদের আলো ছড়িয়ে আছে। খাটের দিকে তাকিয়ে বোঝা গেল রমেন ঘুমোয়নি। দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে আছে মাত্র। মাঝে মাঝে সিগারেটের আগুন জ্বলছে। গোপা দরজায় খিল দিয়ে জানলার কাছে এল। পর্দা নামিয়ে

দিতে ওদিক থেকে রমেন বলে উঠল, পর্দাটা ফেলছ কেন? বেশ তো আলো আসছে।— গোপা বিছানার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, কাল রাতে ভাল ঘুম হয়নি। কি বিশ্রী জ্যোৎস্না!— রমেন কোন জবাব দিল না। সিগারেটের শেষাংশ দেয়ালে ঘষে নিভিয়ে দিয়ে গুটিসুটি মেরে পড়ে রইল।

গোপা কম্বলের ভেতর ঢুকে পড়েছে। রমেন নিঃসাড়। গোপা এপাশ থেকে ফিসফিসিয়ে উঠল, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?— রমেন উত্তর করল না। ভাবল, ঘুমুতে পারলে বেঁচে যেত সে। গোপা এবার ওর চওড়া পিঠে হাত রাখল। আঙুলের নখ দিয়ে আঁক কাটতে কাটতে বলল, একটা কথা বলব? — ওদিকে কোন সাড়াশব্দ নেই। গোপা নড়েচড়ে রমেনের কাছে চলে এল। ভাঙা-ভাঙা গলায় বলল, আমি বলছিলাম কি, চল ফিরে যাই। আর ভাল লাগছে না এখানে—। — রমেন এবার ওপাশ থেকে স্পষ্ট বলল, সে কি! তুমিই তো বললে ছুটি বাড়িয়ে নিতে। আর এখন—। গোপা ওর পিঠে মুখ লুকিয়ে বলে উঠল, কতদিন হল এসেছি। আর ভাল লাগছে না। বাবার জন্যে মন কেমন করছে। মার ছানি কাটাবার সময় হয়ে এল। বড়দির শরীর ভাল নেই। ঝুনুকে দেখি না কত দিন—! — গোপার কথা শেষ হবার আগেই পাশ ফিরে রমেন ওকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে বলল, আমারও তাই ইচ্ছে—

তারপর আর কোন কথা হল না। ওরা ক্রমশ নিবিড়তর হয়ে একাকার হতে চাইল। ওরা পরস্পর পরস্পরের বুকের ওম্ পেতে চাইল। আর তখন বাইরে মস্ত চাঁদটা একটু একটু শব্দ করে যেন ভেঙে যাচ্ছে। জ্যোৎস্নায় কুয়াশার রঙ লাগছে। ইউক্যালিপটাস আর ঘোড়ানিমের পাতায় আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে। আতাগাছের পিছনকার ঘাসজঙ্গল থেকে মুরগির পালকগুলো হাওয়ায় উড়ে উড়ে আসছে। একটা দারুন ঝড়ের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে পৃথিবী।

কাণ্ডারী

সত্যেন্দ্র আচার্য

বড় নির্জীব, ঠিক সাপের খোলসের মত এই অঞ্চলটা গেরুয়ার রঙ গায়ে মেখে চুপচাপ পড়ে আছে। রাঙামাটির বুকের ওপর ছোট্ট ছোট্ট টিলা। টিলার ওপর বনঝোপ, সবুজ। কিন্তু হাওয়ায় গেরুয়া ধুলোর পুরু আস্তরণে সবুজ গাছ নক্ষত্রের রঙ নেয়। কিছু বাড়ি চোখে পড়ে। খোলা খাপরির। মাটির দেওয়ালে নানা নকশা আঁকা এবং এসব ছাড়ালে ডুলং নদী। নদীটা যুদ্ধ শেষের ছাউনির মত। শুধু অস্তিত্বে বেঁচে আছে।

নদীব নামে ছোট্ট একটা ইস্টিশান আছে প্রায় চোখ বুজেই। দূরপাল্লার ট্রেন রাঙাধুলো উড়িয়ে চোখ বুজিয়ে চলে যায়। নিতান্ত তাচ্ছিল্যে দিনে বাতে দুবার থামে প্যাসেঞ্জাব। এই প্যাসেঞ্জারেই নেমেছিল লোকটা।

সোজা হেঁটে সামনে একটা বাড়ি পেয়ে দাঁড়াল লোকটা। দেখল বাড়িটা। গোবরমাটিব আলপনা দেওয়ালে। দরজার মুখেই বনমহিষের সিং ঝোলান। লোকটা কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। কাকে চাস বাবুজী?

লোকটা অবাক চোখে চোখ তুলে তাকাল। ভরযৌবনের দেহাতী মেয়েটা চোখ না নামিয়ে নিচু গলায় বলল, রাজবাড়ি? লোকটার উত্তরের অপেক্ষা না করেই আঙুল তুলল মেয়েটা। তারপর ঘাড় বেকিয়ে ইশারায় পথ দেখিয়ে বলল, অইদিকে।

লোকটা তবু হাঁটল না। মেয়েটিকে দেখছিল, অবাক চোখে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, মেলায় যাবি না? একটু হেসে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল মেয়েটা। যাব না কেনে, মেলা যাব, ফুল দিব মাথায়, রাজবাড়ি যাব, মাগন না আমাদেব?

ঠিক ভাদু উৎসব এটা নয় কিন্তু ভাদুর আচরণ আব লক্ষণ নিয়ে এই মাগন উৎসবটা চলে আসছে। তখন ভিন গাঁয়ের লোক নামে এই ইস্টিশানে। মেয়ে মরদ লটবহর সঙ্গে নিয়ে। ডুলং-এর রাজবাড়ি সেদিন সাজে। ফুলের সমারোহ। আলোর রোশনাই। খানাপিনা আর মাইফেল। এই গান বাজনার জমাট আসর শেষ হলে শুরু হয় ফুল খেলা। কিছু যুবক-যুবতী ফুল ছুঁড়ে ছুঁড়ে রাজার সামনে অন্তঃপুরে খেলা করে। রাজার একান্ত অনুগতরা রাজাকে তারিফ করে। নেশার পাত্র হাতে তুলে দেয় অনুগতরা। খেলা শেষ হলে দেওয়ানজী হাঁক দেন, বিল্লী, বাওয়া, নয়না —

যাদের ডাক পড়ল তারা ভাগ্যবতী। দেওয়ানজী হাঁকে, অন্যরা চলে যাও, রুক্ষ গলায় তারপর বলে, বিদায় নিস দারে। নজীর হাত থেকে। এক লোটা, এক রূপিয়া। যা—

এত গর্বের ভেতর তবু চোখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে বিল্লী, বাওয়া, নয়না? রাজার একান্ত অনুগতদের দিকে তাকিয়ে কস্তুরীর জলে ভেজানো পান তুলে মুখে পুরে দেন দেওয়ানজী। চিবোতে চিবোতে উচ্চারণ করেন যা, বাবুদের ঘরে যা। সুপরির একটা অংশ কটাং করে শব্দ তুলে ভেঙে ফেলে দাঁতের ওপর। বলে, সারা রাত্তির সেবা দিবি, না চাইলে যেচে দিবি, মাঝের পায়ের কাদা নিবি, যা।

আলোর ভেতর দাঁড়িয়ে কালো কালো দাঁতে শব্দ না তুলে হাসে ওরা। নয়নাও হাসে। সেই সকালের দেখা লোকটার দিকে চোখ তুলে তাকায়। তাকিয়ে বলে, ধরম লিবি, শরম লিবি আর লিবি কি, মাগন বিবির সঙ্গ আছে, রাজার আছে কী?

রাজা তখন বেহুঁশ। সত্যিই রাজার আজ কিছুই নেই। নিতান্ত উৎসব, তাই আসে, নইলে কলকাতায়। যুবরাজ এখনো যুবক নয়। আসেও না।

লোকটা রাজাকে কতদিন বলেছে, এই উৎসবের কোন মানে নেই রাজা। তুলে দিলে হয় না?

রক্তে, আভিজাত্যে বাধে রাজার। বলে, পূর্ব পুরুষের রক্ত আমার গায়ে। মাগন প্রথা তোলা কী যায়?

যায়।

না। রাজা গর্জায়। দম্ভভবে পায়চারি করেন মেঝেব ওপর। বলেন, প্রথাকে বাতিল কবে দেব, এত বড় স্পর্ধা আমার নেই, তুমি কাফের।

লোকটা হাসে। তবুও একান্ত অনিচ্ছায় এই প্রথম এসেছিল উৎসবে। সকালের প্যাসেঞ্জারে নেমেছিল, গা-গতর ক্লান্ত। সূর্য সবে উঠেছিল। স্টেশনের অনেক আগে থেকেই সবুজের সমারোহ শেষ। প্রান্তর ধূ ধূ। মাঝে মাঝে ছোট ছোট অই বনঝোপ। রুক্ষ মাটিব বুকে অনেক সন্তর্পণে যেন দাঁড়িয়ে হাওয়া দিচ্ছিল। লোকটা ট্রেন থেকে নেমে হকচকিয়ে চাবিদিক দেখছিল। হাওয়ায় এখনো শীতের রেশ স্পষ্ট নয়। পাখির ডাক কানে এল না। উড়ন্ত পাখির ঝাঁক চোখে পড়ল না লোকটার। কিন্তু সামনেই অই বাড়িটা পেয়ে গেল। দাঁড়াল। আর দাঁড়াতেই অই চোখাচোখি। মেয়েরা বলেছিল, রাজবাড়ি?

সে। এখন লোকটা চোখ নামিয়ে নিতে আবার হাসল মেয়েটা। চ।

বিল্লী কিন্তু বেঁকে বসে। উঁহু। তবু হাত ধরে টানে তবলচি। চ—

ক্যানে? হাসিতে গড়িয়ে পড়ে বিল্লী। ধরম দিব, শরম দিব। দাম বাড়ায়।

দেওযানজী গর্জায। বিল্লী উত্তুঙ্গ বুকের ওপর লাল পাড় শাড়ি আরো শক্ত করে জড়ায়। পিটের দিকে ঝুঁকে পড়া ঝুলন্ত আঁচলটা কোমরের সঙ্গে জড়িয়ে জড়িয়ে জোর করে বাঁধে। তারপর বলে, আচ্ছা, চ—

লোকটাও পিছু পিছু এল নয়নার। একটা ঘরে এসে বলল, তুই নতুন গো বাবু। আমি কিন্তু পুরনো এ বাড়িতে। তারপর হাসল ভঙ্গি করে। হেসে বলল, বাড়ি আমার কাছে পুরনো হলে হবে কি, আমি কিন্তু আনকোরা।

তবু লোকটা কথা বলছিল না। সারাদিন ঘুরেছে বাড়িটা। অঞ্চলটা। মেলা দেখেছে। রাজপ্রাসাদ। সারা সন্ধ্যা নদীর চরে বসেছিল লোকটা। বসে বসে দেখেছে সন্ধ্যা নামল। অস্পষ্ট হল আকাশ। রাঙা ধুলোর চত্বর অন্ধকারে একাকার হয়ে গেল। মেলা ভাঙলো। উড়ো পাখির ঝাক, নদীর বাঁক পার হয়ে, রাজপ্রাসাদ পার হয়ে উড়ে কোথায় চলে গেল।

নয়না বলল, কি ভাবিস? খাটিয়ার এক কোণে বসে পড়ে বলল, বসে নে ত নে। মাঝ আকাশে তারা ঢলে পড়লে আমি কিন্তু ঘুমোবো।

লোকটা কোন আগ্রহ না দেখিয়ে তেমনি চিৎ হয়ে শুয়ে থেকেই বলল, নয়না এ বাড়িতে আর কে আছে রে।

বাব্বা! নয়না জিবের ওপর শব্দ তুলল একটা। সব কিছু তোকে জানতে হবে। তারপর পা নাচাতে নাচাতে বলল, তুই কেমনধারা মরদ গো? নয়না এবার পায়ে হাত রেখে বলল, আচ্ছা, কামে কাটে না তোরে? তারপর হাসিতে ঢলে পড়ে হেঁট হয়ে বুকটা ছোঁয়াল পায়ে। তবে আমি ঘুমোই।

নয়না খাটিয়া থেকে নেমে মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে কাপড়টা খুলে ফেলল। ছোট সায়াটা কোমর কামড়ে ধরে হাঁটুর নিচে পর্যন্ত ঝুলছে। পা দিয়ে অন্ধকারেই মেঝের ওপর বিছিয়ে নিল কাপড়টা। কুঁকড়ে ধনুক হয়ে শুয়ে আঙুলের সাঁড়াশি দিয়ে বারবার পা পর্যন্ত কাপড়টা টানবার চেষ্টা করল নয়না।

নয়না। লোকটা এবার ডাকল, নয়না মেঝের ওপর শুয়ে পড়লে?

নয়না উঠল না। বলল, কি বলিস।

পাপ বুঝিস, পাপ?

নারে। নয়না জবাব দিল। বুঝিনে।

পুণ্য?

পুণ্যি? নয়না এবার আড় হয়ে শুয়ে উত্তর দিল, বুঝি না ক্যানে?

লোকটা আর কিছু বলল না। এক সময় অনুভব করল নয়না ঘুমিয়ে পড়েছে। অন্ধকারে বুকের ওঠানামা লক্ষ করা যায় না কিন্তু অনুভবে বুঝল নয়না জেগে নেই। সমস্ত রাজবাড়িটা এখন নিঝুম। উৎসবের আমেজ বুকে নিয়ে গোটা বাড়িটা নিঝুম হয়ে আছে, পাথর হয়ে গেছে।

বাইরে এল লোকটা। ওপরে অজস্র নক্ষত্র। প্রেতের মত এ-ঘর থেকে ও-ঘর ঘুরে বেড়াল লোকটা। শেষ রাতের এই হাওয়ায় শীত। শিশির জমেছে রুক্ষ মাঠে। মাটি ভিজেছে। দূরে কোথাও কোন শব্দ নেই। শুধু রাজার ঘরে বাতি জ্বলছে।

বেশ বেলা করেই ঘুম ভাঙলো নয়নার। আলো এসেছিল ঘরে। হাই তুলল। পাশ ফিরল। ফিরেই চোখে পড়ল খাটিয়াটা। লোকটা নেই।

আস্তে আস্তে প্রাণের সাড়া অনুভব করল ঘুমন্ত এই প্রেতপুরীতে। অবাক চোখে হকচকিয়ে তাকাল চারিদিক। তারপর শাড়িটা পরে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। এ বাড়ির প্রতিটি অঙ্গ -প্রত্যঙ্গ নয়নার চেনা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দক্ষিণে তাকাল। কয়েদখানা। জীর্ণ দরজা হাঁ হয়ে আছে। উত্তরে চিড়িয়াখানা ছিল আগে। এখানে দাঁড়িয়ে জন্তুদের নিঃশ্বাস এবং গর্জন অনুভব করতেন পূর্ব পুরুষরা। আজ কিছু নেই।

নয়না কয়েক সিড়ি নেমে আবার দাঁড়াল। তারপর একেবারে উঠোনে নেমে এল। না কোথাও নেই লোকটা। বাঁদিকে ঘুরে নয়না এসে দাঁড়াল মন্দিরের চাতালে। না বন্ধ দরজা।

চাতালে বসল নয়না। রাজবাড়ির সামনে ঐই ভগ্ন নহবতখানা থেকে একটু দূরে বিস্তৃত খোয়াই। খোয়াই যেখানে শেষ, সেই শেষ চিহ্নের ওপর পাহাড়ের রেখা। পাহাড় নয়। টিলা। লোকটা রাত্তিরে ঐই দিকে তাকিয়ে বলেছিল, আচ্ছা, এই ফুলখেলা উঠে গেলে তোমরা খুশী হও না?

না। অতশত বোঝেনি নয়না। উত্তর দিয়েছিল।

কেন? লোকটা বেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার প্রশ্ন করেছিল।

অতশত না বুঝেই নয়না উত্তর দিয়েছিল, তোর সহ্য হয় না?

না।

না ক্যানে? নয়নার ঘুম পাচ্ছিল। ঘন ঘন হাই তুলছিল। মশা তাড়াচ্ছিল অন্ধকারে চাপড় মেরে মেরে।

ওমনি করে বেঁচে আছিস বলে?

বলে কি লোকটা? নয়না প্রথমে হাসতে গিয়ে থেমে গিয়েছিল। তারপর কি একটু ভেবে নিয়ে হাসিতে ফেটে পড়ে বলেছিল, জিন্দারে জিন্দা। লোকটার হাতটা টেনে নিয়ে বুকের ওপর ছুঁইয়ে বলেছিল, দ্যাখ না বেঁচে নেই? কলজের ভেতর পরাণটা তোর সঙ্গে বসবার জন্যে হাহুতাশ করছে না?

লোকটা হাত সরিয়ে নিয়েছিল। নয়না দম্ভভরে খাটিয়ার ওপর থেকে উঠে এসে মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে সায়াটা খুলে ফেলেছিল। শুয়ে পড়ে বলেছিল, তবে আমার ঘুম পাচ্ছে, ঘুমোই।

নয়না এই মন্দিরের চাতালের ওপর এখন বেশ আরাম করে বসল। বসে বসে ভাবল এই নিয়ম, এই প্রথা। কবে এ নিয়ম চালু হয়েছিল, নয়না অতশত বোঝে না। জানে না। শুধু রূপকথার গল্পের মত জানে সে, দশ পুরুষ আগে রাজার মেয়ে অকালে মারা গেলে তাকে স্মরণ করেই এই উৎসব। নয়নার মা-ও নয়নার মত কাঁচা ছিল একদিন। নয়নার মত ফুল খেলত। তিনদিন আগে থেকে মহলা দিত তখন রমণীরা। বারটি মেয়ে ছ'জোড়া পুরুষ-রমণীতে বিভক্ত হয়ে নকল খেলা খেলত। ফুল ছুঁড়ে মারত। অভিনয়ের পুরুষ মেয়েটা প্রকাশ্যে চুম্বন করত। খেলতে খেলতে এক সময় হাত ধরে বিবস্ত্র করে দিত।

একদিন ফুল খেলার শেষে এক মরদ দেওয়ানজী নয়নার মাকে বলেছিল, চল চলে যাই।

কোথায়?

রাজার এই পুরী থেকে দূরে। অন্য কোথাও।

নয়নার মা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল।

কোথায়? দেওয়ানজী কমলির কথাটাকে উচ্চারণ করেছিল। করে বলেছিল, অনেক দূরে অই পাহার পেরিয়ে। দুজনে থাকব। ঘর বাঁধব।

কেন এখান থাকলে?

কঠোব হল দেওয়ানজী। আমার চোখের ওপর তুই ফুল খেলবি আমি দেখব?

ছিঃ ছিঃ বলিস না। দেওযানজীর মুখে কমলি হাত চাপা দিয়েছিল। উৎসব না আমাদের। মাগনঠাকরণ সগ্‌গে বসে বাগ করবে। —এ গল্প কমলি বৃদ্ধ বযেসে কতবাব শুনিয়েছে নয়নাকে।

এসব ভাবনার ভেতর নয়নাব এখন মনে হল লোকটা তবে গেল কোথায়? নয়না পড়শীদের জিজ্ঞেস করলে কেউ বলল, এই ত ছিল। কেউ বলল, নহবত ঘবে একটু আগেও বাঁশী শুনছিল। দূরেব খোযাই-এ কারো ছায়া নেই। না, পাহাড়েব দিকে কেউ হেঁটে যাচ্ছে না। তবে গেল কোথায়? নয়না শুধু এই একটা প্রশ্ন নিয়েই ঘরবার করল।

অথচ লোকটা একদিন এল। এই রাজবাড়ি দেখতে। এই রাজবাড়ির বয়েস তখন আরো পঁচিশ বছর বেড়ে গেছে। উৎসব বেঁচে আছে। প্রথাও বেঁচে আছে। লোকটা নিজের বয়েস হিসেব করে দেখল, এখন সে পঞ্চাশের কাছাকাছি। বাজা মাবা গেছে। যুবরাজ ফুল খেলে এখন। নিজেই অবাক হল, প্রায় পঁচিশ বছর আগে এ বাড়িতে একবাব এসেছিল সে।

এখন লোকটার মাথায় জটা। একটা ঝোলা কাঁধে, হাতে লাঠি নেই। একটা চন্দনা পাখি কাঁধেব ওপর বিনা শিকলিতে বসে। লোকটা বাজবাড়ির চত্বরে দাঁড়িয়ে বাড়িটা নিরীক্ষণ কবল। বাড়িটা আরো জীর্ণ। আরো যেন কংকালসার। তারপর ঝোলা থেকে সিঙা বার করে তিনবার ফুঁকল। সকলে ঘিরে দাঁড়াতে লোকটা বলল, আমি দেবতা নই, মানুষ। আমি সন্ন্যাসী নই, রাজার আত্মীয় নই, তোদের একজন।

এই অদ্ভুতবেশী লোকটাকে দেখতে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল সকলে। পরনে ময়লা হাঁটু-ছুঁই ধুতি। গায়ে একটা হাত দুই চাদর। অথচ কী সুঠাম চেহারা। ঋজু, গৌরকান্তি এই লোকটার পায়ে হাত দিয়ে কেউ কেউ প্রণাম করছিল। কেউ দূরে দাঁড়িয়ে ভক্তিভরে হাতজোড় করছিল।

লোকটা আপত্তি করছিল। না না, পায়ে হাত দিতে নেই। মাথা নোয়াবে কেন? লোকটা মৃদু মৃদু হাসছিল। মেরুদণ্ড সোজা রাখ।

লোকটাকে হকচকিয়ে দেখল লোকে। কথা শুনছিল আর অবাক হচ্ছিল। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখ, আত্মশক্তিকে দৃঢ় কর, কুসংস্কার যম, কুপ্রবৃত্তি রাবণের গদা। তারপর এক সময় বলল, কাল তোদের উৎসব না? মাগন না?

বিগ্রহের ভাঙা দেউলে বসান হল লোকটাকে। দুধ দিয়ে পা ধুইয়ে দেওয়া হল। হবিষ্যান্নের সমস্ত যোগাড় করে সিধে পাঠিয়ে দিলেন যুবতী রানী নিজে।

লোকটার মুখে কিন্তু অই একই কথা। না না আমি কোন দেবতা নই, মানুষ। দেবতা যা পারে না, দ্যাখ মানুষ তা পারে। লোকটা কাঁচা চাল মুঠো মুঠো করে খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করল। দেখছিস ত কোন অলৌকিক ক্ষমতা আমার নেই। শুধু ইচ্ছাশক্তি। আত্মশক্তি। যে শক্তিতে মানুষ অলৌকিক হয়।

মৃদু হাসতে হাসতে চন্দনা পাখিটার চোখে এক একবার তাকাচ্ছিল। দ্যাখ আমি ব্যবসায় জানি না। যাগযজ্ঞ আমি শিখিনি। তাই ভক্ত আমার জোটেনি। আমি একা। তাই আমাব কথা কেউ শোনে না। সমবেত কণ্ঠে না বললে এতবড় অট্টালিকে পার হয়ে রাজার কানে সব কথা যাবে রে?

লোকটার প্রতি শ্রদ্ধা আসছিল সকলের। দেবতা ভাবছিল। সন্ধ্যা নামছিল। ভাঙা দেউলের বাইরে ও আশ্রয় নিল। ঝোলা গোছাল। চন্দনা পাখি রাখল। রেখে বলল, দ্যাখ না, পাখিটা আমায় কত ভালবাসে?

লোকে দেখছিল।

কোন শিকলি আছে পায়ে? বাঁধা আছে?

সকলে তাকালে লোকটা বলল, উত্তর ত সোজা রে, দুই আর দুই-এ চারের মতন। আমিও বাসি বলে?

আবার মৃদু মৃদু হাসল লোকটা। হেসে বলল, এ বাসা ভয়েব নয়, ভক্তিরও নয়। ভালবাসার জন্য ভালবাসা। বাস না তোরা।

অবাক চোখে শুনছিল। দেখছিল লোকটাকে।

দেখবি সব কেমন জাদু হয়ে যাচ্ছে। দেবতাকে ভালবাসি ভয় করি বলে, বুঝিস না?

যত শুনছিল, লোকগুলো তত অবাক হচ্ছিল।

তারপর বেশ জোরে একটু ক্লেশে নিয়ে বলল, তোরা প্রথাকে ভালবাসিস, রাজাকে কি ভগবানকে ভয় করিস বলে। আবাব হাসল মৃদু। বলল, নিজেকে ভালবাস, শ্রদ্ধা কর, দেখবি কুসংস্কার, কু-প্রথা কোথায় সব হারিয়ে গেছে। না না, এবার তোরা আমায় ঘুমোতে দে। যা যা—

সকাল হতেই বেরিয়ে গেল লোকটা। বাঙা ধুলোর ওপর দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে কখনো হাঁটল। কখনো দাঁড়াল। উদাস তাকাল ধূ ধূ প্রান্তরে। তারপর এক সময় ঘোড়া ঘরের সামনে এসে হকচকিয়ে গেল।

একটা দেহ শুয়ে আছে। সারা দেহ বসন্তে ভর্তি। লোকটা বুঝল গুটি বসন্ত। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে কখনো কখনো, উঠে বসতে চাইছে। সারা দেহটা টেনে টেনে একটু তুলছে, আবার নেশাগ্রস্তের মত ঢলে পড়ছে। লোকটা পাশে দাঁড়িয়ে সন্তর্পণে ডাকল, নয়না?

কে? ঘোলাটে চোখে নয়না তাকাবার চেষ্টা করল, করে বলল, একটু জল খাব।

লোকটা জল আনল। জল দেবার আগে কপালে হাত রেখে বলল, আমি।

প্রায় প্রৌঢ়ত্বে এসেছে নয়না। জীর্ণ দেহ। মাথার চুল কিছু পেকেছে। মুখে চোখে বয়েসের চিহ্ন বেশ স্পষ্ট। মাথায় হাত রেখে লোকটা বলল, চিনতে পার?

মাথা নাড়িয়ে নয়না বলল, না।

কষ্ট হচ্ছে?

নয়না চুপ। চোখ বুজে অনেকক্ষণ পড়ে থেকে বলল, না।

জল খাও। লোকটা অনেক সন্তর্পণে গালে জল ঢেলে দিল। আড়ষ্ট জিব, জল গিলতে কষ্ট হচ্ছিল নয়নার। একটা চাটাই-এর ওপর নয়না শুয়ে আছে। সারা অঙ্গ গুটিতে ছেয়ে। কিছু ফেটেছে। রস গড়িয়ে পড়ছে।

নিজের বসনের খানিকটা ছিড়ে রস মোছাল লোকটা। মাছি তাড়াল। আলতো দেহটা তুলে ধরে ছেঁড়া টেনা খানিকটা পেতে দিয়ে বলল, শোও। আমি আসছি।

লম্বা লম্বা পা ফেলে আবার ঘুরল লোকটা। শুকনো গাছ-গাছালির ডাল ভাঙল। কাঠ সংগ্রহ করল। শক্তিমান পুরুষেব মত নিজের মাথায় করে বয়ে এসে দেহটার অনতিদূরে আগুন জ্বালাল।

নয়নার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লে লোকটা একটা দীর্ঘশ্বাস তুলল। তুলে বলল, ছিঃ, কেঁদ না। আগুনের তাপ স্তিমিত হয়ে গেলে শুকনো পাতা ছুঁড়ে দিল। একটা কাঠ সেই আগুনেব ভেতর গুজে দিল। তুমি ভাল হয়ে যাবে।

লোকটা দেবতা। সারা গ্রাম রটে গেল। কেউ অই বয়েসে নিমগাছের মগ ডালে উঠতে দেখেছে বলল। কেউ বলল, মাথায় রাশীকৃত কাঠ নিয়ে নদী পার হয়ে এল, পায়ে এতটুকু জলেব দাগ পর্যন্ত লাগল না। কেউ বলল, বান মেরে পোকা মারছে ঝুড়ি ঝুড়ি। শুধু আগের চেয়ে একটু সুস্থ হয়ে নয়না বলল, তুমি কে, আমি কিন্তু এখনো চিনতে পারিনি।

তুমি নয়না। আমি কিন্তু চিনেছি।

তুমি দেবতা। যেন নেশার ঘোরে অইটুকু বলে নযনা পাশ ফেরবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না।

আমি মানুষ। লোকটা আবার মাথায় হাত রাখল। তুমি ঘুমোও। নিমের কচিপাতা সারা দেহে বুলিয়ে বুলিয়ে স্বস্তির পবশ দিল। নয়না ঘুমিয়ে পড়ল।

দিন গড়িয়ে এখন বিকেল। শুকনো চাল, ফলমূল খাওযাল চন্দনাকে। তারপব পাখিটাকে পাশে নিয়ে বসে ভাবল লোকটা -

এই সুদীর্ঘ দিন ঘরছাড়া। গোটা পঁচিশ বছর ধরে সাবা ভাবতবর্ষ ঘুবেছে। দেখেছে অনেক। অনেক অভিজ্ঞতা জড়ো হয়েছে এই পঞ্চাশ বছরের জীবনটাতে। দেখেছে বেগার প্রথা। খেতখামারেব দাযিত্ব নিয়ে যে লোকটা অন্ন সংগ্রহ করে সংসারেব, সে প্রভু সেবা করে মাসে অন্তত একদিন। প্রভু অতিথি হন বাড়িরে। যুবতী স্ত্রী অথবা কন্যা তাঁকে সেবা করেন দেহ দিয়ে।

এই লোকটা রুখে দাঁড়িয়েছিল। বুঝিয়েছিল, এ পাপ, এ অন্যায়। প্রহাব দিয়ে প্রভুব ভৃত্যই গ্রামছাড়া করে দিল।

দেখেছে নর্মদা ঝরনায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা। স্বর্গ লাভের বাসনায়।

রুখে দাঁড়িয়েছিল লোকটা। স্বর্গ নেই। এই বোধ অন্ধত্ব। এই অজ্ঞতা অক্ষম পিচুটিব মত। রাতের অন্ধকারে এই বাসনাব মৃত্যু তবু কমেনি।

দেখেছে সতীদাহ নিম্ন এক শ্রেণীর জাতেব ভেতর। মা-এব পুণ্যকামী দেহাত যুবক সহায় সম্বলহীন অশীতিপর বৃদ্ধাকে টাকা দিয়ে কেনে। তাবপর মা-এর বেনামীতে পিতার শ্মশান চুল্লীতে এখনো বেঁধে পুড়িয়ে মারে। লোকটা রুখে দাঁড়িয়েছিল। পুড়িয়ে মারবে বলে ধবতে গিয়ে লোকটাকে খুঁজে পায়নি।

প্রথা-সর্বস্ব এই সংস্কার পাপ। মুক্তি চাই। আত্মার মুক্তি। বিবেকের বিকাশ চাই। ইচ্ছা শক্তিকে প্রবলতর কর। কেউ শুনল, কেউ শুনল না। কেউ বলল, পাগল। কেউ কেউ গুন গুন করল লোকটা দেবতা।

এই ভাবনার সুতো ছিঁড়ে গেল, কারণ লোকটা এখন দেখল। নয়নার গলা দিয়ে কেমন একটা ঘড় ঘড় শব্দ উঠছে।

লোকটা তাকাল দূরে। সন্ধ্যা অনেক আগেই নেমেছিল। ঠাণ্ডা থেকে আগলহীন ঘরের ভেতর কোলে করে নিয়ে গেল অচৈতন্য নয়নাকে। ঘরের ভেতর থেকে বাইরে তাকাল লোকটা। দূরের মাঠ পার হয়ে টিলা। তার ওপর চাঁদের রেণুকণা ছড়িয়ে পড়েছে। রাজবাড়ি মুখর হয়ে উঠেছে আস্তে আস্তে। ধূপের গন্ধ, আতরের মাতাল সুবাস মিলেমিশে একাকার। বাতাসে জড়িয়ে আছে। লোকটা ভাবল, হয়ত এ-মুহূর্তে রাজার অনুগতদের হাতে ফুল। রাজগৃহের প্রমোহ উৎসবে যুবতীরা ব্যস্ত। মাগন উৎসব আরম্ভ হবে যুবরাজ বাজুবন্ধ পরে উৎসবে এসে দাঁড়ালেই।

শুকনো চাল, জল আর কলা চিবিয়ে চিবিয়ে লোকটা রাতের আহার অনেক আগেই শেষ করেছিল। উঠে গিয়ে পাখিটাকে ঝোলার ভেতর সযত্নে শুইয়ে রেখে নয়নার পাশে এসে বসল।

দেখতে দেখতে রাতের আঁধার সব কিছু গ্রাস করে নিল। চাঁদ ডুবে গেল। নক্ষত্রের আলো আরো যেন মরে এল। লোকটা এখন বাইরে আকাশে তাকিয়ে বুঝল, মাঝরাত পার হয়ে গেছে। আগলহীন দরজার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে বুঝল, একটা ছায়া যেন এদিকে আসছে।

কে? লোকটা উঠে বসল। শেষ বাতিটা জ্বলতে জ্বলতে প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। বাইরে কাঠের আগুন প্রায় নিবু নিবু। তবু যেটুকু জ্বলছিল তার অস্পষ্ট আলোয় কোন রমণীর ছায়া বলে মনে হল।

ভূত প্রেত কোনদিন বিশ্বাস করেনি লোকটা। বাইরে এসে দাঁড়াল। ছায়া এগিয়ে আসছে।

ছায়াটা এল। সর্বাঙ্গ চাদরে মোড়া। এই প্রথম ভয় পেল লোকটা। গলা ছেড়ে চিৎকার করতে গিয়েও থেমে গেল। তারপর ভাঙা গলায় জড়িয়ে জড়িয়ে অস্পষ্ট উচ্চারণ করল, কে, কে তুমি?

কোন উত্তর নেই।

কে? প্রায় চিৎকার করে উচ্চারণ করল লোকটা।

চাদর খুলে এবার সামনে দাঁড়াল ছায়াটা। অস্পষ্ট আলোয় যতটুকু প্রত্যক্ষ করা চলে, সেই আলোয় দেখল লোকটা, ছায়া নয়, একজন রমণী। রমণী প্রণাম করল লোকটাকে।

কে তুমি? এবারে অনেকখানি সাহস আনল গলায় লোকটা।

তবু কথা নেই। আরো কাছে সরে এল লোকটা। রমণী এবার বুঝল লোকটা তাকে দেখছে। নিরীক্ষণ করছে। শুধু বলল, আপনি দেবতা, তাই এলাম।

না না আমি মানুষ। ঠিক বিনয় নয়, যথাসম্ভব কর্কশ উচ্চারণ করল। আপাদমস্তক আবছা অন্ধকারে প্রত্যক্ষ করে বলল, আমি মহাপুরুষ নই, কেন বিশ্বাস করে না লোকে?

আমি অসহায়। রমণী স্থির দাঁড়াল লোকটা সামনে। বলল, আপনি জলের ওপর দিয়ে হাঁটতে পারেন আমি শুনেছি। আপনি হাত বাড়ালে গাছের ডাল নুয়ে আসে। আমাকে বাঁচান।

বল। লোকটা এবার সোজা হয়ে দাঁড়াল।

আমি রাজার বংশধর চাই। একটু থেমে মাথা নিচু করে বলল, রাজা অক্ষম, অথচ আমার সন্তান না হলে এই প্রথা উঠে যাবে। উৎসব উঠে যাবে। এই পাপের দায়ভাগ নিয়ে প্রজাদের কাছে কী করে আমি মাথা তুলে দাঁড়াব?

সব নিঝুম। সমস্ত পৃথিবীটা যেন এই রাজপুরীকে কোলে নিয়ে আশ্চর্য একটা ঘুমে ঢলে আছে। এই প্রথম পাশে কোথাও কামিনী গাছে ফুল ফুটেছে বলে মনে হল লোকটার। সুন্দর

গন্ধ অনুভব করে বুঝল রমণী যুবতী। পূর্ণ যৌবনবতী। রমণী এখন আরো কাছে এল। মুখাবয়ব ভাল করে চোখে পড়ছে না। তবু আশ্চর্য সুন্দরী বলে মনে হয় লোকটার।

আপনি মুখ তুলে চান ঠাকুর। চাদরের এক কোণের গিঁট খুলে রমণী এবার দেখল বাইরেটা। তারপর বলল, এই নিন পুষ্প, আমাকে ছুড়ে মারুন। আমাকে গ্রহণ করুন।

লোকটা তবু কোন আগ্রহ দেখাল না।

আপনার সেবাব জন্য এই রাত্তিরে এই বিরাট সমুদ্দুর পার হয়ে আপনার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি।

দিনের আলোয় কামিনীর ঝোপ কি ফুল, অত চোখে পড়েনি লোকটার। এখন বুঝল ফুলে ফুলে ভর্তি গাছগুলো। এতক্ষণ কোন পাখির ডাক লক্ষ করেনি লোকটা। এখন বুঝল, এই রাতে কোন না-ঘুমের পাখির ডাক শুনতে পাচ্ছে। ডাকছে। তারায় তাকালো লোকটা। জ্বল জ্বল করে তারাগুলো জ্বলছে। অস্পষ্ট আলোয় সব কিছু কেমন সুন্দর বলে মনে হল লোকটার। রমণী এবার মধুর গলায় বলল, উৎসবকে বাঁচান ঠাকুর। আপনি দেবতা। মাগনকে বাঁচান।

এতক্ষণ স্থির দাঁড়িয়েছিল লোকটা। কেমন চঞ্চল হল এখন। বার বার শরীরে তাকাল। মুখাবয়ব লক্ষ করতে চাইল। রমণী এবার স্পষ্ট গলায় বলল, তুমি তো দেবতা, এতটুকু করুণা নেই?

না না আমি মানুষ। লোকটা বাধা দিল।

তবে দয়া নেই কেন শরীরে? এবারে কঠোর হল রমণী।

লালসা, লালসা, এই প্রথম একটা কেমন লালসা অনুভব করল মানুষটা! তারপব ত্রস্ত পায়ে ভেতবে ঢুকে গেল। লজ্জায়, অভিমানে রমণী আর দাঁড়াল না।

ত্রস্ত পায়ে ভেতরে ঢুকে বাতিটা ফুঁ দিয়ে নিবিযে দিল। নয়নার মৃতদেহটা একটানে দেওয়ালের দিকে সরিযে দিযে মুখ বাড়িয়ে ভাঙা গলায় ডাকল, কই এস।

কেউ এল না।

রোদের অন্ধকারে বৃষ্টি

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

অন্ধকার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আগুনের লকলকে শিখাটাও ক্রমে নিভে যাচ্ছে। লাল আলোয় উদ্ভাসিত অরণ্যশীর্ষ আবার অন্ধকারে ডুবে গিয়ে আকাশের নীচে একটা জমাট কালো পাহাড়ের মাথা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শব্দ, সোরগোল এ সব কিছুই এখন নেই। আর্তনাদও নয়। একটা নতুন শব্দের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে লায়লি। ট্যা-ট্যা-ট্যা-ট্যা। শিবানী বলেছিল, ওটা বন্দুকের শব্দ। শিবানীর ভাই নরহরি বলেছিল, দূর বোকা, ওটা বন্দুকের শব্দ নয়। বন্দুকের শব্দ হয় গুড়ুম, গুড়ুম। সেবার মেঘনার চরে বালিহাঁস মারতে গিয়ে বন্দুক ছুঁড়েছিলাম, তোর মনে নেই?

লায়লি বলেছিল, শব্দটা তাহলে কিসেব?

লায়লির ভাই জাকারিয়া, সংক্ষেপে জ্যাক এক সময় ক্যাডেট কলেজের ছাত্র ছিল। সে বলল, সাব মেশিনগান, মর্টারের শব্দও শুনছি মাঝে মাঝে। এ ছাড়া পাহাড়-কাঁপানো যে শব্দ হচ্ছে থেকে থেকে, তা খুব শক্তিশালী এক্সপ্লোসিভের। ওগুলো দিয়ে আগুন লাগানো খুব সুবিধে। গ্রামকে গ্রাম উজাড় করে দেওযা যায়।

ফিস্ফিসিয়ে কথা বলছিল সবাই। পচা ডোবাটায় একহাঁটু কাদা। এতক্ষণ ব্যাঙের ডাক শোনা যায় নি, হঠাৎ ঐকতান শুরু হল। শিবানী বলল, দাদা এবার টর্চটা জ্বালাও। আমার পায়ের কাছে কি যেন একটা সরসর করছে।

লায়লি বলল, চুপ, মিলিটারিরা এখনো চলে যায় নি।

শিবানী হঠাৎ যন্ত্রণাকাতর একটা শব্দ করল, আহ্।

জ্যাক বলল, কি হল শিবানী?

আমাব পা ক্রমেই কাদায় সেঁধিয়ে যাচ্ছে। আর পায়েব কাছে কি যেন একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ...

নরহরি জামার খুঁটে চাপা দিয়ে টর্চ জ্বালল। আলোটা যেন বেশি দূরে না যায়। একটা সাপ সরসরিয়ে সকলের গা ছুঁয়ে ছুটে পালাল।

নবহরি বলল, কুইক, সকলে উপরে ওঠো।

নবহরি লায়লিকে একটা হ্যাঁচকা টানে উপরে তুলে দিল। শিবানী কাতর স্বরে বলল, আমার একটা হাত ধরো দাদা। কাদা থেকে পা টেনে তুলতে পারছি না।

নরহরি তাকেও টেনে তুলল।

জ্যাক বলল, টর্চটা জ্বালো নরহরিদা, শিবানীকে সাপে কেটেছে কিনা দেখ।

আবার আলো জ্বলে উঠল। ডোবার কাছেই বাঁশঝাড়। আলোর তাড়ায় একটা কাঠবেড়ালি ছুটে পালাল। বাঁশঝাড়ে শো শো শব্দ হল। এপ্রিল মাসের বাতাস। এখনো গরম পড়ে নি। একটা ঠাণ্ডা হিমহিম ভাব। জ্যাক আলতোভাবে শিবানীর একটা পা তুলে ধরল। আলতা রাঙানো পা। ফর্সা পায়ে কাদা লেগে আলতার রঙ চুনসুর্কির মত লাগছে। যেন পলেস্তারা খসা সাদা দেয়ালে চুনসুর্কির দাগ। জ্যাক শিহরিত হল না। অথচ ওই সাদা তুলতুলে পায়ের দিকে কতদিন সে অধীর হয়ে তাকিয়েছে।

জ্যাক আনমনা আরেকটা পা তুলে ধরল। শিবানীর মুখে রা নেই। অন্যদিন অন্যসময় হলে সে বাধা দিত। সঙ্কোচে দূরে সরে বসত। আজ পরম আশ্বাসে জ্যাকের কোলে পা তুলে সে বাঁশঝাড়ের দিকে চেয়ে রইল পুতুলের মত।

নাহ্ সাপে কাটে নি। কোথাও বিষ-ব্যথা নেই তো!

না। শিবানী মাথা নাড়ল। তারপরই আবার কঁকিয়ে কেঁদে উঠল, মা, আমার মা।

সঙ্গে সঙ্গে কথাটা মনে পড়ল সকলের। পাশেই পাটক্ষেতে আশ্রয় নিয়েছে নরহরির বাবা মা আর গ্রামের একদল নরনারী। জ্যাকের বাবা মা ঘর ছেড়ে আসেন নি। লতিফ সাহেব বলেছেন, আমি মুসলিম লীগের পুরনো লোক। ফ্রন্টিয়ারের গণভোটে লীগের ভলান্টিয়ার হয়ে গেছলাম। কায়েদে আজমের সার্টিফিকেট আছে আমার কাছে। আমার ভয় কি?

নরহরির বাবা রাখহরিবাবুর কানে কানে বলেছিলেন, ঘরে তিন শো মণ ধান আছে, মালমাত্তা কম নেই, এসব ছেড়ে কই যাব। মিলিটারি আসার আগেই চোর বাটপাড়ে লুট করে নেবে। আপনারা যান, তাড়াতাড়ি পালান। সোমত্ত মেয়ে দুটোকে সঙ্গে নিয়ে যান। ছেলে দুটোকেও। ভয় তো ওদেরই।

সেই ট্যা-ট্যা শব্দটা তখন আরো কাছে চলে এসেছিল। হঠাৎ আগুনের হল্কা উঠেছিল আকাশের পূব কোণে। লতিফ সাহেবের বাড়ি থেকে গ্রামের বাজার মাইল দুই দূরে। লতিফ সাহেব ভারি গলায় বলেছিলেন, বাজারে আগুন দিচ্ছে। আমার আড়তটাও পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

শিবানী তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। তার শাড়িতে গায়ে চোখে মুছে ছোপ ছোপ কাদা। লায়লির চুলে কাদার ছিটে। জ্যাক তার কনুই থেকে কাদা মুছে নাক ঝেড়ে বলল, চল, চল, পা চালিয়ে চল। মিলিটারিরা চলে গেছে।

নরহরি টর্চটা নিভিয়ে দিল। বলল, বলা যায় না, কোথাও হয়তো ওৎ পেতে রয়েছে।

জ্যাক বলল, আমি সামনে। শিবানী ও লায়লি মাঝখানে। নরহরিদা পেছনে। কুইক মার্চ।

ঝরা পাতায় পায়ের শব্দ জাগল না। ক'দিন ধরে পাতলা পাতলা বৃষ্টি হচ্ছে। মরশুমের শুরুতেই এবার বৃষ্টি। নিঃশব্দে ওরা এগিয়ে গেল পাটক্ষেতের দিকে।

চাপ চাপ অন্ধকার গা সওয়া হয়ে আসে। সারা বিরিন্দি গ্রামটা মনে হয় পরিত্যক্ত শ্মশান। আগে ঢুলিপাড়া থেকে মাঝে মাঝে ঢোলের শব্দ ভেসে আসত। এখন তাও নীরব। জ্যাক বলল, হাতঘড়িটা আনি নি। এখন রাত কটা?

লায়লি বলল, দশটার কম নয়।

এঃ, বলিস কি? আমরা তাহলে তিনঘণ্টা ওই ডোবাটায় ছিলাম?

তা হবে। নরহরি বলল।

তাহলে এশার নামাজের আজান শুনি নি কেন?

নরহরি জ্যাককে ধমকে উঠল, দূর বোকা! আজান দেবে কে? মসজিদে লোক আছে নাকি!

জ্যাকের মনে হল, সে যুগ যুগান্তর ধরে হাঁটছে। এই হাঁটা শুরু হয়েছিল কবে? না, সেই ছাব্বিশে মার্চ রাত্রে। হস্টেল থেকে পালিয়ে এসে উঠেছিল বন্ধুর বাসায়। সেখান থেকে হেঁটে কুমিল্লা। মাঝপথে নদী পার হয়েছে নৌকোয়। তারপর নিজের গ্রামে। হিসেব করে দেখেছে, একদিনে চৌদ্দ মাইল হেঁটেছে। একটা তাড়া খাওযা জন্তুর মত সে পালিয়ে এসেছে। পরনে লুঙ্গি। গায়ে ময়লা হাওয়াই সার্ট। গালে মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। লায়লি দেখে প্রথমে চিনতে পারে নি, চীৎকার করে উঠেছিল, কে, কে তুমি?

জ্যাক বোনের চীৎকারে বিহ্বল হয় নি। সে বিহ্বল হয়েছিল দূরে বাজারের দিকে পতাকা উড়তে দেখে। এখনো পতাকা উড়ছে। সবুজ, লাল আর সোনালী রঙের তেরঙ্গা পতাকা। হঠাৎ চোখ ছলছল করে উঠেছিল জ্যাকের।

হল্ট্! পাটক্ষেত নড়ে উঠল।

দুটো বন্দুকের নল বেরিয়ে এল।

নিশ্চয়ই মিলিটারি। শিবানী শক্ত হাতে জ্যাকের একটা কাঁধ চেপে ধরল। জ্যাক এই প্রথম তার কাঁধে মৃদু শিবশিরানির মত একটা ভয়ের তাড়া অনুভব করল।

বাতাসটা বড় ভারি। আকাশটা একটা বন্ধ ডালা কফিনের মত। অনেক উঁচু থেকে নেমে এসে সেই কফিনটা যেন চেপে বসছে চারজনের কাঁধে। তারার আলো মোমবাতির মত জ্বলছে। যেন পথ দেখিয়ে দিচ্ছে শবাধারবাহী চারজনকে। কিন্তু আর এগোবার উপায় নেই।

জ্যাক থমকে দাঁড়াল। অভ্যস্ত নিয়মে দুটো হাত মাথার উপরে তুলল। দেখাদেখি শিবানী, লায়লি এবং নরহরি। ক্যাডেট কলেজে থাকতে এই নিয়মটা শিখে নিয়েছিল জ্যাক।

প্রথমেই বন্দুক হাতে যে বেরিয়ে এল, তাকে দেখে জ্যাক অবাক। বাজারের দরজির বড় ছেলে। বখে যাওয়া ছেলে। ইস্কুলের শেষ দরজা পেরোয় নি। গত বছরই একটা ডাকাতির মামলায় দু'মাস জেল খেটে এসেছে। লোহার পাইপ কিনে গাদা বন্দুক বানায়। লাইসেন্স ছাড়া বন্দুক রাখার অপরাধে একবার ধরা পড়তে গিয়েও বেঁচে গিয়েছিল।

জ্যাকের ভয় আরো বাড়ল। মিলিটারি নয়, এবার ডাকাত। দরজিনন্দন রহমতকে সে চেনে। খুন জখম রাহাজানি এই তিনটাতেই সে সিদ্ধহস্ত। গ্রামের মেয়েদের দিকেও তার কুৎসিত নজর। একবার শিবানীর কাছে সে উড়ো চিঠি দিয়েছিল। রাখহরিবাবু ভয়ে কিছু বলেননি। শত হোক তিনি সংখ্যালঘু। তাছাড়া টাকা পয়সাওয়ালা মানুষ। সুযোগ বুঝে রহমত একবার চিঠি লিখে দশ হাজার টাকা দাবি করেছিল। লিখেছিল, নইলে তার বাড়িতে ডাকাতি হবে। রাখহরিবাবু কাউকে কথাটা জানান নি। কারণ, তিনি জানতেন, এ ব্যাপারে থানার ও.সি. মোবাবক খাঁর যোগসাজস রয়েছে। রাখহরিবাবুর আগে কৃষ্ণপালের আড়তে ডাকাতি হয়। লুট হয়েছিল বন্ধকি গহনার সিন্দুক। প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার সোনা। অপরাধীরা কোনদিন ধরা পড়ে নি। যদিও গ্রামের অনেকেই জানত, এই ডাকাতির সঙ্গে রহমতের দলের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। রাখহরিবাবু সব বুঝে গোপনে রহমতকে ডেকে পাঁচ হাজার টাকায় রফা করেছিলেন। জ্যাক ব্যাপারটা জেনেছিল নরহরির কাছ থেকে।

সেই রহমত এখন বন্দুক হাতে তার সামনে দাঁড়িয়ে। জ্যাক নিরস্ত্র। তার পেছনে লাযলি এবং শিবানী। এব চাইতে মিলিটারিদেব হাতে পড়াও বুঝি ভাল ছিল।

একটা শক্তিশালী টর্চের আলো জ্যাকের চোখ ধাঁধিয়ে দিল। রহমতের পেছন থেকে কেউ টর্চ মেরেছে। রহমত ধমকে উঠল, এই আলোটা নিভিয়ে ফেল্ আলিজান্।

আলিজান মানে থানাব ও.সি. মোবারক খাঁর ছেলে। সেও এই দলে জুটেছে। এতক্ষণে রহমতের হাতে গাদা বন্দুক নয়, একেবারে বিলিতি বন্দুকের রহস্য উদঘাটিত হল জ্যাকেব কাছে। এগুলো নিশ্চয়ই থানার বন্দুক। দেশে এখন আইনকানুন নেই, থানা-পুলিশ নেই। সুতরাং একদিকে রাজত্ব হানাদার মিলিটারিদেব, অন্যদিকে চোর ডাকাতের। জ্যাক মনে মনে দুঃখ করল, নিরস্ত্র হয়ে এসে কি ভুলটাই না করেছে। ঘরে যে-বন্দুকটায় মরচে ধবে আছে, সেটাও এই দুঃসময়ে কাজে লাগত। তবু—কপালে যা থাকে। নিজের দেহে প্রাণ থাকতে শিবানী আর লায়লির গায়ে হাত তুলতে দেবে না সে কাউকে। রহমত, কি চাও তুমি? জ্যাক রুদ্ধশ্বাসে বলল। তার গলার স্বর বুঝি একটু কেঁপে গেল।

কিচ্ছু চাই না। পাহারা দিচ্ছি। মিলিটারির ভয়ে সবাই এই পাটক্ষেতে পালিয়েছে। কিন্তু তোমরা কি চাও?

আমবা কি চাই মানে? জ্যাকের গলায় সাহস ফিরে এল।

এই দুটো ভরযৌবন মেয়ে নিয়ে কোথায় গিয়েছিলে? রহমতের গলায় সন্দেহ আর বিদ্রূপের একটা কুৎসিত চটক।

কোথায় গিয়েছিলাম মানে?

মানে খুব সহজ! রহমত সহজ গলায় বলল, মিলিটারিদের ভেট্ দিতে গিয়েছিলে নাকি?

ক্রোধে সেই অন্ধকার পাটক্ষেত আরো অন্ধকার হয়ে এল জ্যাকের চোখে। বহু কষ্টে নিজেকে সামলে বলল, তুমি একটা জোচ্চোর, ডাকাত। তার ওপর হাতে বন্দুক পেয়েছ। তাই একথা বলতে সাহস করছ!

রহমত চাপা কণ্ঠে হাসল, আমি ডাকাত। মুসলিম লীগার নই।

জ্যাক চাপা রাগে ফেটে পড়ল, তুমি একটা লোফার, লম্পট। মেয়েদের সম্মান রেখে চলতে জান না।

রহমতের হাসি তীব্র ও তীক্ষ্ণ শিসের মত হয়ে উঠল, মেয়ে দেখলে কোন্ পুরুষের না শরীর টাটায়, কিন্তু মোল্লা মওদুদীর চ্যালাদের মত আমরা আদমখোর নই।

জ্যাক স্তম্ভিত বিস্ময়ে বলল, আমি মুসলিম লীগার, মোল্লা মওদুদীর লোক?

রহমত বলল, তুমি কিনা জানি না, তোমার বাবা মুসলিম লীগার ছিলেন। এখন মাথায় গোল টুপি চাপিয়ে জামাতের মজলিসে যান। আমি বন্দুক উঁচিয়ে ডাকাতি করি, তোমার বাবা ডাকাতি করে মাথায় টুপি চাপিয়ে।

ঝগড়াটা পাকতে যাচ্ছিল, নরহরি এগিয়ে এল, রহমত, আমরা মিলিটারির ভয়ে পালিয়েছিলাম। দেখছ না আমাদের সারা গায়ে কাদা। এখন বাবা মাব খোঁজে এখানে এসেছি। তারা পাট ক্ষেতে এসেছিলেন।

আমার মা। আমার মা! শিবানী এতক্ষণ পর চেতনা ফিরে পেয়ে যেন ককিয়ে কেঁদে উঠল।

দু'দুটো বন্দুকের নল চোখের সামনে থেকে সরে গেল। রহমত বলল, গ্রামের অনেকেই এই পাটক্ষেতে আছেন। মিলিটারিরা এগিয়ে আসতে পারে ভেবে আমরা তিনজনে মাত্র পাহারা দিচ্ছি। বন্দুক বলতে তিনটা। বাকি বন্দুক নিয়ে কনেস্টবলরা পালিয়েছে। তারা নাকি মুক্তিফৌজে যোগ দেবে। আমাদের অবস্থাটা একবার ভাব?

তোমরা পাহারা দিচ্ছ? জ্যাকের গলার স্বরে সুস্পষ্ট অবিশ্বাস!

রহমত ঠাণ্ডা নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল, কেন, তুমি ভাবছিলে বুঝি সুযোগ পেয়ে গ্রামের মানুষের ওপব চড়াও হয়েছি, তাদের যথাসর্বস্ব লুঠ কবছি। আর তোমার সম্পর্কে আমবা কি ভাবছিলাম জানো? তোমার বাবা মাথায় টুপি চাপিয়ে মিলিটারিদের অভ্যর্থনা করতে গেছে। সঙ্গে তুমিও গেছ। সংবর্ধনা সেরে ওদের পথ দেখিয়ে তোমরাই নিয়ে আসবে এখানে। তাই মিলিটারিদের সঙ্গে না পারি, তোমাদের গুলি করে মারার জন্য প্রস্তুত ছিলাম।

নরহরি বলল, এটা ঝগড়া করার সময় নয় রহমত।

জ্যাক মাথা নামাল। মৃদুস্বরে বলল, তোমার ভোলা উচিত নয় রহমত, আমিও বাঙালী।

রহমত হাতের বন্দুক মাটিতে রাখল, বলল, তাহলে আমাকে ডাকাত, লম্পট বলছো কেন? আমিও তো বাঙালী।

রোদের আলোয় উঠোন উদ্ভাসিত। করমচা গাছের পাতা ঝরেছে প্রচুর। পেছনে আম গাছের পাতায় এপ্রিলের বাতাসের শিরশিরানি। ভোরের রোদ একটা নারকেল গাছের ছায়াকে আড়াআড়ি করে শুইয়ে দিয়েছে প্রশস্ত উঠোনটায়। একটা চিলের ছায়া সেই গাছের ছায়াটাকে ঘিরে ঘুরছে। বিরিন্দি গ্রামের আকাশটা আজ ভারী নীল। সূর্য একটা নীল পাতে মোড়া বিরাট চত্বরে গড়াগড়ি খাচ্ছে। উঠোনটায় অনেক লোক। কিন্তু গমগমানি নেই। ওই

নারকেল গাছের ছায়াটার মত সবাই যেন ছায়া। চিলটা মাথায় উড়ছে। কখন ছোঁ মেরে নেমে আসে, সেই ভয়ে যেন ছায়াগুলো শিহরিত। কিন্তু নিঃশব্দ।

একটানা দমবন্ধ করা নৈঃশব্দ ভাঙলেন প্রথম রাখহরিবাবুই, মিলিটারিরা বাজার পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। ঘাঁটি গেড়েছে পাঁচ মাইল দূরে। রহমতের দল যে-খবর এনেছে তাতে মনে হয়, আজ বা কালই গ্রামে ঢুকবে দল বেঁধে। কালকের মত ফিরে যাবে না। এই অবস্থায় আমরা কি করব, কি আমাদের কর্তব্য, তুমিই বল লতিফ। তুমিই এই গ্রামের মাথা। মাতব্বর ব্যক্তিও। তোমার পরামর্শই আমাদের মানা উচিত।

জ্যাকের বাবা লতিফ সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কথা বললে নিজের মান আর কথার দাম দুটোই বাড়ে। গম্ভীর হয়ে বললেন, আমার কথা কি আপনারা শুনবেন? তাহলে ছোকরাদের কথায় কান দেওয়া উচিত হবে না। এত শক্তিশালী মিলিটারিকে বাধা দিয়ে আমরা পারব না। ওদের আমরা বাধা দেব না। তার চেয়ে চলুন, ওদের ঘাঁটিতে গিয়ে বলি, আমরা আপনাদের অনুগত প্রজা। পাকিস্তানের ফ্লাগ উড়িয়ে দি ঘরে ঘরে। তারপর ছাগল বকরি মেরে ওদের ঘটা করে খাইয়ে বিদায় দি।

রহমত একপাশে দাঁড়িয়ে লতিফ সাহেবের কথা শুনছিল, বলল, তাহলেই মিলিটারিরা অত্যাচার না করে চলে যাবে আপনি মনে করেন?

লতিফ সাহেব বললেন, আমি তাই মনে করি।

মেয়েদের ওপর অত্যাচার হবে না?

না।

হিন্দুদেব ওপর অত্যাচার হবে না?

আমরা তাদের বুঝিয়ে বলব, এই গ্রামের হিন্দুরা সাচ্চা পাকিস্তানী।

জ্যাক মৃদুস্বরে বলল, বাবা, তুমি কি বলছ, ওরা হিন্দুদের, আওয়ামী লীগারদের ছেড়ে দেবে ভেবেছ? ওদের রাগ সব বাঙালীদের ওপর। আমি ঢাকা থেকে পালিয়ে আসার সময় দেখেছি, ওরা হিন্দু মুসলমান, দোষী, নির্দোষী বাছে নি। যাকে সামনে পেয়েছে হত্যা করেছে, মেয়ে ধরে নিয়ে গেছে। বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে।

লতিফ সাহেব দাড়িতে হাত বুলিয়ে মৃদু হাসলেন, তুই যা দেখেছিস তাও ঠিক, আমি যা বলছি তাও ঠিক। তোরা শহরে বসে ঘুমন্ত বাঘকে খুঁচিয়েছিস, বাঘ বেগে গিয়ে তুলকালাম করবে না? কিন্তু গ্রামের মানুষদের ওপর ওদের রাগ নেই। থাকতে পারে না। তবে হ্যাঁ, ওরা রাগবে, যদি ওরা দেখে গ্রামের ঘরে ঘরে এখনো স্বাধীন বাংলাব ফ্লাগ উড়ছে। তাই আমি বলি, যুদ্ধ করে যখন পারবে না, তখন বৃথা রক্তপাতে লাভ কি?

উঠোনে নারকেল গাছের ছায়াটা তখন আরো লম্বা হয়ে উঠেছে। একদল কাক জটলা করছে একটা পাকুড় গাছের ডালে বসে। রোদের হলদে লাল আভায় উদ্ভাসিত উঠোনের সবগুলো মুখে কেমন এক অসহায় সন্ত্রাস চাউনি। শীতের বিহানে রোদ আর কুয়াশা মাখা অস্পষ্ট চেহারা মনে হয় সবগুলো মানুষকে জ্যাকের কাছে। এমন কি নিজের বাবাকেও। কেবল বন্দুকসী দর্জির ছেলে নষ্ট স্বভাবেব রহমত উত্তরমুখো ঘরের ভিটিতে পা ঠেকিয়ে একটা বাঁকা তলোয়ারের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে।

লতিফ সাহেব তার দিকে তাকালেন, আমার মত আমি বললাম, তোমরা কি বলো?

উঠোনের অনেকগুলো মাথা একসঙ্গে নড়ে উঠল, আপনি যা ভালো বোঝেন, তাই করেন। আপনি আমাদের বাঁচান।

রহমত সোজা হয়ে দাঁড়াল। বলল, আমি এখনো মনে করি, শিশু মেয়ে আর বুড়োদের নিয়ে আপনারা এ গ্রাম থেকে সরে যান। মিলিটারি আজ রাতে এখানে আসবেই। আমরা

তাদের সঙ্গে পারব না জানি। তবু লড়াই করে মেরে মরব। আর যদি বাঁচতে পারি, মুক্তিফৌজের গোপন ঘাঁটি গড়ব।

তুমি মুক্তিফৌজের লোক নাকি? লতিফ সাহেবের কণ্ঠে ঠাট্টা আর তাচ্ছিল্য গোপন রইল না।

কেন, আমি মুক্তিফৌজে যেতে পারি না? রহমতের চোখ আর কণ্ঠ এক সঙ্গে হিংস্র হয়ে উঠল।

উঠোনের সমবেত লোকগুলোর মুখে নিজের প্রতি সমর্থনের ছায়া আরও গাঢ় দেখতে পেলেন লতিফ সাহেব। এপ্রিলের রোদ তেতে উঠতে শুরু করেছে। বললেন, তুমি নিজের কথা একেবারেই ভুলে গেছ রহমত। দেশে থানা পুলিশ আইন-কানুন থাকলে তুমি এমন প্রকাশ্যে এসে গাঁয়ের মাথাওয়ালা লোকদের সঙ্গে কথা বলতে পারতে, না গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার জন্য হুমকি দিতে পারতে!

আমি হুমকি দিই নি, আপনাদের ভালোর জন্য বলছি। রহমত আশ্চর্য ঠাণ্ডা ও নিরুত্তাপ গলায় বলল।

আমাদের ভালোব জন্য বলছ? লতিফ সাহেব উঠোনেব লোকগুলোর মুখের দিকে আবার তাকালেন। তাঁর প্রতি সমর্থন ও আস্থার সেই ছায়াটাও দেখলেন বাড়ছে। গলার স্বর আরো চড়িয়ে বললেন, ভুলে যাচ্ছো কেন, তুমি জেলখাটা দাগী আসামী। তোমার হাতে গ্রাম ছেড়ে আমরা চলে যাই, আর তুমি, সব লুটপাট করে সটকে পড়ো! তাই না?

বহমত কথা বলল না। তার ছায়াটা নারকেল গাছের ছায়ার মত আরো অকম্প স্থিব হযে দাঁড়িয়ে রইল।

জ্যাক বাবাকে বাধা দিল, কাল বাতে ও-ই পাটক্ষেতে সবাইকে পাহারা দিযেছে বাবা। ওর সঙ্গে আবো ক'জন ছিল।

লতিফ সাহেব ধমকে উঠলেন, বিড়ালের কাছে ভাজা মাছ পাহারা! কে ওকে পাহাবায় বসিযেছিল রাত্রে? গ্রামের মেয়েরা ওর পাহারায় নিরাপদ নাকি? বলেই শিবানীর বাবা রাখহরিবাবুর দিকে তেরছা চোখে তাকালেন তিনি।

নারকেল পাতায় হঠাৎ বাতাস লেগে আন্দোলিত হওয়াব মত এক সঙ্গে অনেকগুলো মাথা আন্দোলিত হল, একটা স্‌স্‌ চাপা অস্পষ্ট আওযাজ গড়িয়ে গেল। লতিফ সাহেব আদেশ দানের ভঙ্গিতে হাত ওঠালেন, আপনারা সকলেই নিজ নিজ ঘরে পাকিস্তান ফ্লাগ উড়িয়ে দিন। শান্ত হযে ঘরে থাকুন। মিলিটারি এলে আমিই সকলের আগে যাব তাদের কাছে। আপনাদেব কারো ভয় নেই। কিন্তু তার আগে আমাব কথা মত কাজ করতে হবে।

রহমতের দিকে তাকালেন লতিফ সাহেব, আর তুমি এবং তোমার দলের কাছে আমার কথা তোমরা গ্রাম ছেড়ে চলে যাও। তোমরা গ্রামে থাকলেই আমাদের বিপদ। মুক্তিবাহিনীর লোক ভেবে মিলিটারি তোমাদের মারতে গিয়ে সারা গ্রামটাই জ্বালিয়ে দিতে পারে। তার চেয়ে তোমরা বরং গ্রাম ছেড়ে চলে যাও।

বেশ, তাই হবে।

এমন নিরুত্তাপ নিরুত্তেজিত ভাবে রহমতকে কখনো চলে যেতে দেখে নি জ্যাক। রহমতের সঙ্গে সঙ্গে যেন তার লম্বমান আড়াআড়ি ছায়াটাও চলে যাচ্ছে। পিঠে বাঁধা রাইফেলটার অস্তিত্ব যেন ভুলে গেছে রহমত। শত হোক একটা অর্ধশিক্ষিত ছিঁচকে ডাকাত, ওর মরাল কারেজ আর কতটুকু হবে, ভাবল জ্যাক।

রোদের ছায়াটা তখন শ্রান্ত হয়ে তার হলদে আঁচল গুটিয়ে নিয়েছে গাছের মগডালে। ঘাসের বুকে, পুকুরের পানিতে, শিবানীদের বাড়ির উঠোনে বৃষ্টির আগে জমাট মেঘের মত

ঘন ছায়া। জ্যাককে যেন বাঘে তাড়া করেছে, এমন ভাবে ছুটতে ছুটতে এল সে শিবানীর কাছে। শিবানী দেখল, জ্যাককে একজন বয়স্ক প্রৌঢ় মানুষের মত লাগছে। ভয় পেলে প্রৌঢ় মানুষেরা যা করে, মনের ভাব লুকিয়ে আরো সাহসী হতে চায়, জ্যাকের চেহারায় সেই বুড়োমির ছাপ। শিবানী বলল, দাদা নেই বাড়িতে। বাজারে গেছে। বাবার সঙ্গে গোলার চাল—যা বেঁচেছে সরিয়ে আনতে।

জ্যাক বলল, আমি কেবল নরহরির কাছে আসি নি। তোমার কাছেও এসেছি।

কেন? শিবানীর চোখের তারা দুটো যেন স্থির হয়ে বিঁধে গেল জ্যাকের চোখে।

আজ রাত্রে কি তোমরা বাড়িতে থাকতে চাও!

আর কোথায় থাকবো?

আমি বলছিলাম, তুমি আর খুড়িমা দুজনেই আমাদের বাড়িতে থাকলে ভাল হত! আজ রাতটা ভালয় ভালয় কেটে গেলেই ভাল।

জ্যাকের চোখ থেকে শিবানীর চোখ সরে গেল। যেন আকাশ থেকে উল্কাপিণ্ড হঠাৎ খসে গেল। মৃদু ফুলকি যেন ছড়িয়ে পড়ল শিবানীর চোখ থেকে জ্যাকের সারা গায়ে, তুমি দাদাকে কথাটা বল, কিংবা বাবাকে। তাঁরা যা ভালো মনে করেন। তবে বাবাকে রেখে মা আমার সঙ্গে যাবেন মনে হয় না!

তাহলে তুমি লায়লির সঙ্গে থাকবে।

তা না হয় হবে, কিন্তু জ্যাক ভাই?

জ্যাকের মনে হল আবেকটা উল্কাপিণ্ড খসবে। শিবানী বলল, — তোমাব কি মনে হয় পাকিস্তানী ফ্লাগ ওড়াবার পরও কিছু হবে?

শহরে এবং অনেক গ্রামে হয়েছে। পাঞ্জাবী মিলিটারিদের বিশ্বাস নেই।

ওরা কি চায়? শিবানীর গলাটা হঠাৎ কেঁপে উঠল। জ্যাক চোখ তুলল। উল্কাপিণ্ড খসার আগেই নিভে গেল।

একদল হিংস্র ক্ষুধার্ত নেকড়েকে দেড় হাজার মাইল দূরে এসে খাঁচা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ওরা উপোসী, বন্য এবং বর্বর। আর ওদেরকে বলা হয়েছে, ওদের বর্বরতা অধর্ম নয়, বরং ধর্ম রক্ষার জন্য। তুমি বুঝতে পারছো না, এরপব ওরা কি চায়?

জ্যাক ভাই! বহুদূর থেকে একটা তরল ক্রন্দনের উচ্ছ্বসিত শব্দ এসে যেন ভেঙে পড়ল জ্যাকের কানে। চেয়ে দেখল শিবানী কাঁদছে না। কেমন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এইমাত্র শিবানী এখানে ছিল। রক্তমাংসের মানুষ। এখন যেন সে কাঠখোদাই মূর্তি।

নরহরি এসে দেখল দু'জনকে। দু'টি অপলক চোখ মূর্তি। কাঠখোদাই নয়। মাটি কেটে এইমাত্র যেন ছাঁদ তৈরি। বলল, কি হল তোমাদের?

জ্যাক আর শিবানী আবার মানুষ হল। জ্যাক বলল, কি, গুদামে কিছু পেলে?

না, সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

আজ রাত্রে কি করবে ভেবেছ, এখানেই থাকবে, না আমাদের বাড়িতে?

নরহরি মাথা ঝাঁকাল, না। বাবা বললেন বাড়িতেই থাকবেন। পাকিস্তানী ফ্লাগ উড়িয়ে দিয়েছি, ভয় কি? তোমার বাবা তো তা-ই বললেন। তাছাড়া ঘরে মালপত্র তো কম নেই। সব ফেলে রেখে তোমাদের ওখানে গিয়ে উঠব, মুসলিম লীগের গুণ্ডারা সব লুঠ করে নেবে।

জ্যাক বলল, তা ঠিক। কিন্তু শিবানী আর খুড়িমা, তারাও কি বাড়ি থাকবেন?

নরহরি বলল, মা থাকবেন। শিবানী বরং যাক। লায়লির সঙ্গে গিয়ে থাক।

জ্যাক ঘুরে দাঁড়াল, আমি মাকে গিয়ে বলি। শিবানী, তুমি বেলা থাকতেই বরং চলে এস।

দু'পা এগিয়ে জ্যাক থেমে গেল। নরহরির দিকে চেয়ে বলল, নরহরি, আমার যেন কেন মনে হচ্ছে, আমরা রহমতের দলেই যোগ দিলে ঠিক করতাম।

নরহরি নয়, শিবানী দ্রুত ঘরের ভেতরে চলে গেল। নরহরি কথা বলল না। তার চোখ অচল টাকার মত ঘষা এবং অস্পষ্ট।

সেই রাতটা গেল। পরের দিনটাও। কোথাও মিলিটারির আনাগোনা নেই। ঝড় হলে বাতাসে বেগ না থাক, আকাশ তো থমথমে হবে, তাও নয়। ওই যে একদিন বিরিন্দি বাজার পুড়ল, স্টেনগান আর মর্টারের আওয়াজ, ওই পর্যন্তই যেন সব। লতিফ সাহেব বাজারে আধপোড়া চায়ের স্টলে বসে সকলকে বললেন, আমার পরামর্শের ফল দ্যাখো। ফ্লাগ ওড়াতেই সব ভয় ঠাণ্ডা। আর ভয় নেই। কেবল লক্ষ রাখতে হবে, ওই রহমতের দলের যেন কেউ ফিরে না আসে গ্রামে। তাহলেই বিপদ।

সেদিনটাও গেল। ইস্কুলের মাঠটায় বুড়ো অশ্বত্থের অনেক পাতা ঝরল মাটিতে। কেউ কুড়িয়ে নেবার নেই। না ছাত্র, না শিক্ষক। সোমবারে বাজারের হাট। বসল না। কেউ এল না। কেবল নারকেল, সুপারি গাছের মাথায় বিবর্ণ চাঁদ তারা মার্কা সবুজ ফ্লাগ উড়তে লাগল।

রাত্রে লায়লির পাশে শুয়ে শিবানী ফিসফিসিয়ে বলল, ওরা বোধ হয় গ্রামে আর ফিরবে না?

ওরা কারা?

ওই যারা থানা থেকে বন্দুক লুট করেছিল। চাচার কথায় গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে।

রহমতের নামটা ইচ্ছে করেই মুখে আনল না শিবানী। লায়লি টের পেল।

কেন আসবে? গ্রামের লোক ওদের ভাল চোখে দেখে না। ওরা টের পেয়েছে।

শিবানী বালিশে মুখ গুঁজে বলল, আমার কিন্তু তা মনে হয় না।

তোর কি মনে হয়?

গ্রামের লোক মিলিটারির ভয়ে ওদের গ্রাম ছাড়তে বলেছে। আসলে মনে মনে ওদের সমর্থন করে।

লায়লি হাসল, আমারও তাই মনে হচ্ছে।

কেন বল তো?

রহমত একটা খারাপ ছেলে। ওর নাম শুনলেও ঘৃণা হত। কিন্তু সেদিন ওর কথা শুনে খুব খারাপ লাগে নি রে। রাইফেল কাঁধে ওকে মনে হচ্ছিল সত্যি সত্যি মুক্তিফৌজ!

শিবানী মৃদু স্বরে বলল, আমার একজন মুক্তিফৌজ দেখার ভারি শখ্।

লায়লি হাসল নিঃশব্দে। দু, জনেই হঠাৎ চুপ হয়ে গেল।

সেই রাতেই ঘুম ভাঙল অদ্ভুত একটা আওয়াজে। অন্ধকারে সেই শব্দের বিভীষিকা ভয়ঙ্কর। ঘুম ভেঙে শিবানী কিছুক্ষণ চারদিকের অস্পষ্ট অন্ধকার পরিবেশকে অনুভব করার চেষ্টা করল। লায়লিরও তখন ঘুম ভেঙেছে। বলল, কি হয়েছে ?

লায়লি কাঁপা গলায় বলল, বুঝতে পারছি না। হয়তো মিলিটারি এসেছে।

মি-লি-টা-রি। চারটি শব্দ শিবানীকে নীরব করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

হঠাৎ লকলকে আগুনে পরস্পরের মুখ দেখতে পেল তারা। প্রথমে কালো ধোঁয়া। তারপরই সবেগে আগুনের লেলিহান শিখা উড়ল আকাশে।

আমাদের বাড়ি, আমাদের বাড়ির দিকে আগুন। শিবানীর কণ্ঠে আর্ত অস্ফুট চীৎকার।

লায়লি কাঠ হয়ে রইল। একটা কথাও বলল না। চারদিকে শব্দ আগুন, চীৎকার ও অন্ধকার মিলে মিশে দু'টি মানুষ যেন সব উপলব্ধির বাইরে চলে গেল।

ভোর হল। আগুন সব অন্ধকার পুড়িয়ে পূবের আকাশটাকে ফর্সা করে দিয়ে গেল। গত রাতের অন্ধকারই যেন পুড়ে ছাই হয়ে ছড়িয়ে আছে সারা গ্রামে। পালিয়ে যারা বাঁশ বনে, পাটক্ষেতে আশ্রয় নিয়েছিল, তারা মরেছে। যারা পালায় নি, তারাও মরেছে। যারা বেঁচে আছে, ভাগ্যের জোরে বেঁচে আছে। দ্বিতীয়বার মৃত্যুর থাবার জন্যে তৈরী হয়ে রয়েছে।

মাকে দেখে চমকে উঠল শিবানী। খয়েরী পাড় শাড়ি পরনে মার। মাথায় সিঁদুর নেই, বাবার কথা মনে করে একটা ভয়ঙ্কর আশঙ্কায় শিবানী ডুকরে কেঁদে উঠতে যাচ্ছিল। পেছনে বাবাকে দেখে উচ্ছ্বসিত কান্না থামাল। বাবার পরনে লুঙ্গি। গায়ে ফতুয়া। মাথায় টুপি। লতিফ চাচার মত গোল করে কাটা টুপি।

ভয়ঙ্কর বিবরণ। সেই বিবরণ বাবা শিবানীকে শোনালেন আস্তে আস্তে। থানার বাড়িতে মিলিটারি উঠেছে। বড় দারোগা মোবারক মিয়ার লাশ ঝুলছে এখন থানার বুড়ো বট গাছে। এক গুলিতেই ফুটো হয়ে গেছে তার কলজে। আওয়ামী লীগের নেতা সোবহান মিয়া বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিলেন। তার ছোট দু'ছেলেকে গুলি করে মেরেছে। অন্তঃসত্ত্বা বৌকে ধরে নিয়ে গেছে মিলিটারিরা। অন্তত দশটি হিন্দু পরিবারের কেউ বেঁচে নেই। সতীশ কবরেজের অমন সুন্দরী মেয়ে এবার স্কুল ফাইনাল দিল, তাকে ধরে নিয়ে গেছে মিলিটারি ক্যাম্পে। আর বাড়ি-যে কত পুড়েছে তার হিসেব নেই। শিবানীদেব বাড়ি পুড়ে গেছে। লতিফ মিয়ার বাড়ি অবশ্য বেঁচেছে। গোলা ঘর পুড়ে গেছে। শিবানীর মার কপালেব সিঁদুর মুছে, বাবাকে লুঙ্গি আর টুপি পরিয়ে মিলিটাবির কাছে মুসলমান পবিচয় দিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে এসেছেন লতিফ মিয়া। শিবানীর মা মাথার সিঁদুর মুছতে চায় নি। তাব গালে রাখহরিবাবুর প্রচণ্ড চড় কালশিরা হয়ে ফুটে রয়েছে।

সব কথা শেষ করে শিবানীর বাবা বললেন, আমরা ঠিক করেছি মুসলমান হয়ে যাব মা। তুইও মুসলমান হবি।

শিবানীর মা ফিসফিসিয়ে বলল, বর্ডার পেরিয়ে পালানো যায় না?

শিবানী বলল, মুসলমান হলেই কি বাঁচব বাবা, ওরা তো বাঙালী মুসলমানও মারছে।

রাখহরিবাবু বললেন, মারছে। তবে এখন আর মারবে না বলছে। তবে হিন্দু হয়ে আর বাঁচা যাবে না। গ্রামের মৌলবী কাসেম, জামাতে ইসলামীর নেতা। উনি বলেছেন, হিন্দুরা মুসলমান হয়ে জামাতের মেম্বর হলে আর তাদের ভয় নেই।

শিবানীর মা আবার ফিসফিসিয়ে বললেন, বর্ডার পেরুনো যায় না।

রাখহরিবাবু হঠাৎ গর্জে উঠলেন— না, যায় না। গেলে ওই সোমত্ত মেয়ে নিয়ে এখানে বসে মুসলমান হই ভাবছো!

শিবানীর ধর্মকর্মে কোনদিনই মতি নেই। আজ হঠাৎ মুসলমান হতে হবে শুনে তার চোখে কেন কে জানে দর দর করে অশ্রু নেমে এল।

রাখহরিবাবু বললেন, কাঁদিস নে। সারাজীবন রক্ষাকালীর পূজো করেছি। কই তিনি তো বিপদে রক্ষে করতে এলেন না। অমন মাটির পুতুলের ধর্মের কথা ভেবে কি লাভ মা?

শিবানী চোখ মুছল। বুঝল, এটা বাবার অভিমান ও রাগের কথা।

ভোরের রোদ চিক চিক করল তার ভেজা চোখে। বলল, লতিফ চাচা বলেছিলেন, পাকিস্তানী ফ্লাগ ওড়ালেই আমরা বাঁচব। কই বাঁচলাম না তো। এখন তুমি বলচ, মুসলমান হলে বাঁচব। তিনিও কি তাই বলেছেন?

রাখহরিবাবু ম্লান হাসলেন, তোর লতিফ চাচার কোন দোষ নেই মা। তিনি আমাদের বাঁচানোর জন্য যথেষ্ট করেছেন। এখন দেখছেন উপায় নেই। উপায় নেই দেখেই বলছেন, রাখহরি, কপালে যখন ছিল— মুসলমানই হয়ে যাও। আর তো উপায় দেখছি না। তাছাড়া

তোমাদের শাস্ত্রেই বলে সব ধর্ম সমান। আমি বলতে চেয়েছিলাম সব ধর্ম সমান বটে. তবে আমাদের কাছে পরধর্ম ভয়াবহ। কিন্তু আর বলি নি।

শিবানী চোখ আবার কাপড়ের খুঁটে মুছল. না বলে ভালোই করেছ।

অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত। কাসেম মৌলভীর বাড়ির প্রাঙ্গণেই জনা পঞ্চাশেক হিন্দু জমায়েত হয়েছে। শিশু বৃদ্ধ যুবক যুবতীর ভীড়। দু'জন পাঞ্জাবী সেপাই রাইফেলের বাটে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছে। দীক্ষাপত্র হাতে কাসেম মৌলভী দাঁড়িয়ে। তার চোখে সগর্ব উল্লাস। আজ এই ক'জন হিন্দু নর-নারীকে পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দেবেন তিনি। ঘন ঘন দাড়ি নেড়ে কলেমা পাঠ করছিলেন। তাঁর দলের পাঁচজন যুবক কর্মী, পরনে লুঙ্গি, মাথায় টুপি, হাতে লাঠি নিয়ে পাশে দাঁড়িযে। লতিফ সাহেব গম্ভীর মুখে ঘাসে রুমাল বিছিয়ে বসে আছেন। প্রথমেই কলেমা পাঠ কবে ধর্মান্তরিত হলেন বাখহরি। নতুন নাম হল, আল্লাবাখা। শিবানীর মা কাঁদতে কাঁদতে দুরূহ আববী উচ্চাবণের কলেমা পাঠ করলেন. না কেবল বিড় বিড় করলেন কিছুই বোঝা গেল না। ঘোমটা-মুক্ত শিবানীর দিকে চেয়ে হঠাৎ কাসেম মৌলভী কলেমা পড়তে ভুলে গেলেন। বললেন, তোমার তো শাদী হয় নি না?

শিবানী নিরুত্তব। রাখহবি বললেন—না।

কাসেম মৌলভী অভ্যেসবশে দাড়িতে হাত বুলোলেন, তাহলে তো কেবল মুসলমান হলে এর চলবে না। সঙ্গে সঙ্গে একজন মুসলমানের সঙ্গে এর শাদী দিয়ে দিতে হবে। তা না হলে ঈমান কমজোর থেকে যাবে।

রাখহবি বিস্ময়ে ভয়ে বিবর্ণ হযে বললেন, বিয়ে? এখনই বিয়ে। ওই যে ওর বড় ভাই নবহরি। ওবই এখনো বিয়ে হয নি।

কাসেম মৌলভী হাসলেন, ব্যাটাছেলের কথা আলাদা।

কিন্তু এখন ওর পাত্র পাবো কোথায?

কাসেম মৌলভী অভয দিলেন, আপনাকে ভাবতে হবে না। পবিত্র দীন ইসলামের কোলে যখন আপনার মেয়ে ঠাঁই নিচ্ছে, তখন ওর পাত্রের অভাব হবে না। ওই-যে দেখছেন রুস্তম গাজিকে। জামাতের নিষ্ঠাবান কর্মী। বাজারে চায়ের দোকান আছে। লেখাপড়া জানে না। তাতে কি! ঈমান বড় মজবুত। আপনার মেয়ে সুখে থাকবে।

লতিফ সাহেব যেন বাধ্য হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। মিনমিনে গলায় বললেন, আপনি কি বলছেন মৌলভী ভাই। আরে শিবানী যে স্কুল ফাইনাল পাশ। রুস্তম ক' অক্ষর জানে না। তার ওপর রুস্তমের বয়স হবে দ্বিগুণ।

কাসেম মৌলভী হাসলেন, আপনি কেবল বয়স আর লেখাপড়াটাই দেখলেন, ওর ঈমানের জোরটা দেখলেন না। দশ মাইল দূর থেকে মিলিটারিকে পথ দেখিয়ে এই গ্রামে কে এনেছে? ওই রুস্তম গাজি। শিবানীর ওপর গ্রামেব কারো দাবি থাকলে ওর দাবিই তাই প্রথম।

লতিফ সাহেব ঢোক গিলে বললেন, দা-বি?

হ্যাঁ, দাবি। বলেই কাসেম মৌলভী হাঁক পাড়লেন, কই রুস্তম, এদিকে এগিয়ে এস।

কাঁচাপাকা একমুখ দাড়ি। থুতনি বের কবা একটা সরু ছুঁচলো মুখ। নাকের ফানা বড়। চোখ ছোট। কালো, কর্কশ একটি মুখ লুঙ্গিতে নাক ঝেড়ে এগিয়ে গেল।

শিবানী একবার তার দিকে অপাঙ্গে তাকাল। তারপরই একটা অস্ফুট গোঙানির মত শব্দ বেরুল তার মুখ থেকে—মা-মা-গো।

রাখহরিবাবু হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন, না, না, না। আমি মুসলমান হই নি। হব না।

রাখহরিবাবুর চীৎকারের রেশ তখনো চারদিকে যেন ঢেউ তুলে ভেসে বেড়াচ্ছিল। শিবানীর মা মাটিতে লুটিয়ে কাঁদছেন। কেবল শিবানীরই শোক নেই, সব শোক আর

সহ্যের ঊর্ধ্বে শিবানী যেন এইমাত্র একটা ঝরাপাতা হয়ে মাটিতে শেষ শয্যা নিতে নেমে যাচ্ছে। তার যোগ নেই। না গাছের সঙ্গে, না মাটির সঙ্গে। ঝরা পাতার মতই তার কোন অনুভূতি নেই।

কিন্তু তখনই কানে বাজল একটি শব্দ। নাকে এল বারুদের গন্ধ।

কেউ রাইফেলের ট্রিগার টিপল বুঝি। মানুষের অন্তিম আর্তনাদও এমন সকরুণ হয়।

লতিফ সাহেবের গলা শোনা গেল, এ কি জ্যাক, এ কি রহমত তুমি? সৈন্য দুটোকে তোমরাই মারলে? এ কি—এ কি আবার রাইফেল তুলছো?

চকিতে শিবানী মাথা তুলল। হ্যাঁ, জ্যাক এবং রহমত, আরো দু'চারজন। কাসেম মৌলভীর ভারী শরীরটাকেও সে দুমড়ে মুচড়ে মাটিতে পড়তে দেখল। লতিফ সাহেব তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। শিবানীকে, শিবানীর বাবা ও মাকে জ্যাকই দ্রুত টেনে দাঁড় করাল। বলল, কুইক শিবানী, এখনই পালাতে হবে। মিলিটারিরা খবর পেয়ে যাবে এই অপারেশনের। এখনই আমাদের ঘিরে ফেলবে। তার আগেই পালাই চল।

রাখহরিবাবু শূন্য দৃষ্টিতে তাকালেন, কিন্তু কোথায় পালাব? আব আমি — আমি-যে মুসলমান।

রহমত চীৎকার করে—কে বলছে আপনি মুসলমান। জোর করে মুসলমান করলেই মুসলমান হয় নাকি! যারা এভাবে অন্যাকে মুসলমান করে, তাবা নিজেরাও মুসলমান নয়, শয়তান।

জ্যাক তাড়া দিল, আহ্, বক্তৃতা নয়, পালাও।

নরহরি বলল, আর তুমি?

জ্যাক বলল, আমিও পালাব। তবে এখন নয়। সেকেণ্ড অপারেশনের পর। আরো দুটো দালাল খতম করে। কুইক রহমত, কুইক শিবানী। জ্যাক ও তার দলবল দ্রুত পেছনে মিলিয়ে গেল। সামনে শিবানীর বাবা ও মা, পেছনে নরহরি। তাবও পেছনে শিবানী ও রহমত। রহমত বলল, ওই-যে সামনে বন। ওই বনে গিয়ে লুকোতে হবে। তাবপর রাত্রে নদীতে গিয়ে ছোট নৌকা করে চেষ্টা করে দেখতে হবে ত্রিপুবা বর্ডারে যাওয়া যাবে কিনা।

শিবানী ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছিল। খপ করে তার হাত ধরে ফেলল রহমত, কি হল শিবানী।

শিবানী সেই নির্জন বনপ্রান্তে দাঁড়িয়ে হঠাৎ উচ্ছসিত স্বরে কেঁদে উঠল, রুস্তম গাজিকে দেখেও যে-কান্না সে কাঁদে নি সেই কান্না,--

আমি যাব না, কিছুতে যাব না, কিছুতেই আমাকে তোমরা নিয়ে যেতে পাববে না।

শিবানী নিজেই দেখল, তার চোখের পানি বৃষ্টির ফোঁটার মত বড, স্বচ্ছ এবং নির্ভাব।

বেশ কাছ থেকেই আবার তার কানে বাইফেলের শব্দ ভেসে এল। এবার একটা নয়, অনেক এবং একটানা।

ভীষ্মের দীর্ঘশ্বাস

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

তৃষ্ণার্ত রাজা এসে থামলেন এক স্বচ্ছ সরোবরের সামনে।

নিজের সৈন্যবাহিনী থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। কী যেন মোহ ভর করেছিল তাঁর ওপর, তিনি মানুষের কথা ভুলে গিয়ে অরণ্যের শোভায় মুগ্ধ হয়ে ক্রমশ একাকী চলে এসেছেন গভীর থেকে গহনে।

রাজা ঘোড়া থেকে নেমে সেই জলাশয়ের ধারে বসে আজলা ভরে পান করতে যাবেন, এমন সময় কয়েকটি নারী কণ্ঠ একসঙ্গে বলে উঠল, হে রাজন! এই জল ছুঁয়ো না। এই জল পান করো না। তুমি অন্য সরোবরে যাও!

রাজা মুখ তুলে দেখছিলেন তিনটি যুবতী সেই সরোবরে হংসের মতো ভাসছে। হলুদ রেশমেব মতো তাদের মুখ, পদ্ম পলাশ চক্ষু, উড়ন্ত পাখির মতো ওষ্ঠাধর।

রাজা কয়েক মুহূর্ত অপলক ভাবে চেয়ে রইলেন।

রমণী বিলাসে তিনি কাটিয়েছেন বহু বছর, দেশ-বিদেশের বহু নারী তাঁব অঙ্কশায়িনী হয়েছে, কিন্তু তাঁর মনে হল এই যুবতীত্রয়ী প্রত্যেকেই যেন তিলোত্তমা।

একটি মেয়ে একটু এগিয়ে এসে মধুর হেসে বলল, রাজা, আমরা নিরালায় এখানে কেলি করছি, এখানে অবস্থান করা তোমার উচিত নয়। এই জল তোমাব পেয় নয়, তুমি শীঘ্র অন্যত্র যাও!

রাজা বললেন। অয়ি, বরবর্ণিনী, তোমাদের দেখে আমার তৃষ্ণা শতগুণ বৃদ্ধি পেল। চোখের সামনে স্বাদু পানীয় দেখলে কি কোনো তৃষ্ণার্ত দূরে চলে যেতে পারে? কেন আমাকে নিবারণ করছ? কেন আমাকে চলে যেতে বলছ?

সেই মেয়েটি বলল, রাজা, সব ফুলের ঘ্রাণ নিতে নেই, সব পানীয় পান করা যায় না, সব ফল ভক্ষণ কবা ঠিক নয়। এই সরোবর তোমার জন্য নয়, তুমি অন্য কোথাও যাও।

রাজা এবারে হেসে বললেন, তোমরা আমার পরিচয় জান না। আমি রাজা কোনো প্রকার নিষেধ না-শোনায় আমাদের বাসনা বেশি বলবান হয়। যে কোনো নিষিদ্ধ বস্তুই আমরা জয় সাধ্য মনে করি। আমি অচিরেই তৃষ্ণা মেটাব এবং তৃষ্ণা মেটাব।

তিন নারী আবাব একত্রে কলকণ্ঠে বলে উঠল, রাজা অমত করো না, এমন কবো না। নিবৃত্ত হও।

রাজা শুনলেন না। তিনি গণ্ডূষ জল পান করলেন। তারপর তাঁর বস্ত্র খুলে রেখে নেমে পড়লেন সরোবরে।

রাজা সন্তরণ-পটু। জলাশয়টিও তেমন বড় নয়। রাজা ভাবলেন, মেয়ে তিনটি পালাবার চেষ্টা করলেও তিনি অন্তত একজনকে বাহুবন্ধনে আনতে পারবেন ঠিকই। এরা অপ্সরা হলেও নিষ্কৃতি নেই।

যুবতী তিনটি কিন্তু দূরে সরে গেল না। বক্ষ জলে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল।

রাজা কাছে আসতেই তারা বলে উঠল, নিয়তি, নিয়তি!

রাজা এদের মুখপাত্রীটির হাত ধরলেন। তারপর বললেন, কবিতা এবং বনিতা স্বযপসত্তা হলেও সুখদা নয়। হে সুন্দরী, আমি বলপ্রয়োগ করতে চাই না। আমি তোমার রূপ প্রার্থনা করি, তুমি আমার হও।

মেয়েটি তবু হাসতে লাগল।

রাজা মেয়েটিকে বক্ষে জড়িয়ে ধরে মুখ চুম্বন করতে গেলেন।

কিন্তু পারলেন না। তাঁর বিচিত্র এক অনুভূতি হল। তাঁর শরীরে বিদ্যুৎ নেই, শিহবণ নেই। এমন এক দুর্লভ রূপসীকে তিনি স্পর্শ কবেছেন, তবু তাঁর কামনা যথোচিত জাগ্রত হচ্ছে না কেন?

মেয়েটি বলল, নিয়তি নিয়তি!

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, কী বলছ তুমি? কার নিয়তি?

মেয়েটি বলল, তোমার! হায় ভূতপূর্ব রাজা তুমি আর ইহজীবনে কোনো রমণী-রমন সুখ পাবে না।

—কেন?

নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ!

রাজা আপন শরীরের দিকে তাকিয়ে আমূল চমকে উঠলেন।

তিনি আর রাজা নেই। তিনি এক নারীতে পরিণত হয়েছেন। আর তিনটি নারীরই মতো।

সেই তিন রমণীর মধ্যে একজন বলল, তোমাকে এখন কী বলব, রাজা না বানি। শুধু রমণীই বলি। ওহে রমণী, আমরা দিব্যাঙ্গনা। পৃথিবীর কোনো পুরুষ আমাদের স্পর্শ কবতে পারে না। এটা একটা মায়াসরোবব। সাধারণ মানুষ এটা দেখতেও পায না। তোমাব নিয়তি তোমাকে এখানে টেনে এনেছে।

পর মুহূর্তেই তারা অদৃশ্য হয়ে গেল। চিনিয়ে গেল সেই মায়াসবসী। সবটাই যেন স্বপ্ন।

কিন্তু ভূতপূর্ব রাজার শরীরটা স্বপ্ন নয়। তিনি বমণী হয়েই রইলেন। কিন্তু নগ্ন বলে তাঁব ব্রীড়া এল। তিনি প্রথমে স্তনদ্বয় ঢাকলেন দু হাত দিয়ে। তারপর এক হাত বুকে বেখে, অন্য হাতে চাপা দিলেন নিম্ননাভি, তাঁব ভঙ্গিটি হল চিবকালীন প্রথাসিদ্ধ নিরাবরণ নারীব মতোই।

রাজার অশ্ব আর রাজাকে দেখতে না পেয়ে ফিরে গেল।

রাজা আস্তে আস্তে তাঁর রাজ্য, তাঁব মহিষীবৃন্দ, তাঁর সন্তানাদির কথা ভুলতে লাগলেন। অরণ্যের মধ্যে একাকিনী অবস্থায় তাঁর ভয় করতে লাগল।

অসহায় ভাবে এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে কিছুক্ষণ পবে তিনি এক নবীন যুবাব সাক্ষাৎ পেলেন।

যুবকটি ঋষি-কুমার, অঙ্গে গেরুয়া, মাথায় জট-বাঁধা চুল।

যুবকটি এই নবোদ্ভিন্নযৌবনা রমণীকে দেখে হতবাক হয়ে তাকিয়ে বইল কিছুক্ষণ। তারপর যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে জিজ্ঞেস করল, হে অচেনা, তুমি কে?

রাজার তখনও স্মরণে আছে যে তিনি পুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁর শরীরটি নাবীব। তিনি বললেন, আমি কেউ না!

যুবকটি বলল, তোমাকে দেখে আমার মনে তপোবন-বিরুদ্ধ এক অনুভূতি জাগছে। তুমি কি স্বপ্ন না মায়া? মতিভ্রম না তাবৎ জীবনের গুণফল?

নারীরূপিনী রাজা আবার বললেন, আমি কেউ না!

তখন সেই মুনিকুমার এগিয়ে এসে তাঁর অঙ্গ স্পর্শ করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে রাজার জীবনে যেন এক অলৌকিক ব্যাপার হল। জীবনে তিনি বহু নারীকে স্পর্শ করেছেন, কিন্তু আজ তাঁর শরীরে এই পুরুষের স্পর্শে যে তরঙ্গ খেলে গেল, তেমনটি তো আগে কখনো হয় নি। তাঁর তীব্র ইচ্ছা হল এই যুবা তাকে বক্ষে টেনে নিক। কিন্তু মুখে তা প্রকাশ না করে একটু দূরে সরে গেলেন।

তরুণ ঋষি আবার কাছে এস তাঁর বক্ষে হাত রাখতে যেতেই তিনি মুখ ফিরিয়ে বললেন, না!

তখন সেই কামার্ত যুবা মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বললেন, হে রূপসী-শ্রেষ্ঠা, তোমার নয়ন কাছে আহত। তোমার অধর সুধায় আমায় সঞ্জীবিত করো, আমার যাগ-যজ্ঞ সব জলাঞ্জলি যাক, আমি তোমাকে পেয়ে ধন্য হতে চাই।

আরও কিছুক্ষণ স্তব-স্তুতি শোনার পর নারী-রাজা সম্মত হলেন।

তারপর তিনি পেলেন তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ। বমণে এত সুখ তা তিনি জানতেন না। আগে মনে করতেন রতি সুখ মানে জয়ের আনন্দ। এতকাল তিনি ওপরে থাকবেন, আজ নিচে। পিঠের তলায় যে মাটি কাঁপে, ওপরে আকাশও যে কাঁপে তা বোধহয় কোনো পুরুষই জানে না।

চবম উল্লাসে তিনি আঃ আঃ শব্দ করতে লাগলেন।

মুনি-কুমার তাঁর ক্রীড়া সাঙ্গ কবা মাত্রই রমণী-রাজার ইচ্ছে হল, আবার হোক, আবার হোক। এই যুবা তাকে পীড়ন করুক, দংশন করুক, তাকে স্বর্গ সুখ দিক।

সেই যুবা-ঋষিকেই বিয়ে করে রমণী-রাজা বনের মধ্যে পর্ণকুটিরে ঘর-সংসাব করতে লাগলেন।

বেশ কয়েক বছর পর সেই রাজার প্রাক্তন রাজ্যের মন্ত্রী ও পাত্র মিত্রের দলবল সেখানে এসে উপস্থিত হয়ে ঋষিপত্নীর সামনে সসম্মানে অভিবাদন করলেন।

মন্ত্রী বললেন, হে আত্মবিস্মৃত রাজা ভঙ্গস্বন, আমবা অতিকষ্টে আপনাকে খুঁজে পেয়েছি। ইন্দ্রের সঙ্গে আপনি একবার কলহ করেছিলেন, সেইজন্য ইন্দ্র আপনার মনে মোহ এনে দিয়ে আপনাকে নাবীতে পরিণত করেছেন। আমরা যাগ-যজ্ঞে ইন্দ্রকে তুষ্ট করেছি। ইন্দ্র আবাব আপনাকে পূর্ব অবস্থা ফিরিয়ে দিতে রাজি হয়েছেন।

ঋষিপত্নীর সব কথা মনে পড়ে গেল। তিনি ফিক করে হাসলেন।

মন্ত্রী হাত জোড় করে বললেন, রথ প্রস্তুত, আপনি চলুন!

ঋষিপত্নী বললেন, পাগল নাকি! কোনো রমণী কখনো পুরুষ হতে চায়? হে মন্ত্রী, পৃথিবীর কোনো পুরুষ এতকাল ধরে যে গুপ্তকথা জানতে পারে নি, আমি তা জেনেছি। পুরুষরা তো চতুর্দিকে দাপিয়ে বেড়ায় কিন্তু প্রতি মুহূর্তে নারীদের কাছে এসে পরাভূত হয়। শরীবের যে কী আনন্দ তা পুরুষবা সঠিক ভাবে কোনদিন টেরই পেল না। আমি যেমন আছি, চমৎকার আছি। এই আনন্দের তুলনায় রাজপদ অতি তুচ্ছ। আপনারা ফিবে যান। আমাব আগের ছেলেদের সিংহাসন দিন। আমার এই পক্ষের সন্তানদের প্রতি স্নেহ বেশি। তাদের ছেড়েও কোথাও যেতে পারব না।

বহুকাল পর। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে, ভীষ্ম যখন শরশয্যায় শুয়ে দক্ষিণায়নের প্রতীক্ষা করছিলেন, তখন যুধিষ্ঠির তাঁর কাছ থেকে অনেক জ্ঞানের কথা জেনে নিতে নিতে একবার প্রশ্ন করেছিলেন, আচ্ছা, পিতামহ, নারী ও পুরুষের মধ্যে যৌনসুখ কে বেশি পায়?

ভীষ্ম বললেন, তোমাকে আমি ভঙ্গস্বন রাজার উপাখ্যান শোনাচ্ছি।

কাহিনীটি শুরু করার আগে ভীষ্ম প্রথমে মৃদু হাস্য করলেন। মনে মনে ভাবলেন, তাঁর এই ধার্মিক নাতিটি সত্যিই বড় গো-বেচারা। কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছুই নেই। এই প্রশ্ন কি কেউ কোনো মৃত্যুপথযাত্রী জিতেন্দ্রিয় পুরুষকে করে?

তারপরই ভীষ্মের একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। যেন এক বায়ুময় হাহাকার! জিতেন্দ্রিয়? সাধারণ মানুষের চারগুণ লম্বা একটা জীবন কাটিয়ে গেলেন, তবু নারীর রহস্য কিছুই জানলেন না। ব্যর্থ, ব্যর্থ, সব বার্থ!